ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

ড. এম উমর চাপরা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলাম
ও
অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

লেখক
ড. এম উমর চাপরা

অনুবাদ
ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
ড. এ. কে. এম সালেহ্ উদ্দিন
খন্দকার রাশেদুল হক
আমানুল্লাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

ড. এম উমর চাপরা

অনুবাদ

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
এ. কে. এম সালেহ উদ্দিন
খন্দকার রাশেদুল হক
আমানুল্লাহ

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা - ১২৩০, ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৯৫০২২৭, E-mail : biit_org@yahoo.com
Website : www.iiitbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ : ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

ISBN : 984-8203-25-1

মুদ্রণ

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র। US $ 10

This is the Bengali version of Islam and the Economic Challenge by Dr. M. Umer Chapra, jointly published by the Islamic Foundation UK and the International Institute of Islamic Thought, USA, translated into Bengali by Dr. Miah Muhammad Ayub, AKM Salehuddin, Khandker Rashedul Haque and Amanullah, and published by the Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227, E-mail : biit_org@yahoo.com, Web : www.iiitbd.org, Price : Tk. 250, US $ 10

শ্রদ্ধেয়
পিতা-মাতাকে

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

(سورة الإسراء، ٢٤)

হে আল্লাহ, তুমি তাঁদের প্রতি রহমত কর, যেমনি তাঁরা
স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে পালন করেছেন।

(আল কোরআন : ১৭:২৪)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ড. এম উমর চাপরা লিখিত 'Islam and the Economic Challenge' বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এ জন্য আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি ইংরেজিতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুক্তরাজ্য ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ইউ.এস.এ-এর যৌথ উদ্যোগে। বাংলা ভাষায় বইটির রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতির বাংলাভাষী পাঠকের সামনে ইসলামী অর্থনীতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

ড. উমর চাপরা বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। এই বইয়ে তিনি প্রচলিত ও অতীতে অনুসৃত বিভিন্ন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মজবুত একাডেমিক ভিত্তি দান করেছেন। তিনি বিশেষত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নানাবিধ অসংগতি আলোচনার পাশাপাশি কল্যাণ রাষ্ট্র, উন্নয়ন অর্থনীতি ইত্যাদি প্রপঞ্চসমূহের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছেন। অতঃপর তিনি ইসলামী বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশলের আলোকে মানব সম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন, সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ, কৌশলগত নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। বইটি গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক এবং সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সকলকেই তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর বিবেচনা ও সুদূরপ্রসারী পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি।

বইটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন চারজন অভিজ্ঞ অনুবাদক। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের অনুসন্ধিৎসা পূরণ করলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০০

এম, জহুরুল ইসলাম
সেক্রেটারী জেনারেল, বিআইআইটি

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ ড. এম উমর চাপরা লিখিত 'Islam and the Economic Challenge' বই এর বাংলা অনুবাদ 'ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ' বইটির প্রথম সংস্করণ ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। পাঠক সমাজে বইটির ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। এ সংকরণটি ডঃ মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। এর ফলে বইটির উপযোগিতা ও মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমরা মনে করি। আশা করি, পূর্বের ন্যায় এ সংস্করণটিও পাঠকবৃন্দ পছন্দ করবেন এবং তারা এ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

এ সংস্করণ প্রকাশনায় বিআইআইটিকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বর্তমানে বিদেশে পিএইচডি অধ্যয়নরত বিআইআইটি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আজিজ, কবি ওমর বিশ্বাস, জনাব মোঃ আফতাবুজ্জামান ও মোঃ জহিরুল হক খান। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

সূচি

মুখবন্ধ

সমাজতন্ত্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির পতনের পর সকলের কাছে মানবসভ্যতার মতাদর্শিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এটা কি ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদের সমর্থক অতি উৎসাহী লোকদের দাবি অনুযায়ী পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারবাদের দ্ব্যর্থহীন বিজয়, না তা ইতিহাসের গতিধারায় ক্রমঃপতনশীল অবস্থার একটি পর্যায় মাত্র? যদি সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব অসংগতি ও অসমতার ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাকে তাহলে এটা কী প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদ তার ঐতিহাসিক অসংগতি, অবিচার ও ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে? যদি পুঁজিবাদের কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যর্থতার জন্য আংশিকভাবে হলেও সমাজতন্ত্রের উত্থান ঘটে থাকে তাহলে তা ব্যর্থ হলো কেন, এ ব্যর্থতা কি অলীক? অথচ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পরে দ্রুত বিকল্প খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের বিশাল সৌধ ভেঙে চুরমার হওয়ার প্রেক্ষাপটে মানুষের মন ও বিবেকের দুয়ারে জটিল প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

'ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ' বইটি এসব প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার জন্য একটি সময়োচিত প্রচেষ্টা। এতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যথার্থ উত্তর খুঁজে বের করার জন্য পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই, বরং অন্যান্য ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও এর সীমা বিস্তৃত হতে পারে। মানব জাতির সামনে একটি বৈপ্লবিক সুযোগ উন্মোচিত হতে পারে যদি কারো অনুসন্ধিৎসু মন আন্তরিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যকে পরীক্ষা করে দেখেন, যাতে তারা ইসলামী আদর্শের আলোকে এ যুগের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনকভাবে দিয়েছেন। মানবজাতি পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে বিগত তিনশ বছরে চারটি প্রধান অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, সেগুলো পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এসব মতবাদই মৌলিকভাবে বৈশিষ্ট্যগতভাবে একই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয়; বরং অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্থনৈতিক আচরণের সূত্র দ্বারাই সমাধান করা যায় এবং নৈতিক সামাজিক বিধিবিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদ তার সৌধ নির্মাণ করেছিল বল্গাহীন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মুনাফার অভিপ্রায় ও বাজারব্যবস্থার নীতির উপর। সমাজতন্ত্র মানবজাতির জন্য সুখ-সমৃদ্ধি খুঁজেছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সামাজিক প্রণোদনা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে। এ দু'য়ের সমন্বয়ে ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও

সামরিক উচ্চাভিলাসের জন্ম দেয়। কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এসব মতবাদের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও তা মানবজাতির প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ পতিত দেবতা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এখন এটা ধারণা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে যে, সমাজতন্ত্রের পতন পুঁজিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের যথার্থতা প্রমাণ করে।

আমাদের সময়কালের অর্থনৈতিক সংকট এখনও আগের মতোই তীব্র ও বিপন্ন রয়ে গেছে। সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য একই সঙ্গে একটি দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সার্বিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ড. মুহাম্মদ উমর চাপরার 'Islam and Economic Challenge' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী প্রয়াস। ড. চাপরা পেশাজীবী অর্থনীতিবিদ। তিনি করাচী ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস ও সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ, পাকিস্তান এর মতো বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন, প্লাটভাইল ও কেনটাকি, লেক্সিনটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বিগত ২৬ বছর ধরে তিনি সৌদি অ্যারাবিয়ান মনিটারি এজেন্সির সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এ কারণে তিনি অর্থনীতির তত্ত্বগত জ্ঞান ও বাস্তব প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে গভীরভাবে দেখার বিশেষ সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে তার পাশ্চাত্য ও ইসলামী উভয় দিকের ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। বিগত ১৫ বছর ধরে তিনি অর্থনীতির ইসলামিক তত্ত্ব উন্নয়নের জন্য গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজ করছেন। এর আগে তিনি 'টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম' শীর্ষক একটি গ্রন্থ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লেস্টার, ১৯৮৫) রচনা করে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাবিদ মহলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার (১৯৯০) এবং ইসলামিক স্টাডিজের জন্য বাদশাহ ফয়সল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে ড. চাপরা বর্তমান সময়কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকতর মৌলিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে সমাধান তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন।

'Islam and Economic Challenge' শীর্ষক বইটি এক দশকের গবেষণা ও চিন্তার ফসল। তার এই শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মে তিনি অত্যন্ত সূক্ষভাবে ও পাণ্ডিত্যের সাথে পাশ্চাত্যের প্রধান তিনটি অর্থব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি বাস্তবসম্মত ব্যালান্স শিট তৈরি করেছেন। তিনি

অর্থনীতির ইসলামী তত্ত্ব ও তার সমস্যাসমূহ তুলে ধরে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ এবং কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যাপক অর্থে তিনি মুসলিম বিশ্বে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্যে যে উপাদান পেশ করেন তার মধ্যে রয়েছে বাজারব্যবস্থার জন্যে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নৈতিক ছাঁকনির প্রয়োগ, অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্যাপকভিত্তিক প্রনোদনা এবং একটি সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার।

ড. চাপরা একজন সুদক্ষ সমাজ বিজ্ঞানী ও বস্তুনিষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাবিদ হিসেবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার সমস্যাবলী সম্পর্কে তার ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ধারণা রযেছে; ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তার উপস্থাপনা যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও সমসাময়িক মুসলিম সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচনা তিনি এমন সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন যাকে এক কথায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও নির্দেশনাত্মক বলা যেতে পারে। 'Islam and Economic Challenge' গ্রন্থটি নিছক কোনো তত্ত্বীয় গ্রন্থ নয় বরং নীতি নির্ধারকদের জন্যেও অনেক প্রাসঙ্গিকতা এতে রয়েছে এবং তা শুধু মুসলিম বিশ্বের জন্যই নয়, সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য।

আমি মনে করি 'Islam and Economic Challenge' গ্রন্থটি সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর একটি উন্নতমানের গ্রন্থ এবং তা সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী তত্ত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

ড. চাপরার এই অনুপম অবদানের পেছনে রয়েছে তার চিন্তা ও ধ্যান ধারণার বাস্তব প্রয়োগ। তিনি সমস্যাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন; বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যকে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে ইসলামিক বিকল্প ব্যাখ্যা করেছেন।

ড. চাপরা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেন যে, শুধু বস্তুগত সম্পদের পিছনে ছুটলে মানুষের কল্যাণ অর্জিত হয় না, দক্ষতা ও সমতার বিষয়টি কেবল তখনই প্রয়োগিক ধারণা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যদি বিষয়টিকে নৈতিক মূল্যবোধ ও আর্থসামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করা হয়। তিনি মানুষকে অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পুনঃ আবিষ্কারের কৈফিয়ত দিয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যের একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদের মতোই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন উপকরণ যথাসম্ভব কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নত চিন্তাধারা সমৃদ্ধ একটি

নতুন সৌধ নির্মাণ করা যা নৈতিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং যেখানে এমন একটি আর্থসামাজিক কাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং একই সঙ্গে দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা সমাজের বিশেষ কোনো শ্রেণীর জন্য নয় বরং সমগ্র মানবতার জন্য নিশ্চিত করা হয়। নৈতিক চেতনা সঞ্জাত এবং কয়েক শতাব্দীর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি অর্থনীতিকে বিবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তী এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন যা মানুষের সাধারণ প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি তা নিছক সুবিধাভোগীদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কল্যাণের জন্যই সে অর্থনীতির হারানো গতিপথ পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। আগামী দিনের সেই লক্ষ্যেই 'Islam and Economic Challenge' গ্রন্থটি একটি পদক্ষেপ।

খুরশীদ আহমদ
লেস্টার
৩ জানুয়ারি ১৯৯২
২৭ জামাদা আল-সানী ১৪১২

প্রারম্ভিক কথা

প্রায় সকল মুসলিম দেশেই চলমান ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত কর্মসূচী রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মানব জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যে সংকট মোকাবিলা করছে তা উত্তরণে ইসলামকে একটি কল্যাণমুখী ব্যবস্থা উপহার দিতে হবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বহির্দেশীয় ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা করছে। এজন্য এমন একটা বিশেষ কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে এ দু'য়ের ব্যবধানকে নিয়ন্ত্রণসাধ্য সীমার মধ্যে সামনে আনা যায় এবং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করা যায়। মুসলিম দেশগুলো কি পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের বিশ্ববিপণনের আওতায় কোনো কৌশল প্রণয়ন করতে পারে? ইসলাম কি তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে? যদি তাই হয় তাহলে ইসলামী শিক্ষায় কোন ধরনের নীতিমালা নিহিত রয়েছে? এ গ্রন্থে এসব বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়াটি ইসলামী ও প্রচলিত অর্থনীতির প্রায় ডজনখানেক পণ্ডিতের কাছে প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেনঃ সৌদি আরবের ড. এম আনাছ জারকা, ড. এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. মুনাওয়ার ইকবাল এবং ড. ফাহীম খান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর কেনেথ বোল্ডিং, প্রফেসর ইভার্ট হেগেন, প্রফেসর ফ্রাংক ভোগেল এবং যুবায়ের ইকবাল, যুক্তরাজ্যের প্রফেসর রুডনী নীনহাস এবং পাকিস্তানের প্রফেসর খুরশীদ আহমদ।

সকলেই তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে যত্নসহকারে আমার পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছেন এবং মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন, এজন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের পরামর্শের আলোকে আমি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছি। ফলশ্রুতিতে মূল অভিসন্দর্ভ অপরিবর্তিত থাকলেও তাদের মতামতের আলোকে সম্পাদনার ফলে এটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমি বিশেষ করে ড. জারকা, ড. মুনাওয়ার ইকবাল এবং প্রফেসর কেনেথ বোল্ডিং এর তীক্ষ্ম সমালোচনা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি এবং তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রথমোক্ত তিনজন সৌদি আরবে বসবাস করার সুবাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে মূল্যবান সময় দিয়েছেন। এরূপ আলোচনার ফলে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি ইসলামী নীতি কৌশলের যুক্তিকে জোরদার করতেও সহায়ক হয়েছে।

সুতরাং পাঠকগণ যদি বইটিকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন তাহলে এর কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য অংশ উপরে উল্লিখিত পন্ডিতজনদের প্রাপ্য হবে। অবশ্য তাদের কেউই চূড়ান্ত খসড়াটি দেখেননি। ফলে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে সেজন্য আমাকেই দায়ী করতে হবে। বইটির কলেবর যাতে বৃদ্ধি না পায় এবং কৌশলগত পরিভাষায় ভারাক্রান্ত না হয় সেজন্য তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিরত ছিলাম। এ বইতে

প্রকাশিত মতামত আমার নিজস্ব, আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি আমার মতামতের সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

ক্ল্যাসিকাল ও ইসলামী অর্থনীতির চলতি গ্রন্থাবলীর কাছে আমি এতটাই ঋণী যে, পাদটীকায় বিপুলসংখ্যক তথ্যসূত্রের উল্লেখ করা সত্ত্বেও দায়িত্ব শেষ হয় না। অধিকন্তু অর্থনীতির উপর বর্তমানে প্রকাশনার সংখ্যা এত বেশি যে, ব্যাপকভাবে তথ্যসূত্রের নির্দেশ সম্ভব নয়, বিশেষত এ ধরনের একটি বইতে, যেখানে তিনটি বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাকে বেছে বেছে তথ্যসূত্র নির্বাচন করতে হয়েছে। অবশ্য এমন কিছু তথ্যসূত্র বাদ পড়ে যেতে পারে যা অন্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বইটির কলেবর বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই কেবল অন্য ভাষার বর্ণান্ত ব্যবহার করা হয়েছে। আমি ইসলামের বাণীকে বিশেষভাবে বুঝানোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরবি শব্দ ব্যবহার করেছি; ইংরেজি অনুবাদ করা হলে ইসলামী পরিভাষায় মূল ভাবার্থটি প্রস্ফুটিত হতো না।

এই বইটি রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে আরো অনেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের কাছেও ঋণী। এদের মধ্যে আমার স্ত্রী ও আমার সন্তানদের আমার প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। আমার ভ্রাতৃদ্বয় আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ আমাকে অব্যাহত উৎসাহ দেন। আমি আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, টি. বি. ইরভিং ও মুহাম্মদ আসাদের পবিত্র কোরআনের অনুবাদ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি, যদিও তাদের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হয়নি। ফিকাহ্, হাদিস ও অন্যান্য আরবি গ্রন্থের অনুবাদ আমার নিজস্ব। আমার মেয়ে সুমাইয়া অনুবাদের কতকগুলো জটিল সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেছে। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে মুদ্রণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ড. এম.এম. আহসান ও অন্যান্য ভাইদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি রচনাকালে গবেষণা ও দাপ্তরিক সহায়তা প্রদানে দক্ষতার সাথে সাহায্য করার জন্য আমি জনাব মবিন আহমদের কাছে ঋণী রইলাম। আল্লাহতায়ালা এদের সবাইকে তাদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত করুন!

এম. উমর চাপরা
রিয়াদ, সৌদি আরব
১১ জুমাদা আল-আখিরা ১৪১১, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০

পুনশ্চ ঃ

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর সোভিয়েত অর্থব্যবস্থার পতন ঘটে এবং ৫০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর সুইডিশ সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এ ঘটনার ফলে এ পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্যের যথার্থতা পুনরায় প্রমাণিত হলো, বিশেষ করে এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৯ রবিউল আউয়াল ১৪১২, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

ভূমিকা

শরীয়াহর গূঢ় উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। যা কিছু এই পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে তাই জনস্বার্থ বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য।

- আল গাজালী[১]

শরীয়াহর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান এবং পার্থিব জগত ও পরকালে জনগণের কল্যাণ সাধন। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সুখ-সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে। যেখানে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে নির্যাতন, দয়ার স্থলে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য এবং জ্ঞানের বদলে মূর্খতা স্থান পায়, সেখানে শরীয়াহর কিছু করণীয় নেই।

- ইবন আল-কাইয়েম[২]

চ্যালেঞ্জ

সকল সমাজেরই স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। অবশ্য কল্যাণের মৌলিক উপাদান কি এবং কিভাবে অর্জিত হয়, সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও একমাত্র বস্তুগত অবস্থাই কল্যাণের উপাদান নয়, তথাপি আধুনিক সেকুলারতার ধারণায় প্রাথমিকভাবে ঐ সকল বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বলা হয় যে, কতিপয় বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করা পর্যন্ত কল্যাণ বা সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয় না। এসব লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছেঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ, সকল ব্যক্তির বস্তুগত মৌলিক চাহিদা পূরণ, সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকের সুযোগের লভ্যতা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন। অবশ্য বিশ্বের ধনী-গরীব নির্বিশেষে এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশ এসব বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতিতে এ সকল বস্তুগত লক্ষ্য নিশ্চিত অর্জনের সক্ষমতা দাবি করা হয়, সেখানেও তা শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটেরও সম্মুখীন হয়েছে, যাকে নিঃসন্দেহে ব্যবস্থাটির (system) ব্যর্থতা বলতে হবে। বাজার অর্থনীতির দেশগুলো গর্বের সাথে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে যাচ্ছে যে, বাজারব্যবস্থা অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে উৎকৃষ্ট। তবে সামষ্টিক অর্থনীতির (Macroeconomic) ভারসাম্যহীনতা অর্থনীতির ঘনঘন ওঠানামা, উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব, অতিরিক্ত বাজেট ও বাণিজ্যিক লেনদেন ঘাটতি, এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ও শেয়ার বাজারের পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে তাদের ব্যর্থতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জটিল বৈদেশিক ঋণ সমস্যায় মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আক্রান্ত, যা শুধু

তাদের ভবিষ্যতের উন্নয়নকেই নয় বরং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কাঠামো ও অস্তিত্বকেও হুমকির সম্মুখীন করছে।

অধিকন্তু এসব সমস্যার সাথে সাথে বিশ্বের সকল দেশই বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের নবায়ন অযোগ্য (non-renewable) প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। মানুষের জীবনে ক্রমবর্ধমান চাপ, উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার সাথে অস্থিরতার ক্রমবর্ধিষ্ণু লক্ষণসমূহ, যেমন হতাশা, অপরাধ প্রবণতা, নেশা, মাদকাসক্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু নির্যাতন, মানসিক অসুস্থতা ও আত্মহত্যা এসব কিছুই মানুষের ব্যক্তি জীবনে আত্মতৃপ্তির অভাবের পরিচায়ক।

এ গ্রন্থে প্রধানত যে মুসলিম দেশগুলোর উপর আলোকপাত করা হবে, সেগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। এ দেশগুলোতেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মৌলিক চাহিদা অপূরণীয় রয়েছে; অপরদিকে ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশ স্বচ্ছলতার সাথে বাস করছে। বিত্তের পাশাপাশি দারিদ্র্যের অস্তিত্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সামাজিক সংহতিকে ক্রমশ ক্ষয় করে দিচ্ছে এবং তা অপরাধ প্রবণতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে। এসব দেশের অধিকাংশই চরম সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার (macroeconomic imbalance) সংকটে নিপতিত। মুসলিম দেশগুলোর ক্ষেত্রে এসব দুর্বলতা আরো মারাত্মক। কারণ মানব মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারকে ইসলাম আপসহীন গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবকল্যাণের সকল অপরিহার্য উপাদানগুলো নিশ্চিত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসকল কথা অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে পর্যবসিত হবে।

দক্ষতা ও ন্যায়পরতা

এমন কেন হলো যে, বিশ্বের কোনো দেশই মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির বস্তুগত উপাদানগুলো পর্যন্ত বাস্তবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি? এ ব্যর্থতার জন্য কি সম্পদের অপ্রতুলতাকে দায়ী করা যায়? অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই নেতিবাচক জবাব দিতে চাইবেন, কারণ প্রকৃত বিচারে তারা সম্পদকে নিরঙ্কুশভাবে দুষ্প্রাপ্য বলে বিবেচনা করেন না। কেবল সম্পদের উপর দাবির প্রেক্ষিতেই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ স্বীকার করেন যে, সম্পদের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও যদি লভ্য সম্পদ 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা'র সাথে ব্যবহার করা যায় তাহলে বস্তুগত লক্ষ্য অর্জন এবং অস্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যহীনতা দূর করা সম্ভব।[৪] এটা হচ্ছে মানবতার প্রতি সম্ভাব্য সেই চ্যালেঞ্জ যাতে লভ্য সম্পদ 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা'র সাথে ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত বস্তুগত সুখ-সমৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে এবং

অস্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যহীনতা দূর করবে। 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা' এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বহু জটিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এসে যায়।

'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। এ আলোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞা হবে সেটি, যা বিশ্বজনীন স্বীকৃত বস্তুগত লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলা যেতে পারে যে, একটি অর্থনীতি কাম্য দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যদি লভ্য মোট কার্যক্রম জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদকে কর্মসংস্থানে এমনভাবে নিয়োজিত করা যায়, যাতে যুক্তিসংগত পর্যায়ের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংরক্ষিত (reserved) হারে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিসহ সর্বাধিক সম্ভাব্য পরিমাণ চাহিদা পূরণকারী পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। সামষ্টিক অর্থনীতিতে দীর্ঘায়িত অথবা পৃথিবীতে মানুষের জীবন বিপন্ন করে এরূপভাবে পরিবেশ নষ্ট না করে সমাজের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য সুফল অর্জনে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন এসে যায়।

একটি অর্থনীতি সমতা (equality) অর্জন করতে পারে, যদি তার উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এমনভাবে বণ্টন করা হয়, যাতে সকল মানুষের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা যায় এবং কাজের প্রেরণা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উদ্যোগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন করা যায়। যেহেতু দক্ষতা ও সমতার বিষয়টি বাস্তবে রূপদান করার কাজটি মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাজ, সেহেতু সবচেয়ে যুক্তিসংগত পন্থা হবে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা যা ঐ দুটো জিনিসকেই কার্যকর করতে সাহায্য করবে।

তিনটি প্রশ্ন

দক্ষতার সাথে সম্পদের বরাদ্দ এবং ন্যায়পরতার সাথে তার বণ্টন করতে হলে প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই তিনটি সুপরিচিত মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যেমন কি, কিভাবে ও কার জন্য উৎপাদন করা হবে? অর্থাৎ কি পরিমাণ কোনো বিকল্প পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা হবে? কি কি সম্পদের সমন্বয়ে ও কি প্রযুক্তির সাহায্যে সেগুলো উৎপাদন করবে? এবং উৎপাদিত সেবা কে কতটুকু ভোগ করবে?[৫] এ প্রশ্নগুলোর উত্তর শুধুমাত্র একটি অর্থনীতিতে সম্পদের বরাদ্দই নয় বরং ব্যক্তি মানুষের মধ্যে তার বণ্টন এবং বর্তমান (ভোগ) ও ভবিষ্যতের (সঞ্চয় ও বিনিয়োগ) মধ্যকার বণ্টনকেও নির্ধারণ করে দেয়। বরাদ্দ ও বিতরণ অর্থনীতির প্রধান অংশ দখল করে আছে এবং এগুলোই অবশেষে নির্ধারণ করে দেয় সকল ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয়েছে কিনা, অন্যান্য সকল কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং জনগণকে তাদের পূর্ণাঙ্গ কর্মশক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করা হয়েছে কিনা? একটি অর্থনীতির চূড়ান্ত পরীক্ষা তার ঘোষিত লক্ষ্যে নয়, বরং তার বাস্তবায়ন কতটুকু হলো তার উপর নির্ভরশীল।

বিশ্ববীক্ষণ (World View) ও কৌশলের ভূমিকা

আপাত দৃষ্টিতে যদিও তিনটি প্রশ্নই সোজাসাপটা, কিন্তু তা গভীর মূল্যবোধসঞ্জাত, শূন্যের উপর তার উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এর একটি বিশ্ববীক্ষণ (world view) অথবা ভিত্তিমূল দর্শন এবং কৌশল থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষণ দিয়ে প্রভাবিত এবং বিশ্বজাহানের উৎপত্তি এবং মানব জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে এক প্রকার অন্তর্নিহিত ও প্রকাশমান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থার লোভেজয়ের (Arthur Lovejoy) মতে এই বিশ্ববীক্ষণ 'প্রায় যে কোনো বিষয়ের উপর মানব প্রকৃতির প্রতিফলনকে নিয়ন্ত্রণ করে'।[৬] মানব প্রকৃতি সম্পর্কে মতপার্থক্যের ফলশ্রুতিতে মানব জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য, মানুষের আওতাধীন সীমাবদ্ধ সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা ও উদ্দেশ্য, অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ এবং দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ড সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণারও পার্থক্য ঘটে। একটি ভবনের ভিত্তির মতোই এরূপ একটি বিশ্ববীক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও একই রকম ভূমিকা রাখে, এমনকি সহায়ক ভিত্তিমূল সর্বদা একইভাবে অদৃশ্য ও অনুল্লেখ্য হওয়া সত্ত্বেও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা পালন করে থাকে। পদ্ধতিগত কৌশল এই বিশ্ববীক্ষণের একটি যৌক্তিক ফলশ্রুতি। বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর করার জন্য কৌশল হিসেবে থাকতে হবে কতগুলো অপরিহার্য উপাদান। এতে থাকতে হবে একটি পরিশোধন পদ্ধতি (filter mechanism), যার ভেতর দিয়ে সকল দাবি অদৃশ্য বা দৃশ্যমান হাত দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, যাতে সম্পদ ও তার উপর দাবির মধ্যে একটা ভারসাম্য বিধান এবং কাম্য দক্ষতা ও সমতা বাস্তবায়িত করা যায়। এতে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে ব্যক্তি তাদের নিজেদের এবং সমাজের স্বার্থে সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এতে আরো থাকতে হবে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য একটি কার্যকর পন্থা, যাতে করে যতক্ষণ সর্বাধিক দক্ষতা ও সুষম বরাদ্দ ও বন্টন অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এক হাত থেকে অন্য হাতে সম্পদের হস্তান্তর দ্রুততর হয়।

যদি একটি ব্যবস্থার (system) বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশল তার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে লক্ষ্যও বাস্তবায়ন করা যায় না। একটি আমগাছ জন্মাবার জন্য একটি আমের বীজ দরকার, এজন্য একটি লেবুর বীজ তা যত ভালোই হোক না কেন কোনো কাজে দেবে না।[৮] যে ব্যবস্থায় তার লক্ষ্য এবং বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশলের মধ্যে অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান তা তার অর্থনীতির কাঠামো ও সংগঠন এবং জীবনধারার মধ্যে মৌলিক বিন্যাস ঘটাতে সক্ষম নয়। সুতরাং সেগুলো হয় সংকটপ্রবণ। এরূপ ব্যবস্থায় বসবাসকারী জনগণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির শিকার হয় যা পূরণ করা যায় না এবং এতে কিছু ছোট ধরনের সমন্বয় করা হলে তা কোনো ব্যাপারই নয়। এরূপ ছোটখাট সমন্বয় সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এগুলো নিছক সামঞ্জস্যহীনতার লক্ষণগুলোকে প্রতিরোধ করে।

কিন্তু বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশল এবং লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্যাগুলো প্রতিবারে ভিন্ন অবয়বে অধিকতর মারাত্মক এবং আরো অবনতিশীলভাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহ

সৃষ্টিজগত ও প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং মানব জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জীবন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষণ ও অন্তর্নিহিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটি ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা কৌশল গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে- পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও তাদের যুক্তফল সেকুলারিজম। এ সকল ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করার কারণে তার মূল বক্তব্যেও উল্লেখযোগ্য সংশোধন এসেছে এবং সমস্যা সমাধানের জন্যই পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এসবের বর্তমান অবস্থা তার মূল থেকে দূরে সরে এসেছে। বিভিন্ন ব্যবস্থার সংশোধনী সত্ত্বেও এসব ব্যবস্থার ফলে ঐ সকল দেশে যে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং আপেক্ষিকভাবে তাদের যে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে তারপরও এদেশগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্নভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদের মধ্যে আবার অনেকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা করেছে। তাদের সমস্যা অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বাড়ছে এবং সাধারণ লোক এসব সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে।

এ গ্রন্থে যে সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করা হবে, সেগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামোর সম্ভাব্য অথচ অকস্মাৎ ঘটনা (contingent event) নয়। বরং সেগুলো ঐ ব্যবস্থাসমূহের নিজস্ব অন্তর্নিহিত কাঠামোগত দুর্বলতার সহজাত ও মোটামুটি অপরিহার্য পরিণতি। এসব দুর্বলতা হচ্ছে তাদের লক্ষ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি, যার উৎস নিহিত রয়েছে তাদের বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশলে। এগুলো সেকুলারিজমের ফল এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে বৈসাদৃশ্যের প্রতিফলন। অতএব ব্রুটের ভাষায় বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোর নিজেদের যেখানে 'মানুষের শুদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পুনঃচিন্তা' প্রয়োজন, সেখানে তাদের পক্ষে এমন কোনো আদর্শ (model) দেয়া সম্ভব নয় যা মুসলিম দেশগুলো অনুকরণ করতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অনুসরণকারী দেশগুলো যেখানে পৌঁছেছে তার কাছাকাছি পৌঁছতেও মুসলিম দেশগুলোর কয়েক দশক লেগে যাবে।

বিকল্প ইসলামী ব্যবস্থা

ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা পোষণ করে যা বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এর উৎস হচ্ছে শরীয়াহ' এবং এর থেকে তার বিশ্ববীক্ষণ, লক্ষ্য ও কৌশলের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী সেকুলার

ব্যবস্থার মতো ইসলামের লক্ষ্য (মাকাসিদ আল-শরীয়াহ) মৌলিকভাবে জড় ও বস্তুগত বিষয় নয়। বরং এর ভিত্তি হচ্ছে মানবকল্যাণ (ফালাহ) ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন (হায়াতে তাইয়্যেবা) যাতে ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রয়োজন হয় সকল মানুষের জন্য একটি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার।[১০] এর কারণ হলো, সেই ঈমান, যাতে বলা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তার উপর নির্ভরশীল হিসেবে সকল মানুষই সমান এবং আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সকলের প্রকৃত কল্যাণ সাধন না করা পর্যন্ত তারা মনের প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি লাভ করে না।

মাকাসিদ আল-শরীয়াহ

'মাকাসিদ আল-শরীয়াহ' (এ পুস্তকে সংক্ষেপে 'মাকাসিদ' ব্যবহার করা হবে) হচ্ছে শরীয়াহর সীমার মধ্যে থেকে 'ফালাহ' ও হায়াতে তাইয়্যেবা বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সব কিছুই। শুরুতে গাজালীর যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, মাকাসিদ হচ্ছে ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই।

গাজালী বিজ্ঞতার সাথেই মাকাসিদের তালিকায় ঈমানকে শীর্ষে রেখেছেন। কারণ ইসলামী বিষয়বস্তুতে ঈমান হচ্ছে মানবকল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঈমান মানুষের সম্পর্ককে একটি যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষের সকল কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সযত্ন মিথস্ক্রিয়ায় সক্ষম করে তোলে। এতে আরো রয়েছে একটি নৈতিক পরিশোধন পদ্ধতি (moral filter) যাতে ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের মানদণ্ড অনুসারে সম্পদের বরাদ্দ ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটি উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থায় (motivating system) চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করে। মানবীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তথা গৃহস্থালী, সংস্থার বোর্ড মিটিং, বাজার অথবা কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক পরিষদ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে ঈমানকে অনুপ্রবিষ্ট করা না গেলে সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা অথবা অপরাধ, বিবাদ-বিসংবাদ, উত্তেজনা ও অস্থিরতার বিভিন্ন লক্ষণসমূহ দূর করা যাবে না।

নৈতিক পরিশোধনের পথ অবলম্বন ব্যতীত দক্ষতা ও ন্যায়পরতার সংজ্ঞা নির্ণয় সম্ভব নয়।[১১] ফ্রাঙ্ক নাইট যথার্থ বলেছেন, ভৌত বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো 'বস্তু না সৃষ্টি করা যায়, না ধ্বংস করা যায়'। ভৌত মাপকাঠিতে মোট আউটপুট (output) সর্বদাই মোট ইনপুটের (input) সমান হবে। অতএব দক্ষতার সঠিক সংজ্ঞা আউটপুট ও ইনপুটের অনুপাতের মধ্যে নির্ণীত হবে না, বরং তা হবে কার্যকর আউটপুট (useful output) এবং মোট আউটপুট অথবা ইনপুটের

অনুপাতের ভিত্তিতে।[১২] এর অর্থ হচ্ছে দক্ষতা পরিমাপের জন্য দরকার এর প্রয়োজনীয়তার (usefulness) পরিমাপ। পরবর্তীতে এ গ্রন্থে যুক্তি উপস্থাপিত হবে যে, যদি সকলের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার ও মূল্য কোনো পরিমাপক হতে পারে না। পরিপূরক হিসেবে সমাজসম্মত নৈতিক পরিশোধন পদ্ধতি প্রয়োজন। যদি নৈতিক মানদণ্ড ছাড়া দক্ষতা সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হয়, তাহলে এসব ব্যতীত ন্যায়পরতার (equity) সংজ্ঞা নির্ণয় করা আরো কঠিন হবে।

গাজালী সম্পদকে তালিকার সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছেন, কারণ তা নিজেই চূড়ান্ত বিষয় নয়; বরং সেটি হচ্ছে একটি মাধ্যম মাত্র যা মানবকল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্পদ নিজে কোনো সাহায্য করতে পারে না, যদি না তার বরাদ্দ দক্ষতার সাথে এবং বন্টন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করা হয়। অভীষ্ট সম্পদ অর্জন এবং কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক সংস্থা পরিচালনার জন্য কতিপয় নৈতিক মানদণ্ড প্রয়োজন, যার ইঙ্গিত আগেই দেয়া হয়েছে। যদি সম্পদ নিজেই একটি চূড়ান্ত বিষয় হয়, তাহলে তার পরিণাম হবে অবিচার, ভারসাম্যহীনতা ও পরিবেশগত অনাচার, যা অবশেষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকাংশের কল্যাণকে সংকুচিত করবে। মধ্যবর্তী তিনটি লক্ষ্য -জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি ও বংশধর- মানুষের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর এসবের কল্যাণ সাধনই শরীয়াহর উদ্দেশ্য।

এ তিনটি বিষয়ের উন্নতির লক্ষ্যে যে নৈতিক প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু তা সেকুলার পরিবেশে কেবলমাত্র মূল্য ও বাজারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব নয়। কেবল মাত্র ধনী ও উচ্চবিত্তদের নয়, বরং সকল মানুষের জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি ও বংশধরদের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান করতে হবে। সকলের ক্ষেত্রে এ তিনটি জিনিসের উন্নতির জন্য যা কিছু করা দরকার, তা একটি 'প্রয়োজন' (need) হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা পূরণ করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। যেমন– পর্যাপ্ত পুষ্টি, বস্ত্র, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য যথাযথ পরিচর্যা ও শিক্ষা, বাসস্থান, একটি সুষ্ঠু ও ভৌত পরিবেশ (ক্রমহ্রাসমান উত্তেজনা, অপরাধ ও দূষণ), চিকিৎসা সুবিধা, আরামদায়ক পরিবহন, সকল আবশ্যকীয় পারিবারিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য যথেষ্ট অবকাশ এবং সৎ পন্থায় উপার্জনের সুযোগ থাকতে হবে। সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের অবশ্যই একটা নির্দেশনা থাকতে হবে, যা এতসব বিষয়ে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে। এ সকল প্রয়োজন পূরণের ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ই শান্তিপূর্ণ, স্বস্তিকর, সুস্থ ও দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং 'ফালাহ' ও 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বাস্তবায়ন ও তাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। যে বরাদ্দ ও বন্টন 'ফালাহ' ও 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বাস্তবায়নে সাহায্য করে না, যা উপরে উল্লিখিত ইবন আল কাইয়্যেমের উদ্ধৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, তাকে দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচনা করা যায় না।

বিস্তীর্ণ ব্যবধান

দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণে শরীয়াহ্ ও মুসলিম দেশগুলোর বাস্তব অবস্থার মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান রয়েছে। এর মধ্যে দুটো কারণ হচ্ছে ঃ মুসলমানদের অধঃপতন এবং পরবর্তীতে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী উভয় সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শাসন-শোষণ। বর্তমান মুসলিম সমাজ ইসলামের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার প্রতিফলন ঘটায় না। সত্যি বলতে কি, সমাজের বিশাল অংশের মধ্যে ইসলামী সমাজের জন্য যে আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা নেই। মুসলিম দেশগুলোতে প্রধান আদর্শ ইসলাম নয়, বরং সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়ে গঠিত সেকুলারিজম। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের কোনো অংশেই প্রচলিত নেই। মুসলিম দেশগুলো বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের সেকুলার মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নীতির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের সমস্যার আরো অবনতি ঘটেছে এবং মাকাসিদের উপলব্ধি থেকে তারা বহুদূরে সরে যাচ্ছে। দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় ও সম্পদে বৈষম্যের আরো অবনতি ঘটেছে এবং তাদের জনগণের মৌলিক চাহিদা এখনো অপূরণীয় রয়ে গেছে। সরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি এবং একইভাবে লেনদেনের ভারসাম্যে (balance of payment) ঘাটতি এবং বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হুমকি তো রয়েছেই। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মাদ বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের ধারণা দৌড়ে পালিয়েছে। উন্নত অর্থনীতির সাথে আলোচনার মধ্যে সমাধান খোঁজ করার বিষয়টি বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তৃতীয় বিশ্বের কর্মকর্তারা এখন স্ফীত ঋণগ্রস্ততার মধ্য থেকে দরিদ্র দেশগুলোকে টেনে তোলার জন্য নতুন ধারণা উদ্ভাবনের মতো নিরুৎসাহমূলক কাজে নিয়োজিত।[১৩] কেন এরকম হলো? ইসলামীকরণ (ইসলামী শিক্ষার আলোকে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতির পুনর্গঠন) কি এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে না?

এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার একটি প্রয়াস এ গ্রন্থ। এর দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম অংশে ব্যর্থ মতবাদসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম দেশসমূহ আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে চাইলে তাদেরকে ঐসব মতবাদ পরিত্যাগ করতে হবে। এ অংশের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে; কিন্তু তা নিছক সমালোচনার জন্য নয়, বরং ঐ সকল ব্যবস্থার লক্ষ্য, তার বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশলের মধ্যে যে অসংগতি রয়েছে তার কারণ, ধরন ও ফলাফল সনাক্ত করাই আসল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারেন যে, সে সকল ব্যবস্থার অনুসারী দেশগুলোতে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বরাদ্দের বিষয়টি কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একই পরিণতি হবে। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা

যাবে যে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোর প্রেক্ষিতে যে নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছে, তা কিভাবে অর্থনৈতিক নীতি কৌশলের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তার প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পড়েছে। এর ফলে সামষ্টিক অর্থনীতি ও বহির্দেশীয় ভারসাম্যহীনতা পরিস্থিতির শুধু অবনতিই ঘটাচ্ছে না, বরং ন্যায়পরতা আনয়নের লক্ষ্যকেও বানচাল করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সাতটি অধ্যায় যাতে ইসলামের জবাব তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর প্রথমটিতে অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্ববীক্ষণ ও ইসলামের কৌশল এবং মাকাসিদের সাথে অন্তর্নিহিত সংগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের অস্থিরতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে পাঁচটি নীতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারসাম্যহীনতা দীর্ঘায়িত না করে মাকাসিদ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী আদর্শের আলোকে মুসলিম দেশগুলোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ সকল নীতি কৌশলের উপর প্রতিটি আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলো একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এতটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, সকল আর্থ-সামাজিক সংস্কার এবং দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগুলো কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থান করে আছে। অষ্টম অধ্যায়ে সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ হ্রাস করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যা আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দরকারি এবং ইসলাম এ মূল্যবোধ ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। নবম ও দশম অধ্যায়ে ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য অর্থনৈতিক ও আর্থিক পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে ইসলামী আদর্শের নীতিগত বিষয়াদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৌশলগত নীতি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপসংহারে সমগ্র বইয়ের ১১টি অধ্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে পাঠকরা সার্বিক বিষয়গুলোর সারমর্ম দেখতে পারবেন। যেহেতু এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু এতে ফালাহ ও হায়াতে তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক দিকগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়নি।

একটি মাত্র পুস্তকে সকল মুসলিম দেশের সমস্যার আলোচনা অযৌক্তিক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ আয়, মধ্যম আয় ও নিম্ন আয়ের দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করছে। অবশ্য এটা সত্য যে, তাদের সমস্যাগুলোর বৈশিষ্ট্য একই ধরনের, পার্থক্য শুধু তাদের মাত্রায়। তারা সবাই সম্পদের আপেক্ষিক দুস্প্রাপ্যতায় ভুগছে। এসব সত্ত্বেও বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা আর দীর্ঘায়িত না করে 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে কাজ করা মুসলিম দেশগুলোর অলঙ্ঘনীয় নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং তারা সবাই বিভিন্ন মাত্রায় এ আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারেন। এ গ্রন্থে অবশ্য প্রধানত দরিদ্রতর ও মধ্য আয়ের অধিকতর সমস্যা সংকুল দেশগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নোট ও তথ্যসূত্র (ভূমিকা)

১. আল গাজালী, *al-Mustafa* (১৯৩৭), পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০।

২. ইবন কাইয়্যেম আল-জাওজিয়াহ, *I'lm al-Muwaqqi' in* (১৯৫৫), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪।

৩. মানুষের বস্তুগত চাহিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে যে, মানুষের অস্তিত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য ও মানবীয় উন্নয়নে কী কী বিষয় সত্যিকারভাবে অবদান রাখে। এ কাজ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে কেইনস এর মতামত সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন, যদিও "মানুষের চাহিদা দৃশ্যতঃ অপূরণীয় ...; সেগুলো দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের চারপাশে মানব সমাজের অবস্থা যাই হোক না কেন, এক প্রকার চাহিদা সুনিশ্চিতভাবে আমরা অনুভব করি, আর অপর এক প্রকার চাহিদা পূরণ আমাদের চারপাশের মানুষের তুলনায় সৌভাগ্যের অধিকারী করে বা শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দান করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সকল চাহিদা শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, সেগুলো হয়ত সত্যিই অপূরণীয়। কারণ অবস্থান যত উপরেই হোক, আরো উপরে ওঠার সুযোগ থেকেই যায়। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে অনুভূত হয় এমন চাহিদার ক্ষেত্রে একথা সঠিক নয়। (J. M. Keynes, *The Collected Writtings of John Maynard Keynes,* vol. IX, Essays in Persuasion, the essay on "Economic Possibilities for our Grandchildren'', ১৯৭২ পৃষ্ঠা ৩২৬)। এই শ্রেণীবিভক্তির কারণ থেকে বোঝা যায় যে, সুনিশ্চিত চাহিদাগুলো মানুষের নিজের মধ্যেই সৃষ্টি হয় এবং মানবীয় অবস্থার কারণেই আবশ্যক হয়। মানুষের অস্তিত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য ও মানবীয় উন্নতির জন্য এগুলোর প্রয়োজন। পক্ষান্তরে যে সকল চাহিদা আপেক্ষিক সে সকল চাহিদা, Galbraith এর ভাষায়, তার নিজের কারণেই উদ্ভাবিত (Galbraith, *The Affluent Society :* পৃষ্ঠা ১৫২)। তারা মর্যাদা বৃদ্ধিকারী সামগ্রী ও অন্য এমন সকল দ্রব্য ও সেবাকে চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে, যেগুলো তাদের কল্যাণ বাড়ায় না। প্রথমটিকে বলা যায় চাহিদা এবং অপরটিকে অভাব। এই অভাব পূরণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রচারণা ও অন্যের সমতুল্য হওয়ার সামাজিক চাপ থেকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তির নিজের সম্পদ দ্বারা নিজের ও তার উপর নির্ভরশীল লোকদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করার অক্ষমতাকে দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও চাহিদা পূরণ করা এক বিষয় নয়। এক ব্যক্তির চাহিদা অপর কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সহায়তায় পূরণ করা যেতে পারে। তবে ব্যক্তিকে নিজের প্রচেষ্টায় স্বীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম করে তোলাই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। তবে ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা অথবা উপযুক্ত কর্মসংস্থান যোগাড়ে অসুবিধার কারণে এ লক্ষ্য সর্বদা সফল নাও হতে পারে।

৪. মুহাম্মদ বাকির আল সদর এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান যথার্থই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, অ-সুষম বন্টন এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কের নৈতিক কাঠামোর অনুপস্থিতির ফলেই দারিদ্র্য ও বঞ্চনার জন্ম হয়েছে (মুহাম্মদ বাকির আল সদর, Iqtisaduna (১৯৮১), পৃষ্ঠা ৩৪৩।

৫. এ বিষয়ে প্রচলিত অর্থনীতিবিদগণের উপস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য দেখুন Milton Rose Friedman, Free to Choose (১৯৮০), পৃষ্ঠা ৯-৩৭ এবং P. A. Samuelson, Economics (১৯৮০), পৃষ্ঠা ১৫-১৮।

৬. Arthur Lovejoy, *The Great Chain of Being* (১৯৬০), পৃষ্ঠা ৭।

৭. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Edward S. Greenberg, *Serving the Few: Corporate Capitalism and the Bias of Government Policy* (১৯৭৪) এবং সেকুলার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখুন Claus Offe, *Contradictions of the Welfare State*, ed., John keane (১৯৮৪) সম্পাদিত।

৮. আম ও লেবু বীজের দৃষ্টান্ত সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী'র Islami Riyasat গ্রন্থের (১৯৮২), পৃষ্ঠা ৬৯৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

৯. Edwin A. Burtt, *The Metaphysical Foundations of Modern Science* (১৯৫৫), পৃষ্ঠা ২৭।

১০. 'ফালাহ' (কল্যাণ) শব্দটি আল কোরআনে অন্তত চল্লিশবার বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে কল্যাণের দিকে ডাকা হয়। এ ভাষা আজানে দু'বার উচ্চারণ করা হয়, "কল্যাণের দিকে আস"। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি হলো মানুষের কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান। আত্মিক উন্নয়ন ব্যতীত কল্যাণের যে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। *'হায়াতে তাইয়্যেবা'* ভাষ্যটি কোরআনের এ আয়াত থেকে এসেছে : "যে সকল পুরুষ ও নারী সৎকর্ম করে ও ঈমান আনয়ন করে, তাদেরকে নিশ্চয়ই *'হায়াতে তাইয়্যেবা'* দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের (পরকালে) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (১৬:৯৭)

১১. দেখুন, M. Anas Zarqa, "Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-free Islamic Economy, নভেম্বর ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪৯ এবং Islamic Economics : An Approach to Human Welfare, K. Ahmed, *Studies in Islamic Economics* (১৯৮০), পৃষ্ঠা ৩-১৮। আরো দেখুন Benjamin Ward, *What is Wrong with Economics*? (১৯৭২), পৃষ্ঠা ২১১।

১২. দেখুন W. Breit এর *Readings in Microeconomics* (১৯৮৬) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪) উল্লিখিত Frank H. Knight, *The Economic Organisation* এর পুনঃমুদ্রিত *Social Economic Organisation* পৃষ্ঠা ৩-৩০। আমি (লেখক) ড. আনাস জাকরার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি এ প্রযুক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৩. *Arab News*, ২ মার্চ ১৯৮৮।

১৪. এখানে Gottfried Haberler-কে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন, "কতিপয় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ যাকে 'monoeconomics' বলেন অর্থাৎ যে সকল নীতি উন্নত ও অনুন্নত দেশে একইভাবে প্রযোজ্য– আমি তাতে বিশ্বাস করি। কিন্তু monoeconomics অনুসরণ করলেও সকল দেশের নীতি নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিত এক হবে এমন কথা নেই।" (M. Meier সম্পাদিত. *Pioneers in Development*, দ্বিতীয় সিরিজ (১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৫৩ এ উল্লিখিত Gottfried Haberler, Liberal and Illiberal Development Policy).

প্রথম ভাগ

ব্যর্থ মতবাদসমূহ

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِيْدْ إِلاَّ الْحَيوةَ الدُّنْيَا. (سورة النجم، ٢٩)

“অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ হয় এবং পার্থিব জীবনই কামনা করে তার থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন।”

আল কুরআন ৫৩ : ২৯

إِنَّ هؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً. (سورة الإنسان، ٢٧)

“নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।”

আল কুরআন ৭৬ : ২৭

প্রথম অধ্যায়

পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা

এক দিকে প্রাণহীন বিশাল প্রাচুর্য, অন্যদিকে দারিদ্র্য
প্রকৃতপক্ষে গভীর বিশৃঙ্খলারই প্রকাশ ও চিহ্ন।
- টিবর সিটোকভস্কি[১]

ক্লাসিক্যাল 'লেইজে-ফেয়ার' ধারণা সম্বলিত পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোথাও নেই। শতাব্দীকাল ধরে এর পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো, বিশেষত অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন সরকার সংশোধনমূলক বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে পুঁজিবাদ তার আকর্ষণীয় আবেদন অব্যাহত রেখেছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা, অর্থনীতিতে সরকারের বিশাল ভূমিকার নেতিবাচক ফলাফল এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির কারণে পুঁজিবাদের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উদারনীতিবাদ বা স্বল্পতম সরকারি হস্তক্ষেপ সম্বলিত ক্লাসিক্যাল মডেলে প্রত্যাবর্তনের প্রতি সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের আহবান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত জগতেই নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের বৃহদাংশে ও প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশসমূহে এ ধরনের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক নীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যৌক্তিকতা কতটুকু, কোন উপাদানগুলো এর বিকাশে সহায়তা করেছে, এ ব্যবস্থা দ্বারা এর সাফল্য হিসেবে দাবিদার ও বহুল প্রচারিত উৎপাদন দক্ষতা এবং একই সাথে সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংশোধনমূলক পদক্ষেপের কতিপয় অংশ বর্তমান অধ্যায়ে এবং 'কল্যাণ রাষ্ট্র' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বাকি অংশ আলোচিত হয়েছে। পুঁজিবাদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ (ক) পুঁজিবাদ ব্যক্তি মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে সম্পদ বৃদ্ধি ও পণ্য উৎপাদন এবং চাহিদা পূরণকে মানব কল্যাণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে, (খ) পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে অবারিত স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদ অপরিহার্য মনে করে, (গ) পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সম্পদ বন্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অত্যাবশ্যক মনে করে, (ঘ) উৎপাদন দক্ষতা বা ন্যায়সঙ্গত বন্টন কোনো ক্ষেত্রেই সরকারের বৃহৎ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে পুঁজিবাদ মনে করে না, এবং (ঙ) পুঁজিবাদ দাবি করে, মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থও পূরণ হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যুক্তি : সামঞ্জস্যতার দাবি

বাজারব্যবস্থার সামগ্রিক যুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা একই সাথে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থকে সুষমভাবে সমন্বিত করে। মনে করা হয়, সার্বভৌম ভোক্তা হিসেবে মানুষ যৌক্তিকভাবে আচরণ করে এবং তাদের পছন্দ মোতাবেক সর্বনিম্ন মূল্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে চেষ্টা করে। মানুষের এ পছন্দ এবং পছন্দনীয় সামগ্রীর জন্য বাজার মূল্য প্রদানে আগ্রহ বাজার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। উৎপাদক শ্রেণী আবার ভোক্তা শ্রেণীর এ চাহিদা মোতাবেক সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মূল্যে উৎপাদন এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ভোক্তা শ্রেণীর উপযোগিতামূলক বাজারে পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারিত হয়। উৎপাদন উপকরণ, পণ্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য নির্ধারণের এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভোক্তা শ্রেণীর পছন্দের সাথে সর্বোচ্চভাবে সামঞ্জস্যশীল পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন নিশ্চিত হয়।

বাজার অর্থনীতিতে এভাবে নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য কারো সচেতন প্রচেষ্টা বা সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই উৎপাদনের এক খাত হতে অন্য খাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ সঞ্চালন করে থাকে।

বাজার অর্থনীতিতে যে পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় তা ভোক্তা সামাজের পছন্দের ফল, তাই একে সবচেয়ে দক্ষ ব্যবস্থা বলা যায়। যেহেতু এ ব্যবস্থা পণ্যসামগ্রীর ইনসাফভিত্তিক উৎপাদনে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের (শ্রম, ভূমি, পুঁজি ও উদ্যোক্তা শ্রেণী) অবদানের ভিত্তিতে তাদের আয় নির্ধারণ করে দেয়, তাই এ আয় বন্টন ব্যবস্থাকেও বলা যায়।[২] ফলে ভোক্তা শ্রেণীর সর্বাধিক সন্তুষ্টি, উৎপাদক শ্রেণীর সর্বনিম্ন উৎপাদন খরচ, মজুরি ও লভ্যাংশসহ সকল উৎপাদন উপকরণের সর্বোচ্চ উপার্জন নিশ্চিত হয়। উপসংহারে তাই বলা যায়, বাজার অর্থনীতি শুধুমাত্র সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতাই নিশ্চিত করে না, বরং আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে। ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের মাঝেও বাজার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সুসামঞ্জস্যতা বিধান করে। এ ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে কিনা অথবা এর বন্টন ব্যবস্থা সুষম কিনা– এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত নয়। কেননা বাজার অর্থনীতির মূল্যব্যবস্থা পূর্ব নির্ধারিত, সামষ্টিক মূল্যবোধ নির্দেশিকা ছাড়া এ প্রসঙ্গের নিরপেক্ষ সমাধান সম্ভব নয়। সম্পদের বৈষম্য প্রশ্নটিও তাই যথাযথ নয়, কেননা ব্যক্তির সম্পদ পণ্য উৎপাদনে তার অবদানের উপর নির্ভরশীল। তাই সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ততটুকুই, যতটুকু সামগ্রীর প্রতিযোগিতা, সুস্থ বাজার, দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহের ত্রুটি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন।

প্রত্যেক প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যকে একটি 'প্যারেটো অপটিমাম' (Pareto Optimum) বলে ধরা হয়। কারো অবস্থার কিছু অবনতি না ঘটিয়ে অন্য একজনের অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয় এবং এ অবস্থাকে 'দক্ষ' ও 'সুষম' বলে

মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা'র এ সংজ্ঞার কাঠামোর সাথে তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ, অভাবমোচন ও প্রয়োজন পূরণ, আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ধরে নেয়া হয় যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা দ্বারা যে 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা' অর্জিত হবে, তার পরোক্ষ ফল হিসেবে এসব উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হবে। প্যারেটো অপটিমালিটির কাঠামোর মধ্যে থেকে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে, কারোর অবস্থার অবনতি না ঘটিয়ে অন্যের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। কিন্তু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের মাঝে সমন্বয়ের এ দাবিটিতে শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে। এ ব্যবস্থা ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। মূলত 'ব্যক্তিস্বার্থের' দ্বারা পরিচালিত বাজারব্যবস্থার 'অদৃশ্য হাত' ডালটনের ভাষায় জন্ম দিয়েছে, "ভোগবাদের ফসল অমানবিক, অবহেলিত ও অন্যায্য এক সমাজ; সামাজিক বৈষম্য মালিক, শ্রমিক, ভূস্বামী ও প্রজা এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব"।[৩] কারণ হচ্ছে তা পুঁজিবাদের যৌক্তিকতাভিত্তিক এমন কতগুলো পূর্বশর্তের ধারণা, উপর নির্ভরশীল যা বাস্তবসম্মত নয় এবং সাধারণ অবস্থার মাধ্যমে যা কার্যকর হয়নি বা কার্যকর করা যায় না। ব্রিটটান তাই যথার্থ বলেছেন, "বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে সামাজিক সুফল পাওয়ার জন্য যেসব পূর্ব ধারণা, শর্ত ও সীমারেখা প্রয়োজন তা কখনো পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি; বরং পুঁজিবাদের অধিকাংশ রীতিনীতি বিশেষ সমস্যা উদ্ভব হবার পূর্বে রচিত হয় না।[৪] যেহেতু ব্যক্তি ও সমাজস্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সেকুলার ধারণাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে, তাই এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উপাদানগুলো অবলোকন করা দরকার।

সেকুলার মতবাদের উপর গুরুত্বারোপ

জ্ঞানালোকের বিশ্বদৃষ্টি (The Enlightenment Worldview)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী রেঁনেসা আন্দোলন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারণাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। 'রেঁনেসা' যা প্রায়শ 'যুক্তির যুগ' এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার চূড়ান্তরূপে দেখা যায় যে, তারা খৃস্টিয় বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে।[৫] এ ধর্মবিরোধী ভূমিকার কারণসমূহ অনুসন্ধান করার অবকাশ এ পুস্তকে নেই। তবে অবশ্যই অন্যতম কারণ হিসেবে চার্চের দুর্নীতি ও কুপমণ্ডুকতাকে চিহ্নিত করা যায়। 'যাজকশ্রেণীর মাঝে ধর্মীয় অবস্থার অবনতি এত বিশাল যে, তা প্রমাণের জন্য হাজারো উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে'।[৬] দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ যাজক-বিরোধী মনোভাব প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের প্রতিও আস্থার ভিত নাড়িয়ে দেয়। ফলে চার্চের সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রকার বিশ্বাসকেই "অগ্রহণযোগ্য" বলে ধরে নেয়া হয়।[৭] রেঁনেসার সামগ্রিক সময়ে ভর্লতেয়ারের

"কুখ্যাত জিনিসটি ধ্বংস কর" এ বাণী প্রতিধ্বনি করে বেরিয়েছে।[৮] ডুরান্ট যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'যদি যাজক শ্রেণী সুরুচিশীল ও ভক্তিবাদী জীবনযাপন করত, তবে হয়ত খৃস্টিয় প্রত্যাদিষ্ট কিতাব ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে চার্চ রক্ষা করতে পারতো'।[৯]

রেঁনেসা আন্দোলনের অগ্রগামী চিন্তানায়কগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের বদলে মানব জীবনের ক্ষেত্রে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মতে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হতে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। আধ্যাত্মিক সত্যকে অনুভব বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র যুক্তিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য প্রদান করা হয়। একের পর এক ক্ল্যাসিক চিন্তাবিদ লক, বার্কলি, হিউম, কান্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সম্মানজনক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন এবং তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, পারলৌকিক জীবন এবং অন্যান্য ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি সংশয় সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হিউম ধর্মীয় বিশ্বাসকে আধিভৌতিক ও কল্পনাপ্রবণ বিভ্রম বলে অভিহিত করেন।[১০] এ ধরনের মন্তব্য নিউটনের জগত সম্পর্কে ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করল। নিউটনের মতে, ঈশ্বর একজন ঘড়ি নির্মাতার মতো, যিনি এ জগৎ সৃষ্টি করে একে স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির মতো চালিত করে দিয়েছেন, কিন্তু এরপর আর এর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেননি। ভলতেয়ার এ কথাটাই তার বহুল প্রচলিত প্রবচনে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "যদি ইশ্বরের অস্তিত্ব নাও থাকত, তবে তাকে আবিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ত"।[১১]

বিশ্বের এ যান্ত্রিক ব্যাখ্যার ফলে মানব আত্মারও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা শুরু হলো।[১২] মানুষকে অন্ধ, উদ্দেশ্যহীন প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক দুর্ঘটনাজাত উপজাত হিসেবে দেখা হলো। মানুষ এক অন্ধ নিষ্ঠুর শক্তির করুণার শিকার, যাকে ঐ শক্তি অজ্ঞাতসারে জন্ম দিয়েছে।[১৩] যেসব প্রতিপাদ্যের উপর ধারণা অবয়ব লাভ করল তা কতটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তা বিবেচ্য বলে গণ্য হলো না। বরং বিজ্ঞানের নামে এসব ধারণা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হলো।

ধর্মের বাধন, যা নৈতিকতা ও মানব ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে জীবনের ভিত গঠন করে, তা এভাবে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ল। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় অথবা মানব জীবনের জন্য কোনো তাৎপর্য বহন না করে, তবে মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার কোনো প্রশ্ন আসে না। যদি জীবনের কোনো চরম ও গূঢ় উদ্দেশ্য থাকেও, তবে দেকার্তের ভাষায় তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য এমন একটি ধারণা যা 'বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থহীন'[১৪] এবং ক্রমান্বয়ে সামাজিক চিন্তাধারা থেকে তা অপসৃত হচ্ছে।[১৫] তদানুসারে বার্ট্রান্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন, 'সকল যুগের সকল পরিশ্রম, সকল অনুপ্রেরণা, মানব প্রতিভার সকল ঔজ্জ্বল্য এ সৌরজগতের মৃত্যুর সাথে অমোঘ নিয়তির মতো নিভে যাবে। মানবকীর্তির সকল সৌধ এ বিশ্বজগতের

ধ্বংসস্তূপের নিচে কবরস্থ হয়ে যাবে'।[১৬] 'জীবনের যদি কোনো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য না থাকে, তবে কোনো প্রকার উচ্চতর অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না'।[১৭] তাই জাঁপল সার্ত্রের ভাষায় 'মূল্যবোধের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে মানবীয় স্বাধীনতা। কোন মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত হবে তার জন্য বাহ্যিক বা অতিলৌকিক কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন নেই'।[১৮] সামাজিক ডারউইনবাদ এ ধারণাকে আরো জোরদার করল। 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার' এ ধারণাদ্বয় শেকড় গেড়ে বসল।

বস্তুবাদ ও নির্ণয়বাদ (Materialism & Determinism)

রেঁনেসা কর্তৃক ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানের ফলে সমাজ বিজ্ঞানে ব্যক্তি ও সামাজিক আচরণকে নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানের যান্ত্রিকগুণে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা শুরু হলো। লা মেটরি বললেন, মানুষের আচরণ পদার্থ বা রাসায়নিক কার্যকারণ ও প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।[১৯] 'পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা বস্তুর বুদ্ধিমত্তা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না'– এ ধারণা 'পজিটিভিজম (Positivism) আন্দোলন নামে দানা বেঁধে উঠল। এর ফলে যুক্তি ও বিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করল। মানুষের কর্মকাণ্ডকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যার এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজ বিজ্ঞান বস্তুবাদী ও নির্ণয়বাদী রূপ পরিগ্রহ করল।[২০]

স্রষ্টায় অবিশ্বাসের পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে বস্তুবাদ। বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী বস্তুই হচ্ছে এ মহাবিশ্বের প্রথম বা মৌলিক সৃষ্টির ভিত্তি। কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য, চরম লক্ষ্য বা বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এ মহাবিশ্ব পরিচালিত নয়। সব কিছুকে বস্তুর ভিত্তিতে ও প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করতে হবে। মানুষের আবেগ এবং মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া বা বিভ্রম যার প্রকৃত কোনো ভিত্তি নেই।[২১] এর ফল দাঁড়ায় সম্পদ, দৈহিক সুখ ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ হচ্ছে সর্বোচ্চ বিষয় যা মানুষ অর্জন করতে পারে। বস্তুবাদ এভাবে বাণিজ্যিক সংস্কৃতির জন্ম দিল। বছরের পর বছর এরূপ ভোগ সংস্কৃতির লিপ্সা এত বৃদ্ধি পেলো যে, তার চাহিদা সীমিত সম্পদের সীমাকে ছাড়িয়ে গেল।

নির্ণয়বাদকে মানবাত্মার সচেতন রূপকে অস্বীকার করার ফল বলা যায়। নির্ণয়বাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দাঁড়ায়, এ মহাজাগতিক বিশ্বের সকল কিছু, ইতিহাসের সকল ঘটনাবলী তাদের ভৌতিক, সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল এবং নিয়ন্ত্রিত। লক মানব মনকে 'টেবুলা রাসা' (tabula rasa) নামে অভিহিত করেছেন, যার কোনো নিজস্ব চরিত্র নেই। তার মতে, মানব মন হচ্ছে কাঁচামালের মতো যা বাহ্যিক আর্থ-সামাজিক শক্তিসমূহ দ্বারা রূপ ও আকৃতি লাভ করে। মার্কস, ফ্রয়েড, ওয়াটসন এবং স্কিনারের মতে 'মানুষের মন পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এ পরিবেশ মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণের বাইরের শক্তি। মানুষের

আচরণকে তাই অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়ার প্রভাবে সৃষ্ট স্বয়ংক্রিয় ও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলা যায়' (ওয়াটসন ও স্কিনার)। ফ্রয়েডের মতে, 'এ আচরণ হচ্ছে অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া'। আর মার্কসের মতে 'মানুষের আচরণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিক্রিয়ার প্রতিফলন'। মানবসত্তার জটিলতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা ছাড়াও নির্ণয়বাদ ব্যক্তিমানুষের কার্যকলাপের জন্য স্বীয় নৈতিক দায়দায়িত্বকেও অস্বীকার করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নির্ণয়বাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মীয় মতে 'সকল কাজের জন্য স্রষ্টার নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে'।

অসফল প্রতিবাদ

মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে এই যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ হয়নি এমন নয়। রুশো, কান্ট ও বার্গসনের মতো রোমান্টিক ও আদর্শবাদী দার্শনিক এবং অসংখ্য ধর্মবেত্তাগণ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ উচ্চারণ করেন। তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তির সীমাবদ্ধতাসমূহের উপর আলোকপাত এবং অনুভূতি ও সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এভাবে তারা মহাজাগতিক বিশ্ব পরিকল্পনায় মানুষের অনন্য অবস্থানকে চিহ্নিতও করতে চান। তারা রেঁনেসা চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভলতেয়ারের 'কেনডাইড'-কে (Candide) "ভাঁড়ের কলম হতে বেরিয়ে আসা অখাদ্য" হিসেবে বর্ণনা করেন। রোমান্টিক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে রেঁনেসাবাদী দার্শনিকগণের দর্শন অনুভূতিহীনতা, নিরেট যান্ত্রিকতা, অবাস্ত বতা ও অমানবিকতার দোষে দুষ্ট। কিন্তু পাশ্চাত্যে সেকুলারতার যে জোয়ার উত্তাল হয়ে উঠেছিল, রোমান্টিক দার্শনিকগণের প্রচেষ্টা তা রোধ করতে ব্যর্থ হয়। দেকার্তে, স্পিনোজা লিবনিজ এবং লকের মতো রেঁনেসার প্রাথমিক চিন্তাবিদগণ তাদের যুক্তিবাদ বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের প্রতি বিরোধিতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাননি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভলতেয়ার, হিউম এবং হলব্যাচের মতো চিন্ত াবিদগণ ছিলেন ভিন্নতর। তারা শুধু অধিকতর বস্তুবাদীই ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন।

ফলে রেঁনেসা আন্দোলন যা কতিপয় বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, তা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রভাবিত করে একসময় বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহদাংশসহ জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আকৃষ্ট করে ফেলে। ই. এফ. শুমেকারের ভাষায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর এই মতাদর্শ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আজকের পশ্চিমা জগতের প্রত্যেকের মনে সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গেছে বসেছে'।[২২] ক্রেইন ব্রিন্টন মন্তব্য করেন, 'পশ্চিমারা বিশেষত আমেরিকানরা এখনো রেঁনেসা যুগের আত্মিক সন্তান'।[২৩]

রেঁনেসা চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও স্রষ্টায় বিশ্বাস, আস্থা ও আশা মানব হৃদয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দৃঢ়মূল ছিল এবং তারা যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার কাছে

আত্মসমর্পণ করেনি। সার্বিক নিরশ্বরবাদের অস্তিত্ব যেমন আজকে নেই তেমনি রেঁনেসা যুগেও ছিল না।[২৪] প্রকৃতপক্ষে তখন যা ঘটেছিল তা হলো, রেঁনেসা চিন্তাধারার মোকাবিলায় সমাজে সম্মিলিত শক্তি হিসেবে ধর্মের ভূমিকা হ্রাসপায় এবং সেকুলারমতবাদ ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ তার সামাজিক আইনগত ক্ষমতা হারায় এবং সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ অপরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়।[২৫] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক শিক্ষাসূচি কদাচিৎ বাধ্যতামূলক করা হয়, ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তা আর ছাত্রদের আকর্ষণ করল না। কেননা শিক্ষার্থীরা বাস্তব জগতে যা তাদের জন্য লাভজনক হবে, সেসব বিষয়ের প্রতিই মনোযোগী হলো।[২৬]

নৈতিক ছাঁকনির অভাব

ধর্মের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব তার মূল্যবোধের সামাজিক প্রয়োগশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাহলেই কেবল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। এমতাবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে দুঃখজনক বিপর্যয় বলা হয়। কেননা এর ফলে সমাজ জীবনকে মন্দ হতে পরিশুদ্ধ রাখার আর কোনো ব্যবস্থা থাকে না। স্বার্থপরতা, জিনিসপত্রের মূল্য ও মুনাফা ধর্মীয় মূল্যবোধের স্থান দখল করে নেয় এবং তা সম্পদের বণ্টন, চাহিদা ও সরবরাহের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি মানুষের অভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে কার্যকর বিবেকবোধ তখনো কিছুটা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করলেও ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য যে সামগ্রিক নিয়ামক ব্যবস্থা থাকা দরকার তা আর কার্যকর থাকে না।

ধর্মীয় মূল্যবোধের নিয়ামক ব্যবস্থাকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন দুর্বল হয়ে পড়ায় একই স্রষ্টার সৃষ্টি সকল মানুষের ন্যায়পরতা ধারণাটি ধূলিস্যাৎ হয়ে পড়ে। উক্ত অনুশাসনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সকল মানুষের অভাব পূরণ এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন। ইতিহাসের ব্যাপক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে টয়েনবি ও ডুরান্ট এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ ব্যতিরেকে নৈতিক উচ্চমান ও সামাজিক সংহতি অর্জন সম্ভব নয়। টয়েনবি'র ভাষায়, 'ধর্ম মানুষের মাঝে সামাজিক দায়িত্বানুভূতিকে ধ্বংসের পরিবর্তে বৃদ্ধি করে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের পূর্বশর্ত হচ্ছে সব মানুষের পিতা তথা স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা। যদি মানব পরিবারের পিতা হিসেবে স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেয়া না হয়, তবে মানব সমাজকে এক সূত্রে বন্ধনের আর কোনো বিকল্প থাকে না'।[২৭] উইল এবং এরিয়েল ডুরান্টও জোরালোভাবে মন্তব্য করেছেন যে, 'ধর্মের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো সমাজ উচ্চ নৈতিক মান বজায় রেখেছে ইতিহাসে এর কোনো উদাহরণ নেই।'[২৮]

উপযোগবাদ (Utilitarianism)

ধর্মীয় অনুশাসন হতে যে সামাজিক শুভবুদ্ধি ও চেতনা জাগ্রত হয় তার অনুপস্থিতিতে কিভাবে ভালোমন্দ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করা যাবে? জেরেমি বেন্থাম, যিনি নিজে ছিলেন একজন নাস্তিক, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়াস পান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সদুত্তর তিনি খুঁজে পাননি। নৈতিক মূল্যবোধের স্থান অধিকারী উপযোগবাদের ভোগবাদী মতবাদ হচ্ছে, যা কিছু কষ্টদায়ক তাই মন্দ। এভাবে আনন্দ ও কষ্টের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি।[২৯] উপযোগবাদের এই নীতিকে অনেকটা গাণিতিক অংক শাস্ত্রের মতো মনে করা হলো। ১৭৭৯ সালে রেভারেন্ড জন ফরস্টারকে লিখিত এক পত্রে বেন্থাম বলেন, 'উপযোগবাদ এমন এক দৈব শক্তির ন্যায় যা ভালোমন্দ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে'।[৩০] তাই যে ব্যক্তি তার উপযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন তিনি একজন ভালো লোক এবং একটি ভালো সমাজ হচ্ছে তাই, যা তার সামগ্রিক উপযোগ বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টায় যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়োজিত হয়, তাহলে সর্বাধিক মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত হবে। ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মাঝেও সমন্বয় সাধিত হবে। বেন্থামের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালিত হবার অধিকার রাখে। সুতরাং বেন্থামের যুক্তি অনুযায়ী মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হবার ধারণা একটি 'সারহীন বাহুল্য কথা মাত্র'।[৩১]

যেহেতু সুখ হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা, সেহেতু কী কী উপাদান ব্যক্তি ও সমাজের সুখ বৃদ্ধি করে তার বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা নেই বলে উপযোগিতাবাদ নীতিকে অস্পষ্ট ও অকার্যকর বলা যেতে পারে। লক্ষ কোটি মানুষের সুখকে পরিমাপ ও যোগ করা সম্ভব নয় বিধায় বিকল্প উপযোগবাদ নীতির মাধ্যমে কতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন সম্ভব তাও নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[৩২] এ বিষয়ে কোনো প্রকার সর্বসম্মত ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থের অনুসরণ করে; স্বীয় স্বার্থান্বেষণ অন্যের কল্যাণ-অকল্যাণের উপর কি প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তি সচেতন নয়। তাছাড়া ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অনুকূলে শক্তি ও ক্ষমতা খাটিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। এখানে রাউলস এর 'অজ্ঞতার পর্দা' (veil of ignorance) নামক নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজের প্রত্যেকটি লোক তার নিজের স্বার্থ, সামাজিক অবস্থান, তার শ্রম ও প্রতিভা সম্পর্কে বাজার মূল্যের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান সম্পর্কে না জেনেই যদি নিজ নিজ পছন্দ বা অগ্রাধিকার ব্যক্ত করতে থাকে, তবে তা হবে একটি কল্পনাবিলাসী ব্যাপার। একটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা হিসেবে এটি কার্যকরভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[৩৩] তাই এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, উপযোগবাদ সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য বা ন্যায়নীতির কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। বরং কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব

দিতে অবম এমন হাজার প্রশ্নের জন্ম দেয়। অধিকন্তু, ধর্ম যেভাবে মানুষকে সামাজিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে, উপযোগবাদ তা করতে পারে না। তই পশ্চিমা বিশ্বেও উপযোগবাদের বিরোধিতা দেখা যায়। এ সবের ফলশ্রুতিতে নৈতিক নীতিমালার বিষয়ে উপযোগবাদের দৃষ্টিভংগির প্রতি সামগ্রিক বিকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।[৩৪]

এতদসত্ত্বেও গত দু'শতাব্দী ধরে পশ্চিমা দর্শনের উপর উপযোগবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩৫] পশ্চিমা জীবনাচরণ ও চিন্তাধারা বাকি বিশ্বকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। উপযোগবাদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত প্রয়োগবাদ উভয়ই নৈতিক মূল্যবোধের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। প্রয়োগবাদ ধর্মীয় আবরণ হতে মুক্ত করে সেকুলার ব্যক্তি মানুষের কোনো কিছুর 'প্রয়োজনীয়তা' এবং 'আর্থিক মূল্যে'র ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যবোধের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করেছে। ফলে বিশেষ কোনো নীতিমালার প্রতি আস্থা এবং সামাজিক ঐকমত্যের জন্য মানুষের সর্বসম্মত কোনো নৈতিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। কেননা কোনো বিশেষ নৈতিক নীতিমালা দ্বারা আর্থিকভাবে কে কতটুকু লাভবান হবে, সে সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায়, "সমাজের অধিকাংশ মানুষ অন্য মানুষের কল্যাণের চেয়ে নিজের সুখ সুবিধার প্রতি অধিক আগ্রহশীল"।[৩৬]

উপযোগবাদ মানুষের সম্পদ ও দৈহিক ভোগলালসাকে যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করে। এই মতবাদ ভোগকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা মানুষের সকল শ্রম-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করে। উপযোগবাদের মতে, উপার্জন বৃদ্ধি ও ভোগ চরিতার্থকরণ একটি উৎকর্ষ মূল্যবোধ। এ লক্ষ্যে যা কিছু করা হবে তা হবে ন্যায়সংগত। এভাবে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সামাজিক স্বার্থও পূরণ হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দর্শন নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। ১৯৭৮ সালে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসীন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন, 'দু'শত বছর এমনকি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও আমেরিকায় একথা কল্পনা করা যেত না যে, একজন মানুষকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য অসীম স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে পশ্চিমা জগতের সর্বত্র সবধরনের বাধা নিষেধ উঠে গেল। শতাব্দীব্যাপী যে খৃস্টিয় মূল্যবোধের ঐতিহ্য বজায় ছিল তার বন্ধন হতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগত মুক্ত হয়ে গেল'।[৩৭]

কৌশলসমূহের ব্যর্থতা

কতিপয় অসমর্থনযোগ্য ধারনা

অর্থনীতিতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কতিপয় ধারণার প্রবর্তন পুঁজিবাদের ভিত্তি ও কৌশল নির্মাণে সহায়তা করেছিল।

অর্থনীতির সূত্র

এই সব বিশ্বাসের অন্যতম হচ্ছে, বিশ্বজগত সম্পর্কে যান্ত্রিকতার ধারণাকে সমাজ বিজ্ঞানের উপর অর্পণ করে বলা দেয়া হয়েছে যে, পদার্থ জগত যেভাবে আচরণ করে বা যেভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অনুরূপভাবে মানুষের আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ নিউটনের পদার্থবিদ্যার অনুসরণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জড় জগতের সামঞ্জস্যতা ও ছন্দময়তার মতোই আর্থ-সামাজিক জীবনেও যান্ত্রিক নিপুণতায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে।[৩৮] এভাবে স্মিথ থেকে অর্থনৈতিক সূত্রাবলীকে নিউটনের সূত্রসমূহের মতো গাণিতিক বলে গণ্য করা হতে লাগল।[৩৯]

মানুষের যৌক্তিক অর্থনৈতিক আচরণ

দ্বিতীয় ধারণা হলো, "মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সব সময় যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তিতে হবে"- এই ধারণাটি আধুনিক অর্থনীতির মূল কথা। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। জেভনস এর ভাষায় 'মানুষের সমগ্র আচরণ স্বীয় স্বার্থ ও উপযোগিতা দ্বারা সুনিপুণভাবে তথা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়'।[৪০] ফ্রিডম্যান বলেন, 'মানুষের একমাত্র সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা'।[৪১] অর্থনীতির এই সব সূত্র ব্যক্তিস্বার্থকে যুক্তিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখে। এজওয়ার্থ তাই সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, অর্থনীতির প্রথম সূত্র হচ্ছে, 'প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক এজেন্ট তার স্বীয় স্বার্থবোধ দ্বারা উজ্জীবিত'।[৪২] প্রায় সকল আধুনিক অর্থনৈতিক মডেলই এই নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত।

কিন্তু বাধাবন্ধনহীনভাবে এভাবে ব্যক্তিস্বার্থকে অনুসরণের মনোভাব ও মতবাদকে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে কলুষমুক্ত মনে করতে পশ্চিমের খৃস্টিয় সমাজে সামাজিক আশীর্বাদ বা গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য নতুন ধারণা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে ধারণাটি হচ্ছে, প্রকৃতির মধ্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেভাবে সামঞ্জস্যতা বিধানের কাজ করে, তদ্রুপ ব্যক্তি মানুষের স্ব-স্ব স্বার্থের অনুসরণও সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যতা বিধানের কাজ করে।[৪৩] এডাম স্মিথ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যদি প্রত্যেকে স্ব-স্ব স্বার্থ অনুযায়ী চলে তবে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার অর্থনীতির 'অদৃশ্য হাত' সমগ্র সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষা ও নিশ্চিত করবে এবং এভাবে ব্যক্তি ও সমাজে স্বার্থের মাঝে সমন্বয় সাধিত হবে।[৪৪] তাই দেখা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিস্বার্থ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্বার্থকেই সংরক্ষণ করছে। ব্যক্তিস্বার্থকে এভাবে এক ধরনের পবিত্রতা দানই অর্থনীতিতে এডাম স্মিথের অন্যতম প্রধান অবদান।

অর্থনীতির অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত যে, মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত। তবে এই যৌক্তিতার স্বরূপ কি তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। কেবলমাত্র আর্থিক স্বার্থ ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যতাকে অর্থনৈতিক যুক্তির

উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই আর্থিক স্বার্থের আওতায় পড়ে সীমাহীন সম্পদ আহরণের প্রয়াস ও যথেচ্ছ ভোগবিলাস। যৌক্তিক আচরণের বিষয়ে মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, জীবনের উদ্দেশ্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অন্যান্য মানবিক দিককে বিবেচনার মধ্যে ধরা হয়নি। যেহেতু উল্লিখিত এই সব উপাদান ও বিষয়কে পরিমাপ করা যায় না, তাই ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের সূত্রের মাঝে এসব উপাদানগুলো কোনো তাত্ত্বিক স্থান দখল করে নিতে পারেনি।

নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)

তৃতীয় ধারণাটি হচ্ছে 'পজিটিভ' অর্থনীতির ধারণা। এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো রকম নৈতিক রূপরেখা বা মূল্যবোধের সাথে অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।[৪৫] অর্থনীতিতে মূল্যবোধের বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক। অর্থনীতির এভাবে সম্পূর্ণভাবে মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রহিত হয়ে যায়। প্রায় সব অর্থনীতিবিদই ক্রমান্বয়ে এ ধরনের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। 'প্যারেটো অপটিমাম'কে 'অর্থনৈতিক দক্ষতা'র সাথে সমার্থক ধরা হয় এবং এ তত্ত্বটি কল্যাণ অর্থনীতির প্রিয়পুত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে যদি লক্ষ লক্ষ লোক মনে করে যে তারা ভালো অবস্থায় আছে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে ভালো অবস্থায় নেই, তাহলে অর্থনীতিবিদ তার প্রস্তাবিত নীতির প্রত্যাশা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। হার্ভে লিভেনস্টেইন বলেন, 'যেখানে সার্বজনীন সম্মতি নেই, এবং যেখানে কিছু লোক বলে ভালো আছি, অন্যান্যরা মনে করে খারাপ আছি, সেখানে কল্যাণ অর্থনীতিবিদরা ঘোষণা করতে পারেন না যে কল্যাণ বৃদ্ধি পেয়েছে'।[৪৬] অন্যভাবে বলা যায় যে, যারা পরিবর্তন চায় 'প্যারেটো অপটিমাম' তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রদান করে। এর ফলে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া হয়ে পড়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয়, বৈচিত্র্যহীন, লাগামহীন, বিশেষ করে বস্তুবাদী সমাজে, যেখানে সকল গোষ্ঠী প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকে।

অর্থনীতিবিদ 'সে' (Say) এর সূত্র

চতুর্থ ধারণাটি হচ্ছে অর্থনীতিবিদ 'সে' এর সূত্র। 'সে' নিউটনের পদার্থবিদ্যার সূত্রকে অর্থনীতিতে প্রয়োগ করেছেন। এই মহাবিশ্ব যেভাবে স্বয়ংক্রিয় ও সুচারুরূপে চলেছে, সেভাবে অর্থনীতিকে হস্তক্ষেপহীন অবস্থায় ছেড়ে দিলে তা সেরকম সুচারুরূপে চালিত হবে। উৎপাদন তার নিজস্ব চাহিদার জন্ম দেবে। অতিরিক্ত উৎপাদন বা বেকারত্ব সৃষ্টি হবে না। অতি উৎপাদন বা বেকারত্বের কোনো প্রবণতা দেখা দিলে তা আপনাআপনি সংশোধিত হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক নিয়মকানুন ও সূত্রাবলী সার্বিকভাবে শক্তিশালী এবং এর জন্য বাইরের কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। সূচারু অর্থনীতি পরিচালনায় সরকারের কোনো ভূমিকাই যেহেতু নেই, তাই অনর্থক হস্তক্ষেপ থেকে সরকারের দূরে থাকাই শ্রেয়। বাজার শক্তিসমূহ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্যতা, দক্ষতা ও ন্যায়পরতা নিশ্চিত করবে।

যে বাজারব্যবস্থা আপনাআপনি ভিতর থেকে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, সেখানে সরকারের অনাহূত হস্তক্ষেপ বরং বিকৃতি ও অদক্ষতারই জন্ম দেবে। মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হবার এই মতবাদ তাই বাজার শক্তির কার্যকারিতার বিষয়ে এক অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

সামাজিক ডারউইনবাদ

ব্যক্তিস্বার্থের অন্ধ অনুসরণ ও পজিটিভ অর্থনীতিকে দুষণমুক্ত বলে যে পবিত্রতার আচ্ছাদন প্রদান করা হলো, তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী বলে দেখা দিলো। যুগ যুগ লালিত আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনের ধারণা ও বিশ্বাস বিরাট ধাক্কার সম্মুখীন হলো। নতুন ধারণা অর্থনীতিবিদের সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দান করল। তাদের প্রচারিত আর্থিক মতবাদ অপর্যাপ্ত ও অন্যায়– এই মন্তব্য হতেও পজিটিভ অর্থনীতির মূল্যবোধ- নিরপেক্ষ ধারণা তাদের অব্যাহতি প্রদান করল। ফলে অর্থনীতিবিদের কাজ দাঁড়ালো উপাত্ত-তথ্যের বিবরণ বিশ্লেষণ করা, নৈতিক মূল্যমান বিচার করা নয়। উপর্যুক্ত মতবাদের নিরিখে একজন দরিদ্র ব্যক্তি এক ডলার খরচ করে যে উপযোগ সন্তুষ্টি লাভ করবে, তা একজন লাখপতির এক ডলার খরচের সন্তুষ্টির চেয়ে অনেক বেশি– এ ধরনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের কোনো অবকাশ নেই এবং তা করা হলে তাকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলে আখ্যায়িত করা হবে।[৪৮] আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি প্রদর্শিত এই উপেক্ষার প্রেক্ষাপটে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) খৃস্টিয় সমাজে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট এ পৃথিবীতে কোনো নতুন শিশু যদি জন্মগ্রহণ করে, যাকে তার পিতামাতা ভরণপোষণ করতে পারে না, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর বাজারে যার শ্রমের কোনো চাহিদা নেই, তার খাদ্য দাবি করার প্রকৃতপক্ষে কোনো অধিকার নেই; বস্তুত এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করারই তার অধিকার ছিল না। প্রকৃতির হিংস্র মুষ্টির নিচে তার কোনো আশ্রয় নেই। প্রকৃতি তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না এবং তার ধ্বংসের আদেশকে প্রকৃতি ত্বরিৎ গতিতে কার্যকর করে'।[৪৯]

সামাজিক ডারউইনবাদ অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে নৈতিকতা ও ন্যায়নীতির সংজ্ঞা পালটে দিলো। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করলো না। অর্থনীতির এই নবতত্ত্বের ছত্রছায়ায় ধনীরা বিবেকের দংশনবোধকে ঢেকে রাখল।[৫০] দরিদ্র ও বেকারদের অলস, অস্থিরমতি, অসৎ বা উদ্যমহীন বলে মনে করা হলো। তাদের ভর্তুকি প্রদানের যে কোনো উদ্যোগ বাজার অর্থনীতিকে ভণ্ডুল করে যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার দেবার সুন্দর ব্যবস্থাকে সাবোটাজ করার অপচেষ্টা বলে অভিহিত করা হলো। সমাজের এই সব দরিদ্র বেকারদের ভাতা প্রদানের উদ্যোগ হবে উদ্যমী, পরিশ্রমী, উৎপাদনশীল ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডদান করা, যার ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়ে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন প্রচেষ্টাও নেয়া হলো যে, অর্থনীতির উপযুক্ত বিবৃতিতে যদি কাজ না

হয় তবে পাদ্রীদের মুখ থেকে উচ্চারণ করা হবে যে, দারিদ্র্য হচ্ছে পাপের শাস্তি এবং ধন সম্পদ হচ্ছে পূণ্যের পুরস্কার। এভাবে সমাজের প্রভাবশালী মতটি দাঁড়াল, ধনিক বণিক উৎপাদক শ্রেণীর বিপক্ষে দরিদ্র শ্রেণীকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তবে সামাজিক ভর্তুকির সাহায্যে নয়, বরং ব্যক্তিমানুষের দান দাক্ষিণ্যের উপর তাদের টিকে থাকতে হবে। এসব মতামত বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ভাষায় প্রখ্যাত লেখকবৃন্দ যথা ডেনিয়েল ডেফো (১৭০৪), বার্নার্ড মেনডিভিলি (১৭১৪), আর্থার ইয়ং (১৭৭১) থেকে শুরু করে হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮৫০), ডইসি (১৯০৫) এবং কেলভন কুলিজ এর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে।[৫১]

পুঁজিবাদ নামক পদ্ধতি এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পদ উপার্জনে অপরিসীম ও বাধাহীন স্বাধীনতা প্রদান করে। বাজার অর্থনীতির নিয়মকানুন ও সূত্র যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের মতো নিখুঁত ও প্রয়োগসিদ্ধ, তাই জীবন যুদ্ধে পরাজিত পেছনের সারির মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজিবাদের ফল বলে অভিহিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সামাজিক ডারউইনবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, মুক্তবাজারের খোলা প্রতিযোগিতা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ কল্যাণের ঢাল স্বরূপ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হবে, দক্ষতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। তাই নৈতিকভাবে উচিত বা অনুচিত এরূপ বিচার-বিশ্লেষণ বা সরকারি হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করলে, ব্যক্তিমালিকানায় উদ্যোগ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকলে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভের মধ্য দিয়ে জাতীয়স্বার্থ সর্বাধিকভাবে রক্ষিত হবে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বীয় স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাতে বাঁধাহীনভাবে স্ব-স্ব স্বার্থের অনুসরণের দ্বারা শুধু নিজের কল্যাণ হবে না, শেষ পর্যন্ত তা অন্যের কল্যাণও ডেকে আনবে।

তিক্ত ফলাফল

বাজারব্যবস্থা পশ্চিমা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে দীর্ঘকালীন সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সম্পদের বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে। বাজারব্যবস্থার বিজয় দেখিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকে। পোলেনি'র ভাষায় সমাজই যেন বাজারের সম্প্রসারিত এক রূপ পরিগ্রহ করলো। অবশ্য অবিস্মরণীয় সমৃদ্ধি কিন্তু দারিদ্র দূর করলো না বা সকলের চাহিদাও পূরণ করলো না। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলল। এতে দেখা যায় দ্রুত উন্নয়ন ও বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও দক্ষতা ও ন্যায়পরতা স্বপ্ন সোনার হরিণই হয়ে রইল।

পুঁজিবাদের তিক্ত বাস্তব পরিণতি মানুষের বিবেকের ন্যায়নীতিবোধকে নাড়া না দিয়ে পারেনি। তাই দেখা যায়, অতীত বা বর্তমানে পুঁজিবাদের মৌলিক নীতিমালাসমূহ বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ইংল্যান্ডের টমাস কার্লাইল (Past

and Present, 1843), রাস্কিন (Unto this Last, 1862) ও চার্লস ডিকেন্স (Hard Times, 1854-55) এবং আমেরিকার হেনরী জর্জ (Progress and Poverty, 1870) এর ন্যায় বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ 'লেইজে ফেয়ার' নীতির স্বার্থপরতাকেন্দ্রিক মতবাদকে আক্রমণ করে লেখনী চালনা করেন। থমাস কার্লাইল এই প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিকে 'ডিসমাল সাইন্স' (Dismal Science) বলে অভিহিত করেন। তিনি নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিস্বার্থ সমাজস্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে অনুকূল হতে তরান্বিত করবে– এ চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৫৩] হেনরী জর্জ বিত্ত ও দারিদ্র্যের বৈপরীত্যকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন এবং মন্তব্য করেন, 'যতদিন পর্যন্ত স্ফীত সম্পদরাজি শুধু ধনিক শ্রেণীর বিত্ত বেসাতি বিলাসের ঘরে জমা হবে, যতদিন ধনিক শ্রেণী ও দরিদ্র শ্রেণীর দূরত্ব তীব্রতর হবে, ততদিন সত্যিকার ও স্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলা যাবে না'।[৫৪]

যাই হোক, এসব খ্যাতিমান লেখকদের সকল সমালোচনা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী অর্থনীতির চিন্তাধারার জোয়ার তীব্রভাবে প্রবাহিত হতে লাগল। খ্যাতিমান সমালোচক ও মনীষীদের সকল বিরূপ মন্তব্য শুধু ইতিহাসের প্রভাবহীন মন্তব্য রূপেই বিরাজ করল।[৫৫] আধুনিক যুগের কিছু কৃতি লেখকও পুঁজিবাদের তিক্ত ফলাফলে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। হীমেন মিনিস্কি'র মতে, 'পুঁজিবাদী সমাজ বৈষম্যপূর্ণ ও অদক্ষ'।[৫৬]

সমাজের চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদের উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে সমাজের লক্ষ্য ও চাহিদার সংঘাত। ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের মাঝে বিরোধিতার বদলে সেতুবন্ধন রচিত হবে বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাবি করেছে। কিন্তু যেসব ধারণা, পূর্বশর্ত ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এই দাবি করা হয়েছে, তা অবাস্তব ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের চাহিদা ও লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তা সামাজিক ডারউইনবাদ বাস্তবায়নেরই এক প্রকার অমানবিক প্রচেষ্টার নামান্তর। পুঁজিবাদের ভিত্তিভূমি হিসেবে যেসব শর্ত ও ধারণার কথা বলা হয়েছে তার সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ উপস্থাপন করেননি বিধায় এসব অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক 'দক্ষতা' ও 'ন্যায়পরতা' অর্জিত হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সম্পদের অদক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা

কী উৎপাদন করতে হবে

বাজারব্যবস্থা দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের সুদক্ষ বণ্টন নিশ্চিত করে বলে যে দাবি করা হয় তাকে কেবলমাত্র সামাজিক ডারউইনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সত্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। আসলে দেখা যায়, এই ধরনের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাহীন পুঁজিবাদী সমাজে অর্থবিত্তের মালিক ভোক্তাশ্রেণীর পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি পূর্বশর্তের কথা বলে এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের চাহিদা পূরণ হবার দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে এই পূর্বশর্তসমূহের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবাস্তব অনুমান

প্রথম অনুমান করে নেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সামাজিক ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। বরং বিভিন্ন শ্রেণীর ভোক্তাগণ স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই তাদের চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমিত রাখবে। ফলে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সাথে বিশেষ শ্রেণীর ভোক্তার কোনো স্বেচ্ছাচারী চাহিদার সংঘাত দেখা দেবে না। কিন্তু এই ধারণা তিনটি কারণে ভুল প্রমাণিত হয়েছে: (১) যখন কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই, তখন বিত্তশালীরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভোগ্য ও বিলাস সামগ্রী ক্রয় ও ভোগে কেন বিরত থাকবে? এটাই স্বাভাবিক যে সীমিত সম্পদের অপচয় দরিদ্র শ্রেণীর উপর কী প্রভাব ফেলবে তার কোনো খেয়াল বা তোয়াক্কা না করেই ধনিক শ্রেণী তাদের ভোগস্পৃহা পূরণ করে যাবে। সেকুলার সমাজে 'টাকা যার জগৎ তার' মনোভাব দ্বারা তাড়িত বিত্তশালীদের সীমিত সম্পদের অপচয়ে দরিদ্র শ্রেণীর ভোগান্তি হবে- এ ধরনের বিবেক দংশনে ভোগার কারণ নেই। ধনিক শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার জন্য নিজেদের বিলাস ও অপচয়কে দায়ী না করে বরং গরীব মানুষের অদক্ষতা ও তথাকথিত অকর্মণ্যতাকে দায়ী করে। (২) ভোগলিপ্সা ও প্রয়োজন পূরণ অথবা অত্যাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়– এভাবে চাহিদাকে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নেই। বরং এ ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়ার কোনো অবকাশ পুঁজিবাদী দর্শনে নেই। যেহেতু এ ধরনের সামাজিক কোনো মূল্যবোধের তাড়না পুঁজিবাদী সমাজে নেই অথবা সমাজের সার্বিক চাহিদার বিচারে কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজনীয় আর কোনগুলো তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজনীয়, তা নির্ধারণ করে দেবার বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো ভূমিকা নেই। তাই ধনিক শ্রেণী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেদের যথেচ্ছা ভোগলালসা ও চাহিদা দ্বারা দরিদ্র মানুষকে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত করে থাকে। (৩) বণিক শ্রেণী তাদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার জন্য পত্রপত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনী চমক চাঙ্গা করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ভোক্তাশ্রেণীর মাঝে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সক্ষম যে, তার সামাজিক মর্যাদা তার কেনাকাটার ধার ও ভারের দ্বারা বাড়বে বা কমবে। ফলে সে তার মানসিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, চটকদার বিজ্ঞাপনী আকর্ষণের জোয়ারে ভেসে যায়।[৫৭] 'স্টাটাস সিম্বল' (Status Symbols) বা সামাজিক মর্যাদা লাভের অন্তহীন প্রতিযোগিতায় সমাজে সৃষ্টি হয় অফুরন্ত চাহিদার নানা প্রকরণ। গলব্রেথের ভাষায়, "ভোক্তাশ্রেণীর সকল প্রকার বিজ্ঞাপনী ভাষার মর্মবাণী দ্রব্যসামগ্রী ভোগের মাঝেই রয়েছে আনন্দের সর্বোচ্চ উৎস এবং এটাই হচ্ছে মানুষের অর্জনের সর্বোচ্চ শিখর"।[৫৮]

ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক নয় এমন সব সামগ্রীর উৎপাদনে বাজার ভরে যায়। বিজ্ঞাপনের প্রভাবমুক্তভাবে ভোক্তাশ্রেণীর যখন দ্রব্য সামগ্রী নির্বাচন ও কেনার স্বাধীনতা থাকে না, তখন ভোক্তাশ্রেণীর সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত স্বাধীনতার পুঁজিবাদ হাস্যকর বিষয় মাত্র।[৫৯]

এ ধরনের পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া মুনাফার স্তূপকে স্ফীত করে তোলে ঠিকই, তবে তা দরিদ্র শ্রেণীকে তাদের প্রয়োজন পূরণের হক থেকে বঞ্চিত করার বিনিময়ে। ধনীক শ্রেণীর লোক দেখানো এই ভোগবিলাসপূর্ণ কেনাকাটায় ইন্ধন যোগায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক এ খাতে ঋণ প্রদান। এ বিষয়ে ড্যানিয়েল বেল এর মন্তব্য 'আগে ক্রয়ের পূর্বে মানুষকে সঞ্চয় করতে হতো, আর এখন ক্রেডিট কার্ডের বদৌলতে মানুষের সঞ্চয় না থাকলেও তারা কেনার হিড়িকে নেমে যেতে পারে। ফলে আগে যা কল্পনা করেনি তেমন চাহিদা ও ক্রয়ের নতুন সড়ক খুলে যাচ্ছে'।[৬০] ফলে একদিকে সকল কেনার ইচ্ছা হয়ত মিটছে না, কিন্তু অপরদিকে অবাঞ্ছিতভাবে বেড়ে চলেছে ঘাটতি, মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধি, মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি এবং দুঃসহ বৈদেশিক ঋণ। এ ব্যবস্থা সমাজে অহংকার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার জন্ম দিচ্ছে বলে অনেক পণ্ডিত ও গুণিজন সমালোচনা মুখর হয়েছেন। এ ধরনের তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন সমালোচনা যতই প্রশংসার দাবিদার হোক না কেন এতে কোনো কাজ হচ্ছে না। যতক্ষণ না সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের স্ফূরণ ঘটছে, অন্য মানুষের হকের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতা সৃষ্টি না হচ্ছে, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির আদর্শবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সে আলোকে পুনর্গঠিত না হচ্ছে, ততদিন এ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায় না।

ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ প্রথমেই এমন এক আদর্শবাদী সমাজ কল্পনা করে নিয়েছেন, যেখানে সম্পদ ও আয়ের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি আয় ও সম্পদের এমন ইনসাফপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন সমাজে বজায় থাকত, তবেই বাজারে কী ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে তার উপর প্রত্যেক মানুষের পছন্দ অপছন্দের প্রভাব কাজ করত। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কোনো শ্রেণীর বিশাল বিত্ত-বৈভব প্রাপ্তি; ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা; বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুযোগ; পারিবারিক ঐতিহ্য, শারীরিক শক্তির বিভিন্নতা ও উচ্চাশা সব মিলে সমাজে মানুষের আয়ের বণ্টন শুধু যে বৈষম্যমূলক তা নয়, প্রকৃতপক্ষে সেখানে আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের কোনো অবকাশই নেই। ফলে বিত্তবেসাতির মালিক সমাজে উপর শ্রেণী, যারা জাতীয় আয় ও ব্যাংক ঋণের সিংহভাগ দখল করে আছে, তারাই তাদের পছন্দ মাফিক ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সব দ্রব্যসামগ্রী সমাজের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। যেহেতু এসব মানুষের অর্থকড়ি ও

সম্পদের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তাই মর্যাদাপূর্ণ বিলাস সামগ্রীর দাম যতই উচ্চ হোক না কেন অর্থাৎ পুঁজিবাদী চাহিদা তত্ত্বের ভিত্তিতে দাম যতই বেড়ে যাক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এসব অনুৎপাদনশীল বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের ঘোড়দৌড়ে এ শ্রেণীর কোনো বিষয় নেই। এভাবে দেখা যায়, বাজার অর্থনীতি চাহিদা পূরণের যে সুন্দর স্বপ্ন উপস্থাপন করে, তা অর্থবিত্তহীন বিশাল দরিদ্রশ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতার অভাবে বিত্তশালী শ্রেণীর ইচ্ছেমতো অর্থব্যয়ের ক্ষমতার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের তত্ত্বটির প্রসাদের ভিত কত যে নড়বড় তার বাস্তব অবস্থা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলাফল সম্পর্কে তাই অর্থনীতিবিদ টাওনি Towney সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন, 'প্রতি বছর বাজারে যেসব পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন দেখা যায় তার বৃহদাংশকে সঠিক অর্থে নিছক অপচয় বলা যায়, কেননা এসব সামগ্রী উৎপাদনের কোনো প্রয়োজনই ছিল না অথবা অন্য সব অত্যাবশ্যক সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনের পরই এসব উৎপাদনের অবকাশ দেখা দিত'।[৬১] এ ধরনের অপচয়ধর্মী উৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর টাকার হিসেবে সামগ্রিক মূল্যমান যাকে জাতীয় আয় (Gross National Product) নামে অভিহিত করা হয় তা আপাতঃদৃষ্টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকৃত অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। তাই জাতীয় আয়ের (জিএনপি) হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা মানুষের কল্যাণ বা অবস্থার উন্নতি অবনতি বোঝা যায় না।

দ্রব্যমূল্য চাহিদার প্রতিফলন

তৃতীয়ত, এটা ধরে নেয়া হয় যে, কোনো জিনিসের জন্য যত বেশি টাকা খরচের জন্য মানুষ আগ্রহ প্রদর্শন করে, সে জিনিস তত বেশি প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ তত্ত্বটি তর্কসাপেক্ষ। একজন দরিদ্র বা ধনী পিতার সন্তানের জন্যে দুগ্ধ সমানভাবে আবশ্যক হলেও দরিদ্র পিতা দুগ্ধের জন্য যত টাকা দিতে প্রস্তুত বা সক্ষম, তার চেয়ে ঠুনকো বিলাসী খেয়ালি জিনিসের জন্য ধনী পিতাকে অনেক বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত দেখা যায়। তাই দেখা যায় দ্রব্যের উচ্চমূল্য তার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে না। তাই সমাজের দুগ্ধের প্রয়োজন অনেক বেশি হলেও দরিদ্র শিশুদের সে চাহিদা পূরণ না হয়ে দেখা যায় ধনিক শ্রেণীর বিলাস সামগ্রী অনেক বেশি উৎপাদন হচ্ছে। এর দ্বারা কিন্তু অনুৎপাদনশীল ও বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় না। আর্থার ওকুন (Arthur Okun) তাই পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন, 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দরিদ্র ঘরের সন্তানের মুখে এক মুঠো ভাতের সংস্থানের বদলে ধনী ঘরের পোষা কুকুরের মাংসের ব্যবস্থা করাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করে'।[৬২] শেষতক যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়– তা হলো বিলাস সামগ্রীর প্রতি বিত্তশালীদের আগ্রহের কারণে

এসব জিনিস প্রচুর উৎপাদিত হয় এবং সরবরাহ বৃদ্ধির সাধারণ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এসবের দাম পড়ে আসে। অন্য দিকে অগণিত দরিদ্র শিশু থাকলেও তাদের দরিদ্র পিতার ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় দুগ্ধ প্রয়োজন মোতাবেক উৎপাদিত হয় না বরং ফলে এক সময়ে দুগ্ধের দাম বৃদ্ধি পায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা

চতুর্থত, এটাও স্বাভাবিক হিসেবে ধরে করে নেয়া হয়েছে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার অর্থনীতি চালিত হবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় অসংখ্য ক্রেতার সাথে অসংখ্য বিক্রেতাও থাকবে, উৎপাদন করার জন্য কোনো আগ্রহী উৎপাদকের বাজারে প্রবেশে কোনো প্রকার বাধা থাকবে না। বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাজার তথ্যের উপর পরিপূর্ণ ধারণাও সবার জানা থাকবে। কিন্তু এসব শর্তের উপস্থিতি কোথাও দেখা যায় না। পরিপূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার একটি অবাস্তব স্বপ্ন। বড় বড় ব্যবসা ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণকে যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, সে অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা ভবিষ্যতে প্রবর্তনের আশা করাও দুরাশা মাত্র। অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বাধাবিঘ্ন বাজার শক্তিসমূহের সুচারুরূপে পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে সামাজিক সম্পদসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে যে প্রকৃত খরচ পড়ে তা দ্রব্য সামগ্রীর বাজার দরের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। কোথাও দেখা যায় দ্রব্যমূল্য উক্ত দ্রব্য তৈরির সামাজিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি, আবার কোথাও দেখা যায় দ্রব্যমূল্য উক্ত দ্রব্য তৈরির সামাজিক ব্যয়ের চেয়ে কম। এরকম অবস্থায় সামাজের সীমিত সম্পদের যে সুদক্ষ ও সুচারুরূপে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে চারটি উপকরণ ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও সংগঠনের যে আনুপাতিক অবদান রয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। উৎপাদন উপকরণগুলো উৎপাদনে তাদের অবদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় মূল্য পায় না অর্থাৎ কেউ পায় বেশি আর কেউ পায় কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণার একমাত্র উৎস যেখানে ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ এবং যতবেশি তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই মুনাফা অর্জনে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামাজিক লাভ-ক্ষতি কী দাঁড়াবে তা কেউ হিসেবের মধ্যেই আনে না। অথচ সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত এই সামাজিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাজার অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যনির্ধারণী ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীর্ঘ সময়ের কোনো সীমারেখা এসে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের ফারাক ঘুচিয়ে উভয়ের সমন্বয় ঘটাবে– এই আশাবাদ এতই সুদূর পরাহত যে, একে এক প্রকার অর্থহীন আশাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

বিকৃত অগ্রাধিকার

যখন প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের অভাবে বাজার অর্থনীতিতে সন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করতে দেখা যায় না, তখন বাজারে উৎপাদনের বেলায় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকৃতি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।[৬৪] আয় ও সম্পদের বিশাল বৈষম্য ও সামাজিক ঐকমত্যহীনতার কারণে যখন সামাজিক অগ্রাধিকার বাজার অর্থনীতিতে কোনো স্থান পায় না, তখন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পদের যে অদক্ষ ও অন্যায্য ব্যবহার ঘটবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ধনিক শ্রেণীর বিশাল ক্রয় ক্ষমতার বদৌলতে তাদের খামখেয়ালিপূর্ণ বিলাসিতা পূরণের জন্য সীমিত সম্পদের অপচয়ের কারণে গরীব মানুষ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত থাকে। প্রফেসর স্যামুয়েলসন তাই উল্লেখ করেছেন, 'লেইজে ফেয়ারের তথাকথিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি ক্ষুধার্ত, বিকলাঙ্গ ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়, যারা বড় হয়ে তাদের মতো পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশুর জন্ম দেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই'। তাঁর ভাষায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমনকি সমগ্র ভবিষ্যৎ জুড়ে এই লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদ আয় ও সম্পদ বৈষ্যমের নিদর্শক জ্যামিতিক রেখাকে (Lorenz curves) অপ্রতিহতভাবে চালিয়ে নেবে'। তিনি আরো বলেন, "অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের কোনো অধিকার নেই একথা বলার যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির 'অদৃশ্য হাত' অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক স্বার্থ বিকাশ সাধনের দিকে নিয়ে যাবে। অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ এ ধরনের প্রতিপাদ্যের অনুকূলে কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। শুধু তাই নয় ১৭৭৬ সাল হতে এ পর্যন্ত এ ধরনের ধারণার সপক্ষে কেউ কোনো প্রামাণ্য দলিল পেশ করতে পারেনি"।[৬৫] The Affluent Society নামক গ্রন্থে গলব্রেথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পদের বিভিন্ন উৎপাদন খাতে বণ্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট; সেখানে ধনিক শ্রেণীর মাঝে বিভিন্নভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম প্রয়োজন ও চাকচিক্যময় অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাসের খাতে বিপুল সম্পদের অপচয় এমনভাবে ঘটছে যাতে সম্পদভাণ্ডারে টান পড়ে গেছে। ফলে মৌলিক ও অত্যাবশ্যক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য সম্পদের সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবাখাতসমূহ যার সাথে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণ ও অগ্রগতি জড়িত তা চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে।[৬৬]

সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহকে বাজার অর্থনীতিতে প্রতিফলিত করার উপায় উদ্ভাবনের কোনো পন্থা রয়েছে কি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, উপযোগবাদী দর্শনভিত্তিক প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদ যার ভিত্তি সামাজিক ডারউইনবাদ বা কল্যাণ অর্থনীতি– যেটাই হোক না কেন, উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। এ মতবাদে মানুষের জন্য কোনো নির্দেশনা নেই এবং বিশ্বব্যবস্থার সেকুলার ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বাজার শক্তিসমূহই অর্থনৈতিক সম্পদের বিলিবণ্টনে একমাত্র নিয়ামক

শক্তি হবে, যৌক্তিকভাবে একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কেননা ধর্মীয় নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে যদি কোনো কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়, তবে একমাত্র বিকল্প হিসেবে মেনে নিতে হয় বাজার শক্তিসমূহের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপর নির্ভরতা। কারণ যদি কোনো ব্যক্তি, দল বা শ্রেণীকে সামাজিক অগ্রাধিকার নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তবে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ তারা সমগ্র সমাজের উপর চাপিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় বাজার শক্তিসমূহের উপর নির্ভরতাই তুলনামূলকভাবে শ্রেয়তর বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। সামাজিক অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ঐকমত্য সৃষ্টির কোনো পন্থা উদ্ভাবনের নীতিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজারব্যবস্থা স্বীকার করে না। যেহেতু উচিত বা অনুচিত সম্পর্কে বাজার অর্থনীতিতে কোনো নির্দেশনা নেই, তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বীয় স্বার্থকে সর্বতোভাবে পরিপূরণের দিকে ধাবিত করে। সমাজের সকল মানুষের কল্যাণ ও স্বার্থ নিশ্চিত হচ্ছে কিনা-এ ধরনের মূল্যবোধভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শনে স্বীকৃত নয় বিধায় সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজের বিভিন্ন মানুষের স্ব-স্ব অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। অর্থনীতিবিদ শুমেকার (Schumacher) এর ভাষায়, বাজার অর্থনীতি প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক অঙ্গীকারমুক্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি দায়বদ্ধ নয়।[৬৭] অধিকন্তু পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারকে সামাজিক রূপ দান করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই সম্পদের সামাজিক পুনর্বণ্টনের বিরোধী।[৬৮] ফলে দেখা যায়, বাজার অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহভিত্তিক ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা সরকারের কিঞ্চিত হস্তক্ষেপের সাথে যুক্ত হয়ে মানুষের আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকারের খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা সৃষ্টিতে অকিঞ্চিতকর প্রমাণিত হয়। এর অনিবার্য ফল হিসেবে সমাজের সকলের জন্য অভাব পূরণ ভিত্তিক কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে আনা সম্ভব হয় না।

উৎপাদন ব্যবস্থা

উৎপাদনের মানদন্ড

কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি ও সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। মানুষের শ্রম ও সীমিত সম্পদের সমন্বয়ে মানব সমাজে উৎপাদন সংগঠিত হয়। তাই উৎপাদন ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সুষম করার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কতিপয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাই শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষকেই সর্বতোভাবে তাদের সার্বিক দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধকরণের উপযোগী উৎপাদন ব্যবস্থাপনা চালু করা অত্যাবশ্যক। ন্যূনতম খরচ বলতে শুধু ব্যক্তিগত ব্যয় বোঝায় না। কোন প্রকার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কতটুকু সামাজিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট সে প্রশ্নও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন

খরচের অন্য একটি দিক হচ্ছে বর্তমান সীমিত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, না কী নতুন সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি তৈরি হচ্ছে, সে দিকটির বিচার বিশ্লেষণ করা। তাছাড়া বিবেচনায় আনতে হবে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অভাব অপূরণজনিত অসন্তোষ ইত্যাদি উপাদনসমূহকে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হবে যা মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করে তোলে এবং সংঘবদ্ধ মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব যদি নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করা সম্ভব হয়ঃ

ক. মালিক ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ই যদি উৎপাদনে তাদের অবদানের বিনিময়ে আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক লাভ করে;

খ. উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে যদি সমন্বয় গড়ে তোলা হয়;

গ. কাজের একঘেঁয়েমী ও অনাবশ্যক বিরক্তি যদি হ্রাস করা হয়;

ঘ. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়; এবং

ঙ. ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রবণতা রোধ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সকল বাস্তব পরিস্থিতি হতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়কে তাদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সবটুকু উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যর্থ হয়েছে অথবা বেকারত্ব, প্রকৃত পারিশ্রমিকের বদলে কম মজুরি প্রদান এবং সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটিয়েছে সে উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়; বরং অকার্যকরও বটে।

পূর্বশর্তসমূহ

উৎপাদন দক্ষতার দিক থেকে পুঁজিবাদ সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা বলে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থাধীনে উদ্যোগ গ্রহণকারী পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে সমাজের প্রতিনিধি যারা কী ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হবে তা নির্ধারণ করে। ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি ও মুনাফার আকর্ষণ পুঁজিপতি শ্রেণীকে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। বাজার দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য সংকেত হিসেবে কাজ করে। একদিকে মুনাফার আর্কষণ তাকে সর্বোচ্চ শ্রম ও মেধা নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে অন্যান্য পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতা মূল্য বাড়িয়ে সমাজকে শোষণ করার প্রবণতা হতে প্রতিহত করে। প্রতিযোগিতা তাকে ব্যয় সংকোচন, অপব্যয় হ্রাস, উৎপাদন উপকরণের খরচ কমাতে বাধ্য করে। ফলে পণ্য উৎপাদনের সর্বনিম্ন খরচই পণ্যের বাজার দামে পরিণত হয়। উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এ যুক্তি উপস্থাপন করা যায় যে, উৎপাদক শ্রেণী মুনাফা দ্বারা তাড়িত হলেও প্রতিযোগিতা তাদের অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ থেকে নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং এভাবে ভোক্তা তথা সমাজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে এক ধরনের বাইরের হস্তক্ষেপবিহীন একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা যাতে অপচয়, শোষণ বা অতিরিক্ত মুনাফার কোনো অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার আর্কষণ উদ্যোক্তা শ্রেণীকে অধিকতর দক্ষতা ও দ্রব্যসামগ্রীর মান উন্নয়নে উজ্জীবিত করে। রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ এবং চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এ উপলব্ধি অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করছে। সরকারি খাতের শিল্পসমূহের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহও অধিকতর দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পবিকাশের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প ও মুনাফার ভিত্তিতে দেশের শিল্পকারখানার বিকাশ সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে– এ প্রতিপাদ্যটির সফলতার জন্য কতকগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। তা হচ্ছে, সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, সামাজিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ণীত মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সরকারের কার্যকর তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা।

সুস্থ প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতা, জন্য অত্যাবশ্যক নয়, বরং মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও অতীব প্রয়োজনীয়। প্রতিযোগিতা তখনই সুস্থ বলে বিবেচিত হবে, যখন তা অন্য উদ্যোক্তাকে বাজার থেকে উৎখাতের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি হতে উদ্ভূত না হয়ে পণ্যের মান, সেবা বা দক্ষতার ক্ষেত্রে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবার মানসিকতা দ্বারা উজ্জীবিত হবে। সুস্থ প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার জন্য আবশ্যক। যদি অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ বুদ্ধি ও পদ্ধতি দ্বারা প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন এবং তাদের মনমানসিকতা এ ধরনের নেতিবাচক হীনবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, তবে সে প্রতিযোগিতাকে সুস্থ প্রতিযোগিতা বলা যায় না। এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রতিযোগী উৎপাদকের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের বদলে জিঘাংসার সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সামাজিক ডারউইনবাদের সর্বগ্রাসী প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যেক উদ্যোক্তা প্রতিযোগী অন্য প্রতিযোগীকে বাজার হতে উৎখাতের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তা সম্ভব না হলে সকল উদ্যোক্তা-উৎপাদকশ্রেণী ভোক্তাশ্রেণীকে শোষণের উদ্দেশ্যে অসাধু গাঁটছড়ায় মিলিত হয়। উদ্যোক্তাশ্রেণীর মাঝে অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রকৃতপক্ষে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সব মানুষের বিশেষ করে ভোক্তাশ্রেণীর জন্য অকল্যাণ ডেকে আনে। অসাধু প্রতিযোগীদের মধ্যে স্বার্থের কারণে ঐক্যবদ্ধতা একচেটিয়া বাজারের জন্ম দেয় যা শোষণের দুয়ারকে উন্মোচিত করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বাজার হতে উৎখাতের মাধ্যমে বড় বড় উৎপাদক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে যোগসাজস করে ক্রমশ বাজার অর্থনীতিতে শোষণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতা কার্যকর হতে পারে যদি একই পণ্যের বিপুল পরিমাণ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থাকে এবং কারো পক্ষে এককভাবে দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব না হয়। তাছাড়া উৎপাদক শ্রেণীকে সামাজিক ও নৈতিক

মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। যদি সমাজে কোনো প্রকার নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত ও কার্যকর না থাকে, যদি স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার ভয় না থাকে, তবে অধিক মুনাফা অর্জনের লোভ বাজারে নানাবিধ কার্যকলাপের জন্ম দেবে। অসুস্থ প্রতিযোগিতার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে বাজার দখলের জন্য নানারকম চটকদার বিজ্ঞাপনী প্রচারণা। তাছাড়া রয়েছে একই পণ্যের ক্ষেত্রে সম্মিলিত গবেষণার পরিবর্তে প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আলাদা গবেষণা কার্যক্রমের ফলে খরচ বৃদ্ধির দিক। প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার এই সব নেতিবাচক দিকের ফলে যে কোনো পণ্যের সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধিই স্বাভাবিক ঘটনা।

সরকারি আইনকানুন ও বিধিনিষেধ নৈতিক অনুভূতি ও দায়িত্ববোধের স্থান দখল করতে পারে না। নৈতিক দায়িত্বানুভূতির বিকল্প না হলেও সরকারি বিধিনিষেধের অবশ্যই কিছু কার্যকারিতা রয়েছে যা উৎপাদকশ্রেণীর যথেচ্ছ আচরণকে লাগাম টেনে ধরে– একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য সমাজে যদি সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজ না করে, তবে নানারূপ অসাধু ব্যবসায়িক কলাকৌশল প্রতিরোধের জন্য আইনের পর আইন রচনা করতে হবে, এমনকি আইনের ফাঁকফোকর রোধের জন্য আবার নতুন করে আইন রচনা করতে হবে, যার জন্য সমাজের খরচের দিকটি কোনভাবে কম হবার কথা নয়। এতদসত্ত্বেও আইন ফাঁকি দেবার প্রবণতা ও উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে আইনের বাধা ডিঙিয়ে যাবার প্রচেষ্টা কম হবে মনে করারও কারণ নেই। অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সুচারু ও ন্যায়ভিত্তিক পরিচালিত হবার জন্য সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক আচরণের কোনো বিকল্প নেই।

অপূর্ণ পূর্বশর্তসমূহ

পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তি মালিকানাধীন ও মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণমুখী করার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোতে যে কতগুলো পূর্বশর্তের আবশ্যকীয় প্রয়োজন তা পূরণ হয়নি। উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ক্রমাগতই হ্রাস পেয়েছে। সাধারণভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত কোনো মূল্যবোধ সমাজে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। নৈতিক মূল্যবোধের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য এক সময়ে সরকারি নিয়মনীতির উপর খুব জোর দেয়া হত। কিন্তু সরকারি নিয়মনীতির কড়াকড়িও বর্তমানে ক্রমাগতভাবে শিথিল হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 'উনিশ শতকের বৃটেনে বাজার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিল প্রধানতম বিষয়। বর্তমানে বৃটেনে নয়, বরং সারা পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে'।[৬৯]

গত এক শতাব্দী যাবৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কতিপয় বৃহৎ উৎপাদন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত প্রাধান্য। বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বে

এডাম স্মিথ কল্পিত একটি দ্রব্যের উৎপাদনকারী অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে কতিপয় বিশাল আকৃতির শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই মুষ্টিমেয় শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যটির দাম, উৎপাদনের পরিমাণ এবং ভবিষ্যতে কী পরিমাণে বিনিয়োগ করা হবে–এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের কতিপয় বিশালাকৃতির শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।[৭০] এই সব প্রভূত ক্ষমতাশালী কোম্পানীগুলো শিল্প উৎপাদন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থাসহ বাজার অর্থনীতির বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষি ক্ষেত্রেও কৃষি খামারগুলো একত্রীকরণের মাধ্যমে বিশাল বিশাল কৃষি ফার্ম গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে নর্ম হোয়াইট বলেন, "বৃহৎ কৃষি খামারের প্রতি সরকারি নীতির পক্ষপাতিত্বের ফলে বিশালাকৃতির করপোরেশনসমূহ জন্ম লাভ করেছে। এরা খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে।[৭১] অবশ্যম্ভাবীভাবে কৃষিখাতের এ ধরনের বিশাল ফার্মের উত্থানে সুদূরপ্রসারী ফলাফল রয়েছে।

প্রথমত, অপরিমেয় অর্থ ও ধন-সম্পদের বদৌলতে এসব বিশাল বিশাল কর্পোরেশনসমূহ এসব দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভূত ক্ষমতা ও প্রভাব বলয়ের সৃষ্টি করে। সরকার ও জনগণ উভয়ের উপরই এসব কর্পোরেশনের কার্যকলাপের প্রভাব রয়েছে। ব্যবসায়ী ফার্মগুলোর মাত্র ১০% হওয়া সত্ত্বেও বৃহদাকৃতির এই মুষ্টিমেয় কর্পোরেশনসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি বাকি ৯০% ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপও বিভিন্নভাবে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। পুঁজি, উৎপাদন, বিনিয়োগ, নতুন পণ্য, ভোক্তার প্রতিক্রিয়া অথবা কর্মসংস্থান সর্বক্ষেত্রেই এ সকল বৃহৎ কর্পোরেশন মার্কিন অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ করে।[৭২] অনধিক ২০০টি এ ধরনের কর্পোরেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে। কর্পোরেশনগুলো তাদের নজিরবিহীন ও সীমাহীন অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি অঙ্গনে অপ্রতিহত প্রভাবের ছাপ রেখে চলছে। অনেক সময় নিজেদের স্বার্থের তাগিদে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণে কর্পোরেশনসমূহ সরকারকে বাধ্য করে।[৭৩]

অধিকন্তু দানব আকৃতির এইসব কর্পোরেশনগুলো কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়। মুষ্টিমেয় পরিবার এইসব কর্পোরেশনের সিংহভাগ স্টকের মালিক এবং ঐ কতিপয় পরিবারের হাতেই কর্পোরেশনগুলোর নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে আছে।[৭৪] ১৯৬০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, করদাতাদের মধ্যে মাত্র ১% লোক শেয়ার স্টকের ৪৮% দখল করে আছে।[৭৫] তাই 'শেয়ার হোল্ডারদের গণতন্ত্র' নামক শব্দটি একটি ফাঁকা বুলি মাত্র, বিশেষত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডাররা বোর্ড মিটিংয়েই অংশ গ্রহণ করে না। 'ফরচুন' পত্রিকার

তালিকাভুক্ত ৫০০টি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৫০টির প্রকৃত নিয়ন্ত্রয়ণকারী ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একটি পরিবারের সদস্যদের হাতে কেন্দ্রীভূত।[৭৬] তাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অর্থনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ কতিপয় ধনাঢ্য অভিজাত শ্রেণীর হাতে সার্বিকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিশাল ক্ষমতা তাদের পণ্য সামগ্রী, মূল্য, বিনিয়োগ প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার একচেটিয়া আনুকূল্য প্রদান করেছে যা শুধু সমগ্র জাতিকে নয় বরং সারা বিশ্বকেই প্রভাবিত করছে। [৭৭]

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রেণী, কৃষক, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পজীবীরা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের স্বাধীনতা ও দরকষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে। গত দুই শতাব্দীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি ও বেতনভোগী শ্রেণীর সংখ্যা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৮০ সালে এর সংখ্যা ছিল ২০%, যা ১৯৭০ সালে ৮৪% এ এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী অথবা ম্যানেজার বা অফিসার শ্রেণীর লোকের সংখ্যা এই দুই শতাব্দীকালে ৮০% হতে ২০% এ নেমে এসেছে।[৭৮] স্বল্পমেয়াদী তারতম্য বাদ দিলে দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হচ্ছে বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে। দানবাকৃতির করপোরেশনসমূহের প্রধান কার্যনির্বাহী এবং পরিচালকগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। এর ফলে সমাজে সম্পদ ও ক্ষমতা আরো বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কার্ল মার্কসের ভাষায় বলা যায়, 'মজুরি-দাসত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে'।

তৃতীয়ত, বাজার অর্থনীতিতে যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার কথা বলা হয় বৃহৎ কর্পোরেশনগুলো তা সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম।[৭৯] তারা একসাথে গাঁটছড়া বেঁধে প্রতিযোগিতামূলক পণ্য মূল্যের পরিবর্তে যোগসাজসে একই ধরনের পণ্য মূল্য বাজারে বেঁধে দেয়।[৮০]

চতুর্থত, বৃহৎ শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশাল আকৃতির মুখে নতুন কোনো ফার্ম বাজারে প্রবেশের উৎসাহ পায় না। বাজারে প্রবেশের জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন এবং নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। কেবলমাত্র প্রচুর বিত্তশালী কোনো ব্যক্তি যার জন্য ব্যাংক ঋণও খোলা রয়েছে, এ ধরনের বাজারে নতুনভাবে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হতে পারে।

পঞ্চমত, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। অধিকাংশ বৃহৎ কর্পোরেশনে স্টকহোল্ডারদের পরিবর্তে পেশাজীবী ব্যবস্থাপকগণ সার্বিক দেখাশোনার কাজটি করেন। যদিও তাত্ত্বিকভাবে এসব পেশাজীবী ব্যবস্থাপকগণ শেয়ারহোল্ডারদের বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরাই প্রকৃত ক্ষমতা বিস্তার করে। শেয়ারহোল্ডারদের শুধু বছর শেষে বার্ষিক সভায় রিপোর্ট শোনার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।[৮১] এসব পেশাজীবী ম্যানেজারদের অধিকাংশই উঠে এসেছেন সমাজের উঁচু স্তর হতে। এন্ড্রু হেকার এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, 'ইউরোপের বৃহৎ কর্পোরেশনসমূহে গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করে না।

বরং এটাই লক্ষণীয় যে, সমাজের অভিজাত উঁচু শ্রেণী হতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক শ্রেণীকে বাছাই করে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে'।[৮২] সম্পদ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্কিত বৃহৎ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপকের পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব হচ্ছে ক্ষমতার করিডোরে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবেশপত্র স্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রে একই অবস্থার উল্লেখ করে 'মিল' বলেন, কর্পোরেশনগুলো হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং ক্ষমতা ও সম্পদ অব্যাহত রাখার জন্য একই সাথে ভিত্তি। যেসব ব্যক্তি ও পরিবারবর্গের প্রভূত সম্পদ রয়েছে, দেখা যায় তারাই এসব কর্পোরেশনের হর্তাকর্তা বিধাতা।[৮৩]

কর্পোরেশনসমূহের আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে বিশাল কনগ্লোমারেটে পরিণত হবার পশ্চাতে দৃশ্যত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য কাজ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতে দক্ষ প্রতিষ্ঠান হবার জন্য এর আয়তন আরো সীমিত হওয়া প্রয়োজন।[৮৪] অধিকাংশ বৃহৎ কর্পোরেশনের কাঠামো হচ্ছে এরূপ, যেন কতগুলো আধা-স্বায়ত্বশাসিত কোম্পানীকে একসাথে রেলের বগির মতো বেঁধে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব কোম্পানীগুলোর যদি আলাদা স্বাধীন অস্তিত্ব থাকত তবে তারা অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারত।[৮৫] বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বা বন্ধন পদ্ধতি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাংকসমূহের ট্রাস্ট কার্যক্রম ট্রেড এসোসিয়েশন, প্রাইস-লিডারশিপের পদ্ধতি এবং সর্বোপরি উৎপাদক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অশুভ যোগসাজশ অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে আরো প্রসারিত করেছে।[৮৬] মুনাফা যদি দক্ষতার পরিমাপক হয় তবে গবেষণা হতে দেখা গেছে যে, অনেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের লাভের হার যে শিল্পে মুষ্টিমেয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্ব করছে তাদের চেয়ে কম নয়।[৮৭] সুতরাং, দেখা যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বৃহদায়তনই দক্ষতা নিশ্চিত করে না।

কর্পোরেশন ও কোম্পানীসমূহের বৃহদাকৃতি লাভের পশ্চাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রতিযোগী ফার্মসমূহ ক্রয় এবং ফার্মসমূহের উল্লম্ব ও আনুভূমিক একত্রীকরণে বৃহৎ কর্পোরেশনের উৎসাহকে উদ্দীপিত করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সস্তা দরে ঋণ দান করে। ব্যাংক হতে এ অর্থের যোগান না হলে এ ধরনের একচেটিয়া অবস্থা সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য ছিল। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বদলে কতিপয় বৃহৎ কোম্পানীকে ঋণদান করাকে পছন্দ করে। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে কৃষিখাতেও বৃহৎ খামারগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, কৃষিখামারের সংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। এ অবস্থার জন্য পক্ষপাতমূলক ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাই দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ১৯% বৃহৎ কৃষিখামার কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণের ৬০% দখল করে আছে, যার পরিমাণ ব্রাজিল ও মেক্সিকোর যৌথ বৈদেশিক ঋণের সমান।[৮৮]

কর্পোরেশনসমূহের সম্প্রসারণের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে কর্পোরেশনগুলো তাদের লভ্যাংশের মাত্র অর্ধেক স্টকহোল্ডারদের প্রদান করে, বাকি অংশ নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সম্প্রসারণে ব্যয় করে। লভ্যাংশকে নতুন সম্প্রসারণে বিনিয়োগ স্বীকৃত পন্থা বলা হলেও এটা যেভাবে করা হয় তা যথাযথ নয়। শেয়ারহোল্ডারগণ কীভাবে এবং কোন খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ চায় সে বিষয়ে কোনো মতামত গ্রহণ না করেই বিনিয়োগ খাতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৮৯] যদি বোর্ড মিটিং এর বাইরে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মতামত নেয়া হতো, তবে এ ব্যবস্থাকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক বলা হতো এবং এতে মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হতো।

কর্পোরেশনের সম্প্রসারণ বেকারত্ব সমস্যাকেও তীব্রতর করেছে। এর কারণ হচ্ছে কর্পোরেশনসমূহ শ্রমনিবিড় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বদলে পুঁজিনিবিড় ব্যবস্থার প্রতি অধিক পক্ষপাতী। ব্যাংক ঋণের অবারিত ছাড় সে উৎসাহে আরো ইন্ধন যোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাংকের সুদের হার কম রাখার প্রয়োজনীয়তা, পরবর্তী দুই বছর পাবলিক সেক্টরে ঋণের সুদ পরিশোধের ভার লাঘব করা এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা প্রভৃতি প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র কর্পোরেট সম্প্রসারণকেই উৎসাহিত করা হয়নি, বরং পুঁজি নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এসব পদক্ষেপের ফলে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও বেকারত্ব সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।

উৎপাদন উপকরণসমূহের ব্যক্তি মালিকানা ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করে– এ বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা শুধুমাত্র জন্ম দিয়েছে অপ্রয়োজনীয় দানবাকৃতির কনগ্লোমারেট কোম্পানীসমূহ, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও অপরিসীম বেকারত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে বার্লি চমৎকারভাবে বলেন, 'পুঁজি রয়েছে, তাই রয়েছে পুঁজিবাদ। মধ্যখানে মার খাচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণকারী উদ্যোক্তা শ্রেণী'।[৯০] তাই দেখা যায়, পুঁজিবাদের দু'টি শক্তিশালী স্তম্ভ তথা ভোক্তাশ্রেণীর সার্বভৌম চূড়ান্ত ক্ষমতা ও উদ্যোক্তা শ্রেণীর সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা উভয়ের ভিত নড়ে গেছে। ব্যক্তি ভোক্তা ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা উভয়ই উৎপাদন সংগঠনের বিশাল শক্তিশালী চাকার কাছে হার মেনে আনুগত্য করছে।[৯১]

কিন্তু এ ধরনের অবস্থার উদ্ভব বাহির থেকে হয়নি, বরং পুঁজিবাদী কাঠামোর ভিতর থেকে জন্ম নিয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধহীন পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি, সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থাও এ অপব্যবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহও তেমন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণের বদলে এসব সংস্থা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।[৯২]

উল্লেখযোগ্য বিধিবদ্ধ আইনকানুনসমূহ প্রণীত হয় কর্পোরেশনসমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী মহল কর্তৃকই এসব আইনকানুনের খসড়া প্রণীত হয়।[৯৩] গলব্রেথ তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আধুনিক অর্থনীতিতে বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে ক্ষমতা জিম্মি হয়ে আছে। তথাকথিত সার্বভৌম ভোক্তাশ্রেণী ও সাধারণ জনগণের অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। কর্পোরেশনসমূহের অর্থনীতির উপর সুদৃঢ় কায়েমী-স্বার্থ হ্রাস করার অন্যতম উপায় হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রায়ন। কর্পোরেশন গণতন্ত্রায়নের উপায়সমূহ হতে পারে– এদের আকৃতি কমিয়ে 'অপটিমাম' পর্যায়ে নিয়ে আসা, একই পণ্যের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো, কর্পোরেশনের পুঁজির পরিমাণের মধ্যে ইকুইটির অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়া এবং জনগণের মাঝে শেয়ারের মালিকানা ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু অর্থব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতীত এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাতারাতি প্রতিযোগী ফার্ম কিনে ফেলা, বাজারে প্রচুর বন্ড ইস্যু করা, সর্বোপরি বিশাল উৎপাদন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যাংকসমূহের পক্ষপাত ইতিবাচক পরিবর্তনের বদলে বিপরীতমুখী স্রোতকেই জোরদার করে তুলেছে।

অন্যায্য বণ্টনব্যবস্থা

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শেষ কথা হচ্ছে আর্থিক লভ্যাংশের বণ্টন। উৎপাদনের উপকরণসমূহ তথা শ্রমিক, পুঁজি সরবরাহকারী, ভূমি মালিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণী উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে স্ব-স্ব ন্যায়সংগত লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য কৃষক যেমন তার শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে একটি ভালো ফসল লাভের আশায়– এটি তারই অনুরূপ। তাই একটি সমাজ কাঠামো কতটুকু ভালো তা নির্ভর করেছে শুধুমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতার উপর নয়, বরং একই সাথে বণ্টন প্রক্রিয়া সুষম ও ন্যায়সংগত কিনা তারও উপর। ইতোমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে, সমাজের জন্য কী কী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করা প্রয়োজন এবং কীভাবে তা উৎপাদন করতে হবে– এ প্রশ্নের জবাবে পুঁজিবাদ সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের বিভিন্ন খাতে বণ্টনের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। এখন দেখা যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদ কোনো প্রকার ন্যায়নীতি প্রদর্শন করতে পারেনি।

স্থিতাবস্থার পক্ষে চুক্তি

প্রচলিত পশ্চিমা অর্থনীতিতে লভ্যাংশ বণ্টনের বিষয়টি বিভিন্ন উৎপাদন খাতে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের বণ্টনের ন্যায় গুরুত্ব লাভ করেনি। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, উৎপাদন উপকরণসমূহের যদি বিভিন্ন উৎপাদন খাতে দক্ষতার সাথে বিলিবণ্টন নিশ্চিত করা যায়, তবে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণসমূহ মোট উৎপাদনে প্রত্যেকে নিজস্ব অবদান অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে

তাদের প্রাপ্য আয় পেয়ে যাবে। যদি কোনো উৎপাদন উপকরণের আয় উপযুক্ত নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ততার চেয়ে কম দেখা যায়, তবে দীর্ঘমেয়াদে ঠিক মাত্রায় পৌঁছে যাবে। যেহেতু সম্পদ হচ্ছে মানুষের দীর্ঘকালীন সঞ্চয়ের ফসল, তাই অর্থনৈতিক যুক্তি অনুযায়ী সমাজে বিরাজিত বর্তমান সম্পদ বণ্টনের অবস্থানকে ন্যায়সংগত বলা ছাড়া উপায় নেই। অধিকাংশ পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ সমাজে সম্পদ বণ্টনের বর্তমান স্থিতাবস্থার পক্ষে অর্থনীতির শাণিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৯৫] স্যামুয়েলসন স্বীকার করেছেন, "সম্পদ ও আয় বণ্টনের নীতি ও তত্ত্ব এখনো স্থিতিশীলতা লাভ করেনি"।[৯৬] অর্থনীতির এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের অবস্থা কেন বিরাজ করছে সে বিষয়ে সংগতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়। উৎপাদনশীল অবস্থার প্রান্তিক তত্ত্ব মোট উৎপাদনে প্রত্যেক উৎপাদন উপকরণের অবদান বা হিস্যা কতটুকু তা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। অপরদিকে 'প্যারিটো অপটিমালিটি' তত্ত্ব আয় বণ্টনের বর্তমান স্থিতাবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তনের চেষ্টাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে বর্ণনা করেছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন 'প্যারিটো অপটিমালিটি' অনুযায়ী সমাজের সব মানুষের সর্বমোট যে সুখবোধ থাকে তা বিনষ্ট হবে। বিভিন্ন মানুষের মাঝে উপযোগ-উপভোগের পারস্পরিক তুলনা সম্ভব নয়– এ ধারণায় বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টন আয়ের বৈষম্যমূলক বণ্টনের চেয়ে শ্রেয়তর বা অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে মর্মে কোনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপসংহার টানা যায় না।[৯৭] পুঁজিবাদী সমাজে বলবৎ বর্তমান আয় বণ্টনব্যবস্থা প্রকৃতির কঠিন নিয়মের ফল এবং সংগত বলে তারা রায় প্রদান করেন।

তাই সামাজিক ন্যায়পরতা কোনো অলীক আদর্শের ভিত্তিতে আয়ের পুনর্বণ্টনের যে কোনো উদ্যোগ শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা নয়, এ প্রচেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে। বর্তমান অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ সমাজে বলবৎ আয়বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। আয়ের বিশাল বৈষম্যকে এসব অর্থনীতিবিদগণ প্রকৃতির নিয়ম ও অনিবার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ন্যায়পরতা একটি অবাস্তব স্বপ্নমাত্র। এ ধরনের ন্যায়পরতা প্রচেষ্টা বরং সামাজিক দুঃখ-কষ্টকে বৃদ্ধি করবে।[৯৮] এধরনের চিন্তাধারার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিবাদ হচ্ছে সম্পূর্ণ নৈতিকতাহীনভাবে অন্যায় ও অসংগত।[৯৯] অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ব্যক্তি মানুষের অন্ধস্বার্থপরতা যা বৈষম্যমূলক আয়বণ্টন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, তা একটি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর সামাজিক শক্তি।[১০০] প্রখ্যাত মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম সামনার বলেন, "কোটিপতি ব্যক্তিগণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, সমাজের বিশেষ বিশেষ কর্মসম্পাদনের জন্য প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করেছে। তারা উচ্চ মুনাফা অর্জন করে এবং বিলাস ব্যসনে জীবনযাপন করে। কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্যই সমাজকে এ মূল্য দিতে হবে"।[১০১] তাদের উচ্চ আয়

সঞ্চয় সৃষ্টি করে, উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। রবার্ট ওয়েন বলেছেন, 'দরিদ্র ও বেকারগণ তাদের দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য দায়ী নন, বরং তারা যান্ত্রিক বাজারব্যবস্থার শিকার'।[১০২] কিন্তু পুঁজিবাদের প্রবক্তা অর্থনীতিবিদদের ভাষ্যে রবার্ট ওয়েনের এই বক্তব্যের কোনো প্রতিধ্বনি মেলে না।

প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ

দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সম্পদ ও আয়ের পুনর্বণ্টনের ধারণাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিকল্প হিসেবে তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ প্যারিটো বলেন, 'যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে মোট আয়ের বৃদ্ধির হার বেশি না হয় তবে আয়ের বৈষম্য কমানো সম্ভব নয়'।[১০৩] পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় শিবিরের অর্থনীতিবিদগণ আয়ের সুষম বন্টনের পবিবর্তে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। থুরো এই ধরনের চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যদি কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় তবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সবার জন্য অধিকতর আয়ের পথ সুগম হবে। জনগণ তাদের অধিকতর আয় অর্জনের কারণে বিত্তশালীদের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই সুখি থাকবে। সমাজ তখন আর ধন বৈষম্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না। শেষ পর্যন্ত অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্যের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসবে'।[১০৪]

এভাবে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্নটি মাত্রাহীন গুরুত্ব লাভ করেছে এবং একে আয় বৈষম্য হ্রাসের অস্ত্র হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি দরিদ্র জনগণের ভোগের মাত্রা বাড়াতে সক্ষম হলেও তাদের সব অভাব পূরণ করতে পারেনি। অধিক প্রবৃদ্ধি ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তদানুযায়ী বেড়েছে তাদের ভোগের মাত্রার ব্যবধানও। কোলকো এর মতে, 'যত দিন আয় বৈষম্য বিরাজ করবে ততদিন ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে ভোগের বিরাট ব্যবধানও থেকে যাবে'।[১০৫] অধিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ধনিক শ্রেণীর বিত্ত ও আয়কে আরো ফাঁপিয়ে তোলে, কেননা বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল প্রকার পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এ অবস্থায় অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অধিকন্তু প্রবৃদ্ধি কখনো একটানা চলতে থাকে না। প্রবৃদ্ধিতে মাঝে মাঝে দেখা দেয় মন্দা ও বেকারত্ব। এই অর্থনৈতিক মন্দা সবার জন্য ক্ষতিকর হলেও দরিদ্র শ্রেণীর উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক।

প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যদিও অনস্বীকার্য, তবুও এর উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। বাজেট ও বাণিজ্য ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি ও স্টাগফ্লেশন (Stagflationh) [যে বিশেষ সময়সীমার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না], বৈদেশিক সুদ পরিশোধের দায়ভার প্রভৃতি এ

সমস্যাসমূহের অন্যতম। প্রবৃদ্ধির জন্য সতর্ক বিবেচনাহীন দৌড় প্রতিযোগিতা সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদকে নিঃশেষ করে তুলেছে, প্রকৃতির দূষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা মানুষ, পশুপাখি ও উদ্ভিদ জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলছে।

আয় বৈষম্য নিরসনের জন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন ছাড়াও আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে একথা অস্বীকার করার জো নেই। এ পদক্ষেপগুলো প্রগতিশীল করব্যবস্থা, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, প্রগতিশীল করব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। যেহেতু জনগণের সিংহভাগ মজুরও বেতনভোগী, তাই তাদের আয় পরোক্ষ করের আওতায় পড়ে যায়। অপর দিকে ধনাঢ্য শ্রেণী তাদের আয় ও মুনাফার উপর ধার্যযোগ্য আয়কর নানা পন্থায় ফাঁকি দেবার ফাঁকফোকর ও সুযোগ খুঁজে নেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভর্তুকিব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যা দরিদ্র শ্রেণী থেকে ধনিক শ্রেণীকেই বেশি সহায়তা করে।

সন্দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত কার্যকারিতা ও সক্ষমতার বিষয়ে পুঁজিবাদী দেশসমূহও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছে।[১০৬] নির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির অবমতা, বাজার অর্থনীতির তাত্ত্বিকরূপ বাস্তবে খুঁজে না পাওয়া ইত্যাদি বিষয় ক্রমাগত স্বীকৃতি লাভ করছে। সমকালীন অনেক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অর্থনীতির কোনো খাতেই পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিরাজ করে না। বরং একচেটিয়া মালিকানা, বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য ব্যাংক ঋণের অবাধ সুযোগ, কোনো বিশেষ খাত বা অঞ্চলে নতুনদের বিনিয়োগের জন্য প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি হচ্ছে বাজার অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থাই বিদ্যমান সম্পদ ও আয় বৈষম্যের জন্য প্রধানত দায়ী। এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাহীন পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে আয়-বৈষম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কথাও প্রতিভাত হয়েছে যে, মানুষের কেবলমাত্র কার্যক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আয়-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি।[১০৭] আয়-বৈষম্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী মানবসৃষ্ট পক্ষপাতমূলক নানা অবস্থা।

আয়-বৈষম্যের অন্যতম প্রধান বাস্তব কারণ হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকানা সমাজের মানুষের মাঝে সুষমভাবে বিস্তৃত ও বণ্টিত নয়। ব্যাংকব্যবস্থাও এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যই ব্যাংক ঋণের দুয়ার খোলা থাকে। গেলব্রেথের

(Galbraith) ভাষায়, 'পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বৃহৎ কর্পোরেশনসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী ও বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহের নিকট আকর্ষণীয় খদ্দের'।[১০৮] তিনি আরো মন্তব্য করেন, 'পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দেখা যায় যাদের ঋণ নেবার প্রয়োজন নেই, এসব বৃহৎ সংস্থাসমূহই ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহভাজন। বিপরীত চিত্র দেখা যায় বাজার অর্থনীতিতে। এখানে যাদের ঋণের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, দেখা যায় তারা ব্যাংকের নিকট আকর্ষণীয় খরিদ্দার নয়'।[১০৯] বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংক ঋণের সহজলভ্যতার ফলে সমাজে ন্যায়পরতা সৃষ্টির পরিবর্তে ঐ সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমাজে কাঙ্ক্ষিত ন্যায়পরতার দুয়ার ক্রমাগত অবরুদ্ধ হয়ে কতিপয় ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থই ক্রমাগতভাবে চরিতার্থ হয়েছে। অপর দিকে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা সীমাবদ্ধ বেতন ও মজুরি পাচ্ছে, তাদের দুর্গতি বেড়ে চলেছে। কার্ল মার্কস এ সমস্যা এবং এ অবাঞ্ছিত অবস্থা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তি মালিকানা অবসানের যে অবাস্তব সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন তা সমাধানের বদলে অধিকতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের অভিভাবক ব্যাংকসমূহের ক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পুঁজিবাদ মুখরক্ষাকারী যেসব প্রসাধনীমূলক পরিবর্তন আনয়ন করে, তা দ্বারা সমাজের ইনসাফ বৃদ্ধি করবে এ আশা দুরাশা মাত্র। বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কায়েমী স্বার্থ ফ্রাংকেনস্টাইনের রূপ ধারণ করেছে। ফলে তাদের অপসারণ করে সমাজে শুভ ফলাফল আনয়নের প্রচেষ্টায় সফল হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেভিড রকফেলার একবার সবাইকে স্তম্ভিত করে জানিয়েছিলেন যে, এক ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে তিনজন ছাত্রই মনে করে যে, বৃহৎ পুঁজিপতি পরিবারগুলো সরকারের লাগাম প্রশাসন ও কংগ্রেসের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়েছে। উক্ত ভোটের ফলাফল মিশিগান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণা জরিপ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, ৫৯% আমেরিকান নাগরিকই মনে করেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী কতিপয় পুঁজিবাদী পরিবারই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।[১১০] এমতাবস্থায় আয় ও সম্পদের বৈষম্য নিরসনে অর্থনীতির কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক বলে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বৈষম্য হ্রাস করতে পারে এমন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আদর্শিক দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় না। একই সাথে প্রয়োজন সামাজিকভাবে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি রাষ্ট্রের শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সদিচ্ছা। কিন্তু লেইজে ফেয়ার অর্থনীতির স্থলে যে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বাঞ্ছিত ফলাফল আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে।

'লেইজে ফেয়ার' ব্যবস্থার অবসান

দু'টি ঘটনা 'লেইজ ফেয়ার' পুঁজিবাদের ভিত বিশেষ করে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে হস্ত ক্ষেপ না করার নীতিকে ধবসিয়ে দিয়েছিল। ঘটনা দু'টি হচ্ছে, ১৯৩০ এর দিকে মহামন্দা এবং সমাজবাদের উত্থান। ঘটনাদ্বয় কিনেসিয়ান বিপ্লব ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। 'লেইজে ফেয়ার' পুঁজিবাদের কফিনে ঘটনা দু'টি শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। স্যুমপিটার ও টয়েনবির মতো মার্কসবাদী নয় এমন অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অবশ্য মিল্টন ফ্রিডম্যান ও ফ্রেডরিখ হায়েক এর মতো কতিপয় অর্থনীতিবিদ 'লেইজে ফেয়ার' অর্থনীতিকে সমর্থন করে যেতে লাগলেন, যদিও তা অনেকটা পরিবর্তিত কাঠামোয়। আশির দশকে এ ধরনের অর্থনীতিবিদের বলয় বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মহামন্দার পর অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রবণতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল সে উৎসাহ ক্রমান্বয়ে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের অদক্ষতা, বাজেট ঘাটতি পূরণের অসমর্থতা ও এসব কারণে কল্যাণ রাষ্ট্রের উপর সৃষ্ট বিরূপ ধারণা ইত্যাদি কারণে হ্রাস পেতে লাগল।

ত্রিশ দশকের দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দা অর্থনীতিবিদ 'সে' এর অর্থনীতির সূত্রের উপর দীর্ঘকালীন আস্থা বিনষ্ট করে দেয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতির নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হবার বা বিচ্যুতি ঠিক করে আদর্শ স্থানে ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে বৃটিশ ও অন্যান্য সরকারের লেইজে ফেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রফেসর কিনস বিস্মিত হয়ে পড়েন। কিনসের ক্লাসিক্যাল পূর্বসূরিরা উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোকে যেখানে স্বাভাবিক, প্রকৃতিসম্মত, যুক্তিসংগত, চিরকালীন ও সরল অভিধায় অভিষিক্ত করেছিলেন সেখানে কীনস তার Economic Consequence of the Peace গ্রন্থে পক্ষান্তরে লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে 'অস্বাভাবিক, অস্থিতিশীল, জটিল, অনির্ভরযোগ্য ও ভঙ্গুর' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১১১]

সংস্কারের কন্টকাকীর্ণ পথ ঃ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সূচনা

কিনস এর জেনারেল থিওরির মূল প্রতিপাদ্য তারল্যের অগ্রাধিকার (liquidity preference) বা ভোগ বা সঞ্চয় বিনিয়োগ রেখা নয়; বরং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এডাম স্মিথ হতে শুরু করে সব ক্লাসিক্যাল ধারণায় 'আপনাআপনি সব সময় পূর্ণ কর্মসংস্থান বিরাজ করবে' মর্মে যে তত্ত্ব ও ধারণা দেয়া হয়েছে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।[১১২] কিনস যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি সব সময় পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্থনৈতিক মন্দার খানাখন্দে পড়ে থাকতে পারে। মন্দার কবলে পতিত অর্থনীতি একসময়ে আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমৃদ্ধির যুগে ফিরে আসবে– এ ধরনের বিশ্বাস একটি চরম ভ্রান্তিবিলাস বলে কিনস যৌক্তিক পন্থায় দেখিয়ে দিয়েছেন। কিনস বলেন, কেউ ধৈর্যের সাথে দীর্ঘকাল

সমৃদ্ধির আশায় বসে থাকবে না, কারণ দীর্ঘকালীন সময় আমরা সবাই লাশে পরিণত হব।[১১৩] এ প্রেক্ষাপটেই মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য কিনসীয় প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই ১৯৩০ দশকের প্রলয়ংকরী মহামন্দা বাস্তবে লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদকে সমূলে উৎপাটিত করেছে, আর তাত্ত্বিকভাবে কিনসের অর্থনৈতিক দর্শনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। এর সাথে সমাজতন্ত্রের উত্থান যুক্ত হয়ে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' যুগের সূচনা হয়েছে।

অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ব্যর্থতা

একথা বলা প্রয়োজন যে, কিনস কল্যাণ রাষ্ট্রের শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপরই আলোচনা করেছেন- তা হচ্ছে পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার বিষয়টি। এ উদ্দেশ্যে রাজনীতির মাধ্যমে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধিকে তিনি জোর দিয়েছেন। কিনসের এই ব্যবস্থাপত্র যেহেতু যুগপৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার তীব্রতাকে হ্রাস করে ব্যবসায়িক চক্রের উর্ধ্বগামীতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, সেহেতু তার দেয়া ব্যবস্থাপত্র সঠিকভাবেই হোক বা ভুলক্রমেই হোক এ আস্থার জন্ম দিয়েছে যে, ১৯৩০ দশকের গভীর ও প্রলম্বিত মন্দা অতীতের বিষয় এবং এর আর পুনরায় আবির্ভাব হবে না।

কিনস কিন্তু সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন খাতে কত বরাদ্দ করতে হবে তথা তুলনামূলক অগ্রাধিকারের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থাপত্র রেখে যাননি। তার ব্যবস্থাপত্রে মূল প্রতিষেধক হিসেবে পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় মোট চাহিদার পরিমাণকে একই পরিমাণে অক্ষুণ্ন রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রতিরক্ষা, ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা কল্যাণ ভাতা যে কোনো খাতে খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে মোট চাহিদার পরিমাণকে অব্যাহত রাখা যেতে পারে। কিনস অগ্রাধিকারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তবে তাঁর মতে পুঁজিবাদ বিভিন্ন উৎপাদন খাতে উৎপাদন উপকরণের বণ্টন ও মানুষের সাথে আয়ের বণ্টন সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল। তাই দেখা যায়, কিনস পুঁজিবাদের কাঠামোয় সামান্য পরিবর্তনেই সন্তুষ্ট ছিলেন ততটুকু মাত্র যা পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। পূর্ণ কর্মসংস্থানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না এমন সব পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোয় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনয়নে কিনস বিশ্বাসী ছিলেন না।[১১৪]

অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক মন্দাকে মোকাবিলা করার জন্য কিনস প্রস্তাবিত ঘাটতি ব্যয়ের অস্ত্র অধিকাংশ সরকার সমাজকল্যাণ বা প্রতিরক্ষা খাতে অর্থায়নে অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। অধিকাংশ দেশে সরকারি খাতে এই ব্যয় বৃদ্ধি বেসরকারি ভোগখাতে ব্যয় হ্রাস না করেই সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্তি লাভকারী ভোগবাদ, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, ব্যাংকের ভোগখাতে ঋণের প্রসার

বেসরকারি ভোগখাতকে বরং চাঙ্গা করে তুলেছে। এ ভোগব্যয় বৃদ্ধিটি এমন যে, একে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা বিরাজমান ভোগবাদী পরিবেশে জীবনের পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যত বেশি ভোগ করা যায় তা এবং দেখা গেছে সমাজের কেউই অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত নয়। সমাজে যদি সবাই মান্য করে এমন ত্যাগ স্বীকারকারী মূল্যবোধের অস্তিত্ব ও তার প্রতি আনুগত্য না থাকে তবে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়াই খুব স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। সরকারি ও বেসরকারি খাতে এরূপ ব্যয় বৃদ্ধি পঞ্চাশ ও ষাট এই দুই দশকে পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় রেখেছিল। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের পরিসীমায় অর্থনীতির উপর যে প্রচণ্ড চাপ ও ভার সৃষ্টি করেছে তাতে নব নব গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। উদ্ভূত সমস্যাসমূহের অন্যতম হচ্ছে অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতির হার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় দু'শতাব্দী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩%। কিন্তু ১৯৪০ এর দশকে গড় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণ।[১১৫] কোনো ব্যাখ্যা দ্বারা একে মেনে নেয়া যায় না। কেননা এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, এ ধরনের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দক্ষতা ও ন্যায়পরতা উভয়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় উচ্চ অর্থনীতি স্টাগফ্লেশন (Stagflation) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দেখা যায় উচ্চ দ্রব্যমূল্য ও উচ্চ মজুরি হারের সাথে হাতে হাত রেখে পড়তি চাহিদা, নিম্ন উৎপাদন, অধিক বেকারত্ব ও উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের অসমর্থতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে প্রবৃদ্ধির হার কমে আসে এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় কিনসীয় পদ্ধতিতে মোট চাহিদার পরিমাণ অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এটা আবার একদিকে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিকে আরো অবনতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। এখন একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

১৯৮০ এর দশকে মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও অর্থনীতিবিদগণ একে একটি সাময়িক স্থিতিশীলতা বলে মনে করেন এবং ধারণা পোষণ করেন যে, মূল্যস্ফীতি আবারও একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বাজেট ঘাটতি যদি অব্যাহত থাকে।[১১৬] এ অবস্থার আরো অবনতি হবে যদি রাশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে অর্থবাজার হতে ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ করে থাকে এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোও অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বেকারত্বের হার হ্রাসের জন্য উচ্চমাত্রার সরকারি ব্যয় অব্যাহত রাখে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, অর্থবাজারে অত্যধিক লেনদেনের তারল্য সৃষ্টির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা স্টক ও পণ্য বাজারে সৃষ্ট উচ্চমাত্রার অস্থিতিশীলতা। ব্রাডি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পুঁজিবাজার ক্রমশই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক কিছু করারও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না।[১১৭] যখন বিশাল বাজেট ঘাটতি, নাটকীয়ভাবে স্থিতিহীন সুদের ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার বিরাজ করে এবং স্বল্পমেয়াদের পণ্য আন্তঃদেশে দমকা বাতাসের মতো অর্থের আগমন ও নির্গমন হয়, তখন অর্থবাজার বিপজ্জনকভাবে অস্থিতিশীল হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অস্থিতিশীলতার অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণদানের অত্যধিক প্রসারণ বা সংকোচন, সম্পদ ও আয়ের বিরাট বৈষম্য, যাকে হেইলব্রোনার 'পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনাহীন ও নৈরাজ্যবাদী চরিত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১১৮] সুষম অর্থ ও রাজস্বনীতি প্রবর্তন এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে অস্থিতিশীলতার এইসব উৎসের মূল্যোৎপাটন করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে, ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণের ক্রমবর্ধমান সুদের বোঝা। তুলনামূলকভাবে অধিক ঋণের হার ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা অর্থনীতিতে আবার নতুন নেতিবাচক মাত্রা যোগ করে। ঘাটতি বাজেটের জন্য অর্থ সংগ্রহ সকল দেশের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ালেও উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ প্রক্রিয়া সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব উন্নয়নশীল দেশের জন্য বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের বিষয়টি সমগ্র আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দিয়েছে। চরমভাবে ঋণগ্রস্ত দেশসমূহের দুঃসহ অভাব লাঘবের জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংকুলান করা যায়নি বলে এসব কর্মসূচি গতিশীলতা লাভ করতে পারেনি। ইতোমধ্যে কতিপয় দেশ তাদের রপ্তানি আয়ের সুনির্দিষ্ট অনুপাতে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। বৃহৎ ঋণগ্রস্ত দেশসমূহ যদি একই পরিকল্পনা ঘোষণা করে তাহলে ব্যাংকসমূহের জন্য সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিবে।

চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের হার হ্রাস পাওয়া। যেহেতু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত, তাই বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে। ১৩টি মুখ্য ওইসিডি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার ১৯৬০-৭১ দশকের ১৭.৫% ও ১৭.৬% হতে হ্রাস পেয়ে ১৯৮০-৮৭ সালে ১০.৭% ও ১০.৮% এ এসে দাঁড়িয়েছে।[১১৯] রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও একত্রীভূত জার্মানী কর্তৃক বিনিয়োগের জন্য সংকুচিত বিশ্ব-সঞ্চয়ের ভাণ্ডারের উপর যেহেতু অধিকতর চাহিদা ও চাপ সৃষ্টি হবে, তাই বিশ্ব অর্থনীতির দিগন্তে সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব-সঞ্চয় ভাণ্ডার বিশেষত

উচ্চ সঞ্চয়কারী দেশ জাপানেও সঞ্চয়ের ফলে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং স্টক, দ্রব্য সামগ্রী ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চম সমস্যা হচ্ছে, ভোগের ইচ্ছা চরিতার্থকরণ ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির উপর অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপের ফলে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদের ক্রমবর্ধমান হ্রাস এবং প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় এই গ্রহে জীবনের উপর হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। এখন এটা সর্বমহলে উপলব্ধি হচ্ছে যে, 'বিশ্বের পরিবেশগত সংকট মোকাবিলার জন্য বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মৌলিক নীতিমালার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই'।[১২০] বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে এ বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ দিকের প্রতি স্বল্পই সচেতনতা ও উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে। তা হচ্ছে 'সম্ভোগের জড়তা' থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নৈতিক মূল্যবোধ ও সহজ সরল জীবনযাত্রার দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুরাগ ও অনুভূতি।[১২১]

উভয় সংকট

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার দুটি পন্থা রয়েছে– হয় উৎপাদন ব্যয় না হয় মোট চাহিদা কমাতে হবে।[১২২] প্রথম ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কোনো না কোনোভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সুষম বাজেটের দিকে ফিরে যেতে হবে। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রথমটি অর্জন করা যেতে পারে। অবশ্য এর দীর্ঘকালীন ব্যবহার সম্ভব নয়, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতিজনক পরিস্থিতিতে। কারণ প্রকৃত মজুরি হ্রাসের এই ব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও অন্যায্য। তাছাড়া এতে কালোবাজারী, দীর্ঘকালীন সরবরাহ স্বল্পতা এবং উৎপাদন উপাদানের বিভিন্ন খাতে বন্টনে বিকৃতি দেখা হয়। দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণের ঢাকনা যখন তুলে ফেলা হয়, তখন দ্রব্যমূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি পাগলা ঘোড়ার বেগে ছুটে আসে। সুষম বাজেটের ব্যবস্থাপত্র মূল্যস্ফীতির দিগন্তে স্বস্তির বাতাস এনে দিলেও অন্য সীমান্তে বৃদ্ধি হ্রাস, অধিকতর বেকারত্ব, কল্যাণ খাতে ব্যাপক কাটছাঁটের দুর্যোগ ডেকে আনে, বিশেষত যখন সরকার তার জন্য সকল খাতে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে, ব্যয় কমাতে রাজী না থাকে এবং সেকুলার ভোগবাদী সমাজ যখন তাদের অনাবশ্যক ও অপচয়মূলক খরচ কমাতে অসম্মত থাকে। এ অবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে একটি সংকটে নিপতিত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সমাধানহীন এক সংঘাতের। এ সংঘাত হচ্ছে পুঁজিবাদের কথিত সফল ও বাঞ্ছিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত স্বাস্থ্যকর অর্থনীতির সংঘাত।

তাই দেখা যাচ্ছে, কিনসীয় কৌশল উভয় সংকটের সৃষ্টি করেছে। একদিকে এ অর্থনৈতিক কৌশল দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যূনতম প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ, মুদ্রাস্ফীতি

ও বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। অন্যদিকে সম্পদ ও আয়ের বিশাল বৈষম্য হ্রাসেরও কোনো পন্থা এই কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি। অবশ্য সমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাধিকারের মুখে এ লক্ষ্যসমূহ কালক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে, যা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কল্যাণ রাষ্ট্রের এ ধারণা সজীব শিকড়ের আকার ধারণ করেছে।

কল্যাণ রাষ্ট্র কেবলমাত্র অর্থনীতিতে সরকারের ভারসাম্য সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালনের কিনসীয় প্রস্তাবকেই গ্রহণ করেনি, অধিকন্তু কল্যাণ খাতে অধিকতর ব্যয় এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের কল্যাণমুখী ভূমিকাকেও আত্মস্থ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি কোনো খাতে ভারসাম্য সৃষ্টিকারী ব্যয় হ্রাস না করেই কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রত্যাঘাতের জন্ম দিয়েছে। সামাজিক ডারউইনবাদীদের দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে কল্যাণ খাতে ব্যয় হ্রাস। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন যার লক্ষ্য হিসেবে এখানে সজীব, সেখানে কল্যাণ খাতে ব্যয় হ্রাস বা পূর্ণ কর্মসংস্থান ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্য কি বিসর্জন দেয়া সম্ভব? যেহেতু এটা সম্ভব নয়, তাই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কোথায় ভুল আর কোথায় বিভ্রান্তি ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতেই মৌলিক গলদ রয়েছে।

সামাজিক অনিষ্টকারিতা

পুঁজিবাদের সেকুলার দর্শনের ট্রাজেডি হচ্ছে কতিপয় পুঁজিপতিদের লাগামহীন স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দানের বিনিময়ে সমাজের সিংহভাগ মানুষ অধিকার ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে; শুধু তাই নয় বরং পুঁজিবাদ আরো অনেক সামাজিক অনিষ্টকারিতার জন্ম দিয়েছে। ঐশী নির্দেশনা এবং তা হতে উদ্ভূত সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে অবহেলা ও অস্বীকৃতির মাধ্যমে পুঁজিবাদ এমন একটি বাঁধনহীন, লাগামহীন সমাজের জন্ম দিয়েছে যার পরতে পরতে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে। অধিক হতে অধিকতর ভোগবিলাসের লালসা, ছলেবলে কৌশলে যেভাবেই হোক অধিকতর সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার মানসিকতার ইন্ধন জুগিয়েছে।

পুঁজিবাদী দর্শনের ফসল নেতিবাচক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মস্বার্থপরতার অবাধ প্রচার ও প্রসার হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দুর্বল করে তোলে। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, সুস্থ ও সবল সামাজিক অগ্রগতিতে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। পারিবারিক আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা ব্যতিরেকে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসার বন্ধনের মাঝে জড়িয়ে রাখতে পারে না। ঐ সমাজে এটা সম্ভব নয় যেখানে অবাধ যৌন স্বাধীনতা বিরাজ করে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই প্রতারণামূলক যৌন অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এমন সমাজে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ভেঙে পড়াই

স্বাভাবিক। 'ঈশ্বর এখন মৃত'– এ দাম্ভিক ঘোষণার পরপরই এলো 'পরিবার কাঠামোকে ভেঙে ফেল'– এই বাণিজ্যিক কৃষ্টির শ্লোগান। 'শাসন-শোষণের নীড় ও শৃঙ্খল' অভিধায় পরিবারকে চিহ্নিত করে এর নিন্দাবাদ উচ্চারিত হলো।[১২৩] 'ঐতিহ্যের শিকল' এবং 'সমষ্টিগত সকল বন্ধন' হতে মানুষের মুক্তি দেবার জন্য পশ্চিমা রেনেসাঁ আন্দোলনের স্বাভাবিক ফলাফল ছিল এগুলো।

বিবাহ বন্ধনের বাইরে যৌন সম্পর্কের অনুমোদন এবং অর্থ উপার্জনের অবাধ লিপ্সার সাথে সন্তান লালনপালনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপযুক্ত যত্ন ও স্নেহমমতার মাধ্যমে সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য মাতাপিতার পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন, এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার কথা, তা এখন আর লভ্য নয়। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যে সময়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে সময়টি মাতৃক্রোড়ের বদলে ডে-কেয়ার সেন্টারে হতে পারে না। তাই কিশোর অপরাধ বেড়ে চলছে এবং এমন এক প্রজন্ম বেড়ে উঠছে যাদের মাতাপিতা, ভাইবোন, মানুষ এবং সামাজিক মূল্যবোধ কোনো কিছুর প্রতিই কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের এরূপ অবনতিশীল পরিস্থিতিতে কি মানব সভ্যতা টিকে থাকতে পারে?

মুষ্টিমেয় বৃহৎ কতিপয় পুঁজিবাদী পরিবার কর্তৃক সমগ্র অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ এবং নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামার আছে এমন ধরনের জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান হার গ্রামাঞ্চল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর হতে বিরাট জনগোষ্ঠীকে কাজের খোঁজে বৃহৎ নগরীর দিকে ধাবমান করে তুলেছে।[১২৪] গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নগরমুখী এই বৃহৎ অভিবাসন একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের সাথে যুক্ত হয়ে পরমাণু আকৃতির ক্ষুদ্র পরিবারের সমকালীন ধরণাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছে।[১২৫] ফলে পরিবারের সদস্য হিসেবে পূর্বে একে অন্যের আপদে-বিপদে, সুখ-দুঃখে যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহায়তা পেত, তা হতে বর্তমান একক পরমাণু পরিবারগুলো বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দরিদ্র, আর্ত, রোগগ্রস্ত, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ জনগণের দেখাশোনা করার সমগ্র বোঝা ও দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, যেটা আনজাম দেবার শক্তি, সম্পদ ও সরঞ্জাম কোনোটাই রাষ্ট্রের নেই।

পরিবার নামক তৃণমূল প্রতিষ্ঠান ও যুথবদ্ধ সামাজিক জীবনের ভাঙন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অতীব কার্যকর পথ ও পন্থার ভিত্তিভূমিকে প্রবলভাবে ক্ষয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যুগিয়েছে। দারিদ্র্য দ্বারা সৃষ্ট দস্যুতা, চুরি, ধর্ষণ ও অর্থের বিনিময়ে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ এবং ধনিক শ্রেণী কর্তৃক ঘুষ, ভোক্তাকে প্রতারণা, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, নিম্নমানের দ্রব্য সামগ্রীর বাজারজাতকরণ, অন্যায্য শ্রমনীতি এবং কর ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি হোয়াইট কালার অপরাধ ও দুর্নীতিকে একত্রীভূত করলে যে অপরাধ ইনডেক্স বেরিয়ে আসবে তা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। সরকারিভাবে অপরাধের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা

ডুবন্ত বিশাল হিমবাহের পানির উপরকার শীর্ষ দেশের মতো। সমাজদেহে অস্বাভাবিকতার সকল লক্ষণের বৃদ্ধি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এটি ব্যক্তি-মানুষের জীবনে অসুখি হবার অভিব্যক্তিরই প্রকাশ। দেহ এবং যৌন সম্ভোগ ও সম্পদ বৃদ্ধির বল্গাহীন প্রচেষ্টার মাঝে যদি মানুষের সুখ ও প্রশান্তি নিহিত থাকত তবে সমাজদেহে যে অস্বাভাবিকতার লক্ষণ জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে উঠেছে তা এত তীব্র হয়ে দৃশ্যমান হতো না, যা বস্তুত সভ্য সমাজের অস্তিত্বকেই হুমকির সম্মুখীন করেছে।

অধিকাংশ সরকারই একথা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, কেবলমাত্র পুলিশী শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অপরাধ হ্রাস ও দমন করা সম্ভব নয়। অপরাধ হ্রাসের জন্য প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং একই সাথে মৌলিক চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ দেহের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস। অপরিহার্য বিষয়ের বাস্ত বায়ন ব্যতীত অপরাধ হ্রাসের কথা উচ্চারণ ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার যুক্তির মতো অন্তঃসারশূন্য। ফলে ব্যর্থতা অবধারিত। আর্থ-সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার, যা শুধু ঐশীবাণী প্রদর্শিত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু দেখা যায়, পুঁজিবাদের বিশ্বদৃষ্টি ও কৌশল মানুষের নফসানিয়াতের তাড়না থেকে সৃষ্ট যা ঐশীবাণী নির্দেশিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে জৈবিক তাড়নার দিকে ধাবিত হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদরাজির মালিকও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সত্ত্বেও অধিক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদাপূরণ এবং আয় ও সমাজের বিশাল বৈষম্য হ্রাসে সমর্থ্য হয়নি। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৩৩.৬% তথা ৩ কোটি ২৪ লাখ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে।[১২৬] এদের এক চতুর্থাংশ আবার 'দারিদ্র্য ও হতাশার দুষ্টচক্রে' আবর্তিত। এরা হচ্ছে 'বস্তি সংস্কৃতির বন্দী আদম সন্তান'। কিশোরী গর্ভবতী, পিতৃহীন পরিবার, অমোচনীয় বেকারত্ব, অপরাধ ও মাদকাসক্তির অবক্ষয়িত সমাজ ও সংস্কৃতির অন্ধগলিতে এদের জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।[১২৭] ষাট ও সত্তর দশকে যখন লেইজে ফেয়ার দর্শন প্রত্যাখ্যাত হয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং যার ফলে উন্নত কল্যাণ রাষ্ট্রসমূহের আবির্ভাব ঘটে, উপযুক্ত হতাশাব্যঞ্জক চিত্রসমূহ তখনকার ছবি। এমতাবস্থায় দুর্দশা আরো কত গভীরতর হবে তা কল্পনাও করা যায় না, যখন রিগান ও থ্যাচার প্রশাসন পুনরায় লেইজে ফেয়ারের পথে ওকালতি করছেন এবং তারা দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের ভর্তুকি দেবার সরকারি নীতিকেই দায়ী করছেন? এসবের সাথে যদি শ্লথ প্রবৃদ্ধির সমষ্টি অর্থনৈতিক বৈসাদৃশ্যকে যুক্ত করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে এটা সবার দৃষ্টিগোচর ও হৃদয়ঙ্গম হবে যে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অর্থনৈতিক মডেল ব্যতিরেকে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (প্রথম অধ্যায়)

১. Tibor Scitovsky, *The Joyless Economy* (1976).

২. নিঃসন্দেহে খুব কম অর্থনীতিবিদই বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করবেন। যাই হোক এটি সরকারি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুমিত সামঞ্জস্যের যৌক্তিক ফলাফল। J. B. Clark এর মতো অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, বাস্তব দুনিয়ায় উৎপাদনের উপকরণের আয় তার প্রান্তিক উৎপাদন ও তার শূন্যের প্রায় কাছাকাছি (দেখুন G. Stingler, *Production and Distribution Theories : The Formative Period* (1941)। সুতরাং এ ধারণা সরকারের হস্তক্ষেপ না করার সুপ্রসিদ্ধ নীতির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে।

৩. George Dalton, *Economic System and Society* (1974), p. 68.

৪. Samuel Brittan, *Two Cheers for Self-Interest: Some Moral Prerequisites for a Market Economy* (1985), p. 16.

৫. Crane Brinton, "Enlightenment'', *in Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 2. p. 521.

৬. Will Durant, *The Story of Civilization* (1953), vol. 5, p. 572

৭. E. A. Burtt, *The Metaphysical Foundation of Modern Science* (1955), p. 17.

৮. Will Durant, *The Story of Philosophy* (1970), p. 237 এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, Voltaire তার নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রন্থের Treatise on Toleration অধ্যায় ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন, পাদ্রীরা তাদের ধর্মাদর্শের পরিমণ্ডলে বসবাস করেছেন এবং মতপার্থক্য সহ্য করেছেন। তিনি হয়ত গোড়া মতবাদের অযৌক্তিক গণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য নতুন বাইবেলের কোথাও এরূপ সূক্ষ্ম সম্পর্কের হদিস পাওয়া যাবে না যা খৃস্টীয় ইতিহাসে তুচ্ছ বিতর্কের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

৯. Durant, *The Story of Civilization* (1953), vol. 5, p. 571.

১০. দেখুন John Passmore, "Logical Positivism", *Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 5, p 5

১১. উদ্ধৃত করেছেন Durant, *The Story of Philosophy* (1970), p. 241.

১২. Owen Schadwich তার *The Secularisation of the European Mind in The Nineteenth Century* (1975) গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্বৃত করেছেন যে Littre ও Robin তাদের Dictionnaire (সম্পাদিত ১৮০৯)-এ মানুষের আত্মাকে ব্যাখ্যা করেছেন "শরীরতত্ত্বের দৃষ্টিতে ঘাড় ও মেরুদণ্ডের কার্যক্রম এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতার কার্যাবলীর সমষ্টি হিসেবে। বিশিষ্ট চিকিৎসক Julien La Mettrie মন্তব্য করেন "আত্মা সুস্পষ্টভাবে একটি আলোকিত যন্ত্র ... সুতরাং আত্মা একটি অমর শব্দ ছাড়া কিছুই নয়, যার সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা নেই। একজন আলোকিত (enlightened) ব্যক্তির উচিত আমাদের মাঝে যে অংশ চিন্তা করতে পারে তাকেই আত্মা বলে বুঝানো। আত্মা বলতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ঐ জিনিসকে বুঝানো উচিত আমাদের মাঝের যে অংশ চিন্তা করতে পারে।" Durant কর্তৃক *The Story of Civilization* (১৯৫৩) গ্রন্থে ৯ম খণ্ড ১৯ উদ্বৃত।

১৩. Bertrand Russell, A Free Man's Worship–Mysticism and Logic (১৯১৮), পৃষ্ঠা ৪৬। আরো দেখুন Burtt (১৯৫৫) পৃষ্ঠা ২৪।

১৪. Bertrand Russell, *The Impact of Science on Society* (1953), p.6.

১৫. দেখুন R.H. Tawney, *The Acquisitive Society* (1948), p. 12. জীবনের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্নমুখী ধারণার চমৎকার উপস্থাপনার জন্য দেখুন Paul Edwards, "Life, Meaning and Value of," *Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 3, pp. 467-77.

১৬. Bertrand Russell, *A Free Man's Worship* (1918), p. 46.

১৭. ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া মানব জীবন যে অর্থবহ হতে পারে না তা C. H. D. Clark তার *Christianity and Bertrand Russell* (1958) নামক গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।

১৮. Hazel Barnes (1957) অনুদিত Jean-Paul Sartre Gi *Being and Nothingness*, p.38. Jean-Paul Sartre-এর অভিমত সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য দেখুন Anthony Manser, Satre : A Philosophic Study (1966). Laslie Stevenson, Seven Theories of Human Nature (1974), pp. 78-90

১৯. Durant, *The Story of Civilization* (1953), vol. 9, p. 618.

২০. আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে অস্তিত্ববাদই (Existentialism) সম্ভবত প্রধান এবং এ চিন্ত াধারার অনুসারীগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করেন না এবং মানুষকে তার পছন্দ-অপছন্দ নির্বাচনে স্বাধীন বিবেচনা করেন।

২১. দেখুন, Jecques Barzun, *Darwin, Marx, Wagner* (1958), p. 3.

২২. E. F. Schumacher, *Small is Beautiful* (1973), p. 81.

২৩. Crane Briton, "Enlightenment", Encyclopaedia of Philosophy (1967) Vol. 2, p.523. আরো দেখুন Michael Prowse এর "Why the Churth is losing its Market", *Weekend Financial Times*, 31 March/ 1 April, 1990, p.1 of Section II.

২৪. Economist পত্রিকার ভাষায়, অর্ধেকের বেশি আমেরিকান বলেন যে, তাদের জীবনের জন্য ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (১৯৫০ এর দশকে তিন-চতুর্থাংশ লোকে এ ধারণা পোষণ করত)। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ লোক কোনো না কোনো চার্চ এর সদস্য এবং শতকরা ৪০ ভাগ লোক নিয়মিত চার্চে গমন করে' (*Economist*, মে ১৬, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ২৫। এতে, আরো বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র একটি অস্বাভাবিক ধর্মীয় দেশ'। এ মন্তব্য সম্ভবতঃ যথার্থ, কারণ ফ্রান্স ও বৃটেনে শতকরা মাত্র ১২-১৪ ভাগ লোক নিয়মিত চার্চে গমন করে। অপরদিকে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ লোক চার্চে যায় (দেখুন The Islamic Foundation, Leicester, U. K, কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক নিউজ লেটার *Focus on Christian Muslim Relations* –Man and Religion in Secular Europe, vol. 5, 1988, pp. 9-10.

২৫. বিদ্যালয়ে নীতিবোধ শিক্ষাদানের মধ্যে এটি প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় তাদের শিক্ষাক্রম থেকে মৌলিক নীতিবোধ সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে সকল ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সূত্রগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। (*Washington Post* থেকে *International Herald Tribune* এ উদ্ধৃত, ১৭ মার্চ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৪)।

২৬. Sherry Buchanan, "As Ethics Courses Multiply, Prospective Tycoons Shrug", *International Herald Tribune,* 9 July 1987, p. 9; আরো দেখুন, "The Business Ethics Debate'' "*Newsweek,* 25" May 1987, p. 44.

২৭. Arnold Toynbee, *A Study of History,* সংক্ষিপ্ত করেছেন D. C. Somervelle (1958), vol. 2, p. 380 and vol. 1, pp. 495-6.

২৮. Will and Ariel Durant, *The Lessons of History* (1986), p. 51.

২৯. George A. Miller, *Psychology : The Science of Mental Life* (1962), pp. 230-1, আরো দেখুন, Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy* (1945), pp. 773-82.

৩০. উদ্বৃতি George Lichtheim, *A Short History of Socialism* (1978), p. 20.

৩১. Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy* (1945), p.775.

৩২. Richard A. Posner, *The Economics of Justice* (1981), p. 33.

৩৩. দেখুন, John Rawls, *A Theory of Justice* (1973); আরো দেখুন, Brittan (1985), pp. 25-26.

৩৪. নিয়ম বহির্ভূত বিজ্ঞানের স্বৈর ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভিমত জানার জন্য দেখুন, Quentin Skinner সম্পাদিত *The Return of Grand Theory in the Human Sciences* (1986).

৩৫. Rawls এর মতে আধুনিক দর্শনের চরম উৎকর্ষের যুগে প্রধান প্রধান পদ্ধতিগত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক ধরনের উপযোগবাদ ছিল। (John Rawls, *A Theory of Justice* (1973), p. vii) উপযোগবাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে দেখুন H. Sidgwick, *Outlines of the History of Ethics,* (1946).

৩৬. Russell. *A History of Western Philosophy* (1945), p. 779.

৩৭. Alexander Solzhenitsyn, *A World Split Apart* (1978), p. 49.

৩৮. W. Schneider, *Adam Smith's Moral and Political Philosophy* (1948), p. 52; আরো দেখুন, Piero V. Mini, Philosophy and Economics: *The Origins and Development of Economic Theory* (1974), p. 76.

৩৯. Frank Hahn and *Martin Hollis (eds.),* Philosophy and Economic Theory (1979), p. 13.

৪০. W. S. Jevons, *The Theory of Political Economy,* reprint of the 1871 edition (1965).

৪১. দেখুন, Milton Friedman, *Capitalism and Freedom,* (1972), p. 133.

৪২. F. Y. Edgeworth, *Mathematical Physics : An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Science* (1881), p. 16.

৪৩. Milton L. Myers, *The Soul of Mordern Economic Man : Ideas of Self Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith,* (1983), p. 2.

৪৪. Adam Smith, "Invisible Hand", in L. S. Stepelevich, ed., *The Capitalist Reader* (1977), p. 20. আরো দেখুন, Wilhelm Roepke, "Ordered Anarchy", ibid., p. 32.

৪৫. দেখুন, Milton Friedman, "The Methodology of Positive Economics", in F. Hahn and M. Hollis, *Philosophy and Economic Theory* (1979), p. 19.

৪৬. Harvey Leibenstein, "Notes on Welfare Economics and the Theory of Democracy", *Economic Journal,* June 1962, pp. 299-317 থেকে উদ্ধৃত করেছেন, Mini (1974), pp. 136-7. এখানে John Rawls এর অভিমত উল্লেখ করা দরকার যে, সাধারণ সুখ বৃদ্ধির জন্য কোনো এক ব্যক্তির এককভাবে কাজ করা উচিত নয়, এরূপ করা হলে ঐ ব্যক্তি কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে অসুখি করে (John Rawls, "Justice as Fairness", *Philosophical Review,* vol. 67/1958, pp. 164-94), Pareto Optimum তত্ত্বকে Charles Schultz "প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকারক নয়" নীতি হিসেবে অভিহিত করেন- তার ধারণা সরকারের কোনো কাজ কখনোই কাউকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে না। তিনি যুক্তি দেন যে, প্রধানত এ নীতির কারণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার বিরল পরিলক্ষিত হয়।

৪৭. Robert A. Solo, "Values and Judgements in the Discourse of the Sciences", in Robert Solo and Charles Anderson, eds., *Value Judgement and Income Distribution* (1981), p. 38, আরো দেখুন Amartya Sen, *On Ethics and Economics* (1987), p. 32.

৪৮. Solo (1981), p. 32.

৪৯. T. Malthus, *An Essay on the Principle of Population* (2nd ed., 1803), p. 531.

৫০. Lichtheim, (1978), pp. 17-18, Hofstadter এর মতে "যোগ্যতমেরাই টিকে থাকে" তত্ত্বটি আমেরিকানদের মনে স্থায়ী আসন দখল করে আছে। Richard Hofstadter, *Social Darwinism in American Thought* (revised edition, 1962), pp. 200-4.

৫১. দেখুন, Harry K. Girvetz, "Welfare State", *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (1968), vol., 16, pp. 531-14.

৫২. Karl Polanyi, *The Great Transformation* (1944), p. 57.

৫৩. দেখুন, Elizabeth Jay and Richard Jay, *Critics of Capitalism: Victorian Reactions to Political Economy* (1986).

৫৪. Henry George, *Progress and Poverty* (1955), p. 10.

৫৫. Jay and Jay (1986), pp. 15-16.

৫৬. Hyman Minsky, *Stabilising an Unstable Economy* (1986), pp. 5-6.

৫৭. Vance Packard এ বিষয়টি বেশ কয়েকটি বইতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে জনপ্রিয়তা অর্জন্ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেডিসন এভিনিউয়ের প্রতারকের মুখোশ

উন্মোচন সংক্রান্ত গ্রন্থ *The Hidden Persuaders* (1957)। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত যা হওয়া উচিত তা থেকে অনেক কম যুক্তিসংগত হয়েছে।

৫৮. John K. Galbraith, *The New Industrial State* (1972), p. 153: আরো দেখুন, Edward S. Greenberg, "The Corporate State", in Edward S. Greenberg and Richard Young, *American Politics Reconsidered* (1973), p. 61.

৫৯. অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন পরিভাষায় বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন- 'Bandwagon' effect, the 'Snob' effect, the 'Veblen' effect ইত্যাদি। এ সকল পরিভাষার নমুনা সংজ্ঞার জন্য দেখুন Harvey Leibenstein এর *Beyond Economic Man* (1976), pp. 51-2.

৬০. Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism* (1976), p. 21.

৬১. *Tawney, The Acquisitive Society* (1948), p. 12.

৬২. *Arthur Okun, Equality and Efficiency: The Big Trade-off* (1975), p. 11.

৬৩. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইইসি দেশসমূহে 'উদ্বৃত্ত' দুগ্ধ উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ 'উদ্বৃত্ত' হওয়ার কারণ হচ্ছে উৎপাদকদের উচ্চ হারে সাবসিডি দেয়া হয় যা প্রকারান্তরে সরকারি রাজস্বের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ সুবিধাটির ফল ভোগ করে উৎপাদকরা, ভোক্তারা নয়। যদি ভোক্তাদের নিম্ন ভারসাম্য মূল্য দেয়া হতো, তাহলে 'উদ্বৃত্ত' এর বিলোপ ঘটতো এবং ভোক্তারাও সুবিধা পেতো।

৬৪. Brittan (1985), p. 17.

৬৫. Paul A. Samuelson, *Economics* (1980), p. 591.

৬৬. John K. Galbraith, *The Affluent Society* (1958); আরো দেখুন, Girvetz, "Welfare State", pp. 519-20.

৬৭. Schumacher, *Small is Beautiful* (1973), p. 40.

৬৮. Michael Harrington, *Twilight of Capitalism* (1977), p. 32.

৬৯. দেখুন, Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capita: An Essay on the American Economic and Social Order* (1966), p. 6.

৭০. দেখুন, Andrew Hacker, et al., "Corporation, Business", the *New Encyclopaedia Britannica* (1973-74), vol. 5, p. 182.

৭১. উদ্ধৃতি David Owen, "Go Broke, Young Man", *Financial Times*, 31 January 1987, p. 1.

৭২. দেখুন Edward S. Mason এর সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন *The Corporation in Modern Society* (1980),

৭৩. Lindholm, *Politics and Markets*, p. 356.

৭৪. Edward S. Greenberg, *Serving the Few: Corporate Capitalism and the Bias of Government Policy* (1974), p. 247.

৭৫. উদ্ধৃতি Greenberg, *Serving the Few* (1974), p. 45. from Reagan "What 17 Million Shareholders Share", p. 102.

৭৬. Robert Sheehan, "Proprietors in the World of Big Business", *Fortune,* 15 June 1967, p. 179.

৭৭. দেখুন, Gabriel Kolko, *Wealth and Power in America: An Analysis of Social Class and Income Distribution* (1964), pp. 68 and 127.

৭৮. Michael Reich, "The Evolution of the U.S. Labour Force", *The Capitalist System* (1972).

৭৯. Edward S. Mason, "Corporation", *Encyclopaedia of Social Sciences,* vol. 3, p. 401.

৮০. David Reisman, *Galbraith and American Capitalism* (1980), pp. 58-68.

৮১. Hacker, *et al.* (1973/74), vol. 5, p. 185.

৮২. Ibid, p. 187. See also Kolko, *Wealth and Power* (1964), p. 67.

৮৩. C, Wright Mills, *The Power Elite* (1956), p. 116.

৮৪. Hacker, *et al.* (1973/74), p. 185.

৮৫. *Ibid.*

৮৬. Greenberg, *Serving the Few* (1974), p. 40.

৮৭. Hacker, *et al.* (1973/74) , p. 185.

৮৮. David Owen (1987), p. 1.

৮৯. Hacker, *et al.* (1973/74), p. 185.

৯০. Adolf A. Berle, Jr., *The Twentieth Century Capitalist Revolution* (1954), p. 39.

৯১. Galbraith, *The New Industrial State* (1972), p. xiv.

৯২. Galbraith, *Economics and the Public Purpose* (1973), p. 209.

৯৩. Greenberg, *Serving the Few* (1974), p, 99.

৯৪. Galbraith, *Economics and the Public Purpose* (1975), p. ix.

৯৫. Alice Rivlin, *American Economic Review,* May 1975, pp. 5-6, cited by R. Lekachman, *Economists at Bay* (1976), p.92.

৯৬. Paul A. Samuelson, *Economics* (1980), p. 499.

৯৭. Stanley Lebergott. "Income Distribution II (Size)", *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (1968), vol. 7, p. 146.

৯৮. Gorge Soule, *Ideas of Great Economists* (1952), p. 53.

৯৯. Harrington, *Twilight of Capitalism* (1977), p. 320.

১০০. Soule, *Ideas of Great Economists* (1952), p. 53.

১০১. William G. Sumner, *The Challenge of Facts and Other Essays*, edited by Albert G. Keller (1914), p. 90.

১০২. Dalton, *Economic System and Society* (1974), p. 77.

১০৩. Reported by Stanley Lebergott in "Income Distribution", (1968), p. 151.

১০৪. Lester Thurow, "The IIlusion of Economic Necessity" এর, in Solo and Aderson. (1981), p. 250.

১০৫. Kolko, *Wealth and Power in America* (1964), p. 126.

১০৬. Galbraith, *Economics and the Public Purpose* (1975), p. xi.

১০৭. এ সংক্রান্ত কতিপয় সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য দেখুন Jacob Mincer এর "The Distribution of Labour Incomes: A Survey with Special Reference to the Human Capital Approach", *Journal of Economic Literature,* March, 1970, pp. 1-26.

১০৮. Galbraith, *Economics and the Public Purpose* (1975), pp. 186-7

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭। Galbraith পরিকল্পনা পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চিরায়ত মডেলের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় কিছু বৃহৎ একচেটিয়া করপোরেশন দ্বারা যাদের প্রত্যেকে বাজারের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজারের মূল্য ও উৎপাদনের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে প্রতারণামূলক প্রচারণার মোকাবিলায় ভোক্তারা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১-৫০)।

১১০. Richard J. Barnett and Ronald E. Muller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations* (1974), p. 24.

১১১. John Maynard Keynes, *Economic Consequences of the Peace* (1920), p. 3, cited by Mini (1974), p. 233.

১১২. Lawrence R. Klein, *The Keynesian Revolution* (1954), p. 90.

১১৩. দেখুন J. M. Keynes এর *Tract on Monetary Reform* (1924), p. 88.

১১৪. দেখুন Klein, *The Keynesian Revolution* (1954), Chapter 7 (pp. 165-87); আরো দেখুন, Greenberg এর *Serving the Few* (1974), pp. 230-1.

১১৫. ১৯৫০ সাল থেকে মূল্য সম্পর্কে দেখুন, International Monetary Fund, *International Financial Statistics,* various *Yearbook* issues; এর পূর্ববর্তী বছরগুলোর জন্য দেখুন William Rees-Mogg এর *The Reigning Error: The Crisis of World Inflation* (1974), p. 69.

১১৬. OECD দেশসমূহে ১৯৬৮-৮৬ সময়কালে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ; ১৯৮৭ সালে তা বার্ষিক ৩.৯% ভাগে হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে তা যথাক্রমে ৪.৮ ও ৫.৯ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

১১৭. Nicholas F. Brady, *et al.* Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, January, 1988),

১১৮. R. Heilbroner, *The Limits of American Capitalism* (1966), p. 88.

১১৯. Bank of International Settlements, 59th *Annual Report*- April, 1988-March 1989 (Basle: BIS, June 1989), Table on "Savings and Investment: A Longer-Term Comparison", p.32.

১২০. জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা তোলবার প্রদত্ত প্রতিবেদন "The Fight to Save the Planet", *Time,* 18 December 1989, p. 51

১২১. Bill McKibben, *The End of Nature* (1989).

১২২. Solo (1981), p. 37.

১২৩. এ সংক্রান্ত গ্রন্থতালিকার জন্য দেখুন, Khurram Murad, "On the Family", in *The Muslim World Book Review,* No. 1, 1984, pp. 44-9.

১২৪. দেখুন "Rural America", *Economist*, 8 November 1986, pp. 21-5.

১২৫. Soule (1952), p. 73.

১২৬. Isabell V. Sawhill, "Poverty in the U.S.: Why is it so Persistent", *Journal of American Literature,* September, 1988, p. 1075.

১২৭. Richard Stengel, "The Underclass: Breaking the Cycle", *Time,* 10 October 1988, p. 26.

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাজতন্ত্রের পশ্চাৎপসরণ

পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনিবার্য দুঃখদুর্দশা ও ভোগান্তি। মানবচিত্তের স্বভাবজাত শুভবুদ্ধি এ অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এ অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার মতবাদ ও জীবনাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। অবশ্য সমাজতন্ত্র কোনো এক ব্যক্তির চিন্তাপ্রসূত মতবাদ নয়। এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে; যেমন- ইউটোপিয়ান, ফ্যাবিয়ান, সিন্ডিক্যালিস্ট, গিল্ড, মার্কসিস্ট, মার্কেট, ডেমোক্রেটিক এবং অন্যান্য।[১] সমাজতন্ত্রের এসব বহুবিধ প্রকারের পারস্পরিক তারতম্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যক নয়। তবে সমাজতান্ত্রিক এসব মতবাদের মধ্যে কতক বৈশিষ্ট্য সাধারণ। সমাজতন্ত্রের ধারণাসমূহের সবগুলোই (কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত, যেমন- পল টিললিক, আর এইচ টাউনি এবং কুর্ট সুমেকার) তৎকালীন প্রবল সেকুলার আবহে লালিত হয়েছিল এবং বিশ্ব সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে এদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুঁজিবাদী মতবাদের মতোই সেকুলার।[২] পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমানভাবে সমালোচনা করে এরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মুক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থা অনিবার্যভাবে সম্পদের অসম বন্টন ঘটিয়ে বিত্তশালীকে আরো বিত্তবান এবং দরিদ্র্যকে আরো দরিদ্রতর করে আয় ও সম্পদের অসম বন্টনের দুষ্ট চক্রকে চিরস্থায়ী রূপ দেয়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদসমূহ ব্যক্তি মালিকানা ও মজুরি ব্যবস্থাকে সকল অনিষ্টের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে ধারণা পোষণ করে যে, সম্পদের বিভিন্ন মাত্রায় জাতীয়করণ ব্যতীত দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থা ও বিশেষ স্বার্থভোগী শ্রেণী বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এমনকি গণতন্ত্রের পক্ষেও কার্যকর রূপ নেয়া সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদসমূহ এমন একটি ভবিষ্যতের ধারণা পোষণ করে যখন জনগণ গণতান্ত্রিকভাবে বা বলপূর্বক পুঁজিবাদীদের কবল হতে সরকারের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে এবং উৎপাদন উপকরণের জাতীয়করণ ও পরিকল্পিত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী সংঘাতমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক ও সুসম সমাজব্যবস্থার পত্তন ঘটাবে। অন্য কথায় তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ার এক ভিন্ন ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করে। সমাজতন্ত্রের এ নানাবিধ প্রকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য বিশ্বব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, বরং অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাদের কার্যপদ্ধতি বা কৌশলের মধ্যে নিহিত।

সমাজতন্ত্রের বহুবিধ প্রকরণের মধ্যে এখানে শুধুমাত্র মার্কসবাদী (Marxist), বাজারব্যবস্থা (Market), ও গণতান্ত্রিক (Democratic)- এই তিনটি চিন্তাধারার উপর

আলোকপাত করা হবে। সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ধারণাসমূহ এ তিনটি মূলধারার পূর্বসূরি এবং যেহেতু এগুলো মূলধারা তিনটির মতো রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, তাই তাদের আলোচনা দ্বারা সমাজতন্ত্রের মূল বিষয়বস্তু অনুধাবনে কোনো সুযোগের অবকাশ নেই।

মার্কসবাদ

বিশ্বদৃষ্টি ও কৌশল

জঙ্গি নাস্তিক্যবাদ (Militant Atheism)

মার্কর্সবাদ হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে উদ্ভূত বিভিন্ন আদর্শগত সংশ্লেষণ। এ আদর্শিক চিন্তাধারাগুলো হচ্ছে তৎকালীন সেকুলার মুক্তচিন্তা, হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতবাদ, ফুয়েরবাকের বস্তুবাদ, মিচেলের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব, রিকার্ডো ও স্মিথের অর্থনৈতিক দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের জঙ্গি আহ্বান। ইহুদী পিতামাতার সাত সন্তানের অন্যতম কার্ল মার্কস এসব চিন্তাধারা, বিশেষ করে সেকুলার ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। তার পিতা ধর্মের ব্যাপারে তেমন রক্ষণশীল ছিলেন না। বিশ্বাসের তাগিদে নয় বরং পেশার প্রয়োজনে তিনি পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।[৩] যুবক বয়স হতে মার্কস গোঁড়া নাস্তিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন যার দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনাই সকল সমালোচনা শাস্ত্রের মূল ভিত্তি'।[৪]

অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীর মধ্যে মার্কসও সমাজব্যবস্থার রোগ নির্ণয় এবং প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রেণী বিচ্যুতি, শোষণ, উদ্বৃত্ত-মূল্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী সংগ্রাম, মজুরি-দাসত্ব, অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ নামক কতিপয় ধারণার প্রবর্তন করেন। কিন্তু লেখক হিসেবে সুবিন্যস্ত ও সাবলীল লেখনীর অধিকারী না হওয়ায় তার এই সব ধারণাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অবোধগম্য ও ভাসাভাসা।[৫]

মার্কসের বিশ্লেষণের প্রধান তাত্ত্বিক ধারণা হচ্ছে 'এলিনেশন' (alienation) বা সম্পদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া। বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে শোষণের ফলে পুঁজিবাদী সমাজে এর উদ্ভব ঘটে। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হচ্ছে শিল্প শ্রমিক। উৎপাদন উপকরণের মালিক বিধায় তারা তাদের শ্রম বিক্রয় করে মজুরি-দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী হচ্ছে পুঁজিবাদী, যারা উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক ও নিয়ন্তা। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী সকল উদ্বৃত্ত মূল্যের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে দেয়া হয় সর্বনিম্ন মজুরি যা তাদের কোনো রকমে বেঁচে থাকা ও নতুন শ্রমদাস প্রজননের চক্রে বেঁধে রাখে।

বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং প্রলেতারীয় শ্রেণীকে চিরস্থায়ী মজুরি দাসত্বের

নিগড়ে আবদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়া মানুষকে তার সহজাত মর্যাদা হতে বঞ্চিত করে অমানবিক যন্ত্রে মানবসত্তার বিচূর্ণিত ভগ্নাংশে পরিণত করে। মানব সত্তার সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ হতে তারা নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়। এই শোষণ প্রক্রিয়া পরস্পর স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে অনিবার্যভাবে শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা করে। মানব ইতিহাসের গতিপথের ক্রমবিবর্তনে এই শ্রেণী সংগ্রামই মূল নিয়ন্তাশক্তি। ব্যক্তি মানুষ কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, বরং ইতিহাসের দাবার ছকের অসহায় গুটি মাত্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থের অনিবার্য সংঘাতই নিয়ন্ত্রণ করে মানব ভাগ্য (অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ)।

উপর্যুক্ত যুক্তি অনুসারে মানুষের চিন্তাধারা নয় বরং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাই ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি। বুর্জোয়া সমাজের ধর্ম ও রাষ্ট্র এ শ্রেণী সংঘাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণের জন্য ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কেই বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করে। মানব সমাজের একাংশের ক্রমাগত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হওয়ার প্রক্রিয়ায় এ উভয় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ এলিনেশন প্রক্রিয়া অপসৃত হবে এবং ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রযন্ত্রেরই আর কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। তাই অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হচ্ছে এ সমস্ত অবস্থার অপসারণ যে পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হয় অপমানিত, নিগৃহীত, পরিত্যক্ত ও শৃঙ্খলিত।[৬] কিন্তু লক্ষণীয় যে, মার্কসীয় দর্শনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা তথা দ্বৈততা। মার্কসীয় দর্শনে একদিকে ব্যক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদের চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিণতির কথা, অর্থাৎ সেখানে শ্রেণী সংঘাত ও শোষণের অনিবার্য হাত হতে মুক্তির কোনো পথ নেই, অপর দিকে অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদের কঠোর নিগূঢ় তত্ত্ব থেকে মানবতার মুক্তির স্বপ্নজাল বিস্তার করা হয়েছে।

মার্কসের মতানুসারে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মানব প্রকৃতি বলে কিছু নেই'। এ মতবাদ মূলত অপরিবর্তনীয় ও স্থির এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন সাধারণ মানব চরিত্রের নির্দেশ করে।[৭] যেহেতু ব্যক্তি মানুষের কোনো মৌলিক প্রকৃতি নেই, তাই মানুষের চেতনা রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে এবং এই পরিবর্তন তার জীবনের 'বৈষয়িক অবস্থা তথা যে উৎপাদন পদ্ধতির সমাজে তার অবস্থান তা দ্বারা নির্ণীত হয়'।[৮] নরম্যান গ্যারাস মানব চরিত্র সম্পর্কে মার্কসের এ বহুল প্রচারিত মতের বিরোধিতা করেন।[৯] যাই হোক, মানব চরিত্র সম্পর্কে মার্কসের উপস্থাপিত ধারণা প্রামাণ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। তার ধারণা গ্রহণ করা হলে প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার উপর যে তাত্ত্বিক প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন সেটাই ধ্বসে পড়ে। যদি ব্যক্তি মানব চরিত্র অপরিবর্তনীয় হয়, তবে মানব জীবনের বৈষয়িক অবস্থা ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে বা ইতিহাসের দাবার ছকে মানুষকে নিছক গুটিতে পরিণত করতে পারে না। এর দ্বারা মার্কসের নিজের মতবাদই খণ্ডিত হয়ে যায় অর্থাৎ মানব চরিত্রের এ

অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই তখন ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাবে। কিন্তু মার্কস ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আমরা মানব চরিত্র সম্পর্কে তার পূর্বতন ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে, মার্কসের পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার বীজ মার্কস উপস্থাপিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তার মধ্যেই বিদ্যমান। একদিকে মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মানব চরিত্রে অন্তর্নিহিত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে না, অন্যদিকে তার 'এলিনেশন' সম্পর্কিত ধারণাটি এমন এক বৈশিষ্ট্যের অপরিহার্যতা দাবি করে। মার্কসের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ ও এলিনেশন সম্পর্কিত উপর্যুক্ত দু'টি ধারণাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক এবং এটাই মার্কসীয় দর্শন ও মতবাদ সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্যতার যে সাধারণ অভিযোগ সমালোচক মহলে বিরাজিত তার মূল কারণ।

রণকৌশলের ভুল প্রয়োগ

'এলিনেশন' প্রক্রিয়ার অবসানের একমাত্র উপায় হচ্ছে এর উৎস ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্য এবং তাদের রাজনৈতিক ও শোষণ-নিপীড়নমূলক ক্ষমতার বিলোপ ঘটবে। এই লক্ষ্যে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হচ্ছে প্রলেতারীয় শ্রেণী কর্তৃক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটানো। মার্কস 'ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী'দের প্রস্তাবিত শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজ পরিবর্তনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা এ পন্থা শ্রেণী সংগ্রামের মৌলিক হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেবে। মার্কস পুঁজিবাদী সমাজ থেকে ধাপে ধাপে ক্রমবিবর্তনের ধারণাকেও বাতিল করে দেন, কেননা সমাজে পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা ও শক্তির কারণে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হবে না। গতানুগতিক সরকার কর্তৃক বণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টাও সফল সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করতে পারে না। 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্ত হবে' –এই মৌলিক প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তিশীল নিখাদ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।[১০] জনগণ কর্তৃক বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল উৎপাদন উপকরণের জাতীয়করণের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল ন্যায়পরতাভিত্তিক সমাজ গঠিত হবে, যেখানে ক্রমান্বয়ে মজুরি, বিনিময়ের মাধ্যম মুদ্রা, সামাজিক শ্রেণী বিভাজন এবং পরিশেষে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাবে; সৃজিত হবে 'বিবেক চেতনা ও উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের আওতায় উৎপাদক শ্রেণীর এক মুক্ত সমবায়ী ব্যবস্থা'। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন ও সর্বহারা (প্রলেতারিয়েত) শ্রেণীর বিজয় হবে অবশ্যম্ভাবী।

প্রলেতারীয় শ্রেণীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় অভিসিক্ত করে তাদের বিচ্ছিন্নতার অবসান, তাদের জীবনযাত্রা ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং এভাবে

শ্রেণী সংঘাত অবসানের মহতী উদ্দেশ্য যদিও প্রশংসার দাবিদার, তবু মার্কস প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা ও কৌশল ভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাভিত্তিক মার্কসীয় মতবাদের দার্শনিক দিকটি বাদ দিলে তার লক্ষ্য অর্জনের রণকৌশল হিসেবে বাকি থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, উৎপাদন উপকরণসমূহের রাষ্ট্রীয়করণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন। কিন্তু তিনি যৌক্তিক বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে পারেননি যে, কিভাবে এলিনেশন প্রক্রিয়ার অবসান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তার প্রস্তাবিত মতাদর্শ ও পদ্ধতিগত কৌশল শোষণ ও মজুরি দাসত্বের অবসানের মাধ্যমে প্রলেতারীয় শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার উচ্চতর ধাপে একটি শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সকল শোষণের অবসান ঘটবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার আওতাধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি শোষণের হাতিয়ার হয়ে থাকে তবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন যা সমাজের এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ নির্মূলের প্রবক্তা– সে ব্যবস্থাপনা উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয়করণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যখন বিজয়ী শ্রেণীকে লাগামহীন ক্ষমতা প্রদান করা হবে, তখন জনগণের দুঃখ-দুর্দশা যে আরো বৃদ্ধি পাবে না তা আশংকা না করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। দ্বান্দ্বিক দর্শন, শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে একশ্রেণীর মানুষকে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও বলপূর্বক সম্পদ দখলে বিশ্বাসী মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি সমাজে আর যাই হোক মানুষের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানব হিতৈষী ভ্রাতৃত্ববোধের দর্শন দাবি করে সমাজের শক্তিশালী অংশ কর্তৃক সমাজের দরিদ্রতর ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অংশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও শর্তহীন সেবা প্রদান। অপর দিকে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মতবাদ ডারউইনের 'শক্তিমানের বেঁচে থাকার অধিকার' ভিত্তিক চিন্তাদর্শনেরই প্রতিধ্বনি।

হত্যাকাণ্ড ও বলপূর্বক সম্পদ দখলের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র উৎখাত করে প্রলেতারীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ধ্বজাধারীরা যখন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক ও একনায়কতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র হতে অধিকতর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্তা হবে তখন কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, তারা নিজেরাই শোষক ও নিপীড়কে পরিণত হবে না? মনে রাখা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট মতাদর্শিক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রযন্ত্রে জনগণের সবার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নয় বরং কতিপয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই চালিত হবে। কেননা রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় সমাজের সকল সদস্যের অংশ গ্রহণের ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং পার্টির কতিপয় ব্যক্তি যারা একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষে থাকবে তারা পূর্বতন বুর্জোয়া শ্রেণী হতেও অধিক নিপীড়নকারী বলে প্রমাণিত হতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সমাজে বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী অন্তত কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে। তার বিপরীতে উৎপাদন উপকরণসমূহের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রযন্ত্রে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে শ্রমিক শ্রেণীর ততটুকু

স্বাধীনতা ভোগেরও আর অবকাশ থাকবে না। এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, ফরাসি বিপ্লবের উদ্দেশ্য যেভাবে বিপ্লব সংঘটনকারীদেরই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পদদলিত হয়েছিল, একইভাবে মার্কসীয় বিপ্লবের পতাকাধারী সর্বহারা শ্রেণীর একনায়করা (Dictatorship of Proletariat) বিপ্লবের বাণীকেও প্রতারিত করবে না? যদি এলিনেশন প্রক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানাই দায়ী হয়, তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের মাঝেই সমাধান নিহিত- এ মার্কসীয় ধারণার সাথে একমত হতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলো মানব সমাজে বিভিন্ন ক্ষমতার মাঝে একটি মাত্র উৎস। এছাড়াও ক্ষমতার অন্যান্য উৎস রয়েছে, যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক ক্ষমতা, শিক্ষা, সৃজনশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কঠোর পরিশ্রম, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্বের অবস্থান। বিভিন্ন অমার্কসীয় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস বা এর শোষণ ক্ষমতা ভোঁতা করে দেয়া সম্ভব হলেও, সভ্যতার ভিত্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট না করে মার্কসীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতার অন্যান্য উৎসসমূহের অপসারণ সম্ভব নাও হতে পারে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই এলিনেশন প্রক্রিয়া কোনো বিশেষ একক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আরোপিত বিষয় নয়। ক্ষমতা সম্পত্তি বা সামাজিক অবস্থান যেখান থেকেই আসুক না কেন অথবা যিনি এই ক্ষমতা, ব্যবহার করবেন তিনি বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েত যাই হোন না কেন, এরূপ ক্ষমতার অধিকারী যে কেউ এ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। তবে মার্কসীয় মতাদর্শে ক্ষমতার উৎস ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের পর উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল ক্ষমতা পলিটব্যুরোর সদস্যদের হাতে ন্যস্ত হয়, যারা চাকরি প্রদান ও সম্পদ বণ্টন, পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান, শ্রম শিবিরে প্রেরণের মতো সকল ক্ষমতার অধিকারী। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মার্কসীয় মতাদর্শ যেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব সমাজে এই মতাদর্শ এলিনেশন প্রক্রিয়ার অবস্থান পরিবর্তন ঘটাতে বা কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।[১১] একটি ভুল ব্যবস্থাপত্র প্রকৃতপক্ষে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে তাকে আরো জটিল করে তোলে।

মার্কসের মতাদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের উপর অনাস্থাই প্রকাশ করে। এ মতবাদ মনে করে মানুষের চরিত্র কখনোই সংশোধন করা সম্ভব নয়। যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্ষমতার উৎস এবং শোষণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাই সমীচীন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসক ব্যক্তি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, যে ক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকদের ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। যদি একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনায়, তিনি সামাজিক কল্যাণ সীমাকে লঙ্ঘন করবেন এ আশংকায়, বিশ্বাস করা না যায়, তবে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একদলীয় রাষ্ট্রের শাসকবর্গকে কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে? পলিটব্যুরোর এ শাসক ব্যক্তিরা একই ধরনের মানুষের ভিতর থেকে এসেছে এ বিশ্বাস কি স্থাপন

করা যায় না? পুঁজিপতিদের তুলনায় তারা কি দেবদূত? যদি তা না হয় তবে সকল উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একদলীয় রাষ্ট্রের শাসকবর্গকে কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে? যদি তা না হয়, তবে সকল উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয় সে ক্ষমতা যে তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? মার্কস সম্ভবত এ ধরনের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রহীন সমাজের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার মূল কারণ বোধহয় এটি। কিন্তু মার্কস এটা বুঝতে পারেননি যে, রাষ্ট্রহীন সমাজে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের পরস্পরের সংঘর্ষের ফলে শোষণ ও অবিচারের অধিকতর সম্ভাবনা থেকে যায়।

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তার ফলশ্রুতি

বিপ্লব-উত্তর সময়ে মার্কসীয় কৌশল তথা উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত সম্পদের সুষম ও দক্ষ বণ্টন নিশ্চিতকরণ এবং "from each according to his ability to each according to his needs." স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল এই যে, ব্যক্তি মালিকানা যে সমস্ত অসম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তা একবার দূরীভূত করতে পারলে বাজারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণহীন ক্রিয়ার ফলে সম্পদের যে অদক্ষ ও অসম বণ্টন ঘটে রাষ্ট্রতন্ত্র তা সংশোধন করে নিতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কসীয় চিন্তা দর্শনের ত্রুটির কারণে এ আশাবাদ বিফল হয়েছে।

ভ্রান্ত অনুমান

গণতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্রও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কতগুলো ভুল ধারণা করে নিয়েছে। সঠিক ধারণার অভাবে দক্ষতা ও ন্যায়পরতা উভয় লক্ষ্যই অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ এসব ধারণাগুলোর ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা এসব অনুমানগুলো মার্কসীয় পুস্তকে তত্ত্বের আবরণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে মার্কসীয় দর্শনের এ ভুল অনুমানসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ নেই। যাই হোক, কতিপয় মার্কসীয় অনুমানের উপর আলোচনা বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করবে।

অনাস্থা ও আস্থা

প্রথমত, মার্কসীয় বিশ্লেষণ সামাজিক কল্যাণকামীতার সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের অক্ষমতাকে নির্দেশ করে। এ মার্কসীয় সিদ্ধান্তের আলোকে ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর একই ব্যক্তি ভোক্তা, শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে ভুলে যেয়ে একমাত্র সমাজের সার্বিক কল্যাণবোধ দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় (ক) শ্রমিক শ্রেণী আনুপাতিক হারে বস্তুগত প্রাপ্তির আশা ব্যতিরেকেই স্বার্থহীনভাবে দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করবে; (খ)

কলকারখানার ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ, বাজার প্রতিযোগিতা, বাজার শক্তি দ্বারা নির্দেশিতভাবে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়, বিক্রয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা চালিত না হয়ে দক্ষতার সাথে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবে; (গ) সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বিপুল কার্যনির্বাহী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার কোনো অন্যায় সুযোগ নেবে না। তাছাড়া সকল শ্রেণীর মানুষ ভোক্তা হিসেবে তাদের চাহিদা প্রয়োজনের সীমারেখার মধ্যে রেখে সম্পদের উপর অহেতুক চাপ হ্রাস করবে। উপর্যুক্ত পূর্বসিদ্ধান্তসমূহ বস্তুতপক্ষে অবাস্তব ধারণাপ্রসূত। কারণ সেকুলার একটি ব্যবস্থাপনায় সর্বজ্ঞ এক স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার কোনো ধারণা বা অনুশাসন কাজ করে না এবং একজন ব্যক্তি মানুষের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি মৃত্যু পরবর্তী কোনো জীবন সম্পর্কিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত নয়। এমতাবস্থায় একজন মানুষ বিত্ত-বৈভবের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে সব সময় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাবে– এ ধরনের ধারণা পোষণ করা অবাস্তব আশাবাদ মাত্র। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে কাজ করে যাবে–এ ধারণার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বিশেষত যখন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিহীন এ ধরনের জীবন ব্যবস্থায় বস্তুগত জীবনের ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে। এ কথা বিবেচনায় রাখা হয়নি যে, ব্যক্তিগত লাভালাভের সুযোগের অভাবে তাদের উৎপাদন ও কর্মপ্রেরণা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপরন্তু জোরজবরদস্তিমূলক উপায়ে তা করতে চেষ্টা করা হলে নির্ধারিত সামাজিক লক্ষ্য অর্জনই ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়সাধন

দ্বিতীয়ত, এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রযন্ত্র এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ দ্বারা চালিত হবে যাদের ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের কোনো সংঘাত থাকবে না– এটাও একটি ভুল ধারনা। কেননা একটি নিরঙ্কুশ একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও ক্ষমতা কাঠামো আপেক্ষিক স্থান, আন্তঃজাতি ও অবস্থানজনিত বিভিন্নমুখী সুযোগ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। বস্তুত নৈতিক চেতনার অনুপস্থিতিতে এমন কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই যা পরস্পর বিরোধী স্বার্থসমূহের সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারে। একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীতিতেও পূর্বনির্ধারিত সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎপাদন উপকরণ বন্টনের ক্ষেত্রে ভোক্তার চাহিদার সাথে সামষ্টিক মূল্যবোধের অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাবিদদের সামাজিক লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্য একটি ভিত খুঁজে নিতে হয় এবং সে লক্ষ্যে এমন এক মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় যা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু এ সামাজিক লক্ষ্য অর্জন ও সে জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ নিরূপণের দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হবে? যেহেতু সামাজিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের মতোই সেকুলার ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও বিবেচনায় ঐশী নির্দেশনার কোনো স্থান নেই, এমতাবস্থায় সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ

ও তা অর্জনের সহায়ক মূল্যমান ও মূল্যবোধ কি প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হবে? যদি ব্যক্তি মানুষকে ব্যক্তিসম্পদের মালিক বানিয়ে বিশ্বাস করা না যায় এ আশংকায় যে, ব্যক্তি মালিকানার সুযোগ নিয়ে সে অপরকে শোষণ করবে না, তাহলে কি করে সেই একই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা যায় যে, সে নিজের স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত না হয়েই সমাজের জন্য সার্বিক কল্যাণমূলক পণ্য উৎপাদন, বিন্যাস ও বিতরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে? তারা কি তাদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা একটুও চালিত হবে না? সমাজ কি প্রক্রিয়ায় তাদেরকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে তাদের কৃতকর্ম দ্বারা শুধুমাত্র সমাজের অভীষ্ট কল্যাণমূলক উৎপাদনে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখবে?

উপরন্তু কার্ল ম্যানহেইমের সেই প্রশ্ন থেকে যায়, 'পরিকল্পনাকারীদের পরিকল্পনা কে করবে?'[১২] তাছাড়া সমগ্র সমাজের জন্য কি পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণের সার্বিক দায়িত্ব গুটি কয়েক ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করার স্বপক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা নেই। ঐশী নির্দেশনার মূল্যবোধকে ধারণ করে যে সমাজব্যবস্থা নির্মিত নয়, এমন সমাজে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে পরিকল্পনাবিদগণ বস্তুবাদী চেতনার ফলশ্রুতিতে তাদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত ঐশী নির্দেশনার মূল্যবোধ দ্বারা চালিত সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমগ্র উৎপাদন উপকরণ নিয়ন্ত্রণের সার্বিক ভার কতিপয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অতিশয় বিপজ্জনক। এরূপ বিপুল ক্ষমতা একনায়কতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের জন্ম না দিয়ে পারে না, যা জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তির গোষ্ঠীস্বার্থকে চরিতার্থ করবে।

তথ্যের লভ্যতা

তৃতীয়ত, এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদের নিকট সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার নিমিত্ত ভোক্তার পছন্দ, উৎপাদন ব্যয় ও দ্রব্যমূলের সব তথ্য মওজুদ থাকবে। কিন্তু মুক্তবাজার ব্যবস্থা এবং চাহিদা ও সরবারহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেখানে অনুপস্থিত সেখানে উপর্যুক্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সঠিক সূচকসমূহ নির্ধারণ করাই সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই হায়েক (Hyake) যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় উপাত্তসমূহ না থাকার কারণেই উৎপাদন উপকরণসমূহ বন্টনের সমাজতান্ত্রিক সমাধান বাস্তবসম্মত নয়[১৩]।

উপর্যুক্ত উৎপাত্তসমূহ লভ্য হলেও অসংখ্য পণ্য ও সেবা উৎপাদনে কোনগুলো উৎপাদন উপকরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ধারণ করা পরিকল্পনা পর্ষদের কতিপয় ব্যক্তির পক্ষে দুরূহ হবে। এ বিষয়ে তারা চেষ্টা করলেও তা হবে অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি, যার ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হবে শ্লথ ও মন্থর। কিন্তু পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে সম্পদ বন্টনের বিষয়টি জনকল্যাণের সাথে এত বেশি সম্পৃক্ত যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা সমীচীন নয়।

মুক্তবাজার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে উৎপাদক, ভোক্তা ও সরবরাহকারী ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই তাকে জনকল্যাণ সুনিশ্চিতকারী দক্ষ ব্যবস্থাপনা বলা যায় না।

আর যদি ভোক্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগই দেয়া হয়, তবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতার সীমারেখার মধ্যে তাদের চাহিদার দ্বারা নির্ণীত বাজার মূল্যের মাধ্যমেই তাদের চাহিদা প্রকাশের সুযোগ প্রদান করাই কি সঠিক হবে না? বাজারমূল্য পদ্ধতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীভূত করে এবং ভোক্তা ও উৎপাদক শ্রেণীকে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে সুযোগ দান করে ব্যক্তির প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে দ্রুততরভাবে নিজেকে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়, যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত জটিলতার জন্য সম্ভব নয়। বিকেন্দ্রীকৃত বাজার অর্থনীতি অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক এবং এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের ভুল সিদ্ধান্ত বাজার শক্তির সাহায্যে সংশোধনের অবকাশ থাকে এবং সে ভুল সমাজের জন্য সর্বাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এমনকি যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদন উপকরণ বন্টনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেও গ্রহণ করে, তবুও ঐশী প্রত্যাদেশভিত্তিক সুষম ব্যবস্থাপনার অভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী অনিবার্য পরিণতির অর্থনৈতিক বৈষম্যের বীজ বহন করতে হবে।

ভর্তুকির সুফল

চতুর্থত, এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, সোভিয়েত পণ্য মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে বিশাল ভর্তুকির ব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করবে–এ ধারণাটিও ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভর্তুকি ব্যবস্থা দরিদ্র জনসাধারণের, যাদের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত তাদের চেয়ে সাধারণত ধনী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকেই বেশি উপকৃত করে।[১৪] সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্য ভর্তুকির পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ১০ ভাগ যা ইইসি'র তুলনায় ৫ গুণ বেশি।[১৫] এ ব্যবস্থার ফলে কৃষি পণ্যের কম মূল্যের কারণে উৎপাদক কৃষক শ্রেণী বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তাদের উৎপাদনের স্পৃহা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে অনুৎপাদক ধনীক শ্রেণী এতে বেশি উপকৃত হয়েছে।

সোভিয়েত পরিকল্পনা পদ্ধতিতে বিশাল আকারের ভর্তুকি হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সর্বক্ষমতাসম্পন্ন মূল্য নির্ধারণকারী রাষ্ট্রীয় কমিটিকে সামান্য আলপিন হতে ট্রাক্টর পর্যন্ত প্রায় বিশ মিলিয়ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়।[১৬] এ কাজটি এতই দুরূহ যে, যত লোকবল সমৃদ্ধই হোক না কেন, কোনো একক সরকারি সংস্থার পক্ষে তা নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। এই একক সংস্থার পক্ষে ভোক্তার পছন্দ, চাহিদা এবং এ সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে পরিকল্পনা কমিশন মূল্য পরিবর্তন না করার সহজ পন্থাই গ্রহণ করে। তাই বছরের পর বছর মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, বিশেষ করে খুচরা মূল্য,

যার পরিবর্তন রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর। এ ধরনের অপরিবর্তনীয় মূল্য কাঠামো, অদৃশ্য ভর্তুকি এবং উৎপাদন উপকরণ বন্টনে অন্যায্যতা ও অদক্ষতার জন্ম দেয়।

বিশাল আকারের ভর্তুকির ব্যবস্থা সীমিত সম্পদের অপরাধযোগ্য অপচয় ঘটায়। এই অপচয়ের ব্যাপ্তি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত মিখাইল গর্বাচেভের বিবৃতি হতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে বলা হয়েছিল, "শিশুরা একটি পাউরুটি দিয়ে বল খেলছে এটা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে"।[১৭] মূল্য নির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান ভেলেন্টিন পাভলভ তাই সঠিকভাবে মন্তব্য করেন যে, "দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সংযোগ সাধনে সামান্যই ভূমিকা পালন করে, ফলে সৃষ্টি হয় পাইকারী ও খুচরা পণ্যের বিপুল ঘাটতি"।[১৮] এই ঘাটতির তীব্র সংকটের অবসান কখনো সম্ভব হয় না। কেননা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম ও গণতান্ত্রিক সকল পদ্ধতির কণ্ঠরোধের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে চাপিয়ে দেয়া হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় সিদ্ধান্তসমূহ উপর মহলে নির্ণীত হয় এবং সর্বস্তরে প্রতিপালিত হয়। রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থা যা অতীতে শক্তিশালী সংস্থা কেজিবি কর্তৃক পরিচালিত এবং যেখানে গ্রেফতার, 'বন্দী শিবির' ও তথাকথিত 'মানসিক হাসপাতাল' এ প্রেরণের বিপুল ক্ষমতা বিদ্যমান এবং এ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কার্যত কোনো প্রতিষেধক নেই। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অপরিবর্তনশীলতা থাকাই অবশ্যম্ভাবী। এই ধরনের একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তনের কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই, অথবা সঠিক সিদ্ধান্তে পুরস্কৃত এবং ভুল সিদ্ধান্তে শাস্তি দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, অপরিবর্তিত স্থিরমূল্য কি ভোক্তা শ্রেণীর জন্য সুবিধাজনক নয়? কিন্তু খেয়াল খুশি অনুযায়ী যখন দ্রব্যমূল্যকে স্থির রাখা হয় এবং চাহিদা ও সরবরাহ সূত্র অনুযায়ী তা নির্ধারিত হতে দেয়া হয় না, তখন এ ব্যবস্থা অন্যায্যতা ও বৈষম্যের উৎসে পরিণত হয় এবং সম্পদ ব্যবহার, কর্ম প্রেরণা এবং দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ তথা অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। ভোক্তাগণ একদিকে উৎপাদিত পণ্যের অপচয়ে লিপ্ত হয়, অন্যদিকে শ্রমিক ও উৎপাদক শ্রেণী তাদের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। পণ্য দ্রবের মান কমে যায় এবং তা ভোক্তা শ্রেণীর উপযোগিতাভিত্তিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। যেখানে শুধুমাত্র ধনীক ও আমলা শ্রেণী তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়, কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী হতে বঞ্চিত হয় অথবা লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে।[১৯] যেহেতু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক উৎপাদন করা হয়, তাই স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয় কতিপয় পণ্যের ঘাটতি, আবার পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর পণ্যের বিপুল উদ্বৃত্তি। এ অপ্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত পণ্য অবিক্রিত থেকে যায়। কিন্তু এর দায়ভার কাউকে বহন করতে হয় না এবং একই ভুল ধারায় উৎপাদন অব্যাহত থাকে।[২০]

বৃহদায়তন খামার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা

পঞ্চমত, এটাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, বৃহদায়তনের অর্থনৈতিক অসুবিধা, প্রতিযোগিতা ও বাজার শক্তির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বৃহৎ একচেটিয়া খামার এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষতার সাথে কাজ করবে। এই ধারণাও ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃহদায়তন খামারগুলোতে সাধারণত অনেক প্রকারের ফসল, নানা জাতের গবাদি পশু উৎপাদন করা হয় এবং তাতে নিয়োজিত বিশাল আকারের কৃষি শ্রমিকগণ অনেকগুলো গ্রামে ছড়িয়ে বসবাস করে। ফলে এর তদারকি এক দুরূহ কর্মে পরিণত হয়। এজন্য কৃষক, মালিক বা ভাগচাষী অনেক বেশি দক্ষতার সাথে একাজ সম্পন্ন করে, কেননা নানা ধরনের কাজের অনেকগুলো সুচারুভাবে নিষ্পন্ন নাও হতে পারে এবং তা তদারকির অগোচরে থেকে যেতে পারে। ১৮৯৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি জমির মাত্র ০.৫ শতাংশ ব্যক্তিগত মালিকাধীন ছিল, তাতে উৎপাদন ছিল সমগ্র কৃষি পণ্য উৎপাদনের ২৭ শতাংশ। এটা রাষ্ট্রীয় খামার ব্যবস্থার চেয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি খামারের দক্ষতা প্রমাণ করে।[২১] কৃষি উৎপাদন হ্রাস ছাড়াও সরঞ্জামের অদক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদনের চুরিজনিত ক্ষতিও কম ছিল না। এ ধরনের ক্ষতির সম্ভাব্যতা ব্যক্তি মালিকানাধীন খামারে তত প্রকট নয়। প্রতিযোগিতার চিরস্থায়ী অনুপস্থিতির ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার বা উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবস্থার এটাই যৌক্তিক পারিণতি। ব্যবস্থাপকগণের যখন লাভ-লোকসানে কোনো হিস্যা নেই তখন তারা কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে? যেহেতু বাজার অর্থনীতির চালিত মূল্যব্যবস্থা অনুপস্থিত এবং ব্যক্তিগতভাবে লাভ বা ক্ষতি কোনো প্রশ্ন নেই তাই ব্যবস্থাপক শ্রেণীকে ভালো উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার আর কোনো হাতিয়ার নেই। ভোক্তাশ্রেণীর চাহিদা এবং সে মোতাবেক উৎপাদক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া তথা উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সংযোগ সাধন করে বাজারব্যবস্থা। এ মৌলিক উৎপাদনটিরই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অস্তিত্ব নেই। ব্যবস্থাপনা তাই হয়ে দাঁড়ায় একদল রাজকর্মচারীর আদেশ জারীর এক প্রহসনে। 'ওয়েবার' এর রাষ্ট্রীয় মালিকানা সম্পর্কে মন্তব্য এখানে প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থনৈতিক জীবনকে আমলাতন্ত্রের চক্রে আবদ্ধ করে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা জড়পিণ্ডে পরিণত করে'।[২২] ফলে খণ্ডিত হয় দক্ষতা। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ওইসিডি দেশসমূহের তুলনায় প্রতি উৎপাদন এককের জন্য ২.৫ গুণ বেশি শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়।[২৩] উপরন্তু সোভিয়েত খামার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণের উৎপাদন উপকরণের মূল্য, উৎস বা উৎপাদিত পণ্যের দামের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে মস্কোর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদ দ্বারা নির্ণীত হয়। উৎপাদন উপকরণের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও তার ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের

একে অপরকে অর্থনৈতিক শর্তানুযায়ী বাছাই করার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই। খামার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণকে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সরবরাহ কমিটির নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু এ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরের সকল খামার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষ স্বতন্ত্র স্থানীয় অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে কোনো সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। প্রতিটি কেসের স্বতন্ত্র বিশেষ অবস্থা বিশ্লেষণ করে ত্বরিৎ সমাধানে উপনীত হবার পর্যাপ্ত সময় বা স্পৃহাও তাদের থাকার কথা নয়। বাজারের অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি বা পরিমাণ পরিবর্তন করারও সুযোগ নেই। উপরন্তু দক্ষতা বৃদ্ধি বা উন্নতমানের পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক বা শ্রমিকরা সরাসরি লাভবান হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একজন উদ্যমী ব্যবস্থাপক সমগ্র সোভিয়েত ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে উন্নতর ব্যবস্থাপনা চালু করার কোনো পথ খোলা নেই। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী অদক্ষ ব্যবহার ক্ষেত্র হতে দক্ষ ব্যবহার ক্ষেত্রে দ্রুত স্থানান্তরিত হয় না।

তাছাড়া কী পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং জনগণকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা যাবে তা নিশ্চিত করার কোনো পদ্ধতি সোভিয়েত ব্যবস্থায় উপস্থিত নেই। একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্পষ্টতই পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব। বাজার সূচকের ইঙ্গিত এবং সামাজিকভাবে সম্মত মূল্যবোধ ব্যতিরেকে দক্ষতার সীমায় পুঁজি বন্টনের জন্য কোনো কার্যকরী উপযুক্ত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় নিছক রাজনৈতিক বিবেচনায় বা পরিকল্পনাবিদগণের ব্যক্তিগত রুচি বা প্রবণতা মোতাবেক।

কেউ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও অবস্থা ভিন্নতর নয়। প্রত্যেক উৎপাদন খাতে কতিপয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কতিপয় বিশাল একচেটিয়া কর্পোরেশন শুধু অর্থনীতিতেই প্রভুত্ব নয় বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কার্যত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তার সার্বভৌমত্বের ধারণাটির অর্থবহ কার্যকারিতার অভাব সর্বজনবিদিত। কোন পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং তা কিভাবে করা হবে, কনজুমার ও শেয়ারহোল্ডারগণ সে সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো মূখ্য ভূমিকা পালন করে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্পোরেশন পরিচালনার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পর্ষদই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সমাজের উপরের স্তরের ধনীক শ্রেণী হতে আগত কতিপয় পরিচালক ও বেতনভোগী পেশাজীবী দ্বারা

গঠিত, তাই সে পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অদক্ষতা ও বেইনসাফ বিদ্যমান সত্ত্বেও উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহের কোনো শক্ত ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পুঁজিবাদী বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর পণ্যের মান, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারিত হয় না। বাজার অর্থনীতির নিজস্ব নিয়ম এখানে কাজ করে। এমনকি যদি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি শিল্পে মাত্র গুটিকয়েক প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান বিরাজ করে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে চাহিদা ও মূল্যের বিষয়ে বিশেষ সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবুও তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু না কিছু প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকবে, যদিও বা সে প্রতিযোগিতা পুঁজিবাদের প্রবক্তাগণ যে পরিমাণ সুষম প্রতিযোগিতার দাবি করে থাকেন তার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত ভুল হলে সেজন্য লোকসানের ভার বহন করে। আবার কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদের দ্বারস্থ বা অনুমতির অপেক্ষা না করেই তাদের এ ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকে। এদিকে তারা যেমন তাদের সৃষ্টিশীলতা ও দক্ষতা দ্বারা লাভবান হতে পারে, অপরদিকে তাদের বিকল্প দ্রব্যের প্রতিযোগিতা, আমদানি এবং দক্ষতার সাথে পরিচালিত না হলে বাজার হতে উৎখাত হতে হবে এ আশংকারও মুখোমুখি হতে হয়। এসব বৈশিষ্ট্যসমূহ রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত।

তিক্ত ফলাফল

অদক্ষ বণ্টনব্যবস্থা

কার্যত বাস্তবে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতো, তাহলে উপরে এ ব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে তাকে একদেশদর্শী সমালোচনা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা বলে চালিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাথাভারী অনাবশ্যক জটিল কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতির ফলে এ ব্যবস্থা শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক শ্রেণীকে প্রয়োজনীয় উদ্বুদ্ধকরণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে অদক্ষ ক্ষেত্র হতে সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হয়নি। পরিণামে সমগ্র অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে এক স্থবিরতা, যা পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সাথে সংগতি রাখতে হয়েছে ব্যর্থ। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত অর্থনীতির সবখাতে বিশেষ করে কৃষি খাতে উৎপাদন গুণগত ও পরিমাণে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সোভিয়েত যৌথখামার ব্যবস্থার চিত্র সত্যিই করুণ। কর্মক্ষম জনশক্তির এক-তৃতীয়াংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত, তবুও খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য আমদানি জরুরি হয়ে পড়ে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এভাবে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ খাদ্য আমদানিকারক দেশে।[২৪] কঠোর

বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও সে দেশের বিপুল কৃষি সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করা যায়নি। যোসেফ স্টালিন ব্যক্তিগতভাবে উইন্সটন চার্চিলকে বলেছিলেন, 'যৌথ খামারব্যবস্থার বিরোধিতার কারণে লক্ষ লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছে বা শ্রম শিবিরে নির্বাসিত হতে হয়েছে'।[২৫] এর ফলে এ বাস্তব সত্যই প্রমাণিত হয় যে, শক্তি প্রয়োগ কখনো মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ বা উচ্চতর মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবার প্রবণতার বিকল্প হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন এবং পলিটব্যুরোর সদস্যবৃন্দের সামনে অর্থনীতির নিয়ামক বাজারশক্তি দ্বারা নির্ণীত চাহিদা ও সরবরাহের কোনো ইঙ্গিত রেখার অস্তিত্ব নেই বিধায় স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব স্বার্থ, ঝোঁক ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ বুলির বাঁধা পথেই তারা অর্থনীতিকে চালিত করেন। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবহারের নিমিত্তে সীমিত সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থনীতির নিয়ম বহির্ভূত বিকৃতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই দেখা যায় অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের বদলে ভারী ও সামরিক শিল্প বিকাশের অনাবশ্যক আড়ম্বরতা। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল অবকাঠামোগত মানবসম্পদের অধিকারী এবং জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসাগ্রী উৎপাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দেশটি দীর্ঘ সময় ধরে ভোগ্যপণ্যের সংকটে ভুগছে। জনগণের হাতে অর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজারে লভ্য নয়।[২৬] ঘাটতি সংকট এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে সোভিয়েত নেতৃত্বও শঙ্কিত।

সোভিয়েত ব্যবস্থার অদক্ষতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নগামী প্রবৃদ্ধির হার। সোভিয়েত শাসনের প্রথম দিকে ১৯২৮-১৯৪০ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশ উচ্চ, বাৎসরিক ৫.৮%। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০-৫০ সালে তা ২.২% এ নেমে আসে। যুদ্ধোত্তরকালে প্রবৃদ্ধির হার পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০-৬০ সালে ৫.৭% এ উপনীত হয়। ফলে সোভিয়েত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে পুনরায় উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হতে থাকে এবং এ ব্যবস্থাকে নবযুগের দ্বারোদঘাটক ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য মডেল হিসেবে অভিষিক্ত করা হতে থাকে। কিন্তু এর পরবর্তী সময় হতে আবার সোভিয়েত প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৬০-৭০ সালে ৫.২%; ১৯৭০-৭৫ সালে ৩.৭%; ১৯৭৫-৮০ সালে ২.৬% এবং ১৯৮০-৮৫ সালে ২.০% এ এসে দাঁড়ায়।[২৭] পেরেস্ত্রয়কার অন্যতম তাত্ত্বিক চিন্তাবিদ 'আগানবেগিয়ান' উপস্থাপিত সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৮০ দশকের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধিই ঘটেনি।[২৮] এর ফলে সোভিয়েত ব্যবস্থার আবেদন বহুলাংশে হ্রাস পায়; বিশেষত যখন জাপান, পশ্চিম জার্মানী, দক্ষিণ কোরিয়া তুলনামূলকভাবে কম সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখে। উন্নত বিশ্বের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যবধান ১০ বছরের মধ্যে পূরণের জন্য স্টালিনের ১৯৩১ সালের বিখ্যাত আহক্ষান শূন্য আস্ফালনে পরিণত হয়। এমনকি ষাট দশকের মধ্যে সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার লক্ষ্যে ক্রুশ্চেভের আশাবাদও অবাস্তবায়িত থেকে যায়।[২৯] প্রবৃদ্ধি হারের ক্রমাগত হ্রাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়েই তোলে। সাম্প্রতিক সময়ে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।[৩০]

অসম বণ্টন ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সমাজতন্ত্র বাস্তবক্ষেত্রে বৈষম্য সামান্যই দূর করতে পেরেছে। সম্পত্তিহীন শ্রমিকশ্রেণী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল। একজন পুঁজিপতির মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিক হওয়ার বদলে সে আরো বেশি ক্ষমতাশালী একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানার শ্রমিকে পরিণত হলো। এ নতুন মালিকের পুরস্কার বা শাস্তি দেবার ক্ষমতা আবার অসীম। এখানে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাদের যে অবস্থান ছিল তা সত্ত্বেও অধিকতরভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে দূরে রয়ে গেল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণী ইউনিয়ন, মুক্ত প্রচার মাধ্যম এবং নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো। উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন এ নতুন ব্যবস্থাতেও বাস্তবের মুখ দেখল না। বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থার আরো অবনতি ঘটল।

কার্ল মার্কস যে মজুরি দাসত্বের অবসান চেয়েছিলেন তা বরং আরো তীব্রতর হলো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজন শ্রমিকের অন্তত তার কর্মক্ষেত্র বাছাইয়ের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নামক একমাত্র মালিক থাকায় সে সুযোগেরও কোনো অবকাশ নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক কারখানা ছেড়ে অন্য কারখানায় চলে যাবার যে স্বাধীনতা একজন শ্রমিক ভোগ করত, তা হারিয়ে সে এখন সারাজীবন একটি কারখানার শিকলে বাঁধা পড়ে গেল। এখন সব কিছু নির্ভর করে তার উপরস্থ কর্মকর্তার উপর। কর্মকর্তা বদান্য হলে কারো অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে একজন শ্রমিক দক্ষতার সাথে অধিক পরিশ্রম করলেও সে জন্য তার কোনো অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবার কোনো সুযোগ এ ব্যবস্থায় নেই। অপরদিকে উর্ধতন কর্মকর্তা প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিত্রের হলে কর্মচারীকে নীরবে নির্যাতন সয়ে যেতে হবে। অভিযোগ করার জন্য তার সামনে কোনো দুয়ার খোলা নেই। যদি সে তার অধিকারের জন্য লড়াই করতে চায়, তবে তার স্থান হবে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র তাই পুঁজিবাদী সমাজ থেকেও অধিকতর নিপীড়নমূলক হয়ে দাঁড়াল।[৩১] শুধু এই কারণটিই কি মজুরি শ্রমিকের ভগ্ন বিচূর্ণ মানসত্তায় পরিণত হওয়ার (এলিনেশন প্রক্রিয়া) জন্য যথেষ্ট নয়? স্যোসাল-ডেমোক্রেট 'ক্রসল্যাণ্ড' যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'উৎপাদন উপকরণ হতে শ্রমিক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নকরণের (এলিনেশন) অন্তর্নিহিত কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বিদ্যমান। কারণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র শ্রমিক শ্রেণী হতে বহু দূরে। শোষণের সম্ভাবনা এবং পুঁজিবাদের সমস্ত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান'।[৩২]

সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী পার্থক্যের ধারা এখানেও অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। 'মুরে ইয়ানোভিচ' মন্তব্য করেছেন, 'সোভিয়েত সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর

শ্রেণীব্যবস্থা'।[৩৩] সমাজের উপরের স্তরের লোকেরাই ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো উচ্চ আয়ের পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকরিসমূহ পেয়ে থাকে।[৩৪] উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় দেখা গেছে শ্রমিকদের সন্তানদের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌভাগ্যের মুখ দেখার সুযোগ পায়নি।[৩৫] 'শ্রমিক-রাজত্বের' বাগাড়ম্বর দ্বারা এ তিক্ত সত্যকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এককালের বিখ্যাত প্রবচন যে "রাষ্ট্রীয় মালিকানা শ্রেণীহীন সমাজ" প্রতিষ্ঠা করবে ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। রাষ্ট্র শিল্পসমূহ অধিগ্রহণ করলে আর কোনো শ্রেণীবিশেষই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে না– এরূপ ধারণা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।[৩৬] এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা যা মানব ভ্রাতৃত্বের মতবাদ বা স্রষ্টার সম্মুখে জবাবদিহিতার ধারণার উপর নয়, বরং দ্বান্দ্বিক মতবাদ এবং একশ্রেণী কর্তৃক অন্যশ্রেণীকে উৎখাত বা অধীনস্থ করার দর্শনের উপর ভিত্তিশীল তা হতে শ্রেণীব্যবস্থা আরো বেশি তীব্রতর হতে বাধ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান না করার ফলে জনগণের বিচ্ছিন্নকরণ (এলিনেশন) প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। খাদ্য, বাসস্থান ও জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ রয়ে গেছে অপ্রতুল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিপরীত পক্ষে প্রভাবশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিবর্গের নিকট সব কিছুই সহজলভ্য। তারা শুধু বিনামূল্যে প্রাসাদোপম বাড়ি ও গাড়িই নয়, গোপনভাবে প্রদত্ত অতিরিক্ত বেতন, হ্রাসকৃত মূল্যের দোকানে বিশেষ সুবিধাও ভোগ করে। এমনকি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বিনামূল্যে দ্রব্যসামগ্রী পাবার জন্য রয়েছে বিশেষ দোকান।[৩৭] এ ব্যবস্থা সমাজে মানুষের শ্রেণী বিভক্তির সুস্পষ্ট দলিল। সেখানে অভিজাত শ্রেণীর জন্য সকল প্রকার বিলাস সামগ্রীর সুযোগ রয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হতেও বঞ্চিত।[৩৮] শ্রমিকদের মনোবল ও শৃঙ্খলাবোধের উপর স্বাভাবিকভাবে এ অবস্থা প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য বিখ্যাত 'নাভোসিবিরিস' রিপোর্টে খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদগণ অলস, দুর্নীতিপ্রবণ ও শৃঙ্খলাবোধহীন শ্রমিক সমাজ গড়ে ওঠার পিছনে অর্থনীতির অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণকে দায়ী করেন।[৩৯] তারা কারণ হিসেবে বিরাজমান শ্রেণী বৈষম্য, সামাজিক অন্যায়পরতা ও নৈতিক স্খলনজনিত পরিবেশের প্রতিক্রিয়া দেখতে বস্তুত ব্যর্থ হন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগের বেলায় সমাজের উপর স্তরের প্রভাব ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের সন্তানদের তুলনায় কম সুযোগ লাভ করে। সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় পুরুষানুক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখার প্রবণতা সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে সুযোগ লাভের শর্ত হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক সিঁড়িতে শিক্ষার্থীর শ্রেণীগত অবস্থান। 'ইয়ানোভিচ' লক্ষ্য করেছেন, "যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যত বেশি ভবিষ্যৎ লাভজনক পেশার সাথে সংযুক্ত

তাতে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের প্রবেশের সুযোগ তত কম এবং 'সাদা কলারধারী' পেশাজীবীদের সন্তানরাই সেখানে সিংহভাগ দখল করে আছে"।[৪০]

অন্যান্য দিক থেকেও সোভিয়েত ব্যবস্থা অন্যায়পরতাপূর্ণ। কৃষক শ্রেণী শুধুমাত্র তাদের কৃষি জমিই হারায়নি, তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্যও যথাযথ মূল্য পায় না যা সরকার কর্তৃক হ্রাসকৃত ও পূর্বনির্ধারিত। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নেই আয় প্রয়োজনের তুলনায় ন্যূনতম।[৪১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে আয়ের বৈষম্য কম হতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই যুক্তরাজ্য ও নরওয়ের তুলনায় কম নয়।[৪২] সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদ 'সুইজি'র দৃষ্টিতে সোভিয়েত সমাজ আয় ও সুযোগের ক্ষেত্রে তীব্রভাবে বৈষম্যমূলক।[৪৩] এ কারণেই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও কৃষক ও শ্রমিকদের তাদের পূর্ণশক্তিতে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরনে সফল হওয়া যায়নি। এভাবে এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হরণ করেনি, এটা শ্রম ও প্রয়োজনের তুলনায় কম মজুরি প্রদান করে সর্বহারা উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি বিরাট অবিচার সাধন করেছে। 'সর্বহারার একনায়কত্ব' এভাবে সর্বহারা শ্রেণীর দমনযন্ত্রে পরিণত হয়। তাই 'সুইজি' এ মর্মে মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, 'মার্কসীয় মতাদর্শের দাবি পূরণে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।'[৪৪]

মিথ্যা স্বপ্ন

শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন, ভ্রাতৃত্বমূলক যে সমাজের স্বপ্ন কার্লমাকর্স দেখেছিলেন, তা এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী মজুরি দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়ে যায়। সামাজিক শ্রেণীবিভেদও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা লাভ করল না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্তির মাকর্সীয় ধারণার কোনো লক্ষণও কোথাও দৃষ্টিগোচর হলো না, বরং রাষ্ট্র তার নিপীড়নমূলক অস্ত্র নিয়ে আরো জেঁকে বসল।

এ ব্যর্থতার কারণ সুস্পষ্ট। লক্ষ্যের সাথে দর্শন ও কৌশলের কোনো মিল ছিল না। লক্ষ্য ছিল 'মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা'– একটি শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে কেউ কাউকে শোষণ করবে না, যেখানে সবাই সামষ্টিক কল্যাণের জন্য কাজ করবে এবং সবার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, যেখানে আয় ও সম্পদের কোনো বৈষম্য থাকবে না, ফলে এলিনেশন বা বিচ্ছিন্নকরণেরও কোন প্রক্রিয়া থাকবে না। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত দর্শন ও কৌশল এ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। এ দর্শন দ্বান্দ্বিক মতবাদের প্রবক্তা, যাতে ঘৃণা, শ্রেণী সংঘাত ও উৎখাতের কথা বলা হয়েছে, ব্যক্ত হয়েছে সমগ্র উৎপাদন উপকরণের নিয়ন্ত্রণ কতিপয় ব্যক্তির হাতে সমর্পণের মতবাদ। গুটিকয় ব্যক্তিবর্গের হাতে বিশাল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ, অথচ তাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রেরণা বা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নির্ধারণকারী সামাজিকভাবে সম্মত কোনো নীতিমালা নেই– এমন ব্যবস্থা ক্ষমতা ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে তাদের

অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার লড়াইয়ে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এরূপ ব্যবস্থায় কোনোরূপ গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না; কেননা শক্তিধর আমলাতন্ত্র তাদের সুবিধাভোগী অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে একে স্বভাবতই বাধা দেবে। ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারাদার, তাদের তল্পীবাহক ও চাটুকাররাই শুধুমাত্র এ ধরনের একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশা করতে পারে।

তাই প্রথম থেকেই এ ব্যবস্থা সঠিক পন্থায় অগ্রসর হতে পারেনি। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে লিও ট্রটস্কি সোভিয়েত ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'প্রকৃত সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র উৎপাদন উপকরণের মাধ্যমে আপনাআপনি অর্জন করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন অধিকতর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিকাশ, চর্চা ও অধিকতর ন্যায়পরতা সৃষ্টির উদ্যেগ'।[৪৫] ট্রটস্কির গণতন্ত্র চর্চার এ আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েত ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; কেননা পলিটব্যুরোর মুষ্টিমেয় সদস্যই এখানে সকল মানুষের জীবিকার হর্তাকর্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে দূরে রাখার মাঝেই তাদের স্বার্থ নিহিত। সম্পদশালী বুর্জোয়া হতে ক্ষমতাশালী পলিটব্যুরোর সদস্যদের ভিন্নতর আচরণ করার কোনো কারণ নেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধি লাভ করার স্বভাবজাত মানব প্রবণতাকে সীমারেখা মেনে চলতে বাধ্য করার কোনো কার্যকর পন্থা না থাকলে মার্কসের 'প্রত্যেকে সাধ্যমতো কাজ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে'–এই নীতির উপর ভিত্তিশীল সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিনিময় মূল্য প্রাপ্তির আশা ছাড়া মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে না। তারা সর্বোচ্চ কাজের বিনিময়ে সর্বোচ্চ প্রাপ্তিই আশা করবে। তাই এমন কোনো পন্থা থাকা দরকার, যাতে তারা সর্বোচ্চ কাজ করতেও অনুপ্রাণিত হবে; আবার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্ত দাবিও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। কিন্তু বল প্রয়োগ ছাড়া মানুষের স্বার্থচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোনো পন্থা মার্কস দেখাতে পারেননি। তাই পুঁজিবাদের শক্তিশালী সমালোচনা উপস্থাপন করা সত্ত্বেও মার্কস কোনো গঠনমূলক ও কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করতে পারেননি। তা মানুষের স্বার্থপরতাকে সীমারেখা লঙ্ঘন করতে না দিয়ে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা গঠন করার জন্য প্রয়োজন শ্রেণী সংঘাতের বদলে প্রত্যেক মানবসত্তাকে ভ্রাতৃভাবে দেখা ও একটি সর্বসম্মত মূল্যবোধের শক্ত কাঠামোর মধ্যে থেকে সবাই সামষ্টিক কল্যাণের জন্য কাজ করবে এমন চিন্তাধারায় সৃষ্ট একটি মতাদর্শ। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, একমাত্র ধর্মই এ ধরনের চিন্তাধারা ভিত্তিক দর্শন ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করতে পারে। কিন্তু মার্কস সকল ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রত্যাখানের আহবান জানিয়েছিলেন। মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য ধ্বংসের পর যা মার্কস উপস্থাপন করেছিলেন তা হলো সমস্ত উৎপাদন উপকরণের উপর কর্তৃত্বশালী একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে নীতিনির্ধারণের জন্য কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই, ব্যক্তিস্বার্থের লেলিহান শিখাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই। শুধু রয়েছে এক নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন প্রচণ্ড শক্তি। এমনকি একটি

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবার ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে আপনাআপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে মার্কস বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কীভাবে এ বিলুপ্তি ঘটবে মার্কস তা ব্যাখ্যা করেননি। যদি বুর্জোয়াগণ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগে প্রস্তুত না হয়, তবে কিভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রলেতারিয়েতগণ পলিটব্যুরোর সদস্য হবার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের পর সে ক্ষমতা ত্যাগ করবে? বাস্তব সত্য হলো কমিউনিস্ট দেশসমূহে রাষ্ট্র বিলুপ্ত না হয়ে বরং উৎপীড়নের আরো শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। 'প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা' আর বাস্তবতা লাভ করেনি। প্রলেতারীয় শ্রেণী সেই মজুর দাসই রয়ে গেল। মার্কসীয় বিপ্লব দ্বারা তারা কি পেলো? তাদের আয়ের বৃদ্ধি? কিন্তু তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানীর মতো দেশে সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও চীনের চেয়ে বেশি পাচ্ছে, যদিও তা বুর্জোয়া শ্রেণীর আয়ের মতো নয়। ফলত পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন সম্পর্কিত মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত নিরীক্ষা হতে লব্ধ প্রায় সকল অভিজ্ঞতাই নেতিবাচক– যেমন, অর্থনৈতিক দক্ষতা, আমলাতন্ত্র, শ্রেণী বিভাজন, গোঁড়ামি এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোগকে নিরুৎসাহিতকরণ।[৪৬] মার্কস যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে প্রেক্ষাপট বিচার করলে ফলাফল সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। বিঘোষিত আশীর্বাদসমূহ, যেমন– মজুরি প্রথাহীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মুক্তসমাজ, মুদ্রা ও শ্রেণী বৈষম্যহীন ব্যবস্থা সবই মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। সর্বস্তরে গণতন্ত্রের অস্তিত্বহীনতা, সমালোচনা, নিষ্ঠুর দমন– এসবের দিকে তাকালে হতাশা আরো তীব্রতর হয়।

পুনর্গঠনের জটিলতা

> 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে এলোমেলোভাবে বাজার অর্থনীতির কিছু দিক সংযোজনের চেষ্টা টেলিফোনের খুঁটিতে আঙ্গুর গাছের কলম লাগানোর প্রচেষ্টার মতোই ব্যর্থ হয়েছে'।
>
> –জর্জ আর্বাতভ[৪৭]

অবাস্তব চিন্তাধারার কারণে মার্কসবাদ যা যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সমাজতন্ত্রীদের উপর ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমান্বয়ে তা ক্রমবর্ধমান হারে আক্রমণের সম্মুখীন হলো।[৪৮] সংশোধনবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং মার্কসবাদকে প্রায় ধ্বসিয়ে দিলো। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে এ উপলব্ধি সৃষ্টি হলো যে, সোভিয়েত অর্থনীতির ব্যাপক সংস্কার অত্যাবশক। সেভিয়েত নেতৃত্ব রাজনৈতিক সংস্কারের অপরিহার্যতার উপর জোর দিতে লাগলেন, যা মিখাইল গর্বাচেভ প্রবর্তিত 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রয়কা' ধারণার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হলো।[৪৯] কিন্তু সমস্যা হলো, এখনো এটা কারো কাছে সুস্পষ্ট নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তাদের বিঘোষিত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য কতটুকু সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন। যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিকেন্দ্রীকরণ ও পেরেস্ত্রয়কার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টকরণ প্রয়োজন। তা

হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিযোগিতা, মূল্য সংস্কার, বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নিজস্ব পরিচিতি সম্পূর্ণ না হারিয়ে কতটুকু ছাড় দিতে প্রস্তুত। খণ্ড খণ্ড পরিবর্তন ও সুচিন্তিত ভিতহীন সংস্কার প্রচেষ্টা যেমন অকার্যকর হবে, তেমনি পুঁজিবাদের দিকে ত্বরিৎ যাত্রা প্রয়োজনীয় অবস্থার অনুকূল পরিবেশের অভাবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে আরো অবনতিশীল করে তুলবে মাত্র এবং সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেবে। প্রশ্ন হলো, সমাজতন্ত্রের গায়ে ইতোমধ্যে ব্যর্থ পুঁজিবাদের কিছু উপাদান লেপনের মাধ্যমে সেই কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা কী সম্ভব, যা বিদ্যমান অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক অস্থিতিশীলতাকে অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রের বিঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে? দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পুনর্গঠনের বিতর্কে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল একটি মৌলিক বিষয়কে ভুলে যাচ্ছেন এবং তা হচ্ছে এ পুনর্গঠনের জন্য মূলত সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব আদলেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন ও এর পেছনে প্রয়োজনীয় প্রেরণার ক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যে ভূমিকা রয়েছে, উপযুক্ত বিতর্কে তাকে সামান্যতম স্থানও প্রদান করা হয়নি, যেন এটা কোনো গুরুত্বই বহন করে না।

এটা উপলব্ধি করা হয়নি যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে ভোগ্য পণ্য ঘাটতির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাজার মূল্যের অস্তিত্বহীনতাই যদি শুধুমাত্র দায়ী হয়, তবে পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভোগ্য পণ্যের লক্ষ্য পূরণে সফল হবার কথা ছিল। কিন্তু এ প্রয়োজন পূরণ কখনোই সম্ভব নয়, যতক্ষণ না এ খাতে প্রয়োজনীয় বিপুল সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। ভোগ্য পণ্য খাতে প্রয়োজনীয় বাড়তি সম্পদের স্থানান্তর মানেই অন্য খাতসমূহ যথা প্রতিরক্ষা, মহাকাশ কর্মসূচি, ভারী শিল্প, মর্যাদাবৃদ্ধির খাত, এলিট শ্রেণীর জন্য বিলাস সামগ্রী উৎপাদন এবং অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক খাতসহ যেসব ভৌগোলিক এলাকা সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা ভোগ করে আসছে তাতে কম বরাদ্দ, সম্পদের এরূপ পুনর্বিন্যাস সহজ কাজ নয়। এর জন্য শুধু সামাজিকভাবে সম্মত মানদণ্ডই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সুবিধাভোগী শ্রেণী ও এলাকার পক্ষ হতে ত্যাগ স্বীকারের শক্তিশালী প্রেরণা ও ইচ্ছা। 'জীবন মাত্র একটিই- এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী উপযুক্ত ভোগবাদীরা কেন এটা করতে যাবে? যদি উল্লিখিত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করা না হয়, তবে বাড়তি সম্পদ কোথা থেকে আসবে? মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি? এটা সৃষ্টি করবে সীমিত সম্পদের উপর বাড়তি চাহিদা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানে পুঁজিবাদী ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রসমূহ। ক্ষতিকর রাজস্ব ঘাটতি হ্রাসের প্রয়োজনীতা মনে রাখলে এ সমস্যার ব্যাপ্তি হৃদয়ঙ্গম করা আরো সহজ হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিল, ১৯৮০-৮৫ সালে ৩% এর কম। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৭ সালে হয়েছে প্রায় ৭% এবং ১৯৮৮

সালে ১৪%।[৫০] ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত না করে এটা কী করে কমানো যাবে। এ জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি। সরকারি ঋণের মাধ্যমে যদি এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঋণগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের মতো ঋণের সুদ পরিশোধের তীব্র সমস্যায় নিপতিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে রয়েছে তাই অর্থনীতি পুনর্গঠনের পর্বত প্রমাণ কঠিন কাজ এবং তা তাকে করতে হবে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের যুগে অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার মুখে লাগাম পরানোর কোনো হাতিয়ারের যোগান ছাড়াই সবার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে; বেকারত্ব না বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতি হ্রাসের মাধ্যমে; মূল্যবৃদ্ধির প্লেগ আক্রান্ত অর্থনীতিতে বাস্তবসম্মত মূল্য কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বাস্তবভিত্তিক পণ্য মূল্য ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তন এবং জন বাজেট ঘাটতি হ্রাসের জন্য ভুর্তকি কমানো মানেই পৃষ্ঠপোষকতার বর্তমান ব্যবস্থার অবসান, যেখানে উৎপাদন ও আমদানি ব্যয়ের সাথে খুচরা মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, যেথায় অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সস্তা খাদ্য, বস্ত্র, ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত বলে ধরে নেয়া হয়। বাস্তবভিত্তিক মূল্য প্রবর্তনের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া। যদি মজুরি ও পেনশন যুগপৎ বৃদ্ধি করা না হয়, তাহলে সর্বসাধারণ বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান তীব্রভাবে হ্রাস পাবে। ফলে গ্লাসনস্ত বা খোলামেলা সমালোচনার পরিবেশের প্রেক্ষিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেবে। আবার মূল্যবৃদ্ধির সাথে মজুরি বৃদ্ধি পেরেস্ত্রয়কা বা সংস্কার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে। পেরেস্ত্রয়কা দাবি করে যে, মজুরি বৃদ্ধি ঘটবে না বা সে বৃদ্ধি আনুপাতিক হারে হবে না। মজুরি নির্ধারণ করা হলে মূল্য ও মজুরি পরিবর্তন দ্বারা কিছু শ্রমিক অন্যদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে প্রকৃত আয়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে অধিকতর আয় ও সম্পদ বৈষম্যের সৃষ্টি হবে এবং গণচীনের মতো সামাজিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হতে পারে। বাজার অর্থনীতিতে এ ধরনের পরিবর্তন অল্প মাত্রায় প্রতি বছরই সংঘটিত হয়। কিন্তু তা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে নজরে পড়ে না, যেরূপ জাজ্বল্যমানভাবে দৃষ্টিগোচর হবে সমাজতান্ত্রিক দেশে, যেখানে উপর্যপরি দশকের ভ্রান্তি কয়েক বছরে অপনোদনের চেষ্টা নেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো অর্থনীতির চেয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নৈতিক পুনর্জাগরণ ও আর্থ–সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। অধিকন্তু অধিক দক্ষতার আশা কখনো বাস্তবায়িত হবে না, যদি প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন উপকরণের মান, পরিমাণ ও উৎস নির্ধারণ এবং কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের স্বাধীনতা না থাকে। নিশ্চিত বাজারের যে সুবিধা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোগ করছে, সে সুবিধা সম্ভবত প্রত্যাহার করতে হবে। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান লোকসানের মুখোমুখি হবে। দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদেরকে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে, যার ফলে দেখা দেবে বেকারত্ব। যেহেতু

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশালাকারের, লোকসানকারী এমনসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা বিশেষত বেকারত্বের পরিমাণ হবে বিশালাকৃতির। বাজারব্যবস্থার দিকে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী সামাল দেবার জন্য সোভিয়েত ব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। যে পর্যন্ত সোভিয়েত ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতার ধারা ও আচরণ অব্যাহত থাকবে, ততদিন বাজারব্যবস্থার আংশিক পুনরুজ্জীবন স্ববিরোধী বিষয়ে পরিণত হবে। অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য যদি যৌথ মালিকানা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাসহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যসমূহ পরিত্যাগ করা হয়, তবে সমাজতন্ত্রের আলাদা ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হবার আর কী-ই বা অবশিষ্ট থাকে? বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রশ্নটিও সমস্যাসংকুল। যেহেতু জাতীয়করণকৃত সকল সম্পদের মালিকানা সমগ্র জনগণের, তাই বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে কারো কাছে সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তর প্রক্রিয়াও ইনসাফভিত্তিক হওয়া দরকার। এর জন্য এ পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে বলে মনে হয় না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খামার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শেয়ারভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হস্তান্তরের একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ নিলাম সংঘটিত হবার পূর্বে সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যা আবার বাজারব্যবস্থা কর্তৃক মূল্য ও লাভের পরিমাণ নির্ণীত হবার সুযোগ না থাকায় একটি সময়সাপেক্ষ ও কঠিন কর্ম। এরূপ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে যাদের ভিতরের বিষয়ে জ্ঞান নেই তাদের বিশাল ঝুঁকি নিতে হবে। উপরন্তু এ নিলাম ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক যুগে যারা সম্পত্তি পুঞ্জীভূত করতে পেরেছিল, শুধু তারাই এসব শেয়ার কিনতে সক্ষম হবে। ফলে যারা মালিকানাস্বত্ব ব্যতিরেকেই এতদিন সুবিধাভোগী ছিল, তারা এখন মালিকানাস্বত্ব লাভের মাধ্যমে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। তাহলে যাদের নামে সমাজতন্ত্র আনা হয়েছিল এবং যাদের নামে আবার তা ভাঙা হচ্ছে, সেই প্রলেতারীয় শ্রেণী এখন কোথায় যাবে? যাই হোক, সম্পদের মালিকানা যদি জনগণের মধ্যে ন্যায়পরতার সাথে বণ্টন করতে হয়, তাহলে জটিল প্রশ্নটি থেকে যায় যে, কীভাবে এটা সম্পাদন করা হবে, কে কিসের মালিকানা লাভ করবে এবং কতটুকু পরিমাণ? যদি শ্রমিকদের তারা যে খামার বা কারখানায় কাজ করছে তার অংশীদারিত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে যারা কাজ করছে না বা কম উৎপাদনশীল খামারে কাজ করছে অথবা এমন কারখানায় কাজ করছে যা দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে বা শিগগিরই ঘোষিত হবে, তাদের বেলায় কী হবে? যদি সবাইকে ক্রয়ের জন্য কুপণ দেয়া হয়, তাহলে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য, বিক্রয়যোগ্য সকল রাষ্ট্রীয় খামার ও কারখানার মূল্য নির্ধারণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা করতে হবে। এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ যা বর্তমান প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। অধিকন্তু যারা অতীতে সম্পদ কুক্ষিগত করতে পেরেছে, তারা ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত কুপনের সুবাদে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে চলে আসবে। ডারউইনীয় বাছাই পদ্ধতিও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। গত

কয়েক দশকে সোভিয়েত নেতৃত্বের কাঠামো দর্পভরে টিকে থাকার তত্ত্বের ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হয়েছে এবং বর্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে একটি কায়েমী স্বার্থ তৈরি হয়েই আছে। নৈতিক পুনর্জাগরণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র পেরেস্ত্রয়কা নীতির দ্বারা এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণ বাজারনীতির বাস্তবতা মেনে নিতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে। তাই কলকারখানা ও খামারের অদক্ষ ব্যবস্থাপকদের অপসারণের জন্য প্রয়োজন হবে নেতৃত্বের কঠোর হস্তক্ষেপ। যেহেতু এতে অসন্তোষ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হবে, তাই নেতৃত্বকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একই সাথে এ কায়েমী স্বার্থকে শান্ত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে। সমাজতন্ত্রের কুফলসমূহ তথা ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ, বিশালায়তন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অসুবিধা ইত্যাদি দূরীকরণ তাই সহজ কাজ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্কারের স্বপক্ষে থাকার, আবার একই সাথে তাকে বিরোধিতা করার কোনো না কোনো কারণ রয়েছে।'[৫১]

বাজার সমাজতন্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাজার অর্থনীতির কিছু উপাদান সংযোজন করছে তখন পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ (বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাংগেরি, পোল্যাণ্ড ও রোমানিয়া), যুগোশ্লাভিয়া এবং চীন ইতোমধ্যে এমন এক পথ ধরেছে যা 'বাজার সমাজতন্ত্র' নামে অভিহিত। এমনকি চীন মাও সে তুং কর্তৃক বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া অমানবিক ও অস্বাভাবিক কমিউন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ পরিত্যাগ করেছে।[৫২] এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানাভিত্তিক সোভিয়েত মডেলই এখনো এসব অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড।

সংস্কার ও পুনর্গঠনের মৌলনীতি হতে হবে উৎপাদন উপকরণ বন্টনের ক্ষেত্রে বাজার শক্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে ভূমিকা পালন করতে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আংশিকভাবে বিকেন্দ্রীয়করণ করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান। স্ব-শাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর থেকে উপরের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। বাজার শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য, মজুরি এবং বিনিময় হারের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাজেট ঘাটতি হ্রাসের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ কমাতে হবে। ভারী শিল্পের উপর পূর্বে যে অনাবশ্যক গুরুত্ব প্রদান করা হতো তা হ্রাস করতে হবে।

ব্যর্থতা ও পতন

এসব সংস্কার সকল দেশে সুসমভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।[৫৩] এগুলো বুলগেরিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী ও রোমানিয়ার তুলনায় যুগোশ্লাভিয়া, হাংগেরী,

পোল্যাণ্ড ও চীনে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ দেশগুলোর কোনোটাই বাজার সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা তাত্ত্বিকভাবে যে পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন সেভাবে বাজার শক্তির উপর আস্থা প্রদান ও অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রীয়করণের পথে অগ্রসর হয়নি। বাস্তবে সর্বত্রই অতিরিক্তভাবে এককেন্দ্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক উপরিকাঠামো অটুট রয়ে গেছে। ফলে উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও পণ্যমানের ক্রমাবনতি এবং ঘাটতি সমস্যা যা এদেশগুলো সমাধান করতে চেয়েছে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সমস্যাগুলো অসহনীয় হয়ে উঠলে ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট সরকারগুলো তাসের ঘরের মতো ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে তিয়েনমেন স্কোয়ারের গণতন্ত্রের অন্দোলন পাশবিক শক্তির সাহায্যে দমন না করলে চীনের কমিউনিস্ট সরকার এতদিনে হয়ত উৎখাত হয়ে যেত। প্রশ্ন হলো, লক্ষ্য অর্জনের দিক থেকে সোভিয়েত মডেলের চেয়ে কেন বাজার সমাজতন্ত্র অধিকতর সফলতা দেখতে পারল না?

রাজনৈতিক গণতন্ত্র

অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সাথে রাজনৈতিক গণতন্ত্র চর্চা শুরু করা হয়নি। রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অস্বিত্বহীনতা অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিকে বিকলাঙ্গ করে দেয় এবং অবয়বে বেড়ে ওঠার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। দমননীতি দ্বারা চালিত সরকারের কায়েমী স্বার্থ যেভাবে চরিতার্থ হবে সে পথেই সংস্কার কর্মসূচিকে চলতে দেয়া হয়। আংশিক ও অবিন্যস্ত সংস্কার কর্মসূচি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে ব্যর্থ হয় বলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এর সাথে দুর্নীতি ও অদক্ষতা সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে ঘাটতি ও সংকটের সৃষ্টি করে। যদি অর্থনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক গণতন্ত্রও চালু হতো তবু তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো না। বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার অপসারণ এবং বাজার শক্তির পুনরাবির্ভাবের ফলে সম্পদের বন্টনে অবশ্য নিঃসন্দেহে দক্ষতার সৃষ্টি হতো। তবে তা বাজার অর্থনীতিতে জাতীয়করণকৃত শিল্প সংস্থায় যে দক্ষতা বিরাজমান তার চেয়ে অধিক হতো না। উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতির ফলে বাজার অর্থনীতি থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ বেরিয়ে আসে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অভাবে তা বাজার সমাজতন্ত্রে পাওয়া কখনো সম্ভব নয়, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। বাজার সমাজতন্ত্রকে যদি প্রকৃত অর্থে একটি কার্যকর ও প্রকৃত বিশ্বদৃষ্টির কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত করা না যায়, তবে বাঞ্ছনীয় ন্যায়পরতা, যা বাজার অর্থনীতিও প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, তা কখনই অর্জন করা সম্ভব হবে না। শুধুমাত্র এ ধরনের বিশ্ব দর্শনভিত্তিক বাজার সমাজতন্ত্রই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি, সুষম বন্টনব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক পুনর্বিন্যাস ঘটাতে পারে। এরূপ দর্শনের অভাবে কার্যকর ব্যবস্থা ও কৌশল গড়ে

উঠতে পারেনি। এসব বাজার সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশসমূহ তাই শুধুমাত্র তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানেই ব্যর্থ হয়নি, উপরন্তু তারা বাজেট ঘাটতি, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, উচ্চ বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা, এতদিন যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল, তার ঘূর্ণিপাকেও পতিত হয়েছে। অধিকন্তু আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়েছে।

মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও ঋণ

উদারনীতি গ্রহণে অগ্রসর যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, হাংগেরী এবং চীন এ বিষয়ে উত্তম উদাহরণ। মুদ্রাস্ফীতি ও শ্রমিক অসন্তোষের যাতাকলে আর্তনাদ করছে যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ড। উভয় দেশে প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলছে। যুগোশ্লাভিয়ায় ১৯৭৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ২১.২% যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯ সালে হয়েছে ১২৪০%। পোল্যান্ডে মুদ্রাস্ফীতি ১৯৭৯ সালের ৭.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯ সালে দাঁড়িয়েছে ২৪৫%। এ দু'দেশের মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে যা ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে এসে দাঁড়িয়েছে ২৬৮৫% এবং ৬৪০% এ।[৫৪] হাংগেরী ও চীনে মুদ্রাস্ফীতির হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও তা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। চীনে তা ১৯৮৩ সালের ২.০% হতে ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫ সালে ১১.৯% এ দাঁড়িয়েছে।[৫৫] চীনাদের যারা বিগত ৩০ বছর যাবত মূল্য স্থিতিশীলতা দেখে আসছে এ মূল্যবৃদ্ধি তাদের নিকট তীব্র আঘাত হিসেবে দেখা দেয়। ফলে প্রতিবাদ ও ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির রূপকার ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান হু ইয়াও ব্যাংকে অপমানজনকভাবে পদত্যাগ করতে হয়। সরকার মূল্য বৃদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপসহ সাময়িকভাবে অর্থনীতিকে উন্মুক্তকরণের নীতি শিথিল করে। ফলে ১৯৮৬ সালে মূল্যবৃদ্ধিতে বিরতি এসে মূল্যস্ফীতি ৭% এ নেমে আসে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি রোধের এই ঢাকনি শক্তভাবে আটকে রাখা সম্ভব হলো না। ১৯৮৭ সালে মূল্যস্ফীতি ৮.৮% এবং ১৯৮৮ সালে ২০.৭% এ এসে দাঁড়াল। অর্থনীতি উদারনীতিকরণ পুনরায় শুরু হলে চেপে রাখা মুদ্রাস্ফীতির বিস্ফোরণের সম্ভাবনা রয়েই গেল। বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। বেকারদের জন্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় ছড়িয়ে থাকা অদক্ষতা হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হলে এ অবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। প্রথম দিকে বেকারত্বের কোনো অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করা হলো না। যুগোশ্লাভিয়ায় বেকারত্বের পরিমাণ দাঁড়াল ১৫% যা ওইসিডি দেশের তুলনায় দ্বিগুণ এবং তা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।[৫৬]

পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ও যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বিশালাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-৮৯ এ চার বছরে তা মার্কিন ডলার ৭১.৭ বিলিয়ন হতে

মার্কিন ডলার ১০১.২ বিলিয়নে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ হাংগেরী, পোল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে ২০.৬ বিলিয়ন, ৪৩.৩ বিলিয়ন এবং ১৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীনের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আরো দ্রুততরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০ সালের ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে তা ১৯৮৯ সালে ৪৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৫৭]

সংস্কারের সমস্যা

সংস্কারের কৌশল হিসেবে যেসব পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে তা পুঁজিবাদের সেকুলার কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যশীলতার কাঁচিতে কেটেই প্রদান করা হয়েছে এবং সে পরামর্শগুলো হচ্ছে ঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি ব্যয় কমাও ও ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ কর, বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা মূল্য নির্ণীত হতে দাও, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে ফেল এবং ব্যক্তি মালিকানা চালু কর। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ন্যায়পরতা সমাধিকে ঢেকে দেবে। আবার এ পরিপূর্ণ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস চিরায়ত মূল্যবোধ সমৃদ্ধ চিন্তাদর্শন ব্যতীত সেকুলার মূল্যবোধের কাঠামোয় অর্জন করা সম্ভব নয়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। কিন্তু জনকল্যাণ যখন সরকারি ব্যয়ের উপর মূলত নির্ভরশীল তখন এটা করা কঠিন, কেননা সরকারি ব্যয় হ্রাস রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে– বিশেষত যখন ভর্তুকি তুলে নেয়া হবে; চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে মূল্যকে নির্ণীত হতে দেয়া হবে; মজুরি বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরা হবে এবং ফলে প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে। অধিকন্তু হ্রাসকৃত সরকারি ব্যয়ের সাথে মিলে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত সংস্থাসমূহের ব্যয় কমানোর চেষ্টা বেকারত্ব বাড়িয়ে তুলবে। বেকারদের জন্য কোনো কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো তীব্র হবে। বিজাতীয়করণ জনগণের আয় ও সম্পদের ন্যায়পরতা অমীমাংসিত প্রশ্নটি আবার জাগিয়ে তুলবে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ইতোমধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সুচারুভাবে পরিকল্পিত এবং যুগপৎ দক্ষতা ও ন্যায়পরতা লক্ষ্য পূরণে সক্ষম পরিবর্তন কৌশল নিরূপণ ব্যতিরেকে সংস্কার কত কঠিন। সেকুলার কাঠামোর আওতায় সমাজতন্ত্রী অর্থনীতিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থায় রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করবে। দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগণ এভাবে ভোগান্তির সম্মুখীন হবে। অপরাধের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে, কেননা একনায়কবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে অপরাধ রোধের জন্য নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। সংস্কারবাদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিসমূহ ফলে দ্বৈত সমস্যার সম্মুখীন– কী করে অতীতের বৈষম্য ও অন্যায়পরতাসমূহ দূর করা যায় যা বর্তমান আর্থ-সামাজিক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে এবং একই সাথে কীভাবে দুর্নীতি ও ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি না করে

যুগপৎ দক্ষতা ও ন্যায়পরতা বিধান করা যায়। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কৌশল যা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ বর্তমান মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে তা সহায়ক না-ও হতে পারে, কেননা এ ধরনের মডেলের দেশসমূহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশের মতো উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও ঘাটতির সমস্যায় ভুগছে না। ভিন্নতর কোনো কৌশল অবলম্বন করা না হলে বর্তমানে সামাজিক গণতন্ত্রের দেশসমূহ যে সমস্যায় ভুগছে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহকে তার চেয়ে অধিকতর প্রকট সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা ও অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সংস্কার কর্মসূচিতে নৈতিক মাত্রা সংযোজন এবং আমূল আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের পদক্ষেপ নেয়া না হলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহকে উন্নয়ন তরান্বিত ও ঘাটতি পূরণের জন্য সম্ভবত বিশালায়তনের ঋণের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। এর ফলে জনগণকে আপাতত ঃ শান্ত রাখা সম্ভব হলেও দীর্ঘমেয়াদে অন্যান্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে, যা বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশসমূহ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে মার্কসীয় বাঁধন-কষণ নেই। এতে বলপ্রয়োগের উপর বিশ্বাস বা পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের ধারণা নেই। বরং এ মতবাদ বিশ্বাস করে যে, সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হতে অবিচ্ছেদ্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব ছাড়াই গণতান্ত্রিকভাবে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর প্রথম দিকের প্রবক্তাগণ অবশ্য উৎপাদন যন্ত্রেও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আবশ্যকতার কথা বলেছেন। সুম্পিটার সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত।[৫৮] তার সমসাময়িক পণ্ডিত অস্কার ল্যাঞ্জ সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সমার্থক হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে 'উৎপাদনের প্রধান উপকরণের সামাজিক মালিকানার' কথা বলেছেন।[৫৯]

সোভিয়েত মডেল হতে বিচ্ছেদ

জনগণের উপর দমননীতির বিরূপ ফলাফল ও সোভিয়েত উৎপাদন ব্যবস্থার অদক্ষতা লক্ষ্য করে এ উভয় পন্থার উপর হতে গুরুত্বারোপ কমিয়ে আনা হলো। বাজারব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টন উৎপাদন সংক্রান্ত অন্যান্য সমাধানে সক্ষম বলে প্রতীতি জন্মাল। যেহেতু ধনতন্ত্রের মূল ব্যর্থতা হচ্ছে বন্টন ক্ষেত্রে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা, সেহেতু ধনতন্ত্রের এই চারিত্রিক ত্রুটি দূরীকরণই হবে সমাজতন্ত্রের প্রধান কাজ। মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে এ আরাধ্য কাজ সম্পাদন করা সম্ভব বলে ধারণা করা হলো। কেননা এ ব্যবস্থায় পাবলিক সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এ ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের চরিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৬০] এই পদক্ষেপসমূহ কী

হবে সে সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ থাকলেও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সমার্থক হিসেবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার সাথে তা জনগুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, শ্রমনীতি সংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তা (বেকার ভাতা, অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবহন সুবিধা) ইত্যাদি নিশ্চিত করে। বিপরীত পক্ষে বিপ্লব, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং সকল উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানার সাথে কমিউনিজম সমার্থক পদবাচ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হল্যান্ডের ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্রীগণ এবং জার্মানীর সংশোধনবাদীগণ যে মতবাদ প্রচার করে তার মূল সুর ছিল ক্রমবিবর্তনবাদের অনিবার্য বিজয়।

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিকগণ এ ধরনের চিন্তাধারার প্রতি অনাস্থা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে ধনবাদী পরিবেশ কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়াশীল সংসদীয় গণতন্ত্র ও শ্রমিক ইউনিয়নের সংশোধনবাদী অস্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংসদ ও শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ সমাজের প্রভাবশালী অংশের স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে এবং ধনবাদী সমাজে প্রভুত্ব করে বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই সংশোধনবাদী অস্ত্রের দ্বারা ধনবাদের পতন ঘটানো সম্ভব নয়। এগুলো ধনবাদী সমাজের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহকেই শক্তিশালী করবে। সুতরাং সংশোধনবাদী পন্থা শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের অস্তিত্বকেই দীর্ঘায়িত করবে।[৬১] বিপ্লবীরা কল্যাণ রাষ্ট্রকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেনি। তারা প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে ধরে রাখল, যেখানে কল্যাণ রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে বিলুপ্তি ঘটবে শ্রেণী বৈষম্যের এবং সকল উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয়করণ ও মজুরি সম্পর্কের অবসানের মাধ্যমে সকল সম্পদের সমবণ্টন নিশ্চিত হবে। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে, এ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি মজুরি দাসত্বকে আরো সুদৃঢ় করেছে এবং দক্ষতাকে করেছে খর্ব। তাই এ ধরনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে বর্তমানে আর সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ রাজনৈতিক মঞ্চ বা মেনিফেস্টো হিসেবে ব্যবহার করছে না, বরং তারা কল্যাণ রাষ্ট্রের চিন্তা দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।[৬২] অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বৈপ্লবিক পন্থা পরিত্যাগের কারণে দৃশ্যমান ভবিষ্যতে এ মতবাদের নতুন অনুসারী তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধি ও ধনতন্ত্রের বণ্টন ব্যবস্থায় কিছু কসমেটিক পরিবর্তন এনে দারিদ্র্যের অবসান, প্রত্যেকের প্রয়োজন পূরণ, আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন তথা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা? অথচ ইতিবাচক হতো উদ্বৃত্ত মূল্য বা আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে অন্যায়পরতা থাকা সত্ত্বেও অন্তত যদি বাজারব্যবস্থা বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারত। কিন্তু যেহেতু দেখা গেছে যে, বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বাজার অর্থনীতি দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এ সত্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সমাজতন্ত্রী দলসমূহ ক্ষমতায় এসেছে। তাঁদের মুখ্য

উদ্দেশ্যসমূহ ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, সম্পদের অধিকতর সমবণ্টন, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা।[৬৩] এ দলসমূহ যদিও অর্থনীতিতে কতিপয় প্রশংসনীয় সংস্কার প্রবর্তন ও শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পেরেছে, তবুও তাদের মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এসব অর্থনীতির বিশাল সম্পদের ভিত থাকা সত্ত্বেও এখনো দারিদ্র্য ব্যাপক, মানুষের প্রয়োজন অপূর্ণ এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য বস্তুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দক্ষতা ও ন্যায়পরতা, উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে চলেছে।

আপষকামী নীতি

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। বাজেট ঘাটতি ও করের গুরুভারের কারণে এর কৌশল ও পদ্ধতি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এ কারণে আবেদন হারিয়েছে। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র শক্তি অর্জন করেছে, সেখানে 'নব্য ডানপন্থী'দের পুনরুত্থান ঘটেছে; সমাজতন্ত্র বিরোধীরা ভোটারদের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[৬৪]

ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ এবং ১৯৮৭ সালে বৃটিশ লেবার পার্টি ১৯২৯ সালের চেয়েও প্রকট অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দায়ী রক্ষণশীল দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৬৫] নির্বাচনে জয়ের জন্য তিন মিলিয়ন বেকারের ইস্যুকে ব্যবহারে লেবার পার্টির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে 'ইকনোমিস্ট' ঘোষণা করে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয়ের সুবর্ণ যুগের বৈপ্লবিক ও উদার দানশীল মতবাদ সমাজতন্ত্রকে এখন পুরাতন ও সেকেলের বলে মনে হয়; সমাজতন্ত্র-উত্তর ভবিষ্যতের ইউরোপের কাছে সমাজতন্ত্র আর কোনো আবেদন রাখে না।[৬৬]

আবার কতিপয় প্রথম সারির সমাজচিন্তাবিদ সম্পদ ও মুনাফার ব্যক্তি মালিকানাসহ ধনতন্ত্রের মৌল স্তম্ভগুলোর উপর সমাজতন্ত্রীদের আক্রমণের সারবত্তাকে প্রশ্ন করেছেন। "ফিউচার অব সোসালিজম" গ্রন্থে ক্রসল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, 'মালিকানার ভিত্তিতে ধনতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং একশত বছর পূর্বে ধনতন্ত্র কল্যাণকর ছিল কিনা এ প্রশ্ন বর্তমানে সকল তাৎপর্য হারিয়েছে, কেননা শুধু মালিকানা দ্বারা এখন আর সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র প্রেক্ষাপট নির্মিত হয় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ সমাজের আন্তঃসম্পর্ক ও ন্যায়পরতার নিরিখে সমাজকে বিচার করা এখন বরং অধিক প্রাসঙ্গিক'।[৬৭] জাতীয়করণ এখন আর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নয়। ফলে বৃটিশ এবং বহু ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী দল এখন নামে মাত্র যৌথ প্রথার সমর্থক।[৬৮] সমাজের উন্নয়ন ও দক্ষতার উপর মুনাফার প্রভাব এখন অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। তাই ক্রসল্যান্ড মন্তব্য করেন যে, 'এটা চিন্তা করা ভুল যে মুনাফার সাথে পুঁজিবাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রী যে, কোনো গতিশীল

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুনাফা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি'।[৬৯] তাই 'নোভাকের' মন্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় যে, 'তত্ত্ব ও কার্য উভয় ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রীগণ পশ্চাৎপসরণ করেছে'।[৭০] এমনকি সুইডেনের অর্থমন্ত্রী কিয়েল আরোফ ফেলট বলেন, 'আমাদের ধনতন্ত্র বিরোধী দল হিসেবে চিহ্নিত হবার প্রয়োজন নেই। ধনতন্ত্রের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু তার কোন উপযুক্ত বিকল্প নেই'।[৭১]

আর যদি সমাজতন্ত্র সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফাকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের পার্থক্য নিরূপণের কি মানদণ্ড অবশিষ্ট থাকে, বিশেষত যখন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ও সামাজিক শ্রেণী বিভক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে? এমনকি ডানপন্থীরাও এখন রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের সরবরাহের সমর্থক। ট্রেড ইউনয়নের প্রতি দৃঢ় সমর্থন তাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বেকারত্বের বর্তমান উচ্চহারের কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এখন আর 'ক্ষমতার সম্পর্ক বিন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ নয়'।[৭২] তাই উইলিয়াম ফাফ মন্তব্য করেন, উদারনৈতিক বামপন্থী বা রক্ষণশীল বামপন্থী কারো নিকট এখন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বৃহৎ কোনো কর্মসূচি নেই'।[৭৩] আরভিং হাউই আরো দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'সমাজতন্ত্র দ্বারা এখন আর দারিদ্র্য দূরীকরণ বা শিল্পসমূহের জাতীয়করণ বুঝায় না'।[৭৪] আইনসংগতভাবে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় একে নির্বাচনী রাজনীতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এত বেশি আপোস করতে হয় যে, তার প্রাণশক্তি ও মৌলিক পরিবর্তন সাধনের নিজস্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে– সেই পরিবর্তন যা চরিত্রকে পাল্টিয়ে দিতে পারে।[৭৫] বৃহত্তর জনগোষ্ঠী চাইলেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও নির্বাচকমণ্ডলী জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে সমর্থনের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে। এ আন্দোলন সুদৃঢ় শেকড় গাড়তে ব্যর্থ হয়েছে। এখনো এটা জনগণের খেয়াল বা শখের কাছে করুণা প্রার্থী। রক্ষণশীল বা সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বের শক্তির উপর এ দলগুলোর বিজয় নির্ভরশীল। জনগণ এ মতবাদের জন্য দৃঢ় কদমে দাঁড়িয়ে জীবনমরণ লড়াই করতে রাজি নয়, যেমনভাবে তারা করে থাকে ধর্মীয় মতাদর্শের ক্ষেত্রে। জনচিত্তের এ ধরনের দোদুল্যমান অবস্থা কি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বিজয়কে নিশ্চিত করতে পারে? অপরদিকে বিপ্লবও কোনো সমাধান নয়। রাশিয়া এবং চীনের বিপ্লব অযুত-লক্ষ লোকের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, পেছনে রেখে গেছে এমন তিক্ত স্মৃতি যা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে সজাগ কোনো মানুষেরই সমর্থন লাভ করতে পারে না।

এমনকি যেসব উন্নয়নশীল দেশে বিপ্লব বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মানবতার যা কিছু আদি ঐতিহ্য ছিল তার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।[৭৬]

ভাবমূর্তিও বিনাশ

কার্যসম্পাদনের নিক্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এর লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও এর অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ এর লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবের কারণে এ মতবাদ কার্যকর কর্মকৌশল রচনায় ব্যর্থ হয়েছে। ধনতন্ত্রের মতো গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রও রেঁনেসা পরবর্তী সেকুলার দর্শনের ফসল। ধনতন্ত্রের বন্টন ব্যবস্থায় কিছু বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন সাধন করাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের একমাত্র সাফল্য। সার ও মাটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে লেবুর বীজ থেকে আম ফলানো কখনই সম্ভব নয়। বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন, সর্বোপরি মানুষের চরিত্র ও স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন সাধন এবং কর্মকৌশলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের মানবতাবাদী লক্ষ্যসমূহ অর্জন কখনই সম্ভব নয়।

একটি প্রকৃত সমাধানে উপনীত হবার জন্য নতুন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিবর্তে বামপন্থী চিন্তাধারাকে 'আমেরিকানবাদের' ছাঁচে ফেলে দেয়া হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণবাদ বা শান্তিকামীতার মতো ইস্যুর সাথে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে সম্পৃক্ত করার একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যদিও এগুলোর সম্পৃক্তি অবশ্যই প্রয়োজন, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এসবের অন্তর্ভুক্তিই মানুষের চাহিদাপূরণ, বৃহত্তর সমতা বা শ্রেণী বৈষম্যের অবসানকে নিশ্চিত করতে পারে না। বুর্জোয়া দলগুলোও উৎসাহের সাথে এ ব্যবস্থাপত্র নিয়ে জনগণের সম্মুখে আসতে পারে। রায় হেটোরসলে তার 'Economic Priorities for the Labour Government' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি কত সংকুচিত রূপ ধারণ করেছে।[৭৭] লেবার পার্টির এক কনফারেন্সে 'নেইল কিনোক' পূর্ববর্তী এক পক্ষকালের মধ্যে রক্ষণশীল দুটো দলের উপস্থাপনার মতোই নিখুঁতভাবে ধনতন্ত্রী সামাজিক বাজারনীতির এক এজেন্ডা উপস্থাপন করেন। লেবার পার্টির নেতার মতে, উক্ত দলের লক্ষ্য হচ্ছে 'রক্ষণশীলদের চেয়েও দক্ষতার সাথে বাজার অর্থনীতিকে পরিচালিত করা'।[৭৮] লেবার পার্টির প্রধান হিসেবে কিনোকের নির্বাচন কার্যত ধনতন্ত্রের আরো উত্তম ব্যবস্থাপনার প্রতি পার্টির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র তার লক্ষ্য অর্জন ছাড়াই স্বকীয় ভাবমূর্তি হারিয়েছে।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (দ্বিতীয় অধ্যায়)

১. ১৮৩০ সালের দিকে 'সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটি ইংল্যান্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এর আরো আগে ১৮২৬ সালে প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। আরো প্রায় এক শতাব্দী পর একজন বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী সমাজতন্ত্রের ২৬০টির বেশি সংজ্ঞার সংকলন প্রকাশ করেন। দেখুন, D. F. Griffith, *What is Socialism? A Symposium* (London: Richards, 1924), উদ্ধৃতি দিয়েছেন J. Wilczynski, *The Economics of Socialism* (1978), P. 21.

২. চূড়ান্ত অভিমত দিয়েছেন যে, 'সমাজতন্ত্র সাধারণত সেকুলারতার সাথে সংশ্লিষ্ট'। এর কারণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ফরাসি বিপ্লবের মানবতাবাদ সংক্রান্ত মৌলিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ইটালি এবং ল্যাটিন আমেরিকার লুসো-হিসপানিক সংস্কৃতিতে সমাজতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে জঙ্গি নাস্তিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। George Lichtheim, *A Short History of Socialism* (1978), pp. 308-9.

মার্কসবাদ

৩. দেখুন, Lewis S. Feuer, "Marx", The New Encyclopaedia Britannica, 15th ed. (1973-4), vol. 11, p.549.

৪. Neil Mclnnes, "Karl Marx", *The Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 5,p. 172.

৫. John Plamenatz, *Karl Marx's Philosophy of Man* (1975), pp. 11-13

৬. Karl Marx, Early Writings, p.521. থেকে উদ্ধৃত করেছেন Plamenatz (1975), p. 233,

৭. দেখুন, Plamenatz (1975), p. 37-8; Leslie Stevenson, *Seven Theories of Human Nature* (1974), p.54.

৮. 'বস্তুগত জীবনের উৎপাদনের ধরন মানব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। মানুষের বিবেক তার সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অবস্থান তার বিবেক নির্ধারণ করে। –Karl Marx, *Selected Writings in Sociology and Social Philosophy,* অনুবাদঃ T.B. Bottomore সম্পাদনা T.B. Bottomore and M. Rubel (1963), p.67.

৯. দেখুন, Norman Geras, *Marx and Human Nature: Refutation of a Legend* (1983).

১০. দেখুন, Karl Marx and Friedrich Engels, *Basic Writings on Politics and Philosophy,* সম্পাদনা Lewis Feuer (1959), The Communist Manifesto, p. 9 আরো দেখুন, T. B. Bottomore (1963), pp.263.

১১. C.A.R Crosland, *The Future of Socialism* (1963, reprinted in 1985), p. 37.

১২. Ben B. Seligman, *Main Currents in Modern Economics* (1971), vol.l *(The Revolt Against Formalism),* p. 107

১৩. F. A. Von Hayek, *Individualism and Economic Order* (1948) pp.77ff.

১৪. Gyorgy Szakolczai, "Limits to Redistribution: The Hungarian Experience" in D. Collard, R. Lecomber and M. Slater (eds.) *Income Distribution: The Limits to Redistribution* (1980), pp. 206-35; Maksymiban Pohorille, "Collective Comsumption in Socialist Countries: A Theoretical Approach" in R. C. O. Mathews and G. p. Stafford, *The Grants Economy and Collective Consumption* (1982), p. 77. উদাহারণস্বরূপ পোল্যান্ডে সরকারি গাড়ির মূল্য বাজার মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের লাভ অনেক (Branded Red Elephants". *The Economist.* 30 May 1987. p. 72).

১৫. Commission of the European Communities, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Economy, No.45 December 1990, p. 52.

১৬. N. D. Nordhaus, "Soviet Economic Reform: The Longest Road" (1990), vol. 1, pp. 287-307. দেখুন, *European Economy*, No. 45, December 1990, p. 52; L. Sirc, *Economic Devolution in Eastern Europe* (1969); and Russell Lewis, *The Survival of Capitalist System; Chalenge to the Pluralist Societies of the West* (1977), p. 9. রুটি, চিনি ও সবজিতেলের খুচরা মূল্য সর্বশেষ ১৯৫৫ সালে পরিবর্তন করা হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের মূল্য সর্বশেষ ১৯৬২ সালে বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই থেকে স্থিতিশীলতা রয়েছে। কতিপয় মৌলিক খাদ্যের নামমাত্র মূল্য ২০ বছর ধরে স্থিতিশীল রয়েছে (মস্কো থেকে পাঠানো প্রতিবেদন Patrick Cockburn, "Now for the Prices", *Financial Times,* 17 September 1986, p. 16). সোভিয়েতে ১৯২৮ সাল থেকে বিভিন্ন ভাড়ার হার অপরিবর্তিত রয়েছে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল ১৯৬৪ সাল থেকে আর পরিবর্তন করা হয়নি। (Patrick Cockburn, "Doubts over Prices: Soviet Prices Chief Calls for Overhaul'', *Financial Times,* 14 July 1987, p. 2 উদ্ধৃত করা হয়েছে Mr. Valentin Pavlov, Chairman of the Soviet *State Committee for Prices* এর একটি প্রচারপত্র থেকে।

১৭. *Financial Times*, 8 October 1987, p. 2.

১৮. Cockburn, 14 July 1987 (see note 16 above).

১৯. দেখুন, Quentib Peel (in Moscow), "Soviet Black Market Beyond Control'', *Financial Times,* 5 April 1998.

২০. উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৪ সালে ২৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭৪০ মিলিয়ন জুতা তৈরি করে যা ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানীর সম্মিলিত উৎপাদনের চাইতে বেশি Cockburn, 17 September 1986 (উপরের নোট ১৬ দেখুন)।

২১. *European Economy,* No. 45, December 1990, p. 37. আরো দেখুন, Nove (1983), p. 87.

২২. দেখুন Ben Seligman, *Main Currents in Modern Economics* (1971), Vol. 1, p. 26.

২৩. *European Economy,* No. 45, December 1990, p. 40; আরো দেখুন Jan Winiecki, *Economic Prospects: East and West* (1987), and Winiecki, *The Distorted World of Soviet-Type* Economics (1998).

২৪. Marshal I. Goldman, *U.S.S.R. in Crisis: The Failure of an Economic System (1983), p. 2.* আরো দেখুন Russell Lewis (1987), *p. 8.* J. Kornai, *Economics of Shortage* (1980); আরো দেখুন Alee Nove, *The Economics of Feasibale Socialism* (1983), p. 71.

২৫. Winston Churchil, *The Hinge of Fate* (1950), pp. 498-9. আরো দেখুন, Roy Medvedev, *Let History Judge*, George Shriver (1989).

২৬. অরো দেখুন Jan Winiecki, *The Distorted World of Soviet-Type Economics* (1988). আরো দেখুন, Why Planned Economies Fail?" *The Economist, 25* June 1988, p. 69.

২৭. প্রবৃদ্ধির হার সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Gur Offer, "Soviet Economic Growth: 1928-1985." *Journal of Economic Literature,* December 1987, Table 1, p. 1778.

২৮. দেখুন, Able Aganbegyan, *The Challenge: Economics of Perestroika* (1988); আরো দেখুন, N. Shmelev and V. Popov, *The Turning Point: Revitalising the Soviet Economy* (London: Tauris, 1990), pp. 298-9; *European Economy,* No. 45 December 1990, p. 21; and "The Soviet Economy: Survey", *The Economist,* 9 April 1988, p. 3.

২৯. দেখুন, Offer (1987), p. 1798; and Gregory Grossman, "Communism in a Hurry: The Time Factor," in Abraham Brunberg (ed.), *Russia under Khruschev* (1962), pp. 205-18.

৩০. offer (1987), p. 1781.

৩১. Norman Furniss and Timothy Tilton, *The Case of the Welfare State: From Social Security to Social Equality* (1977), p. 42.

৩২. Crosland (1963), p. 37.

৩৩. Murry Yanowitch, *Social and Economic lnequality in the Soviet Union* (1977), p. 108.

৩৪. *lbid.,* Table 4.2, p. 109.

৩৫. *lbid.,* p. 131.

৩৬. Crosland (1963), p. 38.

৩৭. Cited by Russell Lewis (1977), p. 27, from Tibor Szamuely's Postscript to Sir Tufton Beamish's Half Marx (London: Tom Stacey, 1970).

৩৮. দেখুন, Raveendra N. Bata, *The Downfall of Capitalism and Communism: A New Study of History* (1978), p. 227.

৩৯. দেখুন, "Privatisation, Soviet-Style", *Financial Times,* 20 November 1986, p. 16.

৪০. Yanowitch (1977), p. 69.

৪১. Abram Bergson, "Income Inequality Under Soviet Socialism''. *Journal of Economic Literature, September,* 1948, p. 1052.

৪২. Bergson, (1948), p. 1092.

৪৩. Paul M. Sweezy, "Lessons of Soviet Experience", *Monthly Review,* November, 1967, pp. 9-21.

৪৪. *Ibid.*

৪৫. Leon Trotsky, *The Revolution Betrayed* (1937/72)

৪৬. আরো দেখুন, Nove (1983), p. 68 and back cover.

৪৭. George Arbatov, "Soviet Economic Reform: Challenge by the Radicals", *Financial Times,* 2 May 1990, p. 17.

৪৮. দেখুন Crosland (1963), p. 2.

৪৯. দেখুন Mikhail Gorbachev, *New Thinking for Our Country and the World* (1987); আরো দেখুন, Abel Aganbegyan (1988, 1989); Anders Aslund, *Gorbachev's Struggle for Economic* Reform (1989); and A. Hewett (ed.), *Reforming the Soviet Economy* (1988).

৫০. দেখুন, "Alas, Poor Perestroika", The Economist, 24 September 1988. p. 30; and "Budget Perestroika", *The Economist,* 8 October, 1988, p. 75.

৫১. Jerry Hough, *Russia and the West: Gorbachev and the Politics of Reform* (1988).

৫২. ২০-৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময় ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চীনের পতন ঘটে। দেখুন, John K.Fairbank, *The Great Chinese Revolution 1800-1985* (1986). আরো দেখুন Warren Lerner, *A History of Socialism and Communism in Modern Times: Theorists, Actives and Humanists* (1982), pp. 212 এবং 241. প্রায় ৫০ বছর ধরে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে মাও-কে মাও সেতুং বলা হতো। অবশ্য ১৯৭৯ সালে চীনা নামের *pinyin*- সংস্করণে ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এজন্যই এখানে নতুন উচ্চারণ ব্যবহার করা হয়েছে, (দেখুন Warren Lerner (1982), p. 153).

বাজার সমাজতন্ত্র

৫৩. দেখুন, Michael Karen, "The New Economic System in the GDP: An Obituary'', *Social Studies,* April 1973, pp. 554-87; Janos Kornai, "The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality'', *Journal of Economic Literature,* December 1986, pp. 1687-737; U.S. Cogress, Joint Economic Committee, *East European Economics: Slow Growth in the 1980s* (1986), Vol. 3; Dwight H. Perkings. "Reforming China's Economic System", *Journal of Economic Literature,* June 1988, pp.

601-45; and William F. 'Robinson, *The Pattern of Reform in Hungary* (1973).

৫৪. মুদ্রাস্ফীতি উপাত্তের জন্য For data on inflation, দেখুন IMF, *International Financial Statistics,* Table on Consumer Prices.

৫৫. এ বিষয়টি এবং চীনা মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টির জন্য প্রাগুক্ত দেখুন।

৫৬. "Marx Turned Upside Down", *The Economist*, 24 September 1988, p. 17.

৫৭. বিশ্ব ব্যাংকের *World Debt Tables, 1990-91,* vol. 1, p. 105, and vol, 2, 66 (China), 162 (Hungary), 298 (Poland) and 414 (Yugoslavia); এবং Bank for International Settlements, *60[th] Annual Report*, 1989/90 (Basle: BIS, June 1990), p. 48. থেকে তথ্য উপাত্ত নেয়া।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

৫৮. Joseph Schumpeter, *Capitialism, Socalism and Development* (1950), p. 167.

৫৯. Oscar Lange, *Political Economy* (1963), vol. 1 (General Problems), p. 81.

৬০. Crosland (1963), p. 26.

৬১. দেখুন Rosa Luxemburg, *Reform or Revolution* (1963), p. 41. আরো দেখুন George Lichtheim, *Marxism* (1961), p. 329; Furniss and Tilton, (1977), pp. 69-70.

৬২. দেখুন, Lewis A. Coser, "Socialism", *Encyclopaedia Britannica*, 15[th] ed. (1973-74), vol. 16, p. 973.

৬৩. দেখুন, Crosland (1963), p. 1.

৬৪. দেখুন, Nove (1983), p. xii. আরো দেখুন "Europe's Socialists: Has Anybody Seen Our Philosophy?" *The Economist,* 30 September, 1989, pp. 21-4.

৬৫. George F. Will, "A Turning Point in History: British Socialism's Demise", *International Herald Tribune*, 18 June, 1987, p. 5.

৬৬. "Labour's Wilderness", *The Economist*, 10 January 1987, p. 16.

৬৭. দেখুন, Crosland (1963), p. 42.

৬৮. Cf. John Lloyd, "Why it will not be Easy to kill off Socialism?" *Financial Times*, 23 March 1987, p. 14.

৬৯. Crosland (1963), p. 16.

৭০. Michael Novak, *The Spirit of Democratic Capitalism* (1962), p. 197. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৮০টি বামপন্থি ও সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নিয়ে গঠিত সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ১৯৮৯ সালের ২২ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত তাদের ১০০তম বার্ষিকীতে বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে এবং সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার হিসেবে রাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রত্যাখ্যান করে। এটা নিসন্দেহে তাদের মৌলনীতিতে ব্যাপক

সংশোধন (Robert Taylor, "Socialists Revise Objections to Market Economy", *Financial Times,* 23 June, 1989, p. 3)।

৭১. Kjell-Olof Feldt, "The Acceptable Face of Socialism", *Financial Times*, 16 June 1988, Section IV, p. iv.

৭২. John Lloyd (1987), p. 14.

৭৩. William Pfaff, "When the Left has Nothing to Offer, the Right Wins", *International Herald Tribune*, 9 July 1987, p. 4.

৭৪. দেখুন Irving Howe, "Introduction in Irving Hove (ed.), *Twenty-Five Years of Dissent,: An American Tradition* (1979), pp. xiv and xix.

৭৫. দেখুন, Barrington Moore, *Reflections on the Causes of Human Misery and upon Certain Prospects to Eliminate Them* (1972), p. 193.

৭৬. Moore (1972), p. 193.

৭৭. Roy Hattersley, *Economic Priorities for the Labour Government* (1987).

৭৮. "A Battle Won, A Battle Joined", *The Economist,* 8 October 1988, p. 41.

তৃতীয় অধ্যায়

কল্যাণ রাষ্ট্রের সংকট

সামাজিক সুবিচারের বিষয়ে যারা অতিমাত্রায় সচেতন তারা প্রায়ই অনুভব করেন যে, তারা যেন বধিরের সাথে কথা বলছেন।

মাইকেল প্রাউজ [১]

পুঁজিবাদী বিশ্বে কল্যাণ রাষ্ট্রের আবির্ভাব একটি ইতিবাচক ও শুভ ঘটনা। মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণায় গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ ও মন্দা এবং সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে।[২] কল্যাণ রাষ্ট্রের আশু লক্ষ্য পুঁজিবাদের অতিরিক্ত কুফলগুলো প্রশমিত করে সমাজতন্ত্রের আবেদন হ্রাস করা। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ, শ্রমিক, পুঁজিপতি নির্বিশেষে সবাই এ ধারণা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কল্যাণ রাষ্ট্রের অনেক সমালোচকের মতে কল্যাণ রাষ্ট্র হচ্ছে, 'শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের কাছে ক্ষমতার হাত বদল না ঘটিয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি'।[৩]

'লেইজে ফেয়ার' পুঁজিবাদে রয়েছে সামাজিক ডারউইনবাদের মর্মার্থ তথা শক্তিশালীদের টিকে থাকার দর্শন। অপরদিকে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার পশ্চাতে এ ব্যবস্থা থেকে সরে আসার কথা বলা হয়েছে। এ বিশ্বাস এতে জয়লাভ করল যে, ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ বিধান বাজারব্যবস্থার শক্তিসমূহের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার খেয়ালের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না।

মানুষের দারিদ্র্য ও স্বীয় প্রয়োজন পূরণের অক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ব্যর্থতা মাত্র নয়, বরং তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল। এ ধারণা, বিশ্লেষণ ও বিশ্বাস অর্থনীতির মূলধারায় স্বীকৃতি লাভ করল। নিজস্ব ত্রুটির কারণে মানুষ বেকার, অর্ধবেকার বা শ্রমের কম মূল্য পাচ্ছে না, বরং তার অন্য কারণ রয়েছে। তাই সীমিত সামর্থ্যের মানুষদের আধুনিক সমাজে সুন্দর ও দক্ষভাবে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, যোগাযোগ প্রভৃতি সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের দ্বার উন্মোচন করা এবং শিল্প দুর্ঘটনা, অঙ্গহানি ও বেকারত্বের মতো সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে তাদের সামাজিক প্রতিরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। কল্যাণ রাষ্ট্রের দর্শন রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনকে নির্ধারণ করেছে। এ দর্শন লেইজে-ফেয়ার পুঁজিবাদী বা কীনসীয় অর্থনৈতিক মতবাদের বিপরীতে রাষ্ট্রের ব্যাপক ও সক্রিয় ভূমিকার তত্ত্ব প্রচার করল।

কল্যাণ রাষ্ট্রের ধরন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বিশ্লেষকগণ এ সম্পর্কে কোনো ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেননি। দশকের পর দশক যাবত এ বিষয়ে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে, টিটমাস কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে

'অবর্ণনীয় বিমূর্ততা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] কল্যাণ রাষ্ট্রের নানা ধরনের বাস্তব উদাহরণ রয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

কল্যাণ রাষ্ট্র উদারনীতিবাদের দর্শন বা বাজার অর্থনীতির অলঙ্ঘনীয়তার পোশাক ছেড়ে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সেখানে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ উদারনীতিবাদের মতাদর্শ অব্যাহত রইল।[৫] বাজারব্যবস্থার যে ত্রুটি রয়েছে তা সরকারি হস্তক্ষেপ দ্বারা দূর করা হলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিভিন্ন বঞ্চিত উৎপাদন খাতে সম্পদের দক্ষ বন্টন নিশ্চিত করতে সমর্থ হবে বলে ধরে নেয়া হলো। জনগণকে উপযোগিতামূলক দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করা হবে তথা বন্টন খাতে সরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্য হবে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিক হবে সরকারি সুবিধার অংশীদার।[৬] সামাজিক অধিকার হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির নীতি হবে সামাজিক ইনস্যুরেন্স কর্মসূচির ভিত্তি।[৭] এ নীতিমালা অনুসরণের যুক্তি হচ্ছে সাধারণ নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতা ও প্রাপ্যতা যাচাই বাছাইয়ের জন্য ন্যায়সংগত ভিন্ন কোনো পথ খোলা নেই এবং এর ব্যত্যয় ঘটালে 'প্যারিটো অপটিমালিটি'র মানদণ্ডই লঙ্ঘিত হবে।

কৌশল

কল্যাণ রাষ্ট্র তাই বাজারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলে না। বরং মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের বৃহত্তম ভূমিকা 'লেইজে-ফেয়ার' পুঁজিবাদ ত্রুটি দূরীকরণ এবং বাজারব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে। কল্যাণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে সে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছয়টি প্রধান অস্ত্র হচ্ছেঃ ক. নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান, খ. প্রধান শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, গ. শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন, ঘ. রাজস্ব নীতি, ঙ. উচ্চ হারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও চ. পূর্ণ কর্মসংস্থান। কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে এ অস্ত্রগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

(ক) নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান

দ্রব্যসামগ্রীর মান, শৃঙ্খলা ও প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য বেসরকারি খাতকে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কিছু মানদণ্ড বা ঐকমত্য প্রয়োজন যার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। যদি এ ধরনের সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড বা ঐকমত্য না থাকে এবং এরূপ দ্বিধাবিভক্ত সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী নিজস্ব স্বার্থে চালিত হতে থাকে, তবে রাষ্ট্রকে নানা স্বার্থের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে রাজনৈতিক দরকষাকষির মধ্য দিয়ে সমঝোতামূলক যা কিছু সাব্যস্ত হয় তাই হয় রাষ্ট্রের কার্যাবলী।[৮] এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত ঐকমত্য না থাকায় ভোটদানে প্রভাববিস্তার, সংবাদ মাধ্যমের উপর আধিপত্য, নির্বাচনী প্রচারণায়

অর্থবল, লবিং ক্ষমতা প্রভৃতি যে দল বা শ্রেণীর মধ্যে বেশি, সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রণ তাদের অনুকূলে চলে যায়। আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সম্পদ বিভিন্ন স্বার্থের শ্রেণীর মাঝে যেহেতু সমভাবে বণ্টিত নয়, তাই তাদের মাঝে আন্তঃশ্রেণী শক্তির ভারসাম্য বিরাজ করার কথা নয়। অবশ্য স্ট্রেচি, গলব্রেথ ও অন্যান্যের ধারণা বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসমূহ একে অন্যকে প্রতিহত করে ন্যায়পরায়নতা আনয়ন করবে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে শক্তির দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, সরকারি নিয়ন্ত্রণ নীতি ধনী ও শক্তিশালীদের অনুকূলে চলে আসে। কেননা তাদের পক্ষে অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানো, নির্বাচনী প্রচারণায় বিপুল অর্থব্যয় ও প্রভাবিত করার অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

অধিকন্তু সঠিক আইন কাঠামো প্রণয়ন করা হলেও বিধিবিধানের কার্যকারিতার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিই যথেষ্ট নয়। এর সাথে প্রয়োজন শক্তিশালী সামাজিক উদ্দীপনা শক্তি যা শুধু নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সমাজেই আশা করা যায়। যদি বিধিবিধান মেনে চলার জন্য ব্যক্তি মানুষের মাঝে অভ্যন্তরীণ তাগিদ না থাকে, যত বাঁধনকষণ দিয়ে আইন রচনা করা হোক না কেন, আইনকানুন ফাঁকি দেবার বা ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য মানুষ ছলেবলে চেষ্টা করে যাবে। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করার নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে ঐকমত্য ছাড়া আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্রের শক্তির সাহায্যে আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাবে বলে প্রত্যাশা করা আসলে একটি ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। সেকুলার মতবাদ যা কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি তাতে লক্ষ্য সম্পর্কে ঐকমত্য ও নৈতিক চেতনা– এ উভয় শক্তিকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজের বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণীও সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার মুখে বিকল্প হিসেবে কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে কল্যাণ রাষ্ট্র যখন রাজস্ব সংকটের মুখে পড়ল, তখন ব্যবসায়ী শ্রেণী রক্ষণশীল সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে বিধিবিধান শিথিলকরণের পক্ষে আওয়াজ তুলল। তারা যুক্তি দেখাল যে, বিধিবিধানের নিগড়ে অর্থনীতির স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিশীলতা হ্রাস পায়, সরকারি ও বেসরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থ-সামাজিক সুবিচারের প্রতি সুদৃঢ় সামাজিক অঙ্গীকার এবং ঐকমত্যসম্মত মূল্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যায়সংগত হিস্যা অন্যকে দেবার স্পৃহা ও প্রেরণা ছাড়াই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধানের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক হাওয়া বদলের চাপে আইনকানুন যাই প্রবর্তন করা হোক না কেন, সময় ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্রমশ তা তার কার্যকারিতা হারাবে।

(খ) জাতীয়করণ

বড় বড় শিল্পসমূহ জাতীয়করণের দাবিও ক্রমশ তার আবেদন হারিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের অদক্ষতা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের লোকসান কাটিয়ে ওঠার জন্যে বিপুল ভর্তুকি জাতীয়করণের প্রতি মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। উপরন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বাজারব্যবস্থা দ্বারা নির্ণীত ও সংকটের কারণে সরকারি কোষাগারের পক্ষে এরূপ ভর্তুকির জন্যে অর্থ যোগান দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক পছন্দের চেয়েও সংকট কবলিত সরকারি অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনেই বিশ্বব্যাপী ডান-বাম উভয় শিবিরেই বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারা সূচিত হয়েছে। কোনো না কোনো বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি পশ্চিম ইউরোপে চালু হয়েছিল এবং এ ধারা জাপান, ভারত, লাতিন আমেরিকা, কানাডা, আফ্রিকা, এমনকি চীন, পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়েছে।[৯] স্পেনের প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকারের আমলেই বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।[১০] ১৯৭৯ সালে রক্ষণশীল সরকার বৃটেনে যে বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি শুরু করে, তাতে ১৯৮৮ সালের মধ্যে সরকারি কোষাগারে ১৭ বিলিয়ন ডলারের অধিক জমা পড়ে। পরবর্তী ৩ বছরে এর পরিমাণ ৩৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৭৯ সালে জাতীয় আয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ ছিল ১০%। ১৯৮৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬%।[১১] রাজনৈতিক হাওয়া বদলের সাথে সাথে শ্রমিক দলও জাতীয়করণ নীতি হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ধীর প্রবৃদ্ধির হার এবং সরকারের অব্যাহত বাজেট সমস্যার কারণে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি ভবিষ্যতে আরো বেগবান হবে।

(গ) শ্রমিক আন্দোলন

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, যাকে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের মহৌষধ মনে করা হতো, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যার উর্ধগতির কারণে তা গতি হারিয়ে ফেলল। ক্রমাগত মজুরি বৃদ্ধিকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী করা হলো। মজুরি হারের ক্ষেত্রে অনমনীয়তাকে বেকার সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। ফলে অনেক শিল্পোন্নত দেশে ট্রেড ইউনিয়নের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হ্রাস পেল। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা হারিয়ে গেল। বৃটেনে যেখানে শ্রমিক আন্দোলন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালীভাবে দানা বেধে উঠেছিল, সেখানে শ্রমিকদের বৃহদাংশ আর ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত রইল না। বৃটিশ শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নে সদস্য পদ ২৪% কমে গেল, যখন চাকরির পরিমাণ কমলো ১৩%। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কনফেডারেশনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪০% এর কম; যারা সদস্য তারাও সক্রিয় নয়। তৃণমূল পর্যায়ে সম্পৃক্ততা শিথিল হয়ে গেছে। শ্রমিকরা ইউনিয়নের সাথে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।[১২] দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার শক্তিশালী দুর্গের মধ্যেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পশ্চিম জার্মানী,

জাপান ও ফ্রান্স যেখানে মাত্র ১৯% শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত সেখানকার অবস্থা আরো করুণ।[১৩]

বর্তমান বেকার সমস্যার মুখে নিকট ভবিষ্যতে শ্রমিক ইউনিয়নের পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা খুবই কম। শুধুমাত্র সরকারকেই দায়ী করা যথার্থ নয়। কেননা শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর বাড়াবাড়িও অনেকটা দায়ী। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নেতার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা, তাদের অতিরিক্ত দাবিদাওয়ার ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া শিল্পপতিদের নিকট হতে সহযোগিতা ও জনসমর্থনের ভিতকে ধসিয়ে দিল।

আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে শিল্পপতিগণ ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে মেনে নেয়নি। বরং শ্রমিক ইউনিয়নগুলো স্থিতিশীল শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে অবদান রেখে শিল্পপতিদের উপকারে আসবে– এ বিশ্বাস থেকে তারা শ্রমিক ইউনিয়নকে মেনে নিয়েছিল। শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, সমধর্মী শিল্পসমূহে একই ধরনের মজুরি কাঠামো নির্ধারণে এ চুক্তি সহায়ক ছিল এবং এ চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কোনোরূপ ধর্মঘটের কোনো অবকাশ ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন এভাবে অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও স্থিতিশীলতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখল বা প্রকারান্ত রে পুঁজি গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হলো।[১৪] কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের দুর্নীতি এবং ধর্মঘটের সংখ্যাধিক্যে শিল্পপতি ও শ্রমিক ইউনিয়নের মাঝে গড়ে ওঠা সমঝোতা ও সামাজিক চুক্তি ভেঙে পড়ল। ১৯৭৮-৭৯ সালের প্রবল অসন্তোষের সময় বৃটেনে এতবেশি ধর্মঘট সংঘটিত হলো যে, তাতে জনগণের দুর্দশা চরমে উঠল এবং ধর্মঘটের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠল। মিসেস থ্যাচারের রাজনৈতিক উত্থানের পশ্চাতে এটাও একটি কারণ।[১৫] শ্রমিক ইউনিয়নগুলো প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রাখতে পেয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। ১৯৪৭-১৯৬৭ এ দুই দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ঘন্টা প্রতি প্রকৃত মজুরি বেড়েছে ৫৮%। পরবর্তী দুই দশকে এ হার আর বাড়েনি। ১৯৮৭ সালে প্রকৃত মজুরির হার ছিল ১৯৬৮ সালের মজুরির অনুরূপ।[১৬] ১৯৮১ সাল থেকে ঘন্টা প্রতি ন্যূনতম মজুরি হার ৩.৩৫ ডলারে অপরিবর্তিত রয়েছে। রক্ষণশীল নীতির প্রবল জোয়ার এবং নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণের আইনের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন হ্রাসের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক ইউনিয়ন মজুরি হারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আনয়নে সমর্থ হয়নি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে গত এক দশকে মজুরির ক্রয় ক্ষমতা ৪৫% হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে ঘন্টা প্রতি নিম্নতম মজুরি ৪.২৫ ডলারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত তা পুষিয়ে দিতে পারেনি, কারণ ন্যূনতম ৪.২৫ ডলার মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল।[১৭] নিম্নতম মজুরির প্রকৃত মূল্য যদি এভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তবে নিম্নতম মজুরির আইনের চেয়ে মুদ্রাস্ফীতির দাপটই অধিক প্রমাণিত হবে।

(ঘ) রাজস্বনীতি

সরকারি ব্যয়

রাজস্বনীতি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠল। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজস্বনীতির অঙ্গ হিসেবে সরকারি ব্যয়, প্রগতিশীল করব্যবস্থা ও সরকারি ঋণকে ব্যবহার করা হলো। প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন ও কতিপয় সেবা সরবরাহের মতো গতানুগতিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়কে লেইজে-ফেয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাও স্বীকার করে নিয়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকারি ব্যয়ের পরিসীমাকে প্রসারিত করা হয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও অধিকতর আয়-ন্যায়পরায়নতা অর্জিত হতে পারে। এসব লক্ষ্য অর্জনে ক্রমবর্ধমান সরকারি দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশ বছরে সরকারি ব্যয় ও কর রাজস্বের মাত্রা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকার ভাতার মতো সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা (Social Security Benefit), বয়স্ক ভাতা ও শিশু কল্যাণ ভাতার ন্যায় সামাজিক সাহায্য, অনুদান, খাদ্য ও জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে ভর্তুকি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ন, যানবাহন প্রভৃতি গণসেবা সরবরাহের কারণে সরকারি ব্যয়ের মাত্রা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত উপযুক্ত সেবাসমূহ শুধুমাত্র গরীবদের প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকেও বর্তমানে এগুলো সরবরাহ করতে হয়।

ওইসিডি দেশসমূহে ১৯৬০ সাল হতে ১৯৮২ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় গড়ে ১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৩% এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৮ সালে তা ৪০% এ নেমে আসে। ১৯৮২ সালে নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে জাতীয় আয়ের ৭২% এবং ৬৬% এ পৌছে। ১৯৮৮ সালে তা ৫৮% এবং ৫৯% এ হ্রাস পায়। সরকারি ব্যয় ছিল সর্বনিম্ন পর্যায়ে সুইজারল্যান্ডে (জাতীয় আয়ের ৩০%)।[১৮] যুক্তরাষ্ট্র সুইডেনের মতো কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার সাথে ততবেশি সম্পৃক্ত না হলেও সরকারি ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে সরকারি ব্যয়ের মাত্রা ছিল জাতীয় আয়ের ১০%, তা ১৯৮৬ সালে ৩৭% এ পরিণত হয়। ১৯৮৮ সালে সরকারি ব্যয় সামান্য কমে ৩৬.৩% এসে দাঁড়ায়।[১৯] শুধুমাত্র মন্দা ও বেকারত্বের সময় সরকারি ব্যয় বেড়েছে তা নয়, বরং পূর্ণ কর্মসংস্থানের সময়েও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কীনসীয় যুক্তি দ্বারা এর যথার্থতা নিরূপণ করা যায় না। লেইজে-ফেয়ার পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হয়। তাছাড়া ভোগ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশার বিস্ফোরণ ঘটেছে, অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

ওইসিডি দেশেসমূহের সরকারি ব্যয় কাঠামোতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। একটি হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাত ও কল্যাণমূলক সামাজিক সেবা দানের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস। অপরটি হচ্ছে সামগ্রিক ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপকতা। যেহেতু অধিকাংশ দেশে প্রবৃদ্ধির হার বেকারত্বের হারের চেয়ে

বেশি নয়, সরকারি ব্যয় হ্রাসের যে কোনো পদক্ষেপ সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা জন্ম দেবে। এসব কারণে সরকারি ব্যয় সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।[২০] অবশ্য সরকার ব্যয় হ্রাসের জন্য চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহের আলোকে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ছাড়াই সরকার যখন যেখানে সুবিধা সেখানে সরকারি ব্যয় কাটছাঁটের নীতি অনুসরণ করেছে। তবে তাও বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।[২১] আসল জায়গায় কাটছাঁট না করে কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাটছাটের প্রবণতাটাই লক্ষণীয়।[২২] সরকারি ব্যয় হ্রাসের খাত নির্ধারণ করতে গেলে সরকারি বিনিয়োগ ব্যয় এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কল্যাণ খাতে ব্যয় হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়ে পড়ে। তবে দেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সমর্থন ব্যাহত না করে এরূপ সরকারি ব্যয় হ্রাসের কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় বিপরীতটাই ঘটেছে। এসব কারণে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনেক দেশের সরকারের পক্ষে বিশাল সরকারি ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পূর্ব-পশ্চিমের উত্তেজনা হ্রাসের ফলে শান্তির ফসল হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, সম্পদের অবমুক্তি ঘটেছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সেই অবমুক্ত সম্পদের সঞ্চালনের ফলে উৎপাদন দক্ষতা ও ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সাধারণভাবে সবাই যা অনুভব করেছে নিউইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক সম্পাদকীয় ভাষায় তা হচ্ছে, 'পেন্টাগণ ব্যয় হ্রাস সমীচীন বলে মনে করলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তা করতে অনীহা প্রকাশ করবে যতক্ষণ না তারা নিশ্চিত হবেন যে, এতে পেন্টাগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না'।[২৩] এতে দেখা যায়, পেন্টাগণের বিশাল বাজেটের ব্যয় হ্রাস চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বার্থেই করা হয় না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা, অবকাঠামো পরিবেশ প্রভৃতি খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের মাধ্যমেও সামগ্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু কতিপয় বিশাল কর্পোরেশন যারা প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তারা অধিকতর সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষপাতী।

কৃষি খাতে ভর্তুকি কৃষি পণ্যের দাম উর্ধমুখী রাখার মাধ্যমে বৃহৎ কৃষকদের সহায়তা করে এবং খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্যের দ্বারা দরিদ্র জনগণকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কৃষিতে এ ভর্তুকির মাত্রা হ্রাস করা হলে সার্বিক অর্থনীতি লাভবান হবে। কিন্তু ওইসিডি দেশসমূহে ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ভর্তুকি ১৪.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৫.৪%, ইউরোপীয়ান কমিউনিটিতে ৪৪.৩% থেকে ৪৯.৩% এবং জাপানে ৬৪.৩% থেকে ৭৫%।[২৪] ফলে করদাতাদের উপর যে বিপুল চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানে ভর্তুকির পরিমাণও প্রায় সমপরিমাণ। সম্প্রতি কৃষি সেক্টরে সংস্কার সত্ত্বেও ইইসিতে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্য এবং উৎপাদনে

অদক্ষতা বিবেচনা করলে এ খাতে পরোক্ষ ব্যয় আরো বেশি দাঁড়াবে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ওইসিডি দেশসমূহের করদাতা ও ভোক্তাদের কৃষি খাতে ভর্তুকি হিসেবে প্রতি বছর ২৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে হচ্ছে।[২৫] ফাইন্যানসিয়াল টাইমসের এক সম্পাদকীয়তে দুঃখ করে বলা হয়েছে যে, কতিপয় বিশালাকৃতির কৃষি খামারের জন্য অগণিত মানুষকে বিশাল ভর্তুকির ভার বহন করতে হচ্ছে।[২৬] কিন্তু শিল্পোন্নত দেশেসমূহের রাজনীতিবিদগণ বৃহৎ কৃষি খামারসমূহের রাজনৈতিক আধিপত্যের কাছে এমনভাবে বন্দী যে, কৃষি ভর্তুকি সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশংকার কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য ফলাফল আশা করা যায় না।

উচ্চমাত্রার কর এবং ঘাটতি

সরকার কর্তৃক কর আদায় বা ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধির মাধমেই সরকারি ব্যয় বাড়ানো যেতে পারে। ওইসিডি দেশসমূহে করের পরিমাণ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশসমূহে ১৯৬০ সালে যে করের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ২৭.৭%, তা ১৯৮৮ সালে ৩৮.৪% এ পরিণত হয়েছে। সর্বোচ্চ মাত্রাসমূহ হচ্ছে সুইডেন ৫৫.৩% ও ডেনমার্ক ৫২.১% এবং সর্বনিম্ন মাত্রা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ২৯.৮% ও তুরস্ক ২২.৯%।[২৭] ফলে 'Welfare State Backlash' অভিধায় অভিষিক্ত কর-বিরোধী এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

যেহেতু এ Backlash এর কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর বৃদ্ধি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণের উপর সরকারকে অধিকতর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। ১৯৬০ সালে ওইসিডি দেশসমূহের বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল জিডিপির ১.৩%। ১৯৮৪ সালে বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপির ৪.৪%। এ ঘাটতির পরিমাণ অবশ্য কমে এসেছে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৬০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপি'র ২%।[২৮] বড় বাজেট ঘাটতির নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ বাজেট ঘাটতির অন্যতম বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বাজেট ঘাটতি সরকারি সুদ পরিশোধের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭৫ সালে সরকারি সুদের পরিমাণ ছিল সরকারি ব্যয়ের ৫%, যা ১৯৮২ সালে ১০% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সরকারি ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাই সুদের হার যদি হ্রাস পেত তবে ঋণের ভার কিছুটা লাঘব হতো। কিন্তু ১৯৮৮ সাল হতে সুদের হার বেড়েই চলেছে।[২৯]

ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয় যোগান দেবার জন্য উচ্চহারের কর ও ঋণের দ্বারস্থ হওয়া তাই সকল কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকারি ব্যয়-ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের একটি সমস্যাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর দিক হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ ঘাটতি আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। সরকারি এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশের সমগ্র বেসরকারি খাতের সঞ্চয়কেই শুধু শুষে নেয়া হয়নি, বরং বৈদেশিক ঋণেরও দ্বারস্থ

হতে হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র বেসরকারি খাতের বিনিয়োগই ব্যাহত হয়নি, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে ঋণগ্রস্থ দেশে পরিণত হয়েছে। যদি ঘাটতি অব্যাহত থাকে তবে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের জন্য সুদের উচ্চ হার বজায় রাখতে হবে যা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও চলতি হিসেবকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে না, অন্যান্য দেশসমূহ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে। সুদের হার বৃদ্ধির ফলে এদের ঋণের সুদ পরিশোধের বোঝা বেড়ে যাবে এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হতে উন্নয়নের অর্থ যোগান দেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

অসম ভর্তুকি

সরকারি ব্যয়, করের বোঝা ও ঘাটতির পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চললেও কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য– আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস পেল না। বস্তুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে, সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাস সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা সবার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। মানুষের আচরণ, প্রয়োজন, লক্ষ্য ও মূল্যবোধ কী হওয়া উচিত সমাজে তা নির্ধারিত না থাকার ফলে কল্যাণ রাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদী সরকারি ব্যয়ের পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভর্তুকি প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা খাতে সরকারি ব্যয় হতে যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়, ধনী ও গরীবের তা হতে সমান ফায়দা আদায়ের সুযোগকে ইনসাফপূর্ণ নীতি বলা যায় না। ধনীর মোকাবিলায় গরীবকে সাহায্যের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের যে লক্ষ্য অর্জন সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে হওয়ার কথা, তা সাধিত হয়নি। অথচ সরকারি ব্যয়ের বোঝা সাধ্যের অতিরিক্ত হারে বেড়ে চলেছে। কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা এবং সরকারি খরচে ধনীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সামাজিক ব্যয় যদি সঠিকভাবে বিবেচনা ও নির্ধারণ করা হতো, তবে সম্ভবত একই বা কম সরকারি ব্যয় হতে গরীবদের জন্য অধিকতর সুবিধা সরবরাহ করা সম্ভব হতো। সুতরাং, দেখা যায় পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে যেসব এডহক ভিত্তিক কল্যাণধর্মী কর্মসূচি নেয়া হয়েছে, সেসবের কিছু কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

জুলিয়ান লি গ্র্যান্ড সমাজের সামগ্রিক বৈষম্য কাঠামোর উপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ও যানবাহন খাতে সরকারি ব্যয়ের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাতে সরকারি ব্যয়ের প্রতি চারটির মাঝে একটি দ্বারা গরীবের চেয়ে ধনীরাই অধিক উপকৃত হয়েছে বলে দেখা গেছে। ফলে সরকারি ব্যয়ে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে তারতম্যমূলক সুবিধা গ্রহণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি। জুলিয়ান গ্র্যান্ড উপসংহারে উপনীত হন যে, কল্যাণ রাষ্ট্রের গৃহীত বৈষম্য হ্রাসের কর্মসূচিসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং জোড়াতালি দেয়া কোনো কর্মসূচির সাহায্যে অবস্থার আর উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৩০]

সার্বজনীন সুবিধা প্রদানের প্রবক্তা রিচার্ড লিটমাস বিনামূল্যে প্রদত্ত বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, উচ্চ আয়ের লোকেরাই জানে এ সুবিধার সর্বোচ্চ সুযোগ কীভাবে নিতে হবে। ধনীরা বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে পরামর্শ ও সেবা বেশি পেয়ে থাকে এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমৃদ্ধ হাসপাতালের অধিকাংশ সিট তারাই পায়। মোটকথা বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসা, মাতৃসেবা, মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে দরিদ্র শ্রেণী থেকে ধনিক শ্রেণীই অধিক সুবিধা আদায় করতে পারে।[৩১] গরীব মানুষেরা নিম্নমানের চিকিৎসা সুবিধা পায় এবং লাইনের শেষ মাথায় এসে তাদের দাঁড়াতে হয়।[৩২] যুক্তরাষ্ট্রেও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস পায়নি। সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবস্থার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি, বরং সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণীর অবস্থার আরো উন্নতি ঘটেছে।[৩৩] বেশ কিছু সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ হতে দেখা গেছে, সাধারণ ভর্তুকি গরীবদের চেয়ে ধনীদের ভাগেই বেশি সুবিধা বয়ে আনে। ১৯৭৪ সালে নির্বাচনে বিজয়ের পর বৃটেনে শ্রমিকদল রুটি, দুধ, মাখন, পনির, ময়দা ও চায়ের উপর যে ভর্তুকি প্রদানের প্রথা চালু করে তা পর্যবেক্ষণ করে উইট এবং নিউবোল্ড দেখিয়েছেন যে, এ খাদ্য ভর্তুকি নিম্নবিত্তদের চেয়ে উচ্চ বিত্তশালীদেরই বেশি সুবিধা প্রদান করেছে।[৩৫] সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে খাদ্য ভর্তুকি ব্যাপক। গিয়র্গী ঝাকোলঝাই দেখিয়েছেন যে, সেখানেও একই অবস্থা বিরাজমান। কম মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহে হাংগেরীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, খাদ্য ভর্তুকির পরিমাণ বিশাল হলেও তার সামগ্রিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে গরীবের স্বার্থের প্রতিকূলে।[৩৬]

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের দ্রব্যসামসগ্রীর মূল্য কম রাখায়ও একই অসম ফল পাওয়া গেছে। লি গ্রান্ড দেখিয়েছেন, যেহেতু ধনীরা গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, কয়লা, ডাক ও টেলিফোন অধিক ব্যবহার করে, বৃটেনে সত্তর দশকে মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য এসবের উপর প্রদত্ত ভর্তুকির মাধ্যমে গরীবের চেয়ে ধনীরাই বেশি উপকৃত হয়েছে।[৩৭] তাই দেখা যাচ্ছে, কল্যাণ রাষ্ট্রে বিনামূল্যে বা ভর্তুকির মাধ্যমে কম মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ সম্প্রসারণ দরিদ্রের চেয়ে ধনীদেরই বেশি লাভবান করেছে। বৈষম্য তাই বরং বেড়েছে।

প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা

কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজনীতির অপর অঙ্গ প্রগতিশীল করব্যবস্থাও অধিকতর কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। প্রথম দিকে বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল করের প্রতি বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, হেনরি সীমনস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'তাই আমি বলব... বৈষম্য হ্রাসের জন্য প্রগতিশীল করব্যবস্থা শুধুমাত্র কার্যকর ও সক্ষম পদ্ধতিই নয়, বরং এটিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা যা এ যাবত প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা আমাদের কাম্য, অন্য সব ব্যবস্থা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

নয়' ।[৩৮] প্রগতিশীল করব্যবস্থা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলো, কেননা এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে মৌলিক কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তা প্রগতিশীল কর বৈষম্য হ্রাস করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, কর কাঠামোয় প্রগতিশীলতার একটি আবরণ থাকলেও নানা ছাড়, রেয়াত, অব্যাহতি ও সুবিধা প্রদান এ ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। কর হতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা রাজস্ব হ্রাস করে এবং সম্ভবত কর ব্যবস্থাকেও ন্যায়নীতির পরিপন্থী করে তোলে ।[৩৯] স্ট্রেয়ার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণভাবে আয়করকে আয় পুনর্বণ্টনের হাতিয়ার হিসেবে যেরূপ কার্যকর মনে করা হয়, আয়কর বর্তমানে যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাতে তার সেই কার্যকরিতা থাকছে না।[৪০] অন্যান্য অনেক সমীক্ষা অনুরূপ উপসংহারে উপনীত হয়েছে।[৪১] পেচম্যান আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, কর্পোরেট ট্যাক্সের উপর কম এবং বেতন ও মজুরির উপর অধিক আয়কর আরোপের নির্ভরশীলতার কারণে গত ২০ বছরে করব্যবস্থা অধিক নিপীড়নমূলক হয়ে পড়েছে।[৪২] British Institute of Fiscal Studies এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৯ সাল হতে বৃটেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য কর-ভার বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৩] দৃশ্যত একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কাগজে ও কলমে সেখানে আয়কর বেশ প্রগতিশীল, কিন্তু ধনীরা কর-ভার লাঘবের জন্য রেয়াত পাবার এক জটিল পদ্ধতি উদ্ভাবন করে নিয়েছে। করব্যবস্থার নানা ফাঁকফোকর ও অসামঞ্জস্যতাকে ব্যবহার করে ধনীরা ধনীই থেকে যায়।[৪৪] ফলে সাধারণভাবে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, প্রগতিশীল কর কোনো দেশে পুনর্বণ্টনে ন্যায়পরায়নতা আনতেই শুধুমাত্র ব্যর্থ হয়নি, বরং কোনো কোনো দেশে তা উল্টো দিকে চালিত হয়েছে।

যথাযথভাবে প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হলে করব্যবস্থার আয়ের পুনর্বণ্টন ন্যায়পরায়নতা আনয়নে বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও কল্যাণ রাষ্ট্রের ব্যয় বৃদ্ধির চাপে আয় ন্যায়পরায়নতামুখী সংস্কারের পরিবর্তে আয়কর ও কর্পোরেট কর হার হ্রাসের দাবি উঠল। পুনর্বণ্টন করব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে মর্মে দাবি করা হলো। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৬ সালের কর সংস্কার আয়কর হারকে হ্রাস করে এমন পর্যায়ে নামিয়ে আনলো যা ১৯২০ সালের পর আর এরকম দেখা যায়নি।[৪৫] ফল দাঁড়াল এই যে, যখন পূর্বে অন্তত বাহ্যিক আবরণ হতে আয়-ন্যায়পরায়নতা অর্জন করব্যবস্থার লক্ষ্যরূপে মনে হতো, কর হার হ্রাসের পর সে ধারণাও অবলুপ্ত হয়ে গেল।

অব্যাহত বৈষম্য

তিক্ত সত্য এই যে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও দৃশ্যত প্রগতিশীল করব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে গরীব আরো গরীব এবং ধনী

আরো ধনী হয়েছে।[৪৬] যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব মতে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৮ সালে দারিদ্র্য রেখার নিচে জনসংখ্যা ছিল ১১.৪%, যা ১৯৮৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩.৬%।[৪৭] ধনী দরিদ্রের মাঝে আয়ের ব্যবধানও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সালের আয় সিঁড়ির নিম্নধাপের এক পঞ্চমাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের ৫.৩% লাভ করত।

অপরদিকে উপরের সিঁড়ির এক পঞ্চমাংশ পরিবার পেত জাতীয় আয়ের ৩৮.২%। ১৯৮৬ সালে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে নিচের এক পঞ্চমাংশ জনগণের হিস্যা ৪.৬% এ নেমে আসে। অপর দিকে উপরের এক পঞ্চমাংশ জনগণের হিস্যা ৪৩.৭% এ বৃদ্ধি পায়।[৪৮] মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অর্থনৈতিক কমিটির সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ডেমোক্রেট দলের সদস্যগণ মন্তব্য করেছেন যে, গত দুই দশকে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ আরো বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২ সালে ০.৫% জনগণ সম্পদের ২৫.৬% নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৮৩ সালে তারা সম্পদের ৩৫.১% নিয়ন্ত্রণ করে। ৯০% মার্কিন জনগণের গৃহস্থালী সম্পদের হিস্যা গত ২১ বছরে ৩৪.৯% হতে ২৮% এ হ্রাস পেয়েছে।[৪৯] যৌথ অর্থনৈতিক কমিটির সভাপতি কংগ্রেস সদস্য ডেভিড আর ওবে রিপোর্টের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ধনী অধিকতর ধনী হয়েছে। তিনি আরো মন্তব্য করেন, যদি সম্পদ ক্ষমতা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় ১৯৬০ এর দশকের চেয়ে অধিকাংশ মার্কিন জনগণ বর্তমানে কম ক্ষমতার অধিকারী। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের অবস্থার তেমন কোনো হেরফের নেই। সুইডেন যাকে দৃশ্যত আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র বিবেচনা করা হয়, সেখানে উপরের ১০% পরিবারের জাতীয় আয়ে অংশ ছিল ১৯৭২ সালে ২১.৩%। ১৯৮১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.১% এ পরিণত হয়েছে।[৫০] নিচের দিকের এক-পঞ্চমাংশ পরিবারের হিস্যা জাতীয় আয়ের ৬.৬% হতে ৭.৪% এ বৃদ্ধি পেলেও এ বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

(ঙ) উচ্চ প্রবৃদ্ধি

কল্যাণ রাষ্ট্রের ইতঃপূর্বে আলোচিত ব্যবস্থাসমূহ আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তেমনি উচ্চ প্রবৃদ্ধির কৌশলও অধিকতর কোনো অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়নি। কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্মকৌশলে উচ্চ প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ফলে তা সার্বজনীন সমর্থন লাভ করে। যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাটি গতি লাভ করেছিল, তাই প্রবৃদ্ধিই শেষতক শ্রেণীহীন সমাজ রচনায় সক্ষম হবে মর্মে গভীর আস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এডহক অঙ্গ হিসেবে সামাজিক কর্মসূচিগুলো কাজ করছিল।[৫১] কিছু কিছু লেখক

প্রবৃদ্ধি ছাড়া পুনর্বণ্টনকে সামঞ্জস্যহীন বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি এন্থনি ক্রশল্যান্ড এর মতো বিখ্যাত সমাজতন্ত্রীও অনুভব করেছেন যে, প্রবৃদ্ধি অর্জনই পুনর্বণ্টনের জন্য একমাত্র কার্যকর পন্থা। কেননা আয়ের যে কোনো উল্লেখযোগ্য হস্তান্তরের ফলে জনসংখ্যার অধিকতর স্বচ্ছল অংশের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে এবং এর ফলে তাদের মাঝে হতাশার সঞ্চার হবে।[৫২] কিছু বিখ্যাত নীতি নির্ধারক উপদেষ্টা আরো দ্রুততর প্রবৃদ্ধিকেই উন্নয়নশীল ও উন্নত নির্বিশেষে সকল দেশের সকল সমস্যার সমাধান বলে মনে করেন।[৫৩]

যাই হোক, দু'দশক যাবত উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্রয়োজন পূরণ ও বৈষম্য হ্রাসে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকতর কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলে পরিচিত পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও জাপান নির্বিশেষে বিশ্বের সকল ধনী রাষ্ট্রে দরিদ্র জনগণের কিছু অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন চাহিদা পূরণ হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রব্যসামগ্রীর যে সয়লাব বয়ে এনেছে, তা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। একটি সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকাশ লাভ করছে। মিশান এর ভাষায় সর্বত্র স্থিতি ও পরিমিতির বদলে অস্থিরতা ও অপরিমিতি বিরাজ করছে।[৫৪]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি এরূপ ক্রমাগত ধেয়ে চলা পুনর্বণ্টন লক্ষ্য অর্জনে যেমন সহায়তা করেনি, তেমনি অপরদিকে প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশ দূষণ বেড়েছে এবং অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হ্রাস পেয়েছে। ফলে উচ্চহারের প্রবৃদ্ধির ধারণাটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। World Commission on Environment and Development (ব্রান্ড-ল্যান্ড কমিশন) ১৯৮৭ সাল থেকে 'টেকসই' উন্নয়নের ধারণাটি জনপ্রিয় করে তুলেছে। টেকসই উন্নয়নের ধারণা আন্তঃপ্রজন্ম ও অন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়পরতাকে ক্ষুণ্ন না করে উন্নয়নের উপর জোর প্রদান করে। তবে ন্যায়পরতা ক্ষুণ্নকারী কিছু উপাদান, যেমন উচ্চমাত্রার মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার, ঋণ পরিশোধের পরিমাণ, দূষণ ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয় যদি বিবেচনায় আনা হয়, তবে 'টেকসই' উন্নয়নের কোনো উজ্জ্বল ছবির পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়।

অদূর ভবিষ্যতে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব নয়। আইএমএফ এর হিসেব অনুযায়ী ৯০ দশকের প্রথমার্ধে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ৩% হতে পারে।[৫৫] এ ধরনের অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে সামষ্টিক ও বৈদেশিক অন্যায়পরায়নতা ও পুনর্বণ্টন সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না। তাই সময়ের দাবি হচ্ছে কার্যকর নতুন কোনো কৌশল উদ্ভাবন।

(চ) পূর্ণ কর্মসংস্থান

দরিদ্র মানুষের অবস্থা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায় কর্মসংস্থানের হার উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধির লক্ষ্যও তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশসমূহে বেকারত্ব পরিণত হয়েছে এক অমোচনীয় সমস্যায়। ১৯৭০ সালে ইউরোপের ওইসিডি দেশসমূহে বেকারত্বের পরিমাণ ছিল জনসংখ্যার ২.৭%। ১৯৯০ সালে বেকারত্বের পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১% এ এসে দাঁড়ায়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৬ সালে বেকারত্ব ৯.৯% এর শিখরে পৌছায়।[৫৬] নিকট ভবিষ্যতে এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে মনে হয় না।[৫৭] ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিক থেকে সকল বড় শিল্পোন্নত দেশে Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫৮] সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে যুব সমাজের অস্বাভাবিক বেকারত্বের হার। কেননা বেকারত্ব বেকার যুবকদের আত্মসম্মানবোধকে আহত করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশা সৃষ্টি করে, সমাজ বিদ্বেষী করে তোলে এবং তাদের সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দেয়।[৫৯]

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রের হাতে একমাত্র বড় যে হাতিয়ারটি রয়েছে তা হচ্ছে উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি অর্জন। ইউরোপে বেকারত্ব বৃদ্ধি রোধের জন্য ৩.৫% প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৭৬ সাল হতে এক দশকের বেশি সময় ইউরোপের প্রবৃদ্ধির হার এ বেঞ্চমার্ক হারের কম। ১৯৭৮-৭৯ অর্থ বছরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু মধ্যবর্তী মেয়াদের জন্য প্রত্যাশা আশাব্যঞ্জক নয়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বৃদ্ধি রোধের জন্য ২.৫%-৩% প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.৭%। ১৯৯১ সালে এ হার আরো কম হবে বলে মনে হচ্ছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র যদি তার বাজেট ঘাটতি হ্রাসে অধিকতর দৃঢ় সংকল্প হয়, তবে প্রবৃদ্ধির হার আরো কমে বেকার- সমস্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে।[৬০] নিকট ভবিষ্যতে স্বল্প প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সতত শঙ্কা এবং বাজেট সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে পশ্চিমা বিশ্বের পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জনের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়।[৬১] এরূপ হতাশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে লুইস ইম্মেরিজের কণ্ঠে- "স্বল্প প্রবৃদ্ধির হার এবং ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সংখ্যা- এ সমীকরণের দু'দিককে মিলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য পূরণ বলতে গেলে এ এক অসম্ভব আশা"।[৬২]

কৌশলের ব্যর্থতা

পুঁজিবাদের সামাজিক-ডারউইনবাদী দর্শন হতে কল্যাণ রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে একটি শুভ উত্তরণ। অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে মানবসত্তা স্বাভাবিকভাবে পুঁজিবাদ সৃষ্ট বৈষম্যকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তিনশত বছরের সেকুলার মতবাদও বস্তুত মানবসত্তার মৌলিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। যাই হোক, কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানবতাবাদ হলেও এ লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর কৌশল উদ্ভাবনে এ মতাদর্শ ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত পুঁজিবাদী দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিতে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনয়ন করেনি। এ মতাদর্শের এমন কোনো কার্যকর কর্মসূচি বা প্রেরণা নেই, যা ইনসাফ অভিমুখী লক্ষ্যের পরিপন্থী সম্পদের অপচয়মূলক ব্যবহার রোধ করতে পারে। কল্যাণ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় একই পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে যা ধনী দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টির জন্য দায়ী। অর্থনৈতিক মৌলিক পুনর্গঠন ও কোনো সামাজিক দর্শন ব্যতিরেকেই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বাজারব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদের দক্ষ বিলিবণ্টনে সক্ষম হবে, বাজারব্যবস্থার সৃষ্ট বৈষম্যসমূহ সরকারের সক্রিয় ভূমিকা দ্বারা অপসারণ করা সম্ভব হবে–এ মর্মে যে ধারণা পোষণ করা হয়েছিল তা এক কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হয়েছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কিছুটা প্রশমিত করলেও সামগ্রিক দরিদ্র মানুষের মৌলিক প্রয়োজনও পূরণ হলো না। বিত্তশালী ও বিত্তহীনের ব্যবধান শুধু প্রকৃত আয়ের দিকেই নয়, বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গৃহায়ন সুবিধার প্রাপ্যতার দিকেও বাড়ছে। অবাক করার বিষয় হলো, জিডিপি'র উল্লেখযোগ্য অংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও (সুইডেনে ৯% এর উপর) গরীব ও বৃদ্ধরা ত্বরিৎ ও উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে না। হৃৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসা থেকে চোখের অপারেশনসহ অনেক গুরুতর ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ঔষধপত্রের দুর্মূল্য সত্ত্বেও ঔষধপত্র তৈরির বৃহৎ কোম্পানীসমূহের চাপের মুখে সরকার ট্রেডমার্ক ঔষধের স্থলে সমমানের অথচ স্বল্প মূল্যের জেনেরিক ঔষধ বাজারে প্রচলন করতে পারছে না।[৬৩]

যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে স্বাস্থ্যসেবা মূলত বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত, সেখানে জনসংখ্যার ১৩.৩% তথা ৩১.৩ মিলিয়ন আমেরিকান নাগরিকের কোনো স্বাস্থ্যবীমা নেই। এদের মধ্যে ৮.৬ মিলিয়ন হচ্ছে শিশু। দেশের প্রতি ছয়জন শিশুর একজন হচ্ছে এই শিশুরা।[৬৪] গৃহায়ন সুবিধা সবার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত গরীবদের নাগালে বস্তুত কোনো বাসস্থান সুবিধা নেই।[৬৫] অধিকাংশ গরীব মানুষ বাস করে ভাড়া বাড়িতে। গত দশকগুলোতে আয়ের চেয়ে বাড়ি ভাড়া দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলেজ শিক্ষার ব্যয় আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তথাকথিত সমান সুযোগের অর্থনীতিকে তামাশায় পরিণত করেছে। আরো নির্মম পরিহাস হচ্ছে যে, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা শুধু দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখছে না, বরং দারিদ্রকে চিরস্থায়ীত্ব প্রদান করেছে। খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এ সর্বগ্রাসী কৃষ্ণবৃত্ত হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে। বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ শক্তিধর ও বিত্তশালী অনেক দেশের লক্ষ-নিযুত মানবসন্তান পুঁতিগন্ধময় বস্তির অন্ধ গলিতে বন্দী হয়ে আছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের কথিত ছত্রচ্ছায়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে। মাতৃপিতৃ পরিচয়হীন শিশু, অপরাধ, মাদক, গ্যাং এবং হতাশা মিলিয়ে এ হচ্ছে এক দুঃস্বপ্নের জগৎ।

কল্যাণ রাষ্ট্রসমূহের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ন্যায়পরায়নতাপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে।[৬৬] বর্তমান বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কল্যাণ রাষ্ট্র সম্পদের দক্ষ ও সুষম বিলিবণ্টনে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যুক্তি দেখানো হয় যে, যদি কল্যাণ রাষ্ট্রের আবির্ভাব না হতো তবে নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থা সামাজিক বৈষম্যকে আরো তীব্রতর করে তুলত। এ কথা স্বীকার করে নিলেও কল্যাণ রাষ্ট্রকে তার বহুল স্বীকৃত ব্যর্থতার দায়ভার হতে অব্যাহতি দেয়া যায় না। কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যাণকর সমাজের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেলেও তার সকল কর্মসূচিই নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজস্বনীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানসহ কল্যাণ রাষ্ট্রের সকল অস্ত্র পরীক্ষা ও প্রয়োগ করা হয়ে গেছে। বস্তুত পূর্ণ কর্মসংস্থান বা কল্যাণমুখী সেবা সরবরাহে কল্যাণ রাষ্ট্রের সক্ষমতার বিষয়ে ব্যাপক আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে।[৬৭] আলবার্ট হির্চম্যান বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে, কল্যাণ রাষ্ট্র যে সংকটাপন্ন এ বিষয়ে আর কোনো বিতর্ক নেই।[৬৮]

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে ওইসিডি দেশসমূহের উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে অধিক হারে সরকারি ব্যয় সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক হতে নিম্নহারের প্রবৃদ্ধি ও উচ্চহারের বাজেট ঘাটতি কল্যাণমূলক কর্মসূচিকে ব্যাহত করে। ফলে নতুন হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অর্থায়নে ভাটা পড়ে। বর্তমান সুযোগ সুবিধার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় তা অদক্ষ হয়ে ওঠে এবং বাড়তি চাহিদা মেটাতে অবম হয়ে পড়ে। কল্যাণ রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে অধিক অর্থের যোগানই সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান হিসেবে দেখা দেয়। এমনকি বৃটিশ লেবার পার্টির মতেও অধিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য অধিক সরকারি ঋণ ও ব্যয় অত্যাবশ্যক হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৬৯] কিন্তু ট্যাক্স বা মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি না করে তা কী করে করা সম্ভব সেটা দেখাতে তারা ব্যর্থ হয়। বিশাল বাজেট ঘাটতি এবং তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রতিক্রিয়ার দরুণ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অধিক অর্থের যোগান দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সত্তর দশকের দুই অংকের মুদ্রাস্ফীতি পরিহারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল নিম্নমাত্রার সরকারি বাজেট ঘাটতি এবং ঋণ সংকোচন। কিন্তু ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিরূপ জনমতের প্রেক্ষিতে সরকারি ব্যয় হ্রাস ব্যতিরেকে ঘাটতি কমানো সম্ভব ছিল না।

শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল জাতীয় স্বার্থের নামে প্রতিরক্ষা ও তাদের স্বার্থের অনুকূল অন্যান্য খাতে ব্যয় হ্রাসে বাধা প্রদান করে। ফলে বেকার ভাতা, ন্যূনতম মজুরি, চিকিৎসা ভাতা ও অন্যান্য কল্যাণ সুবিধার মতো বহু সংখ্যক সামাজিক নীতি পুনর্বিবেচনার সম্মুখীন হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির এ দ্বন্দ্ব কল্যাণ

রাষ্ট্রকে সংকটে নিক্ষেপ করেছে। 'আজকের হালনাগাদ চিন্তাধারাটি হচ্ছে কল্যাণ রাষ্ট্রের ক্রমপ্রসার ও প্রবৃদ্ধি সম্ভবত আর সম্ভবও নয়, বা বলা যায় কাঙ্ক্ষিতও নয়'।[৭০] বস্তুত ৬৪টি দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রণীত হ্যারল্ড ইউলেনস্কির রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৭০ দশকে অনেক ধনী দেশে রাষ্ট্রীয় সেবা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে।[৭১]

রক্ষণশীল চিন্তার এ জোয়ার প্রায় সবগুলো কল্যাণ রাষ্ট্রকে প্লাবিত করে।[৭২] তবে অবশ্যই এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত। কেননা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যতিরেকে কোনো বড় মানবগোষ্ঠীর পক্ষেই তার মানবতাবাদী লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এমনকি পশ্চিমের পরিকল্পিত বাজার অর্থনীতির যে সাফল্য, তাও গড়ে উঠছে সেই কল্যাণমূলক সমাজের স্বপ্নের ভিতের উপর, যা কল্যাণ রাষ্ট্র সরবরাহ করেছে। তাই কল্যাণ রাষ্ট্রের চাকাকে দীর্ঘদিনের জন্য পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যদি জনপ্রতিনিধিদের সময়ান্তরে বারবার নির্বাচনের জন্য জনতার মুখোমুখি হতে হয়, তবে তারা জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে পারবে না। আর রাষ্ট্রের সক্রিয় কল্যাণমুখী ভূমিকা ছাড়া এসব প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব নয়। কল্যাণ রাষ্ট্র তাই উভয় সংকটে। তাহলে কি বলতে হবে, কোথাও কোনো ভুল রয়ে গেছে?

যুক্তি ভ্রান্তি

সমস্যা দেখা দেয়ার কারণ হলো অন্যান্য যে কোনো দেশের মতোই কল্যাণ রাষ্ট্রেরও একই ধরনের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি কল্যাণমূলক খাতে অধিক সম্পদ ব্যয় করা হয়, তবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতে কল্যাণ রাষ্ট্র যে বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তা হতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। শুধুমাত্র বাজার মূল্যব্যবস্থার উপর নির্ভর করে সম্পদের অর্থনৈতিক উপকরণ বা সম্পদের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের দাবিকে এমনভাবে হ্রাস করা সম্ভব নয়, যাতে সামাজিক লক্ষ্যসমূহ পূরণ অবিঘ্নিত থেকে যাবে। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়ে সামাজিক ঐকমত্য সৃষ্টি এবং তদানুযায়ী জনমত ও দাবিকে সেভাবে অনুপ্রাণিত করা। উক্ত সামাজিক ঐকমত্যের আলোকেই তখন বিভিন্ন খাতে কী হারে অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্র কাজ করে নৈতিক মূল্যবোধের বগ্লাহীন পুঁজিবাদী কাঠামোর আওতায়, যেখানে সামাজিক প্রয়োজন পূরণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের কোনো নৈতিক ঐকমত্য ভিত্তিক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নেই। অথবা সামাজিক ন্যায়নীতি, সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক ভারসাম্যের সাথে সংগতি রেখে ব্যক্তি ও দলসমূহকে তাদের দাবিদাওয়াকে সংযত ও বিন্যস্ত করার জন্য অনুপ্রাণিত করার কোনো নৈতিক ব্যবস্থাপনা নেই। পক্ষান্তরে, উচিত-অনুচিত এর মানদণ্ড নির্ধারণ না করার সেকুলার মতাদর্শ ও 'পেরিটো অপটিমালিটি'র কাঠামোর মধ্যে নীতি নির্ধারণ করার ফলে

সীমিত সম্পদের উপর সরকারি ও বেসরকারি খাতের চাহিদার বিপুল ও অপ্রতিহত চাপ সৃষ্টি হয়। দেদার বিজ্ঞাপন প্রচার এবং লোভনীয় কনজুমার ঋণের লভ্যতা সমাজের প্রতিপত্তি অর্জনের যে ইঁদুর দৌড় চলছে তাতে আরো ইন্ধন যুগিয়েছে। সর্বোচ্চ সুযোগ, বৈষয়িক সুবিধা ও ভোগ অর্জন জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়ায় কল্যাণ রাষ্ট্রের সেকুলার সমাজে জনগণের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি খাতে কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য ব্যাপক ব্যয়ের কারণে যে বিশাল রাজস্ব ঘাটতির সৃষ্টি হয়, তাতে সীমিত সম্পদের উপর চাপ আরো জটিল আকার ধারণ করে।

সীমিত সম্পদের উপর সরকারি ও বেসরকারি খাতের চাহিদার বিপুল চাপে কল্যাণ রাষ্ট্র ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। যদিও এরূপ দ্বিমুখী চাহিদা প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করল, কিন্তু পরবর্তীতে তা সম্পদের ও চাহিদার মাঝে বিরাট ব্যবধান গড়ে তুলল। অনেক দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে এ ব্যবধান প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ যেখানে বেইনসাফী অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে বাজেট ঘাটতি হ্রাস করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়। রিগ্যান ও থ্যাচারের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মোতাবেক বাজারব্যবস্থার উপর অধিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ কৌশলের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকার তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে কিছুটা সমর্থ হলেও তা হয়েছে সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিকে ক্ষতিগ্রস্থ করার মাধ্যমে। জনপ্রিয়তার নিরিখে এটা মিসেস থ্যাচারের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ নীতি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করে এবং জনগণের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি আর্থিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করেনি।

সুইডেনের মতো দেশ যেখানে জনগণের কল্যাণমুখী সেবার জন্য অধিকতর সুনাম রয়েছে, সেখানে উচ্চমাত্রার ট্যাক্স ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, অতিরিক্ত মাত্রার ট্যাক্স জনগণের কর্মসংস্থান, সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় সুইডেনে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার দ্বিগুণ। সুইডিস ক্রোনারের বিপুল অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে সুইডেনের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ শেয়ার মার্কেট সংকুচিত হচ্ছে এবং চলতি হিসাব ঘাটতি বেড়ে চলছে। বিশাল কর বেসরকারি সঞ্চয়কে দারুণভাবে ব্যাহত করছে। সুইডেনে বেসরকারি সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৮%। তার তুলনায় অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে এর হার ছিল ৯.৩%।[৭৩] ফলে সুদের হার বেড়ে যেতে বাধ্য, যা বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিকে আরো হ্রাস করে ভবিষ্যৎ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলবে। কিন্তু সরকারি ব্যয় হ্রাস ছাড়া ট্যাক্স কমানো সম্ভব নয়। অন্যথায় বাজেট ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই সবার

কাছে সহজতম পন্থাটি হচ্ছে কল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলোতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করা। তাই দেখা যায় নৈতিকতা নিরপেক্ষ কার্যপরিধির মধ্যে থেকে কর হার হ্রাস করা মূলত রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকাসমূহ হ্রাসের নামান্তর মাত্র।

পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের মতো দেশ যাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার মতো সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি, কিন্তু যারা কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যর্থ হয়েছে, তাদের সমস্যা ভিন্নতর। সমধর্মী আন্ত র্জাতিক সমন্বয়ের প্রয়োজনে তারা ঘাটতিবহুল দেশগুলোর চাপের সম্মুখীন হলো। এ চাপ উদ্বৃত্ত দেশসমূহকে দীর্ঘমেয়াদে তাদের সবল মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করল। প্রবল চাপের মুখে পশ্চিম জার্মানী ও জাপান উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ডিসকাউন্ট হার ১৯৮৭ সালে সর্বনিম্ন ২.৫% এ নামিয়ে আনতে হলো, যা ছিল ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে যথাক্রমে ৪.৫% এবং ৫%। ফলে উভয় দেশই অনাকাঙ্ক্ষিত মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও ফটকাবাজারী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। উভয় দেশকে তাই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে (পশ্চিম জার্মানী) এবং ১৯৯০ সালের আগস্টে (জাপান) ডিসকাউন্ট হার ৬.০% এ বৃদ্ধি করতে হলো। সুদের স্বল্প হারের এ সময়ে জাপানে স্টক ও রিয়েল এস্টেট বাজার শীর্ষে উঠে গেল যা দীর্ঘকাল ধরে রাখা সম্ভব হলো না। ঘাটতি দেশসমূহের অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং সবল মুদ্রা ও রাজস্বনীতি প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত দেশসমূহকে চাপের মুখে রাখার মাধ্যমে ঘাটতি দেশগুলোর তেমন কোনো উপকার তো হবেই না, বরং উদ্বৃত্ত দেশগুলোর সংকট বাড়বে। যেহেতু এ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, তাই সমৃদ্ধ অর্থনীতিসমূহও অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হলো। স্বল্পমেয়াদী ফটকাবাজারী লগ্নী পুঁজির স্থানান্তর তীব্রতা লাভ করল। ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও মুদ্রাবাজার পরিবেশ বিপন্ন হয়ে উঠল। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, পণ্য ও স্টক মার্কেটে অস্থিরতার সৃষ্টি হলো।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় চাহিদার নৈতিকতা-অনৈতিকতার বালাই না থাকায় একদিকে সার্বিক চাহিদার বিস্ফোরণ ঘটল, অন্যদিকে ঐ কাঠামোর মধ্যে থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রে গরীবের অবস্থার যথার্থ উন্নয়ন করতে না পারার সমস্যা আরো জটিলতর হলো। পুঁজিবাদের অগ্রহণযোগ্য ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে যেয়ে কল্যাণ রাষ্ট্রে সমভাবে অসমাধানযোগ্য নতুন সমস্যার জন্ম দিলো।[৭৪] সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে সবচেয়ে কম স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের যে প্রতিযোগিতা তারই নাম হলো সেকুলার পুঁজিবাদের সামাজিক-ডারউইনীয় দর্শন বা ব্যবস্থা। জোড়াতালি দিয়ে এ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের প্রচেষ্টার কারণে কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একদিকে কল্যাণ রাষ্ট্র কতিপয় মানবতাবাদী লক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছে, অন্যদিকে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক ডারউইনবাদ ও ভোগবাদ। আশার সঞ্চার করে পুনঃ নিরাশ করা কতিপয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়া ব্যতীত কল্যাণ রাষ্ট্রের উপযুক্ত দুটি

দিক দীর্ঘদিন পারস্পরিকভাবে সহাবস্থান করতে পারে না। এ ধরনের সমন্বয় ব্যবস্থা কতিপয় সমস্যার সমাধান করে, আবার অন্য কতকগুলো সমস্যার জন্ম দেয়। তাই সমাজ ও অর্থনীতির এমন মৌলিক পুনর্গঠন প্রয়োজন যাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কল্যাণ রাষ্ট্রের মানবতাবাদী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

অনেক চিন্তাবিদ বর্তমানে এ বাস্তবতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মরিস ক্রুসের ভাষায়, কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা কোনো রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তাভাবনা বা দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে জন্ম লাভ করেনি, কল্যাণ রাষ্ট্র কোনো সুপরিকল্পিত চিন্তার ফসল নয়। বস্তুত বিশেষ কতগুলো সমস্যার নিরসনে বছরের পর বছর ধরে যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তারই স্তূপীকৃত রূপ ব্যতীত কল্যাণ রাষ্ট্র আর কিছুই নয়।[৭৫] কল্যাণ রাষ্ট্রের দর্শন সম্পর্কে একই ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পিয়ীট থিয়োনেস, 'কল্যাণ রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কারো পক্ষে সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে এর প্রচার প্রচারণায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা একজন সমাজতন্ত্রীর কাছে কল্যাণ রাষ্ট্র অর্ধসমাজতন্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। আবার লিবারেলদের নিকটও এটি অর্ধ-লিবারেলিজম মাত্র'।[৭৬] সিডনী হুকের মন্তব্য হচ্ছে, "কল্যাণ রাষ্ট্রের পশ্চাতে যে সামাজিক দর্শন তা অপরিণত ও অস্পষ্ট"।[৭৭] বেরিংটনের ভাষায়, কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ এমনকি মৌলিক প্রশ্নগুলোরও অসম্পূর্ণ ও নেতিবাচক জবাব ছাড়া অন্য কিছু দিতে সক্ষম নয়। যেমন, কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ কী? কল্যাণ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কল্যাণের সংজ্ঞা কী? তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, 'একটি বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বসংকটের পর কল্যাণ রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে এমন অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় যখন সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে অবস্থা বিরাজমান তা কারো কাম্য নয়; তা হচ্ছে সংকট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, বেকারত্ব, একনায়কত্ব, খাদ্য বা প্রতিভার অপচয়। তাই দেখা যায়, নেতিবাচক লক্ষ্যসমূহই কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে'।[৭৮] মিরডাল তাই বলেন, 'কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্মসূচিতে সরকারি হস্তক্ষেপের যে ব্যবস্থা দেখা যায় তা মতাদর্শ নয় বরং ঘটনাচক্রেরই ফলশ্রুতি'।[৭৯] সম্ভবত এ কারণেই কল্যাণ রাষ্ট্র আর্থ-সামাজিক সংস্কারে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। কল্যাণ রাষ্ট্রের সুসংবদ্ধ ও সামাজিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ সমন্বিত একক কোনো দর্শন নেই, যার ভিত্তিতে কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে, যে কর্মসূচির প্রতিটি উপাদান ক্রমঃসামঞ্জস্যময় যা মানবতাবাদী লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম।

যে শক্তিসমূহ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের জন্ম দেয় ও তাকে অব্যাহত রাখে তা এতই শক্তিশালী যে, কল্যাণ রাষ্ট্রের সামাজিক কর্মসূচির জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থা দ্বারা তার অপনোদন সম্ভব নয়। কল্যাণ রাষ্ট্র দরিদ্রের পক্ষে আয়ের পুনর্বন্টনের জন্য পেছনের দরজা দিয়ে যে পরোক্ষ ব্যবস্থা রেখেছে, তা দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টিকারী আর্থ-সামাজিক শক্তিসমূহকে অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। দারিদ্র্যের জন্য দায়ী এসব শক্তিসমূহকে সরাসরি মোকাবিলা করা প্রয়োজন; লক্ষণসমূহের

বদলে সমস্যার মূল্যে আঘাত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আমূল সংস্কার এবং পুঁজিবাদ বা তার উন্নত সংস্করণ কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিতে যে জীবনবোধ তার আমূল পরিবর্তন। এর ফলে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধের মতো সামাজিক সমস্যাগুলো যা সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্রের আবির্ভাব সত্ত্বেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে তার সমাধান করা সহায়ক হবে।

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, চিন্তাবিদগণ চাইলেও কল্যাণ রাষ্ট্রের স্ববিরোধিতামুক্ত এক সুসংবদ্ধ দর্শন রচনা করতে পারতেন না। কেননা উপযোগবাদ বা ন্যায়নীতির সামাজিক চুক্তির মতবাদের উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক কল্যাণ দর্শন গড়ে তোলা কী সম্ভব? বিচার-বুদ্ধি, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক চুক্তির ধারণা কী আমাদের পেরিটো অপটিমালিটির অতিরিক্ত কিছু এনে দিতে পারে? এসব দর্শন সামাজিক ঐকমত্যভিত্তিক মূল্যবোধের বিজয় পতাকা তুলে ধরার জন্য মানুষকে জীবনমরণ পণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের রক্তবীজ বপন করে কল্যাণ রাষ্ট্রের সংকট পারস্পরিক সহযোগিতা ও অন্যের কল্যাণে স্বার্থ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। এসব গুণাবলীর উন্মেষ দাবি করে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠার তাগিদ এবং নিজের স্বার্থকে কেঁটেছেটে সীমিত সম্পদের উপর চাপ কমানোর মানসিক প্রবণতা।

ব্যক্তিস্বার্থ ও উপযোগবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে মূল্যবোধ ব্যবস্থা, তাতে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের অবকাশ অনস্বীকার্য। তাই মানব সমাজের মূল্যবোধের ভিত্তি হওয়া উচিত 'ভালো' বা 'মন্দ', 'অশুদ্ধ' বা 'ভুল' এরূপ সুস্পষ্ট সত্যের উপর, যাতে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। এরূপ হলে ধনীদের স্বার্থহানি করে দরিদ্রের উপকার ঘটলেও কেউ কোনো প্রতিবাদ করবে না। একটি সেকুলার সমাজ সামাজিক ব্যবস্থাপনার কোনো সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। মাইকেল নোভাকের ভাষায়, 'বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থময় একটি সমাজের মাথার উপর কোনো পবিত্র আচ্ছাদন নেই। এ ধরনের সমাজে এ ধরনের কোনো মনোগত ইচ্ছাই নেই। আধ্যাত্মিকভাবে এটা একটি শূন্য মন্দির। এ মন্দির এমনই অন্তঃসারশূন্য যে, কোনো শব্দ, প্রতিবিম্ব বা প্রতীকই আমাদের সবার কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়কে মূর্ত করে তোলে না'।[৮০] কেবলমাত্র ঐশী নির্দেশনাই যদি না থাকে, তবে বিলাস পরিহার ও সবার প্রয়োজন মিটাবার স্বার্থে সম্পদ ব্যবহারে ছাড় দেয়ার জন্য ধনীদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আর কিছু আছে কী?

আশার আলো

কালো মেঘের আড়ালেও থাকে আশার রজত রেখা। পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের সমালোচনামূলক ব্যবচ্ছেদে অর্থনৈতিক কালো মেঘের প্রান্তে আশার সে কিরণ দৃশ্যমান করে তুলছে। একমাত্র স্বার্থপরতাই মানবীয় কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে

ক্রিয়াশীল নয়– এ সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে মানব সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অনিবার্যতা ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মূলধারার সীমা ছাড়িয়ে তাই নানা চিন্তাধারা বিকশিত হয়ে উঠছে। এ সকল মতাদর্শ অবশ্যই প্রায় সমধর্মী, পার্থক্য হচ্ছে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়গুলোর বিভিন্নতায়। এ ধরনের তিনটি মতাদর্শ উল্লেখের দাবি রাখে।

একটি মতাদর্শের নাম হচ্ছে Grants Economics। স্বার্থহীনভাবে কাজ করা ব্যক্তিমানুষের যৌক্তিক আচরণ হতে একটি বিচ্যুতি-এ মতাদর্শ তা মনে করে না।[৮১] 'শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থে মানুষ কাজ করে'-এ ধরনের যুক্তি বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক চিত্র নয় মর্মে কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন। অর্থনীতিবিদ হান এর মতে, যৌক্তিক আচরণের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্র সম্ভবত ভুল করেছে। একজন মানুষ শুধুমাত্র পাই পাই আর্থিক লাভক্ষতির চুলচেরা হিসাব করেই চলবে এটা সম্ভবত ঠিক নয়।[৮২] সুতরাং এ কথাও বলা যায় যে, ভুল ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সঠিক তত্ত্ব নির্মাণ করা যায় না। প্রচলিত অর্থনীতিতে মানুষের আচরণের বিষয়ে ফ্রীডম্যান এর সাফাই সত্ত্বেও কিছু অর্থনীতিবিদ ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন।[৮৩] এটা বলা সম্ভবত যথার্থ হবে যে, যদি অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সূত্রের কাজ হয় মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে সঠিক ও অর্থপূর্ণ অনুমানে উপনীত হওয়া, তবে মানুষ স্বার্থপরতা নয়, পরার্থবাদের কাঠামোর মধ্যে থেকে অধিক যুক্তিযুক্ত আচরণ করবে-এ ধারণা করে নিলেই বরং অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে অধিক অর্থবহ পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব হবে। তাই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের নামে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যে মানবিক আচরণের উপাদানকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাকে যথাযথ স্থান দেবার জন্য Pareto Optimum-এর বিকল্প হিসেবে Boulding Optimum তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।[৮৪]

দ্বিতীয় চিন্তাধারাটি হচ্ছে, প্রয়োজন পূরণভিত্তিক মানবতাবাদী অর্থনীতি। এটি সকল মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।[৮৫]

শুধুমাত্র সম্পদের উপর প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের মতো গুরুত্ব আরোপের বদলে মানবতাবাদী অর্থনীতি প্রয়োজন পূরণে সন্তোষ ও মানবিক চেতনার উন্নয়নের উপর জোর প্রদান করে। যার লক্ষ্য হচ্ছে আব্রাহাম মাসলো এর ভাষায় 'আত্ম-উপলব্ধি' বা 'আত্ম-সম্পূর্ণতা'।[৮৬]

তৃতীয় মতাদর্শ সামাজিক অর্থনীতি মতাদর্শ হিসেবে অভিহিত। এ চিন্তাধারা নৈতিক বিবেচনার ছাঁচে অর্থনৈতিক তত্ত্বের পুনর্বিন্যাসে বিশ্বাসী।[৮৭] উদারনীতিবাদী দর্শন হতে অর্থনীতিবিদগণ নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি অঙ্গীকারের যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন, তা প্রকৃত যুক্তির ধোপেও টেকে না এবং প্রত্যাশার প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডেও উতরে যায় না। এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কেননা অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ

তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত রচিত কতকগুলো প্রাক-পক্ষপাতিত্বমূলক অনুমানের উপর। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত, কেননা এ কথিত অনুসন্ধান সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে না। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ একটি শাস্ত্র কখনো জনগণের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে নীতিমালা ও সুপারিশ প্রণয়নে সফলতা লাভ করতে পারে না। অধ্যাপক সেন তাই যথাযথভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'অর্থনীতিকে নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্নকরণের ফলে কল্যাণ অর্থনীতির সমৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে এবং একই সাথে তা বর্ণনামূলক ও পূর্বাভাসমূলক অর্থনীতির ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে। উপসংহারে তিনি বলেছেন যে, মানুষের আচার আচরণ ও বিচারবোধে যে নৈতিক বিবেচনা চালিত হয়, তার প্রতি যদি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করা হতো, তবে অর্থনীতিকে অধিকতর সমৃদ্ধশালী, দক্ষ ও কল্যাণকর শাস্ত্রে পরিণত করা যেত।[৮৮] সমস্যা হলো মূল্যবোধ হচ্ছে এমন চেতনাময় একটি প্রপঞ্চ যা বস্তুগত প্রকরণের মতো বিজ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত বা নির্ণয় করা যায় না। আর্নল্ড ব্রেখটস এর ভাষায়, 'মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যারা বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্বের দাবি করেন, তারা যে ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত তা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই দেখানো যায়'।[৮৯] যদি মূল্যবোধকে 'বৈজ্ঞানিক পন্থায়' নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, যদি 'বিচারবোধ'কে প্রয়োগ করতে হয়, সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এ বিচারকের ভূমিকা কে পালন করবে?

এ ক্ষেত্রে কী কোনরূপ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এমন একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য হবে যথেষ্ঠ শক্তিশালী এবং যে কেউ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করলে নিন্দিত হবে।

'আত্মস্বার্থ' ও 'অর্থনৈতিক মানুষ' সংশ্লিষ্ট ধারণার বিলোপ সাধিত হচ্ছে এবং চাহিদা পূরণ ও মূল্যবোধ বিচার সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ ঘটছে। এতে দেখানো হচ্ছে যে, মানুষ বৈষম্যের মধ্যে বসবাস করবে না। মানুষ তার যুক্তিবোধ উন্নত করতে, সমস্যার বিশ্লেষণ করতে এবং ভ্রান্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম; যেটি সহজ নয়– সেটি হচ্ছে সমস্যার সমাধান। কোনো প্রকার জোড়াতালি বা কৃত্রিম পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয়। সমাধান নিহিত রয়েছে সার্বিকভাবে সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এরূপ পুনর্গঠনের মধ্যে, যাতে একদিকে 'অর্থনৈতিক মানুষ' পরিণত হবে 'নৈতিকভাবে সচেতন' মানুষে, যিনি ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আর্থ-সামাজিক সুবিচারের মাধ্যমে জীবনযাপনে আগ্রহী; অপরদিকে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে সকলের চাহিদা পূরণ হবে, অথচ আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি করবে না, বরং তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে।

যদিও মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপের পুনর্জাগরণের বিষয়টি প্রশংসনীয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের অর্থনীতিতে তার প্রয়োগ একটি দুরূহ কাজ। প্রধান কথা হচ্ছে, গলব্রেইথ এর মতে, 'প্রচলিত ধারণার প্রতি রয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গীকার'– যাতে অর্থনীতিকে দেখা হয় একটি বিজ্ঞান হিসেবে এবং তারা বৈজ্ঞানিক ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিক বিশুদ্ধতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১০] ধর্ম প্রদত্ত ঐকমত্য ব্যতীত মূলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে গত দু'দশকে পাশ্চাত্যে নিরপেক্ষ মূল্যবোধ ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকারের ধারণা বহুদূর এগিয়ে গেছে। স্কাডউইচ যথার্থই বলেছেন, সামাজিক নৈতিকতা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্মত মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল, যা স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত বিধায় খুব একটা বিতর্কের অবকাশ রাখে না। ব্যতিক্রমধর্মী কিছু লোক ছাড়া মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে নৈতিকতা কখনোই ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি।[১১] উপযোগবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেনি। পাশ্চাত্য জগত সম্পর্কে মিনস্কি মজার কথা বলেছেন, 'আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের ঐকমত্য নেই,[১২] কোনো প্রকার সম্মত মূল্যবোধ ছাড়া এরূপ ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন'।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (তৃতীয় অধ্যায়)

১. Michael Prowse, "The Isolation of the Individual", *Financial Times,* 4 May 1989, P. 111 of Suppliment on "Audit of Revolution".

২, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নমুনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষার জন্য দেখুন, Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective". *Archives Europeenes de Sociologie* (1961), আরো দেখুন Richard Titmus, "*Essays on the Welfare State*" (1963); Maurice Bruce, *The Coming of the Welfare State* (1966) এবং David Marsh, *The Future of the Welfare State* (1964).

৩. A. H. Halsey,"Some Lessons from the Debates", in OECD, *The Welfarte State in Crisis* (1981), p. 15.

৪. Richard M. Titmus, *Commitment to Welfare* (1976), P. 24, আরো দেখুন, D. Arnold Hancock and Gideon Sjoberg, *Politics in the Post Welfare State* (1972), P.3; and Norman Furniss and Timothy Tilton, *The Case for the Welfare State: from Social Security to Social Equality* (1977), pp. 14-21.

৫. Harry K. Girvetz "Welfare State", *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (1968), Vol. 16, p. 515.

৬. Neil Gilbert, *Capitalism and the Welfare State; Dilemmas of Social Benevolence* (1983), p. 47.

৭. Peter Saunders and *Friedrich Klau, The Role of the Public Sector: Causes and Consequences of the Growth of Government* (1985), P. 25. 1947 সালের Beveridge Report যা বৃটেনের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান

করেছিল, তাতেও এ মতে সম্মত করা হয় যে, সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কল্যাণ সেবা লভ্য হওয়া উচিত।

৮, দেখুন Ralph Millhand, *The State in Capitalist Society* (1969), and Edward S. Greenberg, *Serving the Few* (1974), p. 20.

৯. "সলোমন ব্রাদার্স" নামক একটি প্রভাবশালী ওয়ালস্ট্রিট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক জুন, ১৯৮৭ এ প্রকাশিত এক হিসাব মতে ১৯৮০ সাল হতে বিশ্বব্যাপী কমপক্ষে ৫৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং আরো ২০০০টি ১৯৯০ সালের মধ্যে বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে দেখুন (Guy de Jonquieres, "Privatisation: Trusting the Market", *Financial Times*, 16 September 1987, Section III. p.1)

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮

১১. Simon Holberton. "A Turning Point in Privatisation", *Financial Times*, 6 November 1988, p. 3; আরো দেখুন, Richard Hemming and Ali M. Mansoor, *Privatisation and Public Enterprise* (1988), p. 7.

১২. Philip Bassett, "Britain's Trade Unions: At War with a Wasting Disease", *Financial Times*, 28 August 1986.

১৩, দেখুন প্রাগুক্ত এবং আরো দেখুন, "Unions: Declining Force, Increasing Power", *The Economist*, 14 February 1987. p. 35. বর্তমানে জাপানী শ্রমিকদের মাত্র ২৭% ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত, যা ১৯৪৮ সালের তুলনায় অর্ধেক মাত্র, (Japan: "All Together Now". *The Economist*, 30 September, 1989, p. 67)

১৪, দেখুন James O' Connor, *The Fiscal Crisis of the State* (1973), p. 138; Greenberg. p. 199: and John K. Galbraith, *The New Industrial State* (1972), p. 288.

১৫. Philip Bassett, "The Spectre Refuses to Rise Again", *Financial Times*, 2 June 1987.

১৬. IMF, *International Financial Statistics* এ যুক্তরাষ্ট্রের উপর আলোচনার জন্য দেখুন পাতা ৬৪ ও ৬৫ এবং "Flat Wages in America", *International Herald Tribune*, 8 September, 1987; আরো দেখুন Albert E. *Rees, Wage Inflation* (1957), pp.27-8.

১৭. IMF, *International Financial Statistics* (Yearbook for 1989 and July 1990) পুস্তকে প্রদর্শিত যুক্তরাষ্ট্রের কনজ্যুমার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে হিসাবকৃত এবং তদানুযায়ী পরবর্তী সময়ের হিসাব নিরূপিত।

১৮. Saunders and Klau, *The Role of the Public Sector* (1985), Table 1, p. 29 হতে ১৯৬০ সনের উপাত্তসমূহ নেয়া হয়েছে। *OECD Economic Outlook, 47.* June 1990 হতে পরবর্তী বছরসমূহের উপাত্তগুলো নেয়া হয়েছে।

১৯. ১৯৪০ সনের উপাত্তসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরীপ ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত *Statistical Abstract of the United* States, 1986, p. 305, 410 হতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী বছরসমূহের উপাত্তসমূহ নেয়া হয়েছে *OECD Economic Outlook,* 47, June ১৯৯০ হতে।

২০. Saunders and Klau, The Role of the Public Sector (1985). pp.11-26.

২১. "John Burton, *Why No Cuts: An Inquiry into the Fiscal Anarchy of Uncontrolled Government Expenditure* (1985), p. 86.

২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮।

২৩. "Retooling without Ruin'', a *New York Times* editorial reproduced in the *International Herald Tribune,* 23 March 1990. p. 4.

২৪. OECD, *National Policies and Agricultural Trade* (1988) cited by the *Financial Times* in an editoroal, "High Cost of Farming'', 20 May 1988, p. 18.

২৫. দেখুন Peter Montagnon *et al.,* "Governments Held to Ransom" *Financial Times,* 14/15 July 1990.

২৬. "High Cost of Farming", *Financial Times,* 20 May 1988, p. 18.

২৭. Saunders and Klau, The Role of the Public Sector (1985), Table 1, p.29: and OECD; *Revenue Statistics of OECD Member Countries,* 1965-89 (1990), Table 1.

২৮. Saunders and Klau, the Role of the Public Sector (1985), p. 29; and *OECD, Economic Outlook, 47,* June 1990, pp. 15 and 194.

২৯, সরকারের সাধারণ সুদ পরিশোধের জন্য দেখুন *Government Financial Statistics Yearbook*, 1989, pp. 74-5; OECD দেশসমূহের সরকারি খাতের ঋণের বিষয়ে দেখুন OECD, *Enonomic Outlook, 47* June, 1990, p. 119. সুদের হারের বিষয়ে দেখুন IMF, *International Financial Statistics* এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুদের হার অংশ।

৩০. Julian Le Grand, *The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Services* (1982), pp. 31,7 and 137.

৩১. Richard M. Titmuss, *Commitment to Welfare* (1976), p. 196.

৩২. Gilbert (1983), p.73.

৩৩. Greenberg, (1974), p. 203 দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবার জন্য Medicaid ফেডারেল ও রাজ্য ফান্ড সরবরাহ করে। Medicaid ৬৫ বয়সোর্ধ আমেরিকানদের জন্য কিছু চিকিৎসা সেবা সরবরাহ করে।

৩৪. Greenberg (1974), p. 181.

৩৫. Witt. S. F. and Newbould G. D., "The Impact of Food Subsidies," *National Westminster Bank Quarterly Review,* August 1976, pp. 29-36.

৩৬. 'Gyorgy Szakoczai, "Limits to Redistribution: The Hungarian Experiencce," in D. Collard, R. Lecomber and M. Slater (eds.), *Income Distribution: The Limits to Redistribution* (1980), pp. 206-35. আরো দেখুন, Maksymilian Pohorille, "Collective Consumption in Socialist Countries: A Theoretical Approach", in R.C.O. Mathews and G. B, Stafford. *The Grants Economy and Collective Consumption* (1982), p. 77

৩৭. Julian Le Grand, "Who Benefits from public Expenditure?" *New Society*, vol. 45, No. 833.1978, pp. 77.

৩৮. Henry C. Simous, *Personal Income Taxation* (1938), p. vi and 29.

৩৯. Joseph A. Pechman, *The Rich, the Poor and the Taxes They Pay* (1986), p. 59.

৪০, Paul J. Strayer, "The Individual Income Tax and Income Distribution", *American Economic Review*, vol. 45, No. 2, pp. 430-1.

৪১, উদাহরণস্বরূপ দেখুন, B. I. Page, "Why Doesn't the Government Promote Equality" in Robert A. Solo and Charles W.Anderson, *Value Judgement and Income Distribution* (1981), p. 83; Joseph A. Pechman and Benjamin A. Okner, *Who Bears the Tax Burden?* (1974), pp., 49 and 56; and Joseph A. Pechman. "The Rich, the Poor and the Taxes They Pay", *The Public Interest*, Fall 1969.

৪২. Pechman (1986)

৪৩. John Plender, "World Tax Reform: Another Wave of Change Ahead", *Financial Times,* 13 March 1987.

৪৪. "Sweden's Economy", *The Economist,* 7 March 1987, pp. 23-4.

৪৫. Joseph A. Pechman, *World Tax Reform: The Progress Report* (1988). p. 1. অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের কর সংস্কারের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় দেখুন।

৪৬. S. Danziger, P. Gottschalk and E. Smolensky, "American Income Inequality: How the Rich have Fared", *American Enonomic Review,* May 1989, pp. 310-14; and Isabell V. Sawhill, Proverty in the U.S.: Why is it So Persistent?" *Journal of Economic Literature,* September 1988, pp. 1085 and 1113.

৪৭. *Statistical Abstract of the United States,* 1988, Table 713, p. 433.

৪৮. Data for 1980 are from IBRD, *World Development Report,* 1989, Table 30, p. 223, While Those For 1986 are from *Statistical Abstract of the*

United States, 1988, Table 70, p.428. For Comparison With 1973, 1979, 1982, and 1087, see Danziger, *et al.* (1989), p. 311.

৪৯. Reported by Michael Wines, "Rich in U.S. Get Richer: Study Finds", *International Herald Tribune,* 28 July 1986, p. 3. For a comparison with other countries. see Alan Harrison, *The Distribution of Income in Ten Countries (1979).*

৫০, দেখুন IBRD *World Development Report,* 1980-1989. Tables 24 (P.157) and 30 (p. 223) respectively.

৫১. Richard M. Titmuss, *Commitment to Welfare* (1976), p. 164.

৫২. C. A. R. Crosland, Socialism Now (1974).

৫৩. ৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত Bretton Woods Committee এর বার্ষিক সভায় Paul Volcker, Helmut Schlesinger, Rimmer de Vries এবং সিনেটর Paul Sarbeans সভায় কতিপয় বক্তা মন্তব্য করেন যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহের চলমান প্রবৃদ্ধির স্বল্পহার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির সমন্বয় ও প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়; বরং তা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রযোজ্য (দেখুন *আইএমএফ সার্ভে,* ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২১

৫৪. E. J. Mishan, *The Costs of Economic Growth* (1973), p. 204.

৫৫. IMF, *World Economic Outlook*, May 1990, Table 5, p. 31 and Table A51, p. 197.

৫৬. *OECD Economic Outlook*, 47 June 1990, Table R19, p. 199; and *OECD Press Release on Standardized Unemployment Rates,* 21 March 191.

৫৭. *OECD Economic Outlook, 47*, June 1990, Table 9, p. 23.

৫৮. Charles Adams, Paul Fenton and Flemming Larson, "Differences in Employment Behaviour among Industrial Countries", IMF, *Staff Studies for the World Economic Outlook,* July 1986, p. 6.

৫৯, যুব বেকারত্বের উর্ধহারের বিষয়ে দেখুন OECD Employment Outlook (1987), Table 2.3; Commission of the European Communities, *European Economy,* Supplement A on Highlights on Employment and Unemployment, December 1989, Table 5, p. 4.

৬০. দেখুন, *OECD Economic Outlook*, 44, (June 1990), op. cit., pp. 1 and 181: and IMF, *World Economic Outlook*, May 1990, p. 31. আরও দেখুন Samue Brittan. "Time to Tackle the Euro Malaise". *Financial Times,* 22 June 1987, p. 19. BIS এর মতে দুর্যোগ পরিহার করে প্রধান শিল্পোন্নত দেশসমূহ যে প্রবৃদ্ধির হার আশা করতে পারে তা' হবে ২.৫% এর মত (BIS, 59th Annual

Report, June 1989, p.3. IMF, *World Economic Outlook,* 1 May 1990, Table 1.

৬১. দেখুন, Morgan Guarantee Trust Co. of New York, *World Financial Markets* , June/July 1986, p. 5.

৬২. Louis Emmerij, "The Social Economy of Today's Employment Problem in Industrial Countries", in *Unemployment in Western Countries* (1980), p. 58.

৬৩. দেখুন" "Sick Health Services: Europeans Seek the Right Treatment'', *The Economist,* 16 July 1988. p. 17-20.

৬৪. *Statistical Abstract of the United Statges*, 1988, p. 92.

৬৫. "The Stretching of the Middle Class'', *The Economist*, 17 September 1988, p. 54.

৬৬. Lindemann আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন যে, যদিও পশ্চিমা সম্পদের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সম্পদের বিতরণের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। গণতান্ত্রিক কাঠামো, গঠন ও নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক রূপ যাই হোক না কেন, বস্তুত একটি ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে (Albert S. Lindemann, *A History of European Socialism*, (1983)-পৃষ্ঠা ৩৫১-৫২)।

৬৭. Halsey, in OECD, *The Welfare State in Crisis* (1981) p. 17.

৬৮. Albert O. Hirschman, "The Welfare State in Trouble, Systematic Crisis or Growing Pains'', *American Economic Review,* May 1980, p. 113.

৬৯. Philip Stephens (1987)

৭০. Bernard Cazes, "Welfare State: A Double Bind'', in OECD, *The Welfare State in Crisis* (1981). p. 151.

৭১. Harold Wilensky, *The Walfare State and Equality* (1975), p. 47.

৭২. Ruud Lubbers, the Dutch Prime Minister, "Beyond the Welfare State," an interview by Laura Rann, *Financial Times*, 15 December 1986, p. 6.

৭৩. Bank for International Settlements, *59th Annual Report,* June 1989, p. 32.

৭৪. দেখুন Claus Offe, *Contradictions of the Welfare State,* ed., John Keane (1984), pp. 35-7.

৭৫. Maurice Bruce, *The Comming of the Welfare State* (1968), p. 13.

৭৬. Piet Thoenes, The Elite in the Welfare State (1966), p. 133.

৭৭. Sidney Hook, "Welfare State–A Debate that Isn't'', in C. I. Schottland (ed.*), The welfare State* (1967), p. 165.

৭৮. Piet Thoenes (1966), p. 133; Barrington Moore, *Reflections on the Causes of Human Misery* (1972).

৭৯. Gunnar Myrdal, *Beyond the Welfare State* (1960).

৮০. Michael Novak, *The Spirit of Democratic Capitalism* (1982), p. 53.

৮১. Janos Horvath, "Forewor" in Robert A. Solo and Charles W. Anderson (eds.), *Value Judgement and Income Distribution* (1981), pp. ix-x.

৮২. Frank Hahn and Martin Hollis (eds.), *Philosophy and Economic Theory* (1979), p. 12.

৮৩. ফ্রিডম্যান বলেন, সত্যিকারভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ, 'হাইপোথিসিস'সমূহ এমন সব অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিতই করে না। বরং বলা যায় যে, থিওরী যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তার ভিত্তিমূলের ধারণাগুলো ততবেশি অবাস্তব।" (Milton Friedman. "Methodology of Positive Economics", in Hahn and Hollis (1979). প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

৮৪. Solo and Anderson (1981), p .x.

৮৫. M. A. Lutz and K. Lux, The *Challenge of Humanistic Economics* (1979), p. ix.

৮৬. Abraham Maslow, *Motivation and Personality* (1970).

৮৭. Masudul Alam Choudhury, "The Micro-Economic Foundation of Islamic Economics : A Study of Social Economics, "*The American Journal of Islamic Social Sciences* (1986), p. 237.

৮৮. Amartya Sen, On *Ethics and Economics* (1987).pp.78 and 9.

৮৯. Cited by Solo in the "Introduction to Solo and Anderson" (1981). p. 1.

৯০. John K. Galbraith, *Economics in Perspective* (1987), p. 284.

৯১. Owen Schadwick, *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century* (1975), pp. 229 and 234.

৯২. Hyman P. Minsky, *Stabilising an Unstable Economy* (1986), p. 290.

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন অর্থনীতির অসংগতি

উন্নয়ন অর্থনীতির নিজস্ব কোনো স্বরূপ নেই। তিনটি মূলধারার অর্থনীতির (নিউক্লাসিক্যাল, কীনেসীয়ান ও স্যোসালিস্ট) যে কোনো বাড়তি অঙ্গ হিসেবে এটা বেড়ে উঠেছে। অর্থনীতির এ তিন ধারাই পশ্চিমা বিশ্বে জন্ম নিয়েছে। তাই উন্নয়ন অর্থনীতির প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ এ পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টির আঙ্গিকে রচিত। যে সময়ে মূলধারার অর্থনীতির জোয়ার বইছিল তারই আবহে বেড়ে উঠেছে তৎকালীন উন্নয়ন অর্থনীতির ধারা। উন্নয়ন অর্থনীতির ধাঁচ তাই কীনেসীয়ান, স্যোসালিস্ট ও নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির উত্থানপতনের দোলাচলে বারবার বাঁক নিয়েছে।

দোদুল্যমান আনুগত্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়ন অর্থনীতির জন্ম। এ সময় তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐসব উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের সমস্যাসমূহ সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে।[১] Economic Development and Cultural Change নামে উন্নয়ন অর্থনীতির উপর প্রথম জার্নালের প্রথম সংখ্যা ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এ সময়ে এ বিষয়ের উপর হাতে গোনা গবেষণামূলক কতিপয় লেখা ছিল।[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মহামন্দা এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমস্যার কারণে কীনেসীয় অর্থনীতি এবং সমাজবাদ পশ্চিমে গুরুত্ব লাভ করেছিল। উন্নয়ন অর্থনীতিও নিওক্লাসিক্যাল ভিত্তি হতে সরে আসছিল এবং বাজার শক্তির উপর কম নির্ভরশীলতা ও অর্থনীতিতে সরকারের অধিকতর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিল। যাই হোক, ৭০ দশকের প্রথম ভাগে কীনেসীয়ান ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কৌশলের মুঠি শিথিল হয়ে আসলো এবং নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি আবার মঞ্চে ফিরে আসলো। উন্নয়ন অর্থনীতি প্রবেশ করলো এক সংকট সন্ধিক্ষণে। তাই উন্নয়ন অর্থনীতির উপর সমকালীন লেখাসমূহ আত্মসংশয় ও প্রশ্নবাণে বিদ্ধ।[৩]

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ এখনো উন্নয়ন অর্থনীতির উপযোগিতায় বিশ্বাসী, তবু কেউ কেউ এ একাডেমিক বিষয়টির বৈধতার প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।[৪] বিতর্কটি মেরুকরণ লাভ করছে। মনে করা হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে বাজার শক্তিসমূহের সমস্যার সমাধানের পথ হচ্ছে বাজার শক্তিসমূহকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া ও অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ হ্রাস করা। অন্য দলের চিন্তাবিদদের মত হচ্ছে, বাজারব্যবস্থা ও মূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার পদ্ধতি সঠিক নয়। তবে বর্তমানে প্রভাবশালী মত হচ্ছে, বাজারমুখী এবং নিয়ন্ত্রণ বিরোধী ব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্বে উদার মতবাদ ও নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পুনর্জাগরণের

নির্দেশক। উন্নয়নশীল দেশসমূহ বর্তমানে যেসব সমস্যায় ভুগছে তার অধিকাংশের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিকে দায়ী করা হচ্ছে যা তিন দশক যাবত অনুসরণ করা হয়ে আসছে। সীমিত সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার, বৃহৎ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বহির্বাণিজ্যে অন্যায়পরায়নতা, সম্পদ ও আয়ের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বা সামাজিক টানাপোড়েন– এসব কিছুর জন্যই নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতিকেই দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বাজার অর্থনীতি ও রাষ্ট্র অর্থনীতির মধ্যে উন্নয়ন অর্থনীতির দোদুল্যমানতা একে সুদৃঢ় লক্ষ্য পথ হতে বিচ্যুত করেছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর বিরোধী বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশ। অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে উদ্ভব হয়েছে অসংগতি ও অনিশ্চয়তা। এসব দেশকে এখন যেসব কাজ করতে হবে তা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের অর্থনীতির উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে সীমিত সম্পদের ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও ক্ষমতা নিশ্চিত হয়। উপরন্তু ভুল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে যে অসংগতি ও অন্যায়পরায়নতা সৃষ্টি হয়েছে তা অপসারণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির আলোকে যে নতুন নীতিমালার ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হচ্ছে তাতে আকাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, ন্যায়পরায়নতা ও স্থিতিশীলতা আসবে কিনা? তাই বিশ্বদৃষ্টি উন্নয়ন অর্থনীতির উপর কী ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং কী সমস্যার জন্ম দিয়েছে তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

নিওক্লাসিক, কীনেসীয়ান এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শিকড় রয়েছে রেঁনেসা উদ্ভূত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। মানব সমস্যার বিশ্লেষণ এবং মানব কল্যাণের উদ্দেশ্য সাধনে উপযুক্ত অর্থনৈতিক চিন্তাধারাসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সেকুলার। মানুষের সুখ ও স্থিতির উৎস হিসেবে এসব চিন্তাধারা বৈষয়িক লাভকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ পুনর্গঠনে নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বরং তারা বাজার অর্থনীতি বা রাষ্ট্রের ভূমিকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। মানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং আর্থ-সামাজিক সুবিচারের ধারণার সাথে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কোনো মানসিক সংগতি ছিল না। নৈতিক মূল্যবোধ কীভাবে সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সামাজিক ছাঁকনি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের ধারণা ছিল না। সম্পূর্ণভাবে এই বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বভাবতই সামাজিক-ডারউইনবাদ এবং বস্তুবাদের ফসল ব্যতিরেকে অন্য কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ কাঠামোর কারণে নিজেকে সামাজিক প্রয়োজন পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কোনো উদ্দীপনা কাজ করতে পারে না। অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক স্বার্থরক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের পরোক্ষ ফসল হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারে।

নিরাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

উন্নয়ন অর্থনীতিবিদের সামাজিক-ডারউইনীয় এবং উচ্চতর বর্ণ ও জাতিসত্তার তত্ত্বের প্রতি যুক্তিহীন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা মূলত অশ্বেতাঙ্গ ও অইউরোপীয় দরিদ্র দেশসমূহের দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন ও রাজনৈতিক গোলামীর কার্যকারণকে ঐসব দেশ ও জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জাতিসত্তার তথাকথিত নিম্নমানের ফসল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে উন্নয়ন সম্পর্কে এক ধরনের নিরাশা জন্ম লাভ করেছে।[৫] যুক্তি দেখানো হয় যে, এ দেশসমূহ উন্নয়নের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করেনি। এ দেশসমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহকে উন্নয়নের উপর্যুক্ত পূর্বশর্তসমূহ বিনির্মাণের অনুপযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি জাতিসংঘের একটি কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি রিপোর্টেও এ ধরনের যুক্তিহীন উচ্চতর বর্ণ ও জাতিসত্ত্বা কেন্দ্রিক মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে। ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পাশ্চাত্যেও পুঁজিবাদী দেশসমূহের অনুসরণে দরিদ্র দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত কাঠামোর সংস্কার সাধন করা না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৬] বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের মাঝেও একই ধরনের অভিমত প্রচলিত যে, কেবলমাত্র উন্নত দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন ও কাঠামো অনুসরণের মাধ্যমেই দরিদ্র দেশের পক্ষে পুঁজি গঠন, উৎপাদন ও ভোগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। 'পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে রচিত বিশ্ব ব্যাংকের ১৩টি রিপোর্ট পড়ে কিন্ডেলবার্জার এবং স্পেঞ্জলার এ ধারণাই লাভ করেছেন।[৭] এদের মধ্যে সবচেয়ে চাঁচাছোলা বক্তব্য দিয়েছেন ইউজিনি স্টেলের; তিনি বলেছেন যে, কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমেই দরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়ন সম্ভব। এসব দেশকে পশ্চিমের মূল্যবোধ ও সমাজ কাঠামো গ্রহণ করতে হবে।[৮] এমনকি পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বর্ণবাদী অর্থনীতিবিদ মিরডালও মনে করেন উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী, যা 'আধুনিক ধ্যানধারণা' নামে অভিহিত, তা দরিদ্র দেশসমূহের নিকট 'বিজাতীয় ও ভিনদেশী'।[৯] তাই দেখা যায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ধারণার অনুসৃতি ব্যতিরেকে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এ আধুনিকতা মানে শুধমাত্র আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনার কৌশল গ্রহণই নয়, বরং পশ্চিমা জীবন পদ্ধতি ও বস্তুবাদী মূল্যবোধের আত্মীকরণও।

প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্তসমূহের 'অনুপস্থিতি তত্ত্বের' উপর অগ্রহণযোগ্যভাবে অত্যধিক জোর প্রদান উন্নয়ন সাহিত্যে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ধারণাকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছে। নার্কস একে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'বৃত্তাকার শক্তিসমূহ একে অপরের উপর এমনভাবে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে যাতে একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্রই থেকে যায়– একটি দেশ দরিদ্র থাকার কারণ এটি দরিদ্র"।[১০] 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ধারণাটি এমন সংক্রামক রূপ লাভ করে যে, প্রত্যেক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদই এ ধারণার জীবাণু দ্বারা

সংক্রমিত হয়ে পড়েছে।[১১] অত্যধিক জনসংখ্যা, স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ, স্বল্প রপ্তানি ও স্বল্প প্রবৃদ্ধির দুষ্টচক্র অতিক্রম করা দরিদ্র দেশগুলোর জন্য সম্ভব হবে না, যেহেতু এগুলো সৃষ্টি হয়েছে 'আধুনিক ধ্যানধারণা'র অভাবে– এ ধারণাটিই প্রসার লাভ করেছে। তাই এ দেশগুলো নার্কস কথিত 'অনতিক্রমনীয় নিম্নমাত্রার ইক্যুইলিব্রিয়ামের' ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে থাকবে। এমনকি ভোগকে সংকুচিত করে তারা যেটুকু সঞ্চয় করে, তাকেও তারা পুঁজিতে পরিণত করতে পারে না। কারণ পুঁজিতে পরিণত করার মাধ্যম রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধিতে তারা অক্ষম। এ দেশগুলো দু'টি ঘাটতি পূরণে অক্ষম- সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং আমদানি-রপ্তানি ঘাটতি। ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে পরিত্রাণের আশা এদেশগুলোতে সুদূর পরাহত।

'প্রবৃদ্ধির ধাপ (Stage of growth) তত্ত্বও অন্তর্নিহিতভাবে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' তত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়।[১২] এ তত্ত্বগুলোতে উন্নয়নের জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলোকে ধরা হয়, তা উন্নয়নের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যেতে বাধা দেয়। বাধা ও অনগ্রসরতার চক্রটি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। উন্নয়ন অর্থনীতি সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখাতেই আমরা দেখতে পাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিরাজ করছে এক ধরনের গভীর হতাশা।[১৩] যেহেতু পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও ধরন ব্যতীত অন্য যে কোনো জীবনব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে ধরে নেয়া হয়েছে উন্নয়নের পরিপন্থি হিসেবে, তাই দরিদ্র দেশসমূহের সীমিত সম্পদ পরিসীমা ও জীবনবোধের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা করা হয়নি। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে উইলিয়ামসন এক লেখায় স্বীকার করেছেন যে, 'স্থির মডেল এবং পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ধারণা দ্বারা অর্থনীতিবিদগণ এতই আচ্ছন্ন যে তাদের পক্ষে পেশাগতভাবে উন্নয়ন অর্থনীতির বিষয়ে সঠিক ভাবনা ও অবদান রাখার প্রত্যাশা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৪] অভিজ্ঞতা হতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, উন্নয়ন সম্পর্কে এরূপ হতাশা ভ্রান্তির ফসল। কেননা ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, অবস্থা ও সম্পদভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও দারিদ্র্য রয়ে গেছে এবং প্রবৃদ্ধির ফসল মুষ্টিমেয় কিছু হাতে জমা হয়েছে।[১৫] উপরন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে দেখা দিয়েছে বিপুল বহির্বাণিজ্য ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। কেন এমনটি হয়েছে তা পরবর্তী আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সমাজতান্ত্রিক কৌশল

'উন্নয়ন অর্থনীতি' নামক বিষয়টির জন্মের প্রথম দিকে উন্নয়ন সম্পর্কে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তাতেই জন্ম নেয় Critical Minimum Effort নামক ধারণাটির। এ ধারণাটির অর্থ হচ্ছে, যদি এসব দেশসমূহকে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ভাঙতে হয়, তবে

উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রভাবক শক্তিসমূহ ঐ মাত্রায় অর্জন করতে হবে যাতে বাধার অচলায়তনটি ভাঙা যায়।[১৬] এ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।[১৭] তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো দেশের জনগোষ্ঠী যখন সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং সঞ্চয় প্রবণতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ যখন সীমিত তখন কীভাবে প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এ Critical Minimum Effort অর্জন করা সম্ভব হবে। এ সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত হলো 'সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কৌশল' যেখানে অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা অগ্রগামী এবং এতে রাষ্ট্রযন্ত্র সামগ্রিক পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা করবে। এ ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাত ও বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল নিওক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।[১৮] অন্য চিন্তাধারাটি হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যটিকে আপাতত কম গুরুত্ব দিতে হবে।

উন্নয়ন সম্পর্কিত লেখাজোখায় সমাজতান্ত্রিক কর্মকৌশলের প্রতি আস্থাশীলতার জোয়ার সৃষ্টি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনে কমিউনিস্ট আমলে এবং পশ্চিমে কীনেসীয় অর্থনীতির প্রাথমিক সাফল্যে। যুক্তি দেখানো হতে থাকে যে, নিওক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক মডেল যা দ্রব্যমূল্যের সামান্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় বাজারব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় তা উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাস্তবসম্মত মডেল হতে পারে না। কেননা শেষোক্ত দেশসমূহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক জড়তা ও অস্থিতিস্থাপকতা দ্বারা স্থবির হয়ে আছে।[১৯] উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকারগুলোকে উন্নয়নের জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়ে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র এক ধরনের big push দ্বারাই এর self generating, self sustained growth এবং great leap forward অর্জন করতে পারে।[২০]

'বিগ পুশ' ধারণাটি আসলে স্টালিনের 'সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের রাস্তা'র অপর নাম। স্টালিনের সময় ভারী শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন উচ্চগতির প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভারী শিল্পায়ন কৃষি ও সোভিয়েত অর্থনীতির অন্য সব খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এভাবে পুঁজিবাদী বিশ্ব হতে আমদানি নির্ভরতা কমানো সম্ভব হয়।[২১] সোভিয়েত মডেলের অনুসরণে একইভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ভারী শিল্পের বিকাশ ও নগর উন্নয়নের উপর অধিক জোর দিয়ে 'বিগ পুশ' অর্জন করতে হবে। কতিপয় শিল্পে উপর্যুপরি বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।[২২] রোজেনস্টেইন-রোডান এর মতে এটা সাফল্যের জন্য যথেষ্ট না হলেও প্রয়োজনীয় শর্ত।[২৩] 'বিগ পুশ' তত্ত্বে পুঁজির বৃহৎ প্রকল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।[২৪] উন্নয়নশীল দেশসমূহকে শিল্পায়নের পথে নিয়ে যাবার জন্য ভারী শিল্পের উপর অগ্রাধিকার প্রদান অপরিহার্য এ চিন্তাধারাকে জোরদার করে তোলা হয়।[২৫] এ ধরনের ভারী শিল্পের ক্ষুদ্রতম ইউনিটও এত বিশাল

যে, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে তাতে নাক গলানোর চিন্তা করাও দুঃসাধ্য, তাই এগুলোর বেড়ে ওঠা সম্ভব হবে সরকারি খাতে।[২৬] 'বিগ পুশ' তত্ত্বের ফলাফল দাঁড়ালো অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সরকারি খাতের ভূমিকার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ। নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির বদলে আসলো নতুন এক অর্থনৈতিক তত্ত্ব যা পরিকল্পনা, সরকারি হস্তক্ষেপ, শিল্পায়ন, আমদানি-প্রতিস্থাপন, নগরায়ন ও অন্যান্য নীতিমালার মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরকারের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করল। উন্নয়ন অর্থনীতি সাধারণভাবে অর্জন করল পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি বিরোধী এক জঙ্গি মনোভঙ্গি।[২৭]

সার্বিক পরিকল্পনার ধারণা দেশের পর দেশ জয় করে নিল। এ পরিকল্পনা সকল পুঁজি বিনিয়োগ উদ্যোগের ভার ভারী শিল্পায়নের কাঁধে অর্পণ করল। পরিকল্পনা তাই দক্ষতা ও ন্যায়পরতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র দিকনির্দেশনায় সীমাবদ্ধ রইল না, বরং বিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়ভার সরকারের উপর চাপিয়ে দিলো।

ন্যায়পরতা নীতির প্রতি অবহেলা

একটি বিশ্বাস বিস্তৃতি লাভ করল যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার- উভয় লক্ষ্য একসাথে অর্জন সম্ভবত সংগতিপূর্ণ নয়। যদি প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্য স্থির করা হয়, তবে ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করতে হবে।[২৮] উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্য একথা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিবেচনায় সোচ্চারভাবে উচ্চারণ করার অবকাশ নেই। তাই পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে আর্থ-সামাজিক সুবিচারের কথাটি কাগুজে প্রতিশ্রুতি হিসেবে আওড়ানো হতে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ১৯৫২ সালে প্রণীত ভারতের প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান ও সর্বোচ্চ উৎপাদনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতা অর্জনের কথা ব্যক্ত করা হয়।[২৯] পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মৌলিক দিকনির্দেশনা হিসেবে গণমানুষের স্বার্থের পরিপন্থি কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণকে প্রতিহত করার ঘোষণা ব্যক্ত করা হয়।[৩০] জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডের কার্যপরিধি ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ব্যক্ত হয় ন্যায়ভিত্তিক ধ্যানধারণার পরিভাষায়। পাকিস্তানের দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো ন্যায়ভিত্তিক আদর্শকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়।[৩১] তবে প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৫৫ সালে উন্নয়ন সাহিত্যে ন্যায়পরতা বিরোধী তত্ত্বপ্রবাহ নিয়ে আসলেন স্যার আর্থার লুইস। পরবর্তী দেড় দশক যাবত তাত্ত্বিক মতবাদ চালু ছিল। তিনি বললেন, প্রথমেই মনে রাখা দরকার আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধি অর্জন, বণ্টন-ন্যায়পরতা নিশ্চিত করা নয়।[৩২] বেয়ার এবং ইয়ামী ১৯৫৭ সালে বলেন, 'দরিদ্র

জনগণের মাঝে আয়ের সমবন্টনের নীতিমালার মাধ্যমে মাথাপিছু আয়ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।[৩৩] এমনকি জাতিসংঘও বন্টন ন্যায়পরতাকে তার নীতিমালার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেনি, বরং জাতিসংঘের দলিলে বলা হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় আয় বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে বৃদ্ধি করা।[৩৪] অধ্যাপক হ্যারি জনসন ১৯৬৪ সালে জোর দিয়ে বলেন, 'দ্রুত উন্নয়নে আগ্রহী একটি দেশের জন্য আয়ের সমবন্টনের নীতির উপর জোর দেয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে না'।[৩৫] ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত জেরাল্ড মেয়ার এর বহুল পঠিত Leading Issues in Economic Development এর প্রথম সংস্করণে দারিদ্র্য, অন্যায়পরতা এবং আয়ের বণ্টনের বিষয়গুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এমনকি মধ্য ষাটের দশকে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো কনফারেন্সের লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র্য ও অন্যায়পরতা নিরসনের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ১৯৬৬ সনের সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের কার্যবিবরণী পড়লে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৬]

দ্রুত উন্নয়নের কিছু প্রবক্তা এতদূর অগ্রসর হন যে, তারা বলতে থাকেন, আয়ের বৈষম্য বেড়ে ওঠা আরো বেশি জরুরি, কেননা এতে ধনীরা অধিক সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে। পুঁজি গঠন তরান্বিত হবে।[৩৭] এ ধারণার অনুকূলে প্রধান বিষয়ে হিসেবে কুজনেটস এর Inverted U-curve কে উপস্থাপন করা হতে থাকে। যদিও কুজনেটসের উক্ত রেখা, লেখা বা পরিসংখ্যান হতে এ রূপ ধারণার কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। কুজনেট কার্ভে বরং দেখানো হয়েছে উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে আয়ের বৈষম্য দেখা দেয়, যা পরবর্তীতে ক্রমশ হ্রাস পায়। আয় বৈষম্যের পক্ষাবলম্বনকারী প্রবক্তারা এ কথা ভুলে যান যে, কুজনেটস কার্ভের প্রদর্শিত প্রবণতা প্রকৃতির অলংঘনীয় কোনো নিয়মের প্রকাশ নয়। এমনটিও তো হতে পারে যে, কুজনেটসের কার্ভের চিত্রটি প্রকৃতির কোনো দৃঢ় আইন নয়, বরং অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ফসল মাত্র।[৩৮]

উপর্যুক্ত মতবাদের পক্ষে বলা হয় যে, শিল্পবিপ্লবের সময় তীব্র আয় বৈষম্যের কারণে উচ্চতর সঞ্চয় হার অর্জন সম্ভব হয়েছিল। এডাম স্মিথ হতে শুরু করে অনেক অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ বৈষম্য ও প্রবৃদ্ধির মাঝে যোগসূত্র টানার চেষ্টার করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের শ্রম-আধিক্যপূর্ণ দেশসমূহের জন্য এ সূত্রকে মডেল হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপযুক্ত তত্ত্বের অনুকূলে কিছু পরিবেশন করতে পারেনি। আয় বৈষম্যের কারণে বৃটেন বা আমেরিকায় সঞ্চয়ের উদ্ভব ঘটেনি। সমকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশে সঞ্চয়ের পিছনেও এরূপ বৈষম্যের কোনো অবদান দেখা যায় না।[৩৯]

পরিকল্পিতভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের তত্ত্বও উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা মুদ্রাস্ফীতি সরকারের ঋণ পরিশোধের ভার লাঘব করে এবং

জনগণকে সঞ্চয়ে বাধ্য করে। যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয় এমন শ্রেণীর অনুকূলে পুনর্বণ্টিত হয় যারা অধিক সঞ্চয়প্রবণ।[৪০] প্রফেসর হেইস যুক্তি দেখান যে, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধিতে শিল্প ও বণিক শ্রেণীর লাভের হার বৃদ্ধি পেয়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে।[৪১] এ যুক্তি এক ভুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন শ্রমিকের বেতন মজুরির প্রতিটি টাকা ভোগের কাজে ব্যয় হয়। আর যে টাকাটি শ্রমিককে দেয়া হয় না তা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই চিন্তাধারা উন্নয়নশীল দেশসমূহের নেতা ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করে। এমনকি জওহরলাল নেহেরুর মতো সামাজিক সুবিচারে আস্থাশীল ব্যক্তিও ভারতে আয় বৈষম্য প্রবণতাকে এ বলে মেনে নেন যে, 'বর্ধিষ্ণু একটি অর্থনীতিতে কিছু মাত্রায় আয় বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী'।[৪২] কিছু মুসলিম অর্থনীতিবিদ এ কোরাসে যোগ দেন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক সুবিচারের প্রশ্নে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট। এসব মুসলিম অর্থনীতিবিদ সেকুলার সামাজিক-ডারউইনবাদকে তুলে ধরে বলেন, আর্থ-সামাজিক সুবিচারের ধারণাটি একটি বিলাস যা কেবলমাত্র ধনী দেশগুলোই বহন করতে পারে। মাহবুবুল হক, যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানের অর্থ ও পরিরকল্পনা মন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন, 'অনুন্নত দেশসমূহকে অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রবৃদ্ধির দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে এবং ন্যায়সঙ্গতবন্টন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণাগুলোকে ভবিষ্যতের সূতিকাগারে জমা রাখতে হবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এ ধারণাগুলো হচ্ছে ধনিক দেশগুলোর উপযোগী বিলাসিতা'।[৪৩] সম্ভবত এ কথাটি বিবেচনায় আনা হয়নি যে, ইসলামী মূল্যবোধে অবিচার করা, তাকে সমর্থন করা বা ক্ষমার চোখে দেখা একটি বড় অপরাধ। উন্নয়নশীল অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা তাই সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেনি। অথচ আমরা জানি পাশ্চাত্য ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, সামাজিক সুবিচার নয়, বরং পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। উন্নয়নশীল দেশে সমাজতন্ত্র তাই রূপ নিয়েছে এক ভিন্ন প্রকৃতির যা কমিউনিস্ট বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্ব হতে ভিন্ন এক তৃতীয় ধারা।[৪৪] তৃতীয় বিশ্বে সমাজতন্ত্র তার অন্য সকল লক্ষ্য ও দর্শন হারিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র অর্থনীতির বৃহৎ অংশের রাষ্ট্র কর্তৃক মালিকানা ও পরিচালনা।[৪৫] সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক পরিকল্পনার অপর নাম।[৪৬] যদিও এ সময়ে কিছু অর্থনীতিবিদ সমাজতন্ত্রের ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তারা ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ।[৪৭] মূলধারার মতবাদটি ছিল 'trickle-down' বা চুঁইয়ে পড়া' মতবাদ, যাতে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হলে তা পরে ছড়িয়ে পড়ে দারিদ্র্য ও আয় বণ্টনের সমস্যা সমাধান করবে।[৪৮] কিন্তু বাস্তবে 'চুঁইয়ে পড়া' পদ্ধতি গুরুতরভাবে অকার্যকর বলে প্রমাণিত

হয়েছে। এটাই হবার কথা। কেননা দারিদ্র্য এবং আয় বৈষম্য এত বেশি বিস্তৃত, অতলস্পর্শী ও অমোচনীয় যে, অর্থনীতিতে বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার, অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন, উপযুক্ত মূল্যবোধ ও প্রেরণা সৃষ্টি ব্যতিরেকে এর অপনোদন প্রত্যাশা করা অবাস্তব স্বপ্নমাত্র।

অন্তঃসারশূন্য বিতর্ক

সামাজিক ঐকমত্য দ্বারা নির্ণীত মূল্যবোধ ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার ছাঁকনি (filter) ব্যবস্থার দ্বারা উন্নয়ন ও তার ফসল সমগ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উন্নয়ন অর্থনীতির দর্শনের যে অঙ্গীকারের প্রয়োজন ছিল, তা ছিল দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। ফলে উন্নয়ন সম্পর্কিত এ যাবত সমগ্র আলোচনা পরিণত হয়েছে শূন্যগর্ভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও অর্থহীন বিতর্কে। উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উন্নয়ন– এ দুই উন্নয়ন অর্থনীতির দর্শন দেশজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ও প্রত্যাশিত সেই ছাঁকনি প্রক্রিয়ার আনজাম দিতে পারেনি যা বিভিন্ন বিতর্কের সমাধান দিতে পারত। দিকদর্শনহীন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও ঝোঁক তাদের সমগ্র আলোচনা ও অভিসন্দর্ভকে অন্তহীন ও দিশাহীন এক পথে ঠেলে দিয়েছে। উন্নয়নের সকল বিবেচ্য ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কৃষি বনাম শিল্প, গ্রামীণ বনাম নগর উন্নয়ন, ভারসাম্যপূর্ণ বনাম ভারসাম্যহীন উন্নয়ন, আমদানি প্রতিস্থাপন বনাম রপ্তানি উন্নয়ন, বাজার অর্থনীতি বনাম পরিকল্পনা– সকল বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। অর্থনীতিতে দক্ষতা ও ন্যায়পরতা এ দু'টিই যদি আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হয়, তবে দেখা যাবে, এ যাবত উন্নয়ন সম্পর্কিত সমগ্র আলোচনা এ দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সমগ্র আলোচনাই পরিণত হয়েছে এক অর্থহীন বাকসর্বস্ব আপাত চাকচিক্যময় কথামালায়। উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনাতেই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতিকে ধরা হয়নি। উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের কোন ধাপে অবস্থান করছে, তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কী, কোন উদ্দীপনাসমূহ মানুষকে সমাজস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সংগতি রেখে কর্মপ্রেরণা দান করে-এসব সম্পর্কে উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় পরিষ্কার ধারণার অভাব সুস্পষ্ট। এর ফলে উন্নয়নশীল অর্থনীতির যে সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে তা হচ্ছে, স্বাচ্ছন্দ গতিশীলতার বদলে প্রতিবন্ধকতা, শ্লথ প্রবৃদ্ধি রেখা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, প্রাণশক্তি শুষে নেয়া ঋণ এবং সামাজিক অস্থিরতা। সত্যিকার কর্মচেতনা ও ন্যায়ানুগ বণ্টন নীতিমালার বোধ ও স্পৃহা সম্বলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কাঠামো গড়ে তোলা যেত, যদি সমগ্র নীতিমালার লক্ষ্য থাকত আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনার এত বেশি বাধাবিঘ্ন, শ্লথ গতি ও ধসে পড়ার মুখোমুখি হতে হতো না।

কৃষি বনাম শিল্প

উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাই পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন ছাড়া তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক পথের মাঝে একটি পথ মাত্র নয় বরং পল্লী উন্নয়ন অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। তবে শিল্পোন্নয়নের সমর্থন ছাড়া পল্লী উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ কথাও সত্য। কৃষকদের আয় বাড়ানো প্রয়োজন যাতে তারা উন্নত বীজ, প্রযুক্তি ও সার ব্যবহার করতে পারে। কৃষক পরিবারের বেকার ও অর্ধবেকার সদস্যদের কর্মসংস্থান ব্যতিরেকে আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। যুগপৎ গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ছাড়া কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব হবে না। উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশের জন্য তাই পল্লী উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পোন্নয়ন অত্যাবশ্যক। এ দ্বৈত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে মৌলিক নীতিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বৈষম্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজন তাই দেশের অর্থনীতির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নীতি অনুসরণ। গ্রামীণ উন্নয়ন বা শিল্পোন্নয়ন কোনোটাই এককভাবে উন্নয়নশীল দেশের বঞ্ছিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির সকল খাতের আধুনিকীকরণ ও বহুমুখীকরণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাই কৃষি উন্নয়ন বা শিল্পোন্নয়ন কোনো বিকল্প পন্থা নয় যে তাদেরও মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিলেই হলো। এ উভয় খাত পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি খাত বা শিল্প খাতের উন্নয়ন লক্ষ্য হচ্ছে, কিভাবে এ খাতদ্বয়ের উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। যদি নীতি নির্ধারকদের লক্ষ্য হতো আপামর সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তবে তারা অবশ্যই কৃষি ও শিল্প উভয় খাতের যুগপৎ উন্নয়নে মনোযোগী হতেন। এসব আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি যা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হারের বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধি বা unbalanced growth এর তত্ত্ব উপস্থাপন করে, তথা কৃষি বা শিল্প কোনো খাতকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে, তা জনগণের জন্য দুর্দশা, কল্যাণ ও সংকট ব্যতিরেকে অন্য কিছু বয়ে আনে না। এ ধরনের একদেশদর্শী নীতি একবার চালু হলে তার কুফল পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীতে প্রয়োজন হয় সংশোধনমূলক নীতিমালার প্রবর্তন। এ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ ও প্রয়োগ কখনো সহজ ও সমস্যামুক্ত হয় না।

আমদানি প্রতিস্থাপন এবং রপ্তানি উন্নয়ন

যদি কৃষি ও শিল্পকে সমভাবে গড়ে তুলতে হয়, তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমদানি প্রতিস্থাপন ও রপ্তানি উন্নয়নের গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে। একটিকে খাটো করে অন্যটিকে গুরুত্ব প্রদানের কোনো প্রয়োজন নেই। উভয় খাতই অত্যাবশ্যক, যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে তাদের

তুলনামূলক গুরুত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্যই এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, যে কোনো মূল্যেই আমদানি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[৪৯] যেহেতু চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, সীমিত সম্পদের দক্ষ ও সুসম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করা, তাই আমদানির ক্ষেত্রে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ দেয়ালগুলো তুলে দেয়া বা না দেয়ার বিষয়টি উক্ত পদক্ষেপ দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ কতটুকু নিশ্চিত হবে সে নিরিখে দেখতে হবে। উৎপাদন উপকরণের বিভিন্ন খাতে বন্টনের যুক্তিযুক্ত নীতিমালাকে উপেক্ষা করা সংগত হবে না। কেননা সম্পদের অদক্ষ ব্যবহারের মূল্য দিতে হবে জনগণকে, যা কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, আমদানি প্রতিস্থাপন কর্মসূচি অনেক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত হয়েছে। আসল কারণটি হচ্ছে, আমদানি প্রতিস্থাপনের এরূপ চাপিয়ে দেয়া কর্মসূচি দ্বারা ধনিক-বণিক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের শ্লোগানটি ব্যবহার করা হয় জনগণের দেশপ্রেমিক অনুভূতিকে ব্যবহারের জন্য।

অর্থনৈতিক নীতিমালা হিসেবে আমদানি-প্রতিস্থাপন কর্মসূচিতে কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি হচ্ছে যে অবস্থা ও পদ্ধতিতে তার অপপ্রয়োগ হচ্ছে তাতে। যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয়ে থাকে সমাজে ন্যায়পরতা সৃষ্টি করা, তাহলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের (Small and Micro Enterprise-SME) সমর্থনে আমদানি প্রতিস্থাপন কর্মসূচিকে ব্যবহার করা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকা এবং ক্ষুদ্র শহর ও নগরীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হতো। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তাদের ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ হয়ে নগরমুখী হতে হতো না। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যাশিত কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের উন্নয়নের পদক্ষেপের পরিবর্তে গ্রহণ করা হলো শহরাঞ্চলে বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনের কর্মসূচি। বৃহৎ শিল্প স্থাপনে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক মুদ্রাহার ও উচ্চ ট্যারিফহার নির্ধারণ করল। নিম্নমূল্যে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রদান করল বিপুল ভর্তুকি। পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক সহায়তা এগিয়ে আসলো। এসব চোখ ঝলসানো বৃহদায়তন প্রকল্পের প্রতি আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাসমূহের সুদৃষ্টি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।[৫০]

কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প খাত সরকারের পক্ষ হতে ভর্তুকি বা অন্য কোনো প্রকার সহায়তা পায়নি, তদুপরি উচ্চ মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রাহারের কারণে এ খাতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব খাতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ছিল প্রাচীনকালের। ক্রমউৎপাদনশীলতার কারণে আয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাত্রা ছিল অনুল্লেখ্য। ফলে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ভারী যন্ত্রপাতির দাম কৃত্রিমভাবে কম রাখায় এবং উচ্চ ট্যারিফহার ও অতিরিক্তভাবে মূল্যায়িত বৈদেশিক মুদ্রার সুযোগের কারণে

আমদানি প্রতিস্থাপক বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রসার লাভ করল। উপরন্তু সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও তাদের সার্বিক স্বার্থ দেখা যেহেতু সরকারি নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য ছিল না, তাই আমদানি প্রতিস্থাপক যে সকল বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য নির্ধারণ করা হলো তা গণমানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের অনুকূলে গেল না। যদি তা করা হতো, তাহলে অন্তত সাধারণ মানুষ সুলভ মূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী লাভ করতে পারত। যদিও এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রশ্নটির সুরাহা সম্ভব হয়ত হতো না। কিন্তু দেখা গেল ঐ সব বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হলো যা সাধারণ মানুষের অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, বরং মুনাফামুখী বিলাস দ্রব্য ও ভারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োজিত রইল। দেশীয় বাজার ক্ষুদ্র হবার কারণে এসব শিল্প দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল সীমিত এবং অদক্ষ হবার কারণে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। অপরদিকে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি নির্ভর বিধায় দেশের আমদানি খরচ উচ্চমাত্রায় রয়ে গেল। ফলে গড়ে ওঠা এসব আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প কারখানা দ্বারা দেশের শিল্পদ্রব্য সামগ্রির ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমানো সম্ভব হলো না। প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু এক শ্রেণীর আমদানির বদলে অন্য শ্রেণীর আমদানি প্রতিস্থাপিত হলো মাত্র।

বিদেশ হতে আমদানি করা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দিয়ে বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রত্যাশিত মাত্রার কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হলো না, যা দিয়ে কৃষি, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনো খাতের প্রবৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবে অর্থনীতিতে যে 'লিংকেজ' প্রতিক্রিয়া তথা অন্য খাতগুলোর জন্য যে সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হবার কথা, তা হলো না। বৃহদায়তন শিল্পসমূহের জন্য যে আমদানি করতে হয় বাড়তি মুনাফা সে পথে আবার ফিরে গেল। ধনী দেশগুলোতে পুঁজির আধিক্য ও শ্রমের স্বল্পতার কারণে সেখানকার প্রযুক্তিসমূহ স্বাভাবিক কারণেই পুঁজি-নিবিড়। উন্নয়নশীল দেশমূহের শিল্পকারখানায় উন্নত বিশ্ব হতে আমদানিকৃত এসব পুঁজি নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল।[৫১] ফলে শিল্প কারখানা গড়ে উঠলেও সে অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হলো না। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বৃহদাংশ গ্রামীণ অর্থনীতির বদলে কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত অল্প সুদে শিল্প অর্থনীতিতে প্রবাহিত হলো। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সম্পদের বৃহৎ ভাগ কৃষি, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প খাতে সৃষ্টি হলেও এসব খাত ন্যায্য হিস্যা হিসেবে পুঁজি রূপে এ সঞ্চয়ের ভাগ পেল না। বরং ঐ সঞ্চয় প্রবাহ সরকারের পক্ষপাতমূলক নীতির কারণে বৃহৎ শিল্পখাতে প্রবাহিত হলো। ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ হস্তশিল্প বিলেতি তাঁতশিল্প দ্বারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের জন্য বেকার থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকল না অথবা তারা শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাতে বাধ্য হলো।[৫২]

এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, অর্থনীতির উন্নয়নে বৃহদায়তন পুঁজি নির্ভর শিল্পখাতকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। কথা হচ্ছে যে, যেহেতু আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি যেখানে প্রাধান্য পাওয়া সামাজিকভাবে প্রয়োজন, সেখানে পুঁজি-নিবিড় বৃহৎ শিল্প তখনই গড়ে উঠতে দেয়া উচিত, যখন শ্রমনিবিড় শিল্পসমূহ ঐ সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সমর্থ নয় বলে দেখা যায়। 'উন্নত চিন্তা কিন্তু সরল জীবনযাপন' -প্রাচ্যের এ দর্শনের নিজস্বতার সাথে সংগতি রেখে দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন ও কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও পদ্ধতির প্রতি যে আসক্তি ও প্রচারণা চালানো হয়েছে, তাতে বর্তমানে যে ধারার দ্রব্যসামগ্রীর শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে সেই প্রবণতাটাই স্বাভাবিক ছিল। এটা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্যের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী বেনিয়া ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থে। তারা তাদের পণ্য ও প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বে বাজারজাতকরণের লোভনীয় পন্থা অনুসরণ করেছে। ব্যাংক ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান মারফত 'ক্রেডিট সেল' এর মাধ্যমে তারা তৃতীয় বিশ্বে তাদের পণ্য সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করে নেয়। ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের রপ্তানির চেয়ে আমদানি বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টি হয় আমদানি ও রপ্তানির মাঝে ভারসাম্যহীনতা ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সংকট।

যদি শিল্পায়ন ও আমদানি প্রতিস্থাপনের নীতিমালা সমাজে ন্যায়পরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত হতো তাহলে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো। তাহলে লক্ষ্য হতো মানুষের মৌলিক দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন, সকল মানুষের জন্য কর্মসংস্থান এবং সমাজের বৈষম্য হ্রাস। দেশীয় ধনীক শ্রেণী ও বিদেশি বেনিয়াদের স্বার্থ পূরণের হাতিয়ার হিসেবে দেশীয় শিল্পনীতি ব্যবহৃত হতো না। সব কিছু করা হতো দেশীয় বাজারের জন্য, ভোগ্য পণ্য ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে গ্রামীণ ও শহরের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য। গ্রামীণ এলাকায় গড়ে তোলা হতো সহজ সরল অথচ দক্ষ ভৌত ও আর্থিক অবকাঠামো। ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের জন্য দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি নির্মাণ করা হতো অথবা আমদানি করা হতো ঐ সব প্রযুক্তি যা উন্নয়নশীল দেশের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। দেশীয় শিল্পকে পরিচর্যার জন্য দেয়া হতো ট্যারিফ প্রতিরক্ষা। এসব যদি করা হতো, তবে শুধুমাত্র দেশজ উৎপাদনই বৃদ্ধি পেত না, বিদেশী পণ্যের সাথে এগুলো এক পর্যায়ে এসে মানের দিক থেকে প্রতিযোগিতায় নামতে পারতো। গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর কর্মসংস্থান হতো, গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পেত, শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমে যেত। গ্রামীণ মানুষের অধিক আয়ের ফলে তারা উন্নতমানের কৃষি উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করতে পারত। ফলে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেত।

এভাবে যদি আমদানি প্রতিস্থাপনের শিল্পনীতি গ্রহণ করা হতো, তবে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে দেশে পণ্যসামগ্রীর চাহিদার সংকুলান করা সম্ভব

হতো এবং পরিশেষে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করতে পারত। প্রথমে অবশ্য দেশীয় বাজারের চাহিদা অনুপাতে পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হতো। শিল্প কারখানার ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন বাড়তি অর্থনৈতিক সুবিধা (external economies) সৃষ্টি হতো, তখন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির সুফল ঘরে তোলা যেত। এ ধরনের শিল্পনীতি হতো উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য। যখন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর প্রয়োজন মিটে যেত, বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, তখন ভারী যন্ত্রপাতি ও 'ভোক্তা টেকসই' উৎপাদন উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতিমালা হিসেবে গৃহীত হতে পারত।

আমদানি প্রতিস্থাপন বা বিদেশ হতে আমদানি হ্রাসের জন্য দেশীয় শিল্পকারখানা গড়ে তোলার যে নীতি, তা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সঠিক পন্থায় পরিচালিত না হওয়ায় রপ্তানি উন্নয়নের যে লক্ষ্য তাও অর্জন হয়নি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি সহায়তা ও ভর্তুকি সত্ত্বেও গড়ে তোলা পুঁজি-নিবিড় অনেক বৃহদায়তন ভারী শিল্পেরই প্রাথমিক পর্যায়ে তুলনামূলক খরচ সুবিধা ছিল না। রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতার সামনে তারা দাঁড়াতে পারল না। পক্ষান্তরে কৃষি ও শ্রম নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ স্থাপন করে যাদের তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ ও উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল, তারা সরকারি সাহায্য সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হলো। বৈদেশিক মুদ্রার হার কৃত্রিমভাবে উচ্চমাত্রায় বেঁধে দেয়ায় কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাত রপ্তানি বাজারে প্রবেশের কার্যকারিতা হারাল। ফলে রপ্তানি যতদূর বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব ছিল তা হলো না।

অধুনা রপ্তানি উন্নয়নের উপর যে পরিমাণ অত্যধিক জোর দেয়া হচ্ছে, সতর্কতার সাথে তার মূল্যায়ন করতে হবে।[৫৩] যদি যে কোনো মূল্যে আমদানি প্রতিস্থাপনের নীতি ক্ষতিকর হয়, তবে যে কোনো মূল্যে রপ্তানি উন্নয়নের নীতিও আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। যেখানে ইতোমধ্যে অনেকগুলো অদক্ষ পুঁজি-নির্ভর বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়ে গেছে, সেখানে যে কোনো নতুন নীতির আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখতে হবে। রপ্তানি উন্নয়ন নীতির দু'টি স্তম্ভ হচ্ছে শ্রমের কম মূল্য নির্ধারণ ও স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন। এ নীতি দ্বারা দেশীয় ধনীক শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদক্ষ শিল্পগুলোর পক্ষে রপ্তানি সম্ভব হতে পারে, তবে তা প্রকৃত মজুরি হ্রাসের দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীকে আরো দরিদ্রতর করবে। তাই রপ্তানি উন্নয়নের এ নীতিমালা হবে আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি বিরোধী। তাই রপ্তানি উন্নয়নের হুজুগে ট্রেনে চটজলদি উঠে পড়ার আগে নিশ্চিত করতে হবে যেন রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফসল মেহনতী দরিদ্র শ্রেণীর হাতে আসে।

যেসব প্রবক্তারা আমদানি প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে উন্নয়নের কৌশল হিসেবে শুধুমাত্র রপ্তানি উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে থাকেন, তাদের মনে রাখা প্রয়োজন তৃতীয় বিশ্বের রপ্তানি সামগ্রী উন্নত বিশ্বে সব সময় সকল প্রকার ট্যারিফ ও ট্যারিফ দেয়ালের সম্মুখীন হবে। অপরদিকে 'ডাম্পিং নীতি' (Dumping Policy) এবং

প্রিডেটরি' (Predatory) মূল্য নির্ধারণীর মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব তাদের মালামাল তৃতীয় বিশ্বে বাজারজাতকরণ অব্যাহত রাখবে। 'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকার ভাষায়, ইউরোপের 'কমন এগ্রিকালচারাল পলিসি' এবং ধনী দেশসমূহের 'মাল্টি-ফাইবার এগ্রিমেন্ট' এর মতো জটিল বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহের প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলো।[৫৪] গত তিন দশকে শিল্পোন্নত বিশ্বে কৃষি ও শিল্পে সরকারি অনুদান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বাহির হতে আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা। বুনক্যাম্প এর মতে, উন্নত দেশের সরকারসমূহ কর্তৃক আরোপিত এসব বাধানিষেধ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিঘ্নিত করে তুলেছে।[৫৫] উন্নত দেশের এসব রক্ষণশীল পদক্ষেপ ও সরকারি নীতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো হতে কৃষি পণ্য রপ্তানি দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, জাপানে চাল আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশ্ববাজার দরের ৯ গুণ দামে জাপানে দেশি চাল বিক্রি হয়।[৫৬] উন্নত বিশ্বে ট্যারিফ হার কমানো হলেও ঐ সব দেশে নন-ট্যারিফ বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ দ্বারা বাহির হতে আমদানি প্রতিহত করে দেশীয় পণ্য সামগ্রীর সংরক্ষণ অব্যাহত থাকে।[৫৭] অধিকন্তু কোনো উন্নয়নশীল দেশ যদি বড় ধরনের রপ্তানিকারকে পরিণত হতে সক্ষম হয়, সেখানে শিল্পোন্নত বিশ্ব তার সামনে 'কোটা-সিলিং' এর দেয়াল তুলে দেয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আঙ্কটাড এর হিসাব মতে, উন্নত বিশ্বের সংরক্ষণশীল নীতির ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বছরে ৭০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হতে বঞ্চিত হয় যা তাদের বার্ষিক বৈদেশিক ঋণের ৫০ ভাগের বেশি।[৫৮]

অপ্রত্যাশিত সমস্যাবলী

উন্নয়ন অর্থনীতির পণ্ডিতগণ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারের বৃহৎ ভূমিকার উপর জোর দিলেও এসব দেশের সম্পদ যেভাবে অপচয় হয়ে যাচ্ছে তা রোধের জন্য কার্যকর কৌশল উদ্ভাবনের দিকে তেমন কোনো নজর দেয়নি। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির একচেটিয়া প্রচারণা চলছে। এমনকি অর্থনীতিবিদ রসটো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পঞ্চম ধাপে যে বিলাসী জীবনযাপনের উল্লেখ করেছেন, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপেই সে জীবনযাত্রার দিকে তাদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ফলে বিলাস দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়ে বাণিজ্য ঘাটতিকে প্রকট করে তুলেছে। বিলাস দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ সঞ্চয় প্রবণতাকে হ্রাস করেছে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অপ্রতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাঝে দূরত্ব বেড়ে চলছে। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস দ্রব্যের খাতে সম্পদের অপচয়কে রুখতে হলে প্রয়োজন ছিল মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতার ধারা গড়ে তোলা। পশ্চিমা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতিতে এ ধরনের কোনো সামাজিক মূল্যবোধের দর্শন নেই। তাদের উন্নয়নের জন্য কর ও মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে ভোগ হ্রাসের জন্য ব্যবহৃত একমাত্র অস্ত্র।

করের ভিত্তি সংকীর্ণ হওয়ায় এবং অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ কর প্রশাসনের কারণে উন্নয়নশীল দেশে বিপুল হারে কর-রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ নেই। বাজেট ঘাটতি তাই তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। এ ঘাটতি পূরণের জন্য কীনসীয় অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ ও বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।[৫৯] মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির প্রবক্তারা একথা ভুলে যান যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাঠামোগত দুর্বলতা ও সরবরাহ জটিলতার কারণে উন্নত দেশের তুলনায় এসব দেশে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি ও আমদানি-রপ্তানি ঘাটতি অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক সাহায্যের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এর ক্ষুদ্রাংশ আসে অনুদান হিসেবে, বৃহদাংশ আসে ঋণ হিসেবে যা সুদে আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে পরিশোধ করতে হয়। টাকা ছাপানো এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ– দুই ক্রাচের উপর ভর করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে চলতে হয়। একবার এ দু'টির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে আর ফেরার পথ থাকে না। কেননা উচ্চহারে কর বৃদ্ধি বা উল্লেখযোগ্য সরকারি ব্যয় হ্রাস কোনোটাই রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় নয়।

মুদ্রাস্ফীতি

সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি তীব্র আকার ধারণ করলেও উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে একে যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় বলে ধরে নেয়া হয়েছে।[৬০] 'ফিলিপস কার্ভ' এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারকগণ যুক্তি খুঁজে পান যে, মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে তারা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে অধিকাংশ কীনসীয় অর্থনীতিবিদ মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে কোনো শংকা অনুভব করেননি; বরং তারা মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির নীতিকে সমর্থন দিয়ে যান'।[৬১] ১৯৬১ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় প্রফেসর হেনরী ব্রুটন বলেন, 'মুদ্রাস্ফীতি দমনকে অর্থনৈতিক নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না করে বরং উন্নয়নের অস্ত্র হিসেবে একে ব্যবহার করা যায়'।[৬২] অবশ্য সাথে সাথে মুদ্রা অব্যবস্থাপনার বিষয়ে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে, 'পরিকল্পনাবিহীনভাবে দেদার মুদ্রা ছাপিয়ে যাওয়া ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই আনয়ন করে না'।[৬৩] কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের নীতিনির্ধারকগণ তাদের ছদ্মবেশে ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ এনে দেয়। বাড়তি ট্যাক্সের মতো মুদ্রাস্ফীতি রাজনৈতিক হট্টগোল সৃষ্টি করে না। তাই ঘাটতি পূরণের জন্য একে সহজলভ্য পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কেননা এর যদি কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে থাকে তবে পরবর্তী প্রজন্মকে তার ধাক্কা সামলাতে হবে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি নীতিনির্ধারকদের এর প্রত্যক্ষ বিরূপ ফল ভুগতে হয় না। এ ধরনের আচরণ এ সমাজে খুব স্বাভাবিক। আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতিকে এ সমাজে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয় না, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধিই চরম লক্ষ্য। মূল্যবোধের লাগামহীন সমাজে আমলা ও রাজনৈতিক নেতাগণ ভিন্ন আচরণ করবেন তা আশা করা যায় না।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয় পুনর্বণ্টন হয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতে জমা হয়। আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির ভারসাম্য ব্যাহত হয়। শুধুমাত্র এ কারণটি উন্নয়ন

অর্থনীতিবিদদের মুদ্রাস্ফীতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের রাশ টেনে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। মুদ্রাস্ফীতি নীতির আরো ক্ষতিকর প্রক্রিয়া রয়েছে যা উন্নয়নকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং ভবিষ্যতে আরো করতে থাকবে।

মুদ্রাস্ফীতির দরুণ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের উপর ভর্তুকি প্রদান করতে হয়। মূল্য এসব দ্রব্যসামগ্রীর দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহকে ব্যাহত করে। অপরদিকে ভর্তুকি প্রদান সরকারি বাজেটের উপর ক্রমাগত দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দেয়। মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির দরুণ যে মূল্যস্ফীতি ঘটে, তা কমিয়ে আনার জন্য সরকারকে বৈদেশিক বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে উঁচু রাখতে হয়। এর ফলে আবার আমদানি উৎসাহিত হয়। বিপরীত দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পখাত যা বৃহৎ ভারী শিল্পের মতো সরকারি সহায়তা লাভ করে না। আমদানির উপর নির্ভরতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সংকুচিত হতে থাকে। ফলে সরকারি ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হয়। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ভার জটিলতর হতে থাকে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের চাপের মুখে সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তুকি প্রদান নীতি তুলে দিতে এবং বাস্তবসম্মত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ করতে চাইলেও তা পারে না। কেননা সংশোধনমূলক এ ব্যবস্থা জীবনযাত্রা ব্যয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিধায় রাজনৈতিকভাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্যার আর্থার লুইস তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, 'উন্নত ও অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে আমরা এ মৌলিক শিক্ষাই পেয়েছি যে, মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এক দুঃসহ ক্লেশকর পন্থা'।[৬৪]

ঋণের বোঝা

ক্রমাগত বড় আকারের ঋণ গ্রহণ করার ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বোঝা তীব্র আকার ধারণ করেছে।[৬৫] প্রথমে এ বিষয়টি তেমন আশংকাজনক মনে করা হয়নি, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ঋণের বোঝা ক্রমশ দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক অর্থবাজার ব্যবস্থার সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের এ বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে। ফাঁপা ও দুর্বল অভ্যন্তরীণ অর্থবাজার হতে সরকারের বিপুল ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাত প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হলো। অর্থবাজার কম সুদ সম্পন্ন সরকারি ঋণের চাপে দুর্বলতর হলো। বহুজাতিক ব্যাংক ও অর্থসংস্থা হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কর্তৃক বিপুল হারে ঋণ গ্রহণ প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণার নিরিখে মন্দ বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু ঋণের বোঝা এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ কর্তৃক ঋণ পরিশোধে অপরাগতা এসব ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক ঋণের ভার লাঘবের প্রচেষ্টা এ হারকে আরো শ্লথ করে দিতে পারে।

পরিকল্পনা বিষয়ক জটিলতা

উন্নয়নশীল দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে, তা যথাযথ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা হয়নি। অপরদিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা হতে অতিরিক্ত ফলাফল আশা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাব এবং উপাত্তসমূহের অসম্পূর্ণতা ও নির্ভরযোগ্যহীনতা সফল উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার সুযোগকে সীমিত করে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উপাদান যথা মোট সঞ্চয়, পুঁজি, বেকারত্বের পরিমাণ, বিনিয়োগ প্রকল্পের মূল্যমান প্রভৃতি পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের অপর্যাপ্ততার কারণে পরিকল্পনায় সৃষ্ট ভুলের মাত্রা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরন্তু একটি পরিকল্পনা মডেল হতে অতিরিক্ত আশা করার প্রবণতা দেখা দিলো। এটা অনুধাবন করা হলো না যে, বিভিন্ন বিকল্পের মাঝে সঠিক পন্থাটি বাচাই করে নেয়ার যে কঠিন সিদ্ধান্ত নীতি নির্ধারকদের নিতে হয়, নিছক কোনো উন্নয়ন মডেল সে সমস্যাটিকে অপসারণ বা সহজতর করে দিতে পারে না। অগ্রাধিকার নির্ধারণ ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মাঝে যে পারস্পরিক সংঘাত আছে তা নিরসন করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন দর্শন যা মূল্যবোধ ও বস্তুগত লক্ষ্যের দিকনির্দেশনা দেয়, তার স্থান কখনো একটি যান্ত্রিক 'ইকোনমেট্রিক মডেল', দখল করতে পারে না। 'প্যারেটো অপটিমালিটি'র ধারণা ও লক্ষ্যও এভাবে অর্জন করা যায় না। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে দ্বিধাহীন চিত্তে নীতি নির্ধারকদের উন্নয়ন দর্শন গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণকে উৎসাহের সাথে তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের দর্শন ও অনুপ্রেরণার অভাব ও অনুপস্থিতিই ব্যাখ্যা করে কেন সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাই তার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ন্যায়পরতা বিধান করছে, অথচ কোনো পরিকল্পনা মডেলই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো কার্যকর পন্থা ও পদ্ধতি বাতলে দিতে পারেনি।

একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যেসব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা নিরসনের দিকে পূর্ব হতে যথাযথ মনোযোগ দেয়া হয় না। অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সুসংগত ও পরিপক্কতার বিচারে কাগজে কলমে সঠিক বলে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগের অভাবে ঐসব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ লাভ করে না। পরিকল্পনাগুলো আধুনিক 'ইকোনমেট্রিক মডেলে'র সহায়তায় প্রণয়ন করা হয় বিধায় তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত পরিকল্পনাগুলো এতো বেশি মার্জিত ও পরিশীলিত যে, তা কাগজে কলমেই সুশোভন, কিন্তু বাস্তবায়নযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যের উচ্চ তাত্ত্বিক মডেলগুলো অনুসরণ না করে অর্থনীতির প্রাথমিক ও সরল মূলনীতিগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিক উপকৃত হতে পারত।[৬৬]

ম্যাক্রো-ইকোনমিক মডেলগুলোর পরিমাপযোগ্য উন্নয়ন উপাদানসমূহের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা রয়েছে। যদিও অপরিমাপযোগ্য উন্নয়ন উপাদানগুলোরও পরিকল্পনার লক্ষ্য বিশেষত আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি 'ইকোনমেট্রিক মডেল' অঙ্ক শাস্ত্রের নিরিখে যত বেশি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, তার তত বেশি অর্থনীতির বাইরের সামাজিক উপাদানগুলো গ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণের সম্ভাবনা কম থাকে। প্রফেসর গলব্রেথের ভাষায়, 'উন্নয়ন সমস্যাটির দিকে সাধারণভাবে দৃকপাত করলেই দেখা যায়, কার্যকর সরকার, শিক্ষা এবং সামাজিক সুবিচারের বিষয়গুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে এগুলোকে চিহ্নিত করতে না পারাই প্রধান সমস্যা। এ বাধাগুলো যতদিন অপসারণ না করা যাবে, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পুঁজি বিনিয়োগ হতে তত দিন বেশি কিছু আশা করা যায় না। একটি পরিকল্পনা কাগজে কলমে যত বেশি বড় হবে, তা তত বেশি ক্ষুদ্র ফল প্রসব করবে।[৬৭]

নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পুনারাবির্ভাব

উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন যেসব সমস্যায় ভুগছে, তার ফলেই পুনরুত্থান ঘটেছে নিওকাসিক্যাল অর্থনীতির। তিন দশক যাবত সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির বৃহৎ সরকার এবং সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এসব সমস্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। সরকারি খাতের বিনিয়োগের উপর প্রবল গুরুত্ব প্রদান এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করার ফলে শুধুমাত্র উৎপাদন উপাদান বণ্টনের মধ্যে বিকৃতি সৃষ্টি হয়নি, অধিকন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য ও সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে বেসরকারি খাতের উদ্যম ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে। বিপুল পুঁজিনির্ভর বৃহদায়তন ভারী শিল্পের প্রতি অনুৎসাহ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বিনিময়ে যে শিল্পায়ন ঘটেছে তা হয়েছে অদক্ষ ও অফলপ্রসূ। আইএমএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইকেল ক্যামডিসাস সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যেসব দেশের অর্থনীতি প্রবল মুদ্রাস্ফীতি, বিশাল বাজেট ঘাটতি, প্রচুর বাণিজ্য প্রতিবন্ধতা, ভারসাম্যহীন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং ক্রমাগত পুঁজি পাচার দ্বারা উপদ্রুত, তারা দীর্ঘকালীনভাবে উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারে না।[৬৮] শ্লথ প্রবৃদ্ধি ও ভারসাম্যহীনতার চেয়েও বিষাদময় চিত্র হচ্ছে, এসব গরীব দেশগুলোর বৈষম্য, বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব ও সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের পরিসীমাকে হ্রাস করতে না পারার ব্যর্থতা। দরিদ্র দেশগুলোর সমস্যা হ্রাস পাবার বদলে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা এবং জাতীয় সরকার গঠনের ফলে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ হয়নি।

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন কৌশলের ব্যর্থতার পথ ধরে নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির যে পুনর্জাগরণ, তা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তারা যে সোপান থেকে শুরু করেছিল

সেখানে ফিরিয়ে আনল। তা হলো সীমিত সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা ও ন্যায়পরতা আনয়ন। উন্নয়ন অর্থনীতি এবার দৃশ্যত নতুন চেহারা ধারণ করল। শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি নয়, আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরতাও এবার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধার্য হলো। সত্তর দশকের শুরু হতে এ ধারা সূচিত হলো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি নয়, দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাসও।[৬৯]

সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দরিদ্র ও জনসংখ্যাপীড়িত দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সমৃদ্ধির আশার আলো দেখাতে পারে শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে দীর্ঘকালীন ন্যায়পরতাভিত্তিক বন্টন। আগে উন্নয়ন এবং পরে ন্যায়পরতাভিত্তিক বিতরণ- এ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[৭০] উন্নয়ন অর্থনীতি তাই আর শুধুমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধির বেদীমূলে পূজার নৈবেদ্য হয়ে থাকল না, বরং তা বন্টন ন্যায়পরতার প্রবক্তা হয়ে উঠল। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, সামগ্রিক দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস, ন্যায়পরতার সাথে উন্নয়ন প্রভৃতি আহবান উচ্চারিত হলো। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি অর্থনৈতিক কার্যকারণের যৌক্তিকতার অভিভাবক হিসেবে না থেকে 'গরীবের অভিভাবক' হিসেবে আবির্ভূত হলো।[৭১]

১৯৭৩ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক সভায় ব্যাংকের তৎকালীন সভাপতি ম্যাকনামারা বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন তাদের প্রতি, যারা নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে; যারা ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা, ব্যাধি ও অশিক্ষার যাতাকলে চরমভাবে পিষ্ট।[৭২] ১৯৭৯ সালে নোবেল প্রাইজ গ্রহণকালে থিওডর শুলজ বলেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ লোক গরীব। তাই গরীব হওয়ার কারণ সম্পর্কিত অর্থনীতিটি যদি আমরা জানতে পারি, তবে অর্থনীতির সত্যিকার জ্ঞান উদয় হবে'।[৭৩] জেরাল্ড মেয়ারের ১৯৮৪ সনে প্রকাশিত 'Leading Issues in Economic Development' এর প্রথম সংস্করণে দারিদ্র্য, বৈষম্য, আয় বন্টন প্রভৃতি বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে তিনি উন্নয়নশীল দেশে আয় বন্টনের ন্যায়পরতার উপর উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সালে প্রকাশিত অন্য একটি বইয়ে তিনি দারিদ্র্য থেকে মুক্তিকেই অর্থনীতির একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন।[৭৪] আয় বন্টন ন্যায়পরতার প্রতি উদ্বেগ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ডাডলি সিয়ার্স এর ভাষায়, 'একটি দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কিনা তা জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে, সে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির কি অবস্থা? বেকারত্ব পরিস্থিতির কি রূপ? আয় বৈষম্যের অবস্থা কি? যদি এ তিনটি অবস্থারই উন্নতি হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে সে দেশের উন্নয়ন ঘটছে বলা যায়। যদি কেন্দ্রীয় সমস্যাত্রয়ের একটি বা দুটির বিশেষভাবে যদি তিনটিরই অবনতি ঘটে তবে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হলেও সে দেশের উন্নয়ন ঘটছে বলা অসম্ভব হবে'।[৭৫]

মৌলিক প্রশ্ন

আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যাকে দ্রুত পুঁজিগঠন ও প্রবৃদ্ধির যুপকাষ্ঠে এতদিন বলি দেয়া হয়েছে, তা আবার পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করল। এ শুভ পরিবর্তনকে অবশ্যই সুস্বাগতম। দক্ষতা ও ন্যায়পরায়নতা অর্জনের প্রশ্নে উন্নয়ন অর্থনীতি রূপ পরিবর্তন করে নিওক্লাসিক্যাল, কীনেসীয় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো অবয়ব ধারণ করল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল, বিশেষ দর্শন ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পক্ষে এ লক্ষ্যদ্বয় অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা? বর্তমানে প্রতিটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এবং প্রতিটি লেখায় নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ যে উন্নয়ন কৌশলের কথা তুলে ধরছেন, তা হলো 'এডজাস্টমেন্ট' বা সমন্বয় সাধন। সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। উন্নয়নশীল দেশসমূহই যে প্রকট ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে, তাতে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র একটি বিকল্প পন্থা নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের উপাদানগুলো সম্পর্কে। সন্দেহ দেখা দিয়েছে, নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি যে উপাদানগুলো উপস্থাপন করছে, তা একই সাথে দক্ষতা ও ন্যায়পরতার লক্ষ্যদ্বয় অর্জনে সক্ষম হবে কিনা। সঠিক সমন্বয় প্রক্রিয়া হচ্ছে তাই যা অর্থনীতির উন্নয়ন পদ্ধতির চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিককে এমনভাবে মোকাবিলা করে যা প্রবৃদ্ধিকে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত করবে। চাহিদার দিকে অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে হবে; এ ব্যয় হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়ের সামগ্রিক মাত্রা। তবে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণ অধিকমাত্রায় কমাতে হবে। আর্থ-সামাজিক সুবিচার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আবার ভোগব্যয় এমনভাবে কমাতে হবে, যাতে কৃচ্ছ্যতাসাধনের ভারটি সমাজের সক্ষম ব্যক্তিদের উপর পড়ে। দরিদ্র মানুষের ভোগের অবস্থার যেখানে উন্নয়ন কাম্য ও প্রত্যাশিত, সেখানে অন্তত যাতে তাদের ভোগের মাত্রা আরো কৃশকায় হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরবরাহের দিকেও আবার আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার দাবি করে যে, উৎপাদন এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে সমাজের প্রয়োজন পূরণ হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং বৈষম্য হ্রাস পায়।

পক্ষান্তরে দেখা যায় বিপরীত চিত্রটাই ঘটেছে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-এর আশীর্বাদধন্য নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সমন্বয় কর্মসূচির ফলে অস্থায়ী বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে, জীবনযাত্রার মান অন্তত স্বল্পকালীন সময়ের জন্য কমে যাচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের দরিদ্র অংশই সবচেয়ে বেশি কষাঘাত লাভ করছে, এ কথা অকপটে স্বীকার করছেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বারবার কোনোবল।[৭৬] কিন্তু আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি সমন্বয় প্রক্রিয়ার মূল্য হিসেবে দরিদ্র মানুষের এ ভোগান্তিকে মেনে নিতে পারে না। এ ভোগান্তি সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী বলে যে প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা

গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ভোগান্তি প্রক্রিয়ায় স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও পৌনঃপুনিক মাত্রা গ্রহণ করার সম্ভাবনাই বেশি। সমন্বয়ের ফলাফলের বিষয়ে কোনাবলের মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির প্রস্তাবনার নিরিখেই করা হয়েছে। এখন দেখা প্রয়োজন, মূল্যবোধ নিরপেক্ষ উন্নয়ন অর্থনীতির প্রসারণ পর্যায়ে যে দরিদ্র শ্রেণীকে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে, তাদের কেন আবার নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সমন্বয় প্রক্রিয়ার পর্যায়ে নতুনভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে?

লিবারেলিজমের উপাদানসমূহ

নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সমন্বয় প্রোগ্রামের বুনন হয়েছে লিবারেলিজমের সুতোয়। লিবারেলিজম বস্তুত 'এনলাইটেনমেন্ট' তত্ত্বের ভিতে গড়া। অর্থনীতিবিদদের 'গরীবের অভিভাবক' হবার অনেক বাকবিতণ্ডা সত্ত্বেও তারা এমন কোনো প্রণোদনা ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারক ব্যবস্থাপনার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারেননি, যাতে শক্তিশালী ও বিত্তশালীদের সমন্বয় প্রক্রিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গরীবের উপর না ফেলে নিজেদের হজম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়। কিন্তু দেখা যায়, গরীব মানুষের জীবনযাত্রার উপর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু পরোক্ষভাবে সামান্য লাঘবের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে যে অধিকতর প্রবৃদ্ধির আবহ সৃষ্টি হবে তারই উচ্ছিষ্ট হিসেবে আসবে।

আইএমএফ-এর সমন্বয় প্রোগ্রামে নিওক্লাসিক্যাল লিবারেলিজমের যেসব উপাদান প্রস্তাব করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ (ক) অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা হ্রাস; (খ) বাজার অর্থনীতিকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া; (গ) বৈদেশিক বাণিজ্যকে বিমুক্তকরণ। এ মূল লক্ষ্য পূরণের জন্য স্থিতি ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন করতে হবে। সার্বিক অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা পরিমার্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য বণ্টন ন্যায়পরতার বিষয়টি মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৭৭] অর্থনৈতিক এডজাস্টমেন্ট বা সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়ায় যে বিরূপ বণ্টন বিষয়ক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার নিরসন বৈদেশিক বা আন্ত র্জাতিক আর্থিক সহায়তাপুষ্ট প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য থাকে না, যদিও পরোক্ষভাবে কিছু ইতিবাচক ফল লাভ করা যায়।[৭৮] ফলশ্রুতিতে দেখা যায় সদস্য দেশগুলোর উপর আইএমএফ-এর বার্ষিক কনসাল্টেশন রিপোর্টের কোনোটিতেই দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ বা প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের উপর কোনো আলোচনা নেই। যদি একটি দেশ অভ্যন্তরীণ আয় বৈষম্যকে আরো তীব্রতর করে হলেও বৈদেশিক ভারসাম্যহীনতাকে কমাতে পারে, তবে সেটাই আইএমএফ-এর নিকট অভিনন্দনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ হ্রাস করা হলে কর নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট খাতটি কমানোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যয়ভার হ্রাস করা সম্ভব

হবে। বেসরকারি খাত স্ব-স্বার্থ দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিধায় তা অধিকতর কার্যকর ও বৃহত্তর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। ঋণ প্রসারের লাগাম টেনে ধরা হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাস পাবে। বাজার শক্তিকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার ফলে সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারসহ সকল উৎপাদন উপকরণ, পণ্য ও সেবার মূল্য সঠিক হারে সঠিক খাতে প্রবাহিত হবে। বাজার শক্তিসমূহ সঠিক সংকেত পাওয়ার কারণে উৎপাদন উৎকরণসমূহ সঠিক খাতে প্রবাহিত হতে থাকবে। অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় হ্রাস পাবে। এ নীতির ফলে অধিকাংশ দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেলেও, নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি প্রকৃত মজুরি হ্রাসের এ ধারাকে সমর্থন করে, যদিও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর উপর এতে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।[৭৯] চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্চতর কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির মারফত তা পুষিয়ে যাবে। আন্ত র্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ করে সমন্বয় সাধনকারী উন্নয়নশীল দেশ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের সংরক্ষণ নীতিজনিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংকোচন প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে। সকল আমদানি বাণিজ্যের বাধা তুলে দিতে হবে। আমদানি ও রপ্তানি উভয়কে উৎসাহিত করতে হবে। বাস্তবসম্মত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চলতি বাজেট ঘাটতি এতে হ্রাস পাবে। যদি ট্যারিফ ধার্য করতেই হয়, তা হওয়া উচিত নিম্নমাত্রার ও সুষম। কোনো কিছুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দ্বারা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ সমীচীন হবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে সম্পদ সঞ্চালনে অস্বাভাবিক ও বিকৃত প্রবাহ সৃষ্টি হবে এবং উৎপাদন দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমদানি প্রতিস্থাপনের জন্য শিল্পায়ন নীতির রয়েছে সীমিত সম্ভাবনা। কেননা এর লক্ষ্য হচ্ছে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ দেশীয় বাজার। অপরদিকে রপ্তানির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা নেই। উদারনৈতিক অর্থনৈতিক মতবাদ সরকারি ব্যয় হ্রাসের আহবান জানালেও বাজেটের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের সমস্যাটির দিকে আলোকপাত করে না। দরিদ্র জনগণকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, যোগাযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চয়ের পন্থা নিরূপণের কোনো দিকনির্দেশক আলোচনা এ উদার নৈতিক মতবাদে দেখা যায় না। এমনকি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচির সরবরাহের দিক সংক্রান্ত আলোচনাও প্রধানত সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানির বাস্তবসম্মত মূল্য, সুদের হার, বিনিময় হার এবং করের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদানের মাঝে সীমাবদ্ধ। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনীতির যে পুনর্গঠনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনো আলোকপাত নেই। উন্নয়নশীল দেশের সম্পদ বণ্টনের বিশাল সমস্যাটির নিওক্লাসিক্যাল সমাধান দাঁড়ায় এসব দেশের জন্য বস্তুত একটি ক্ষীণ ও

অনির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর। তা হলো দ্রব্য ও সেবার সঠিক মূল্যের মধ্য দিয়ে বাজার শক্তিসমূহকে সঠিক সংকেত প্রদান করা।

ভুল উদাহরণঃ শুধুমাত্র উদারনৈতিক মতবাদ নয়

নিওক্লাসিক্যাল ব্যবস্থাপত্রের সমর্থনে সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও জাপানের মতো দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর উদাহরণ টানা হয়। এদেশগুলো অর্থনৈতিক দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য রপ্তানিমুখী উদারনৈতিক অর্থনীতির পথ বেছে নেয়। বলা হয়, উদারনীতিবাদ এসব দেশের বেসরকারি খাতকে অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ ও নৈপুণ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ এবং এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। বহির্মুখীতা এসব দেশের রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে এবং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে।

উদারনৈতিক মতবাদ ও রপ্তানিমুখীতা সব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অর্থনৈতিক সাফল্যের সকল কৃতিত্ব এ নীতির একক ফসল বলা ভুল হবে। সাফল্যের আরো অনেক উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। তার কিছু হচ্ছেঃ প্রত্যক্ষ ও বিপুলভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ, ব্যাপক ভূমি সংস্কার ও সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা আনীত সামাজিক সংহতি, স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার; উচ্চমাত্রার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতা এবং রপ্তানি উন্নয়ন ও আমদানি প্রতিস্থাপনভিত্তিক শিল্পায়নের প্রতি সরকারের সক্রিয় সমর্থন। উল্লিখিত সবগুলোই নিওক্লাসিক্যাল মডেলের নিজস্ব উপাদান নয়, বরং এর অনেকগুলোই এ মডেলের সাথে সংঘাতপূর্ণ।

সরকারি ভূমিকা

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এসব দেশের সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একমাত্র হংকং কিছুটা ব্যতিক্রম যেখানে লেইজে ফেয়ার বা মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা হয়েছে। অন্যান্য দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে সরকার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য হস্তক্ষেপ করেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা, ভর্তুকি, বিধিবিধান ও অন্যান্য বিভিন্ন পন্থায় সরকারি পুঁজিবাজার, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বাণিজ্য তথা অর্থনীতির সকল অঙ্গনকে প্রভাবিত করেছে। এসব দেশের সরকারি শিল্প লাইসেন্স, বিদেশী ঋণ ও প্রযুক্তি চুক্তি ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য বাধানিষেধ ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করেছে।[৮০] তাই নিওক্লাসিক্যাল অর্থে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরকে লিবারেল অর্থনীতি বলা যায় না।[৮১] জাপান সম্পর্কে ইয়াসুও মাসাই বলেন, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সীমিত হলেও অর্থনীতির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও

বিস্তৃত। এ নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রশাসনিক বা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হয় না, তা হয় এক সূক্ষ্ম, সুনিপুণ পদ্ধতিতে। শিল্প ও বণিক সমিতির সাথে সরকার সার্বক্ষণিক সংলাপের এক সংযোগ বজায় রাখে, যা একজন বহিরাগতের নিকট বিচিত্র মনে হতে পারে। সরকার পরোক্ষভাবে অথচ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে ব্যাংকের ঋণ দানের সাথে। তাছাড়া অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তথা রপ্তানি, আমদানি, বিনিয়োগ, মূল্য এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও এজেন্সি রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের বিপুল অংশ গ্রহণের আর কোনো প্রয়োজন দেখা যায় না। অন্যান্য মুক্তবাজার অর্থনীতির মতো তাই জাপানী সরকারও অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে অনীহা প্রদর্শনের একটি আবহ বজায় রাখতে পারে।[৮২] সরকারের সক্রিয় ও শক্তিশালী ভূমিকা ব্যতিরেকে এ দেশগুলো উন্নয়নের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারে কিনা সে বিষয়ে তাই সন্দেহের অবকাশ আছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এসব দেশের সরকারের ভূমিকা কখনো বেসরকারি খাতে উদ্যোগ ও উদ্যমকে ব্যাহত করেনি; বরং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হচ্ছে ইতিবাচক। সরকার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে উৎসাহ ও সহায়তা যুগিয়েছে। এ সব দেশের প্রজ্ঞাবান, একনিষ্ঠ ও অগ্রগতিমুখী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশের সার্বিক স্বার্থে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কার্যকর সহায়তা প্রদান করেছে। সরকারের স্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দূরীভূত হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা উজ্জীবিত হয়েছে।

ভূমিসংস্কার এবং সম্পদবন্টন

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দখলদার শক্তি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত সামন্ত শক্তিকে বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধ্বংস করে দেবার লক্ষ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান ব্যাপক ভূমি সংস্কার করে। এ সুদূর প্রসারী সংস্কার কর্মসূচির ফলে এসব দেশে গ্রামীণ আয় বন্টনের মাঝে ন্যায়পরতা এবং গ্রাম ও নগর জীবনযাত্রার মানের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে। এ তিন দেশেই ভূমি সংস্কার এত ব্যাপক ছিল যে, সংস্কার-পূর্ব সমাজের নিয়ামক সামন্ত শক্তির ভিত ধসে পড়ে এবং সামন্ত শক্তির অধিপতি-প্রজা সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। ভূমি সংস্কারের ফলে জাপানে পরিবার প্রতি আবাদী জমির মালিকানা দাঁড়ায় ২.২৫ একর।[৮৩] গত ৩০ বছর যাবত আবাদী জমির পরিবার পিছু মালিকানা একই রকম রয়েছে। ১৯৮৫ সালের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, জাপানে কৃষি খামারের গড় আয়তন ২.৯ একর। মাত্র ৪% কৃষি খামারের ৭.৪১ একরের বেশি জমি রয়েছে।[৮৪] স্যাচস এর মতে 'আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমি সংস্কার হয়েছে এসব দেশে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে এবং তাইওয়ান জাতীয়তাবাদী শক্তির অধীনে থাকায় বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে এ সংস্কার সম্ভব

হয়েছে। সামন্ত প্রভুগণ বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।'[৮৫] ভূমি সংস্কার মূলত সামন্ত শ্রেণীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি অথবা যেখানে প্রদান করা হয়েছে তা ছিল যৎসামান্য।

তিনটি দেশেই যুদ্ধের ফলে সম্পদের বিন্যাস এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে বন্ড ও নগদ টাকার বিপুল মূল্যহ্রাস ভূমি সংস্কারজনিত জমির পুনর্বন্টন ফলাফলকে আরো তীব্রতর করে তোলে। ১৯৪৭ সালে জাপানে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩৩৪%।[৮৬] ১৯৫০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫০০% এবং তাইওয়ানে ৩৪০০%। এসব সম্মিলিত কারণে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বিপুলভাবে হ্রাস পায় এবং বাজার অর্থনীতি ও সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পটভূমি তৈরি হয়। এ অবস্থার বিকাশ না ঘটলে উদারনৈতিক অর্থনৈতিক মতবাদ সম্ভবত আয় বৈষম্য আরো বাড়িয়ে তুলত।

একটি ক্ষুদ্র বিত্তশালী জনপ্রিয়তাহীন সামন্তগোষ্ঠীর স্থলে একটি বড় আকারের কৃষক শ্রেণী গড়ে ওঠার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য কৃষক শ্রেণীর পক্ষে চলে আসে। কৃষক শ্রেণীর নবলব্ধ এ রাজনৈতিক শক্তির কারণে সমর্থনের প্রয়োজনে সরকারের নীতিও তাদের অনুকূলে চালিত হয়। তাছাড়া গ্রামীণ অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কৃষিকে সমর্থন দেয়া সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। ভূমি মালিকানা প্রাপ্তি ও গড়ে ওঠা অবকাঠামোর সুযোগ সুবিধা কৃষকদের কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। কৃষি খামারের আয়তন ছোট বিধায় কৃষকরা উন্নত বীজ, অধিক পরিমাণ সার, উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ প্রভৃতি শ্রমনির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও আয় বাড়াতে সক্ষম হলো। অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটাল, সঞ্চয় বাড়াল এবং শিল্পদ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করল।

লিবারেলিজম নব্য ধনীদের তাদের সঞ্চয় পাশ্চাত্য পুঁজি ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির চালিকা শক্তিতে পরিণত হতে সহায়তা করলো। এর ফলে অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠল। কৃষি ও শিল্প ভারসাম্যমূলকভাবে বিকশিত হলো। যদি লিবারেলিজম না থাকত, তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো এসব দেশের নব্য ধনীরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তে ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত এবং বিদেশে পুঁজি পাচারে লিপ্ত হতো।

সামাজিক সাম্য

ভূমি সংস্কার অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধি বয়ে আনল, তার ফসল সমাজে সুসমভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সামাজিক সাম্যের এক নতুন যুগ শুরু হলো। মিরডালের ভাষায়, 'সামাজিক বৈষম্য সকল প্রকারেই উৎপাদনশীলতার শত্রু'।[৮৭] সামাজিক সাম্য অপ্রয়োজনীয় ভোগ বিলাসের মাত্রা হ্রাস করল। গরীব মানুষের হাতে সম্পদের সঞ্চালন এবং তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নত করল। একটি স্বাস্থ্যবান ও

শিক্ষিত জনশক্তি গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য প্রবৃদ্ধির ভিত রচনা করল। গরীব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস তাদের ক্ষোভ ও হতাশা দূর করে কর্ম ও দক্ষতার উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। ধর্মঘট ও সংঘাতজনিত অপচয় লোপ পেল। স্যাচস এর মতে, ল্যাটিন আমেরিকায় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক আয় বৈষম্য এবং তজ্জনিত সামাজিক সংঘাতের কারণে তথাকার অর্থনৈতিক সাফল্য বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ব্রাজিলে ৫ম ধনীব্যক্তি ৫ম গরীবের চেয়ে ৩৩ গুণ বেশি ধনী। অথচ তাইওয়ানে একই শ্রেণীর একজন ধনী ব্যক্তি অনুরূপ শ্রেণীর একজন দরিদ্র্য ব্যক্তি হতে মাত্র ৪গুণ ধনী। লাতিন আমেরিকায় গড়ে ২০% ধনাঢ্য ব্যক্তি ২১ গুণ বেশি ধনী যেখানে পূর্ব এশিয়ায় একজনের ধনাঢ্যতার মাত্রা মাত্র ৯ গুণ।[৮৮]

শ্রমনিবিড় পদ্ধতি

শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এসব দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈষম্য আরো হ্রাস পেয়ে ন্যায়পরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যে পথ অনুসরণ করেছে, তাইওয়ান তার চেয়ে একটু ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ভূমিকাকে তাইওয়ান সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃহৎ কোম্পানীগুলোকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেয়নি।[৮৯] এ নীতির ফলে শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি আরো বেশি প্রসার লাভ করে। বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বের পরিধি আরো হ্রাস পায়। ক্ষুদ্র কৃষকগণ তাদের গ্রামীণ পটভূমিকায় আয় বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করে। শিল্পোন্নত দেশের সার্বক্ষণিক মাথাব্যথা বেকার সমস্যার এদেশগুলোতে এভাবে সমাধান ঘটে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি গ্রামীণ আয়ের বিপুল স্ফীতি ঘটায়। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান হতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সর্বমোট আয়ের তিন চতুর্থাংশ অকৃষিজাত গ্রামীণ উৎস বলে দেখা যায়।[৯০] এভাবে ১৯৫০ এর দশকের শ্রম-আধিক্যপূর্ণ তাইওয়ান ৭০ এর দশকে শ্রমিক সংকটের দেশে পরিণত হয় অর্থাৎ দেশটিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জিত হয়। শহর ও গ্রামে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ফলে সকল মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ভূমি সংস্কারের দ্বারা ইতঃপূর্বে যে আয়-ন্যায়পরতা অর্জিত হয়েছিল, সে পরিস্থিতি আরো উন্নতি লাভ করে।[৯১] পঞ্চাশের দশকে তাইওয়ানে যে 'গিনি-কোইফিসিয়েন্ট' (Gini coefficient) এর মাত্রা ছিল ০.৫৬, তা ৮০ এর দশকের প্রথম দিকে ০.৩১ এ নেমে আসে।[৯২] যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় তাইওয়ান অধিক আয়-ন্যায়পরতা অর্জন করে। দেশের ২০% ধনাঢ্য ব্যক্তি ও দরিদ্রতম ২০% জনগোষ্ঠীর আয়ের হারের পার্থক্য ১৯৫৩ সালের ২০.৫ থেকে ১৯৮০ সালে ৪.২ এ নেমে আসে। এ হার সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন।[৯৩]

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

এসব দেশের জনগণের সমরূপতা এবং মূল্যবোধ সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান করে। ব্যক্তির দায়িত্ববোধের

উপর এ মূল্যবোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব, মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্ব, বন্ধু ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব। কেউ যদি এ দায়িত্বকে অবহেলা বা অস্বীকার করে, সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। যে সমাজে দায়িত্বের অবস্থান এত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে সামষ্টিক শৃঙ্খলা অতি শক্তিশালী হয়, মালিক শ্রমিকের প্রতি মানবিক আচরণ করে ও তার কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখে। শ্রমিক সজাগভাবে পরিশ্রম করে এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক হয় অতি ঘনিষ্ট। এ ধরনের যে সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উপর স্থান দেয়, তা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির লিবারেলিজমে খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৯৪]

যুদ্ধের পূর্বে এ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো কেন সুপ্ত ছিল তা একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন বটে। উত্তর হচ্ছে, এ ধরনের মূল্যবোধ আচরিত হবার জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। এসব দেশে পরবর্তীতে এ ধরনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে, যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ফল হিসেবে আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরতার আবির্ভাব। চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে ভরা দেশে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের কোনো বালাই বা দায়ভার নেই। কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক সমাজে এ দায়ভার কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধের এ সংস্কৃতির উন্মেষের আরো একটি কারণ হচ্ছে, সবাই জানত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির দাবি কী? এ উপলব্ধির জাগরণ বিলাসিতা পরিহার এবং সহজ সরল জীবনযাপনের এক সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে।[৯৫]

ফলে এসব দেশে পরিমিত ভোগ-ব্যয় এবং উচ্চহারে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮৭ সালে জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল যথাক্রমে আয়ের ৩৩.৪%, ৩০.৭%, ৩৯.৯%, ৩৭.০%। পক্ষান্তরে এ সময়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল আয়ের ১৯.৮%, আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে ১৩.০%, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ১৭.০% এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯.৩%।[৯৬] সঞ্চয়ের এ উচ্চহার পুঁজি গঠন এবং পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের জোগান দিলো। এসব দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যে সঞ্চয়ের এ উচ্চহারের অবদান কোনোভাবে খাটো করে দেখা যায় না। উচ্চহারের কারণে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি বা বিদেশী ঋণ গ্রহণ ছাড়াই সরকারি ও বেসরকারি খাত তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে অর্থ যোগান দিতে পেরেছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ছিল বিধায় বাজারে এ দেশগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বিদেশী ঋণের সুদের ভারে এ দেশগুলো জর্জরিত হলো না এবং দেশীয় চাহিদা পূরণ রপ্তানিমুখী অগ্রগামী এক অর্থনীতির শক্ত ভিত গড়ে উঠল।

আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি উন্নয়ন

সামাজিক মূলবোধগুলো এসব দেশে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাসে সহায়তা করল। পক্ষান্তরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এ সঞ্চয় যোগাড় করা হলো উচ্চ আমদানি শুল্ক ও কঠোর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। যার ফলে সৃষ্টি হলো চোরাচালান, আন্ডার ইনভয়েসিং এবং দুর্নীতি। এসব দেশের মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণে ভোগ ব্যয়ে সংযম ও কৃচ্ছ্রতাসাধন কোনোটাই জোর করে করা হয়নি; বরং সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা তা উজ্জীবিত ছিল। আমদানি নিয়ন্ত্রণের উপর কঠোর কোনো বিধিবিধান না থাকা সত্ত্বেও এসব দেশ আমদানিমুখী না হয়ে রপ্তানি বহুমুখীকরণের স্পৃহার দিকে উদ্বুদ্ধ ও তাড়িত হয়েছিল।[৯৭] জাপানের বিষয়ে লেস্টার থুরোর পর্যবেক্ষণ এখানে প্রণিধানযোগ্য, 'জাপানে শিল্পফার্মগুলো তাদের নিকটতম সরবরাহকারীদের সাথে শিল্প যন্ত্রাংশের যখন যা প্রয়োজন, তখন তা সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে সরবরাহের বিষয়ে এমন দীর্ঘকালীন নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখে যে, নতুন কোনো বিদেশী ফার্মের জাপানী বাজারে প্রবেশের কোনো সুযোগই ছিল না'।[৯৮]

তবে এসব দেশের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকাকে অত্যধিক ফলাও করে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি জাপানে একটি নতুন বিষয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জাপান ছিল একটি বাণিজ্য ঘাটতির দেশ। দেশীয় বাজারের চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই জাপানী কোম্পানীগুলো প্রথমত সফলতা অর্জন করে। অপরদিকে কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক যে উৎপাদন খরচ কমে আসে, সে সুযোগ গ্রহণ করে জাপান রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করে। অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদাই শেষতক রপ্তানিমুখীতা সৃষ্টিতে সফলতা এনে দিয়েছে। উল্টোভাবে নয় অর্থাৎ প্রথমেই রপ্তানির দ্বারা জাপান সাফল্যের মুখ দেখেনি। কোরিয়া, তাইওয়ান ও আরো অনেক দেশ যারা রপ্তানি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে, তারা সবাই প্রথম পর্যায়ে আমদানি প্রতিস্থাপনের পথ অনুসরণ করেছে।[৯৯] এসব দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা আমদানি প্রতিস্থাপন থেকে রপ্তানি উন্নয়নের দিকে মোড় নেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে উপার্জিত সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার সবটুকু বিদেশী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় হতো। অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হয়। শিল্পায়নের জন্য সংরক্ষণবাদী নীতির প্রয়োজন নেই মর্মে সম্প্রতি যে মতামত ব্যক্ত করা হচ্ছে তা তথ্য নির্ভর নয়। জার্মান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপান পর্যন্ত সকল ঐতিহাসিক উদাহরণ হতে দেখা যায় যে, এসব দেশে সংরক্ষণবাদী শিল্পনীতির মাধ্যমেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে। এমনকি এখনো এসব দেশসমূহ শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সংরক্ষণবাদী নীতি প্রয়োগ করছে, 'যা উন্নত

দেশগুলো করেনি এবং এখনো করছে না, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে করতে বলা অবাস্তব পরামর্শ মাত্র।

নিম্নমাত্রার প্রতিরক্ষা ব্যয়

জাপানী পাবলিক ফিন্যান্সের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পমাত্রার প্রতিরক্ষা ব্যয়। জাতীয় আয়ের ১% এরও কম প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যয় হচ্ছে জাতীয় আয়ের ৪% এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় আয়ের ৩%।[১০০] সামরিক খাতে স্বল্প ব্যয়ের কারণে জাপানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থনৈতিক সম্পদ অবমুক্তি লাভ করে। ফলে সরকারি ব্যয় নিম্ন পর্যায়ে রাখা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়। তাছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় করহার নিচু পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। ১৯৭৫ সালে জাপানে সর্বমোট করের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ২১% এবং ১৯৮৮ সালে ৩১.৩%। পক্ষান্তরে এ সময়কালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে করের মাত্রা ছিল জাতীয় আয়ের ৩.৩% এবং ৪০.৮%।[১০১] জাপানের তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে প্রতিরক্ষা খাতে তুলনামূলকভাবে অধিক অর্থ বরাদ্দ হলেও বাজেটের এ বাড়তি বোঝা বৈদেশিক সাহায্য, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত, দ্বারা লাঘব হয়।

ভবিষ্যতের ছবি

সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এসব দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষত প্রবৃদ্ধি ও ন্যায়পরতার লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পশ্চাতে অনেকগুলো কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ সমস্ত কারণগুলোর সূতিকাগার হিসেবে একমাত্র উদারনীতিবাদকে কৃতিত্ব দেয়া সঠিক হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এ সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে যে ন্যায়পরতা অর্জন করতে পেয়েছে, তা ভবিষ্যতেও ধরে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা। কতিপয় কারণে এসব দেশে আয়-ন্যায্যতা ভারসাম্য সম্প্রতি যেভাবে হ্রাস পেয়েছে তাতে নেতিবাচক উত্তরই পাওয়া যায়।

দক্ষিণ কোরিয়া শিল্প খাতে বৃহদায়তন পরিবার পরিচালিত বিশালাকৃতির কোম্পানী বা কনগ্লোমারেট্স এর পথ ধরেছে। সরকারি সহায়তা ও ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণের মাধ্যমে কোরিয়ান কনগ্লোমারেটসমূহ উত্তরোত্তর বৃহদাকৃতি ধারণ করেছে। ১৯৮৪ সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, জাতীয় আয়ের ৬৪% এবং রপ্তানির ৭০% নিয়ন্ত্রণ করছে বৃহৎ ১০টি কনগ্লোমারেট।[১০২] কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শ্রমঘন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রামীণ এলাকায় নয়, শুধু শহরাঞ্চলেই লভ্য। ফলে গ্রামাঞ্চল হতে শহরাঞ্চলে বিপুল মানুষের অভিবাসন ঘটেছে। তাইওয়ানের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি।[১০৩] দক্ষিণ কোরিয়ায় দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ সিউল, পুসান, টায়ীগু এবং ইনচোন নামক চারটি বৃহৎ শহরে ঠাসাঠাসি করে বাস করছে। ফলে শহর কেন্দ্রগুলোর গৃহায়ন ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার উপর সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড চাপ। গ্রাম থেকে ছুটে

আসা মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ। দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃহৎ শিল্প পরিবারের উত্থান আয় বৈষম্যকে তীব্রতর করে তুলছে। ১৯৬৫ সালে নিচের দিকের ৪০% মানুষের আয়ের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের ১৯.৩%, যা ১৯৮৭ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৯% এ। একই সময় ব্যবধানে উপর দিকের ২০% মানুষের আয় ৪১.৮% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫.৩% এ দাঁড়িয়েছে।[১০৪]

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়-বণ্টন অনেক বেশি ন্যায়পরতাপূর্ণ হলেও শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে কনগ্লোমারেট পদ্ধতিকে বেছে নেয়ার কারণে আয় বৈষম্য, বিলাস ব্যয় এবং শ্রমিক সংঘাতের বীজ রোপিত হয়েছে। ১৯৮১-৮৫ সময়কালে প্রতি বছর ধর্মঘট হয়েছে গড়ে ১০০টি। ১৯৮৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ২৭৬টি। ১৯৮৭ সালে ধর্মঘট সীমা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০৮টিতে।[১০৫] এতে প্রমাণিত হয়, ভূমি সংস্কার ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা অর্জিত আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতার মাধ্যমে যে সুষম শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা শহরাঞ্চলে আগত শ্রমিকদের দুর্দশা ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের দ্বারা ভগ্নদশা লাভ করেছে। "সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, তার দিকে লক্ষ্য না করে কোরিয়া তিন দশক যাবত কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথেই ধাবিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এখন পরিবর্তন ঘটেছে"।[১০৬] পারভেজ হাসান যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'পশ্চাৎপদ গ্রামীণ অর্থনীতি ও শহরাঞ্চলের দিকে মানুষের অত্যধিক অভিবাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা গ্রামীণ ও নগর উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'[১০৭]

জাপানের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্যের একটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাইবাৎসু নামধারী বৃহৎ শিল্প পরিবারগুলোর বিলুপ্তি ও ভূমি সংস্কার সমাজে অর্থনৈতিক শক্তিকে যেভাবে সুষমভাবে বণ্টন করে দিয়েছিল, তাতে মুষ্টিমেয় পরিবারের পক্ষে আর দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির অসংখ্য শিল্প ইউনিট গড়ে উঠল এবং তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সৃষ্টি হলো। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাপানের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে ওঠা সম্ভব হলো। কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষের দিকে Elimination of Excessive Concentration of Economic Power Law-এর কার্যকারিতা প্রায় লোপ পায় এবং পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ আইন বাতিল করা হয়। ফলশ্রুতিতে মিতসুবিসি, মিতসুই, সুমিতোমো নামে প্রাক্তন জাইবাৎসু পরিবারগুলোর পূর্বতন অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে পুনরাবির্ভাব ঘটে।[১০৮] যদিও এ কোম্পানীগুলোর গঠন প্রণালী জাইবাৎসু সময়কাল হতে ভিন্ন; তবু তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করছে। ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়কারী জাইবাৎসু ব্যাংকসমূহ এ কোম্পানীগুলোর ধাত্রী হিসেবে কাজ করল। অর্থনীতির উপর এদের ব্যাপক প্রভাব ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকবে।[১০৯]

জাপানে ক্ষুদ্র ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটলেও মোট বিক্রয়ে তাদের হিস্যা কমে এসেছে।[১১০] এসব ব্যবসা-ফার্মের অধিকাংশের নিজস্ব মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা নেই। ব্যাংকিং ব্যবসা ছাড়া বড় বড় ব্যবসায়ী ফার্মের আনুকূল্যের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কিছু হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটাচ্ছে। সম্পদের কুক্ষিগতকরণ জাইবাৎসু সময়ের সমমাত্রার না হলেও এর প্রবণতা সেদিকেই যাচ্ছে।[১১১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বড় বড় বিত্তশালীদের অবলুপ্তির মাত্র চার দশকের মধ্যে বর্তমানে বিশ্বের প্রথম দশজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন জাপানের।[১১২] এ রকম বিশাল ধনশালী ব্যক্তিদের পক্ষে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলাই স্বাভাবিক।[১১৩] জাপানে 'এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড এ্যাক্ট' সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবনকে এবং 'লার্জ স্কেল রিটেইল স্টোর ল' খুচরা ব্যবসা সেক্টরে বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থার অনুপ্রবেশকে রুদ্ধ করেছিল। জাপানের চলমান উদারনীতিকরণ নীতির ফলে, বিশেষত যদি উপযুক্ত এ্যাক্ট দু'টি বাতিল বা তাদের কার্যকারিতা হ্রাস করা হয় তবে, সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ আরো বৃদ্ধি পাবে।

এসব দেশের সঞ্চয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এখন শেয়ার বাজার ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। শেয়ার ও জমির মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ বাড়ছে। ১৯৫০ সালে 'নিক্কেই ইনডেক্স' ছিল ১০২, যা বেড়ে ১৯৬০ সালে ১,১১৭; ১৯৭০ সালে ২,১৯৩; ১৯৮০ সালে ৬,৮৭০ এবং ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে ধ্বসের পূর্বে ২৬,৬৪৬। অন্যান্য বড় স্টক মার্কেটের তুলনায় জাপানে অবশ্যই দ্রুত বাজার দর ফিরে আসে এবং ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সালে ইনডেক্স ৩৮,৯১৬ তে এসে দাঁড়ায়।[১১৪] জাপানে প্রতি চার বছর অন্তর শেয়ার দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। জাপানী ইক্যুইটির মূল্য ও আয়ের হার তাই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হার ১৯৭০ সালে ছিল ১০.৭, যা বেড়ে ১৯৮০ সালে হয়েছে ১৯.১ এবং ১৯৮৮ সালে ৬১.৪। জুলাই ১৯৮৯ সালে এ হার মূলত সুদের হার বৃদ্ধির জন্য ৫০.৪ এ নেমে আসে। জুলাই, ১৯৮৯-এ কতিপয় বৃহৎ দেশের স্টকের তুলনামূলক মূল্য ও আয়ের হার ছিল যুক্তরাষ্ট্রে ১৩.৩; যুক্তরাজ্যে ১১.৭; পশ্চিম জার্মানীতে ১৫.৭ এবং ফ্রান্সে ১২.৫।[১১৫] জাপানী স্টকের মূল্য ও আয়ের অতি উচ্চহারের মধ্যে সংকটের বীজ লুকায়িত আছে, যা যে কোনো সময়, শুধু জাপানী অর্থনীতিতে নয় বরং বিশ্ব মুদ্রাবাজার ব্যবস্থায় অশনি সংকেত ডেকে আনতে পারে।

জাপানে জমির মূল্য তীব্রভাবে বেড়েছে। ছয়টি বড় শহরে বাণিজ্য, বসতি বা শিল্প স্থাপনে ব্যবহারের জন্য জমির গড় দাম প্রতি চার বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১৬] শিল্প, বাণিজ্য বা বসতবাড়ি সম্পত্তি জাপানে এত বেশি ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের বাইরে চলে গেছে। একদিন তাদের বসতবাড়ি বা ব্যবসা বাণিজ্য হবে, সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। অফিস ও জায়গাজমির উর্ধমূল্যের দরুণ

দ্রব্যসামগ্রীর দামও বেড়ে গেছে। ফলে মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। জাপান বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়েনের অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা তার বৈদেশিক বিনিময় হারের চেয়ে কম।

শেয়ার ও সম্পত্তির ফটকাবাজার তাতে থেমে নেই। যাদের অতিরিক্ত জামানত দেবার সামর্থ্য আছে, তারা ব্যাংক হতে ফটকাবাজারে বিনিয়োগের জন্য প্রচুর ঋণ পাচ্ছে। এ ফটকাবাজার বিস্ফোরণ সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এখানকার নব্য ধনীদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন ধরনের। তারা ভোগবিলাসে অজস্র খরচ করে সামাজিক বৈষম্যকে আরো দৃশ্যমান ও তীক্ষ্ণ করার মাধ্যমে সামাজিক সেই সংযোগ সূত্রকে শিথিল করে দেয়, যা সামাজিক সংহতিকে জোরদার করে রেখেছিল।[১১৭] একই ফটকাবাজার বিস্ফোরণ দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানেও আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে।[১১৮]

তাই দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসব দেশ ন্যায়পরতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হলেও পুঁজিবাদী অর্থ কাঠামোর মধ্যে থেকে আর্থ-সামাজিক ইনসাফকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হলেও সমগ্র অর্থনীতিকে ন্যায়পরতার লক্ষ্যে পুনর্গঠন না করা হলে আয় ও সম্পদ বৈষম্য আবার সমাজে জেগে উঠবেই। অর্থনীতির বিশেষ করে অর্থব্যবস্থার এরূপ পুনর্গঠন কিভাবে করা যায় তা পরবর্তী ৮-১০ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

হারানো সূত্র

দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ন্যায়পরতা পাশাপাশি অর্জন করতে সমর্থ হলেও এর পশ্চাতে উদারনীতিবাদের ভূমিকাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা ভুল হবে। এমনকি নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণও স্বীকার করেন যে, বাজার অর্থনীতির উপর জোর প্রদানের অর্থ এ নয় যে, বাজার ব্যবস্থার যে কোনো ফলাফলকে সরকার মেনে নেবে; বরং এটাই কাম্য যে, সরকার বাজার মূল্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা চালাবে।[১১৯] দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, নিওক্লাসিক্যাল উদারনীতিবাদের প্রয়োগের পাশাপাশি বাজার ও মূল্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ন্যায়পরতার লক্ষ্যকে ধরে রাখা যায়নি।

দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিরাজিত অধিকতর ন্যায়পরতার কারণ উদারনীতিবাদ নয়। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশেষ অবস্থা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সরকারি নীতি এর কারণ। স্বাভাবিক শান্তিকালীন সময়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ন্যায়পরতা সৃষ্টিকারী অবস্থাসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব নয়। ন্যায়পরতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র নিওক্লাসিকাল উদারনীতিবাদের প্রয়োগে আয় বৈষম্যের অবনতি সৃষ্টি করবে। এমনকি যদি

অন্যান্য দেশে অনুরূপ সঞ্চয়ধর্মী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিরাজও করে, তবু বর্তমান পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার আগ্রাসন, ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয় ও বিপুল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য তার কার্যকারিতাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। এসব দেশের আজকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিভাবে সামাজিক আয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতা অর্জন ও বজায় রাখা যায়।

আয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতাকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা সত্ত্বেও এসব দেশ তা অর্জনের কার্যকর কৌশল উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়েছে। পঁচিশ বছরে উন্নয়ন পরিক্রমাকে অধ্যয়ন করে মোরওয়েটজ মন্তব্য করেছেন, 'কিভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় এবং এ জন্য কি নীতি অনুসরণ করতে হবে এ বিষয়ে প্রচুর ও অনায়াসলব্ধ অর্থনৈতিক আলোচনা সমৃদ্ধ লেখা রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের ফসলকে কিভাবে জনগণের মাঝে সুষমভাবে বণ্টন করতে হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক কোনো আলোচনা দেখা যায় না'।[১২০] যদিও এক দশকেরও আগে এ মন্তব্য করা হয়েছে, তবু আজকের জন্যও একথা সত্য। বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মূলত প্রবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করা হচ্ছে। ফিল্ডস যথার্থভাবে বলেছেন, 'দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধারণভাবে দারিদ্র্য হ্রাস করলেও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন যথেষ্ট নয়... অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বৈষম্য হ্রাস পাবে কী বৃদ্ধি পাবে, তা মাথাপিছু গড় আয়ের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে কী ধরনের উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তার উপর'।[১২১] বৈষম্য হ্রাসের জন্য কার্যকর কর্মসূচি প্রদানের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সাম্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ আসলে ফ্যাশন নির্ভর সমাজের আরেকটি ফ্যাশন মাত্র।[১২২] এ অনুভূতিটি আরো তীব্রতর হয়, যখন দেখা যায় নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের একটি বিরাট অংশ ন্যায়পরতা অর্জনকে নীতিমালার মূল লক্ষ্য হিসেবে ধার্য না করে তাকে অনুসৃত নীতির পরোক্ষ লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। ন্যায়পরতা অর্জনের উপর পর্যাপ্ত আলোচনার অভাব বস্তুত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের এ বিষয়ের আলোচনার প্রতি অনীহার ফসল মাত্র।[১২৩] ন্যায়পরতা অর্জনের জন্য কার্যকর কৌশল দাবি করে সামাজিক উদ্দীপনার জাগরণ, সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে উৎসাহ প্রদান এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে তা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ন্যায়পরতা অর্জনের উপযুক্ত পন্থা যদি কেউ বাতলেও দেয় তবুও অন্যরা গ্রহণ করবে কেন? মিয়ারের ভাষায় উন্নয়ন অর্থনীতির সবচেয়ে অসমৃদ্ধ অংশ হচ্ছে, কিভাবে যথাযথ নীতিমালার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে তার দিকনির্দেশ করতে না পারা।[১২৪] পন্থা বাতলানো সহজ হলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন সত্যি কঠিন। এর কারণ বলতে যেয়ে মিয়ার বলেছেন, 'এমন একটি নীতিমালা বা কর্মসূচি পাওয়া দুষ্কর যাতে সবাই লাভবান হয়। যে কোনো কর্মসূচি হতে কেউ লাভবান হবে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটাই স্বাভাবিক'।[১২৫] তাই এমন একটি কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন, যা কোনো কর্মসূচির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদেরও সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি এখানে ব্যর্থ হয়েছে। এ মতবাদ প্রদত্ত কর্মসূচি কার্যকর হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের অনুকূলে থেকেছে। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের জন্য ধাবিত হবে এ ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষম বণ্টন আনয়ন করা যায় না। এ ধরনের অর্থনৈতিক আচরণ বস্তুত বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সুষম বণ্টন দাবি করে সামাজিক স্বার্থে নিছক ব্যক্তিস্বার্থের কিছু ছাড় দেবার স্পৃহা। নিওক্লাসিক্যাল মডেলে সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি ততদূর পর্যন্ত হবে, যতদূর তা ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয়। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ উদারনীতিবাদ আত্মত্যাগ স্বীকার করে, সামাজিক স্বার্থরক্ষার কোনো তাগিদ সৃষ্টি করে না। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের মানুষের আয় যদি সুষমভাবে বণ্টন করা হতো, তবে বর্তমান খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বারাই প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশুকে প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালরি এবং ৬৫ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করা যেত, যা সর্বোচ্চ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।[১২৬] কিন্তু দেখা গেছে ১৯৬৫ সালে মাথাপিছু যে ক্যালরি ছিল তার তুলনায় ১৯৮৫ সালে মাথাপিছু ক্যালরি অনেক কম।[১২৭]

মানুষের অভাব রয়েছে এর কারণ এ নয় যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হয়নি; বরং এটাই যে, তার সুষম বণ্টনের কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। নিওক্লাসিক্যাল মডেল সম্পদের সুষম বণ্টন সৃষ্টি করতে পারেনি। যদি এ মডেলের তা করার সামর্থ্য থাকত, তবে যেসব অধিক সম্পদ ও সমৃদ্ধিশালী উন্নত দেশসমূহে এ মডেলের প্রয়োগ হয়েছে, সেসব দেশে সম্পদের সুষম বণ্টন অর্জিত হতো। তাহলে এসব দেশের উন্নয়ন কমিটিসমূহকে এ কথা স্বীকার করতে হতো না যে, 'দারিদ্র্য দূরীকরণে সমস্যাটির নিরসন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে'।[১২৮] নিওক্লাসিক্যাল মডেলের ন্যায়পরতা অর্জনের ব্যর্থতাই সমাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রও অধিকাংশ দেশেই ন্যায়পরতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রের অধিকতর ব্যর্থতা হচ্ছে, অধিকাংশ দেশে সমাজতন্ত্র উৎপাদন দক্ষতাও অর্জন করতে পারেনি। আয় ন্যায়পরতার লক্ষ্য অর্জন যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের জরুরি আর্থ-সামাজিক ম্যান্ডেট, তাই যে নিওক্লাসিক্যাল মডেল অতীতে এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তার পুনরুজ্জীবন দ্বারা নতুন কিছু আশা করা যায় না।

নিওক্লাসিক্যাল মডেলের দিকে পুনরায় ফিরে গেলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে আয়-বৈষম্য বিরাজমান, সে অবস্থার কোনো উন্নতি সাধিত হবে না। বরং সংকট ও অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তীব্রতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সংকট এমন আকার নিতে পারে যাতে উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে এক ক্রুদ্ধ স্রোতধারা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, উদারনীতিবাদ বিরোধী এ স্রোতধারা উন্নয়নীল দেশসমূহে ন্যায়পরতার লক্ষ্য অর্জনে কী সফল হবে, যখন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উন্নয়নশীল ও সমাজতান্ত্রিক উভয় শিবিরেই উদারনীতি বিরোধী মতবাদ ন্যায়পরতার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

তাই দুটি মতবাদের মাঝে ফুটবলের মতো ছোটাছুটি করার পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে নিজের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনের আলোকে নিজস্ব উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

নোট ও তথ্য নির্দেশিকা (চতুর্থ অধ্যায়)

১. E. E. Hagen, *On the Theory of Social Change* (1962), p. 36 আরো দেখুন H. W. Arndt, "Development Economics Before 1945", in Jagdish Bhagwati and Richard Eckaus, *Development and Planning: Essay in Honour of Paul Rosenstein Rodan* (1972), pp.13-29.

২. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, K. Mandelbaum, *The Industrialisation of Backward Areas* (1945); United Nations, *Measures for the Economic Development of Unerdeveloped Countries* (1951); Paul Baran, "On the Political Economy of Backwardness", *The Manchester School of Economics and Social Studies,* January 1952, pp. 66-84; Bert F. Hoselitz. *The Progress of Underdeveloped Areas* (1952); Moses Abramovitz, "Economics of Growth. In B. F. Haley, A Survey of Contemporary Economics (1952), vol. 2, pp. 132-82; and Jacob Viner, *International Trade and Economic Development* (1952). আরো দেখুন, David Morawetz, "*Twenty-five Years of Economic Development*": *1950 to 1975* (1977).

৩. D. Colman and F. Nixson, *Economics of Change in Less Developed Countries* (1986), p. vi

৪. Deepak Lal, *The Poverty of Development Economics* (1984): Ian M. D. Little, *Economic Development: Theory, Policy and International Relations* (1982); Albert O. Hirschman, "The Rise and Decline of Development Economics," in Gersovitz, Diaz-Alejandro, Ranis and Rosenweig, (eds.), *The Theory and Experience of Economic Development* (1982): Henry Bruton, "The Search for a Development Economics", *World Development, Oct/Nov* (13); and Paul Streeten, *Development Perspectives* (1981).

৫. দেখুন H. W. Arndt, *Economic Development: The History of an Idea* (1987)

৬. United Nations, *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries* (1951), pp. 13-16.

৭. দেখুন, C. P. Kindleberger, "Review of The Economy of Turkey; The Economic Development of Guatemala: Report on Cuba", *Review of Economics and Statistics,* November 1952, pp. 391-2; and Joseph p. Spengler, "IBRD Mission, Growth Theory". *American Economic Review,* May 1954, pp. 586-7.

৮. Eugene Staley, *The Future of Underdeveloped Countries* (1954), pp. 4,21 and 24; আরো দেখুন, Bert F. Hoselitz, *Sociological Aspects of Economic Growth* (1960), p. 56. Staley সম্পর্কে Arndt বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিপাদ্যকে আমেরিকানদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে স্ট্যালির অবদান অন্য যে কোনো ব্যক্তির চাইতে বেশি। দেখুন, Arndt. in Bhagwati Eckaus (1972), p. 26.

৯. Gunnar Myrdal, *Asian Drama* (1968), Vol. 2, p.73 Streeten এর মতে Gunnar Myrdal এর Asian Drama গ্রন্থটিতে সার্বিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি হতাশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে (Paul Streeten, *Development Perspective,* 1981, p.425). Myrdal এর 'আধুনিকতার আদর্শ' হচ্ছে যুক্তিবোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা, দক্ষতা, পরিশ্রম, সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, মিতব্যয়িতা, নৈতিক সততা, কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিবাদিতা, পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি, সুযোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা, বলিষ্ঠ উদ্যোগ, সততা ও আত্ম-নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সদিচ্ছা। আশ্চর্যজনক বিষয় যে, Myrdal কিভাবে এটা বিশ্বাস করলেন যে, এ সকল আদর্শ পাশ্চাত্যের কাছে 'স্বদেশী' এবং সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোর (মুসলিম দেশগুলোসহ) কাছে 'বিদেশী' (Myrdal, *ibid.,* vol. 1, pp. 57-69)

১০. Ragnar Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries,* (1953), p. 4.

১১. দেখুন H. W. Singer, "Economic Progress in Developed Countries" '*Social Research,* March 1949.' আরো দেখুন Gunnar Myrdal, *Rich, Lands and Poor* (1957), pp. 11-38, and *Asian Drama* (1968), Vol. 3, pp. 1844-5

১২. প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। পর্যালোচনার জন্য দেখুন, Bert F. Hoselitz, "Theories of Stages of Economic Growth", in B. F. Hoselitz, *et al., Theories of Economic Growth* (1960), pp. 193-238.

১৩. উদাহরণস্বরূপ বিশেষ কতিপয় দেশের নেতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে দেখুন, IBRD The Basis of Programme for Columbia (1950); Willard Thorp,"Some Basic Policy Issues in Economic Development". *American Economic Review,* May 1951, pp. 407-17; G. E. Britnell, "Factors in The Economic Development of Ceylon", *American Economic Review*, May 1953, pp. 115-25. আরো দেখুন W. A. Lewis, "A Reuiew of Economic Development", *Manchester School*, May 1965, pp. 1-16.

১৪. H. F. Williamson in his Comments on the Abramovitz Paper in Haley (1952), vol. 2.p. 182.

১৫. W. Arthur Lewis, "Reflections on Development", in Gustav Ranis and T. Paul Schultz, *The State of Development Economics; Progress and Perspectives* (1988), pp. 3-14 and 16-19.

১৬. Harvey Leibenstein, *Economic Backwardness and Economic Growth* (1957), pp. 96, 98.

১৭. *Ibid.*, p. 96.

১৮. সমাজতান্ত্রিক কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন উপাদান সমৃদ্ধ রচনা যে সকল অর্থনীতিবিদ লিখেছেন তারা হলেন ঃ Nurkse, Myrdal, Hirschman, Balogh, Rosenstein Rodan, Chenery, Prebisch, Singer and Streeten. আরো যে সকল লেখক বাজার ব্যবস্থাকে সুপিরিয়র হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারা হলেন ঃ Haberler, Viner, Bauer and Yamey, and Schultz. দেখুন Deepak Lal এর, *The Poverty of Develoment Economics* (1983). p. 5.

১৯. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Albert Hirschmen, "The Rise and Decline of Development Economics", in *Essays in Trespassing* (1981); and Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (1957)

২০. দেখুন, W. W. Rostow, "Take-off into Self-sustained Economic Growth", *Economic Journal*, March 1986.

২১. রাশিয়ার সূত্র থেকে স্টালিনীয় মডেল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, Dong Fureng, "Development Theory and Problems of Socialist Development Economics", in Ranis and Schultz (1988), pp. 235-7.

২২. Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (1953), p. 13.

২৩. P. N. Rosentein-Rodan, "Notes on the Theory of the Big Push" in Howar S. Ellis, ed., *Economic Development of Latin America* (1961), p. 1.

২৪. Myrdal, *Asian Drama* (1968), 3, p. 1899.

২৫. *Ibid.*, p. 1900.

২৬. M. L. Qureshi, *Strategy of Industrial Planning and Development in Pakistan* (1965). p.6.

২৭. Gottfried Haberler "Liberal and Illiberal Development Policy," in Gerald M. Meier, (ed.) *Pioneers in Development* (1987), p. 6.

২৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আয় বণ্টনের উন্নতির বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। দেখুন, William R. Cline, *Potential Effects of Income Redistribution on Economic Growth* (1973). Chapter 2.

২৯. Government of India, Planning Comission, *The First Five Year Plan: A Summary* (1952), p. 8.

৩০. Government of Pakistan, *The Constitution of Republic of Pakistan*, (1962), p. 13.

৩১. Government of Pakistan, National Planning Board, *The First Five Year Plan 1955-60*,(1957), pp. 1 ff: and *The Second Five Year Plan 1960-65* (1960), pp. xv, 1.

৩২. Arthur W. Lewis, *The Theory of Economic Growth* (1955), p. 9.

৩৩. Peter T. Bauer and Basil S. Yamey, *The Economics of Underdeveloped Countries* (1957), p. 168.

৩৪. United Nations, ECAFE, "Criteria for Allocating Investment Resources among Various Fields of Development in Underdeveloped Countries", June 1961, p. 30.

৩৫. Harry G. Johnson, *Money, Trade and Economic Growth* (1962), p. 159.

৩৬. G. Fields, "Income Distribution and Economic Growth", in Ranis and Schultz (1988). p. 460; Irma Adelman and Erik Thorbecke (eds.), *Theory and Design of Economic Development* (1966).

৩৭. Bauer and Yamey (1957), p. 168, আরো দেখুন, W. Galenson and H. Leibenstein, "Investment Criteria, Productivity and Economic Development", *Quarterly Journal of Economics*, August 1955, pp. 343-70.

৩৮. Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, March 1955; "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VIII. Distribution of Income by Size," *Economic Development and Cultural Change,* January 1963; and *Modern Economic Growth* (1966).

৩৯. দেখুন, J. G. Williamson and P.H. Lindert, *American Inequality: A Macro-Economic History* (1980); J. G. Williamson, *Did British Capitalism Breed Inequality?* (1985); and J. G. Williamson, "The Historical Content of the Classical Labour Surplus Model", *Pollution and Development Review*, June 1985, pp. 171-91. আরো দেখুন, Williamson's Comments on Lewis' Paper in Ranis and Schultz (1987), p. 29.

৪০. Bauer and Yamey (1957), p. 206, see also p. 168.

৪১. W. Arthur Lewis, *The Theory of Economic Growth* (1955).

৪২. "Strategy of the Third Plan", *Problems in the Third Plan : A Critical Miscellany,* p. 50.

৪৩. Mahboobul Haq. *The Strategy of Economic Planning: A Case Study of Pakistan* (1963) p. 30.

৪৪. Myrdal, *Asian Drama* (1968), Vol. 2, p. 740.

৪৫. *Ibid.*, p. 808.

৪৬. *Ibid.*, p. 807.

৪৭. এরূপ একজন অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন Gunnar Myrdal. তিনি তাঁর সকল লেখায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়পরতার কথা বলেছেন; বিশেষ করে তার *Asian Drama* (১৯৬৮) গ্রন্থে।

৪৮. Morawetz (1977), p. 9.

৪৯. বিষয়টি এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট হবে ঃ Y=C+I+G+X-M, যেখানে Y=gross domestic product; C=consumption; I=gross domestic investment; G=government spending; X=exports; and M=imports. যদি C+I+G=A, যেখানে A হলো gross domestic absorption, তখন Y=(A-M)+ X উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা করছে, সেখানে সফল কৌশল হলো Y বৃদ্ধি করা এবং ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার জন্য শুধু X বৃদ্ধি করাই নয়, বরং (A-M) কেও বাড়াতে হবে, যা কিনা অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার অভ্যন্তরীণ ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু অভ্যন্তরীণ ভোগ কমানোর জন্য A এর দরকার, সেহেতু (A-M) বৃদ্ধির জন্য A এর সমানুপাতের চাইতে M কে কমাতে হবে। অবশ্য এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমদানি-বিকল্প একটি পথ হতে পারে; কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বিলাস পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে, যাতে করে অত্যাবশ্যকীয় ও মূলধনী দ্রব্য প্রত্যাশিত পরিমাণে আমদানি করা যায়।

৫০. Douglas Dosser, "General Investment Criteria for Less Developed Countries", *Scottish Journal of Political Economy*, June 1962, pp. 93-8

৫১. Hla Myint, "Neoclassical Development Analysis: Its Strengths and Limitations", in Meier (1987), p. 118.

৫২. দেখুন ILO, *Employment Objectives in Economic Development: Report of a Meeting of Experts* (1961), pp, 28-32.

৫৩. UNCTADs 1989 *Trade and Development Report* এ ধারণার সমর্থনে এগিয়ে এসে বলেছে যে, বাণিজ্য নীতি সংস্কার উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৮০ সালের দিকে ৩২টি উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য নীতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অনুকূল রপ্তানি পরিস্থিতি সার্বিকভাবে ভালো অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আরো দেখুন "Export Reforms No Guarantee of Economic Growth", *Financial Times,* 6 September 1989, p. 6.

৫৪. *The Economist*, 22 July 1989, p. 65.

৫৫. Clemens Boonekamp, "Industrial Policies of Industrial Countries," *Finance and Development*, March 1989, p. 10.

৫৬. Peter Winglee, "Agricultural Trade Policies of Industrial Countries", *Finance and Development*, March 1989, p. 6.

৫৭. দেখুন Sam Laird and Alexander Yeats, "Non-tariff Barriers of Development Countries, 1966-68", *Finance and Development*, March 1989, pp. 12-13.

৫৮. United Nations Conference on Trade and Development (UCTAD), *Trade and Development Report*, 1985, pp. 123-4. উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক দেনা সম্পর্কে দেখুন নোট ৬৫।

৫৯. দেখুন Hollis Chenery with A. Strout, "Foreign Assistance and Economic Development", *American Economic Review*, September 1966; and Henry Bruton, "The Two-gap Approach to Aid and Development", *American Economic Review*, September 1966.

৬০. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৬৫-৭৩ সময়কালের বার্ষিক ১০% থেকে ১৯৭৪-৮২ সালে ২৬% এবং ১৯৮৩-৮৭ সালে ৫১% বৃদ্ধি পায়। IBRD, *World Development Report*, 1989, p. 62.

৬১. Haberler, in Meier (1987), p. 62.

৬২. Henry Bruton, *Inflation in Growing Economy* (1961), p. 57.

৬৩. *Ibid.*, p. 58.

৬৪. Lewis, in Ranis and Schultz (1988), P. 22.

৬৫. ১৯৮০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক দায়-দেনার পরিমাণ ছিল ৬৩৯ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯০ সালে ১,৩৪১ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। (IBRD, *World Debt Tables: External Debt of Developing Countries* 1990-91, vol. i. p. 12)

৬৬. Gerald Meier, *Leading Issues in Development Economics: Selected Materials and Comentary* (1964), p. 563.

৬৭. J. K. Galbraith, *Economic Development in Perspective* (1962), pp. 9-10.

৬৮. Michael Camdessus, "Opening Remarks", Vittoria Corbo, *et al.*, *Growth-Oriented Adjustment Programmes* (1987), p. 7.

৬৯. Morawetz (1977), p. 10.

৭০. *Ibid.*, p. 71.

৭১. Gerald Meier, *Emerging from Poverty: The Economics that Really Matters* (1984), pp. 5 and 184.

৭২. Cited by *Ibid.*, p. 29.

৭৩. Cited by *Ibid.*p.2

৭৪. *Ibid.*

৭৫. Dudley Seers "The Meaning of Development", *International Development Review*, December, 1969.

৭৬. Barber Conable, "Opening Remarks", Corbo, *et al.* (1987), p. 6.

৭৭. IMF, *Fund-Supported Programmes, Fiscal Policy, and Income Distribution,* IMF Occasional Paper No. 46 (September 1986), p. 1.

৭৮. IMF, *The Implications of Fund-Supported Adjustment Prgrammes for Poverty: Experience of Selected Countries*, Occasional Paper No. 58. (1988). pp. 1 and 32. আরো দেখুন, Occasional Paper No. 55. Theortical Aspects of the Design of Fund-Supported Adjustment Programmes, September 1987.

৭৯. IMF, Occasional Paper No. 58 (1988), p. 17.

৮০. দেখুন Ronald Findlay, "Trade, Development and the State", in Ranis and Schultz (1988); pp, 92-3. আরো দেখুন, Myint in Meier, *Pioneers in Development* (1987), p. 117.

৮১. দেখুন Ronald Findlay's Comments on Harmerler in Meier, (1987), p. 96; আরো দেখুন, Bhagwati and Kruger, "Exchange Control, Liberalisation and Development", *American Economic Review,* 2/1973, pp. 419-27.

৮২. Yasuo Masai, Japan, *The New Encyclopaedia Britannica*, 15th ed. vol. 10, p. 49.

৮৩. Marius B. Jansen, Japan, History of, *The New Encyclopaedia Britannica*, 15th ed, vol. 10, p. 88. South Korea., Agriculture in Korea (1870), pp. 5-17; and Oh Young-Kyun,"Agrarian Reform and Economic Development: A Case Study of Korean Agriculture", *Korean Quarterly*, 1969, p. 99.

৮৪. Australian Bureau of Agricultural and Research Economics, *Japanese Agricultural Policies,* Policy Monograph No. 3. Canberra, 1988.

৮৫. Jeffrey D. Sachs, "Trade and Exchange Rate Policies in Growth-Oriented Adjustment", in Corbo, et al. (1987), p. 301.

৮৬. *Ibid*. p. 303.

৮৭. Myrdal, *Asian Drama* (1968), Vol. 2, p. 747.

৮৮. Jeffrey Sachs, *Social Conflict and Populist Policies in Latin America* (Cambridge, Mass. : National Bureau of Economic Research, Paper, No. 2897).

৮৯. Pranab Bardhan's Comments on Ranis and Fei, in Ranis and Schultz (1988), p. 138.

৯০. Meier, *Emerging from Poverty* (1984), p. 61.

৯১. দেখুন Hea Myint. "Comparative Analysis of Taiwan's Economic Development with Other Countries", *Academic Economic Papers,* March 1982: আরো দেখুন, Myint, in Meier, *Pioneers in Development* (1988), p. 133.

৯২. Ranis and Fei, in Ranis and Schultz (1988), p. 121.

৯৩. দেখুন Meier, *Emerging from Poverty* (1984). p. 63. Tibor Scitovsky, "Economic Development in Taiwan and South Korea", *Food Research Insititute Studies*, No. 4, 1985, pp. 215-64; and "Unequalled Economic Failures", *The Economist*, 17 June 1989, p. 83. Meier এর মতে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে তাইওয়ানই সম্ভবত সবচেয়ে ন্যায়পরতাবাদী দেশ (Meier, Emerging *from Poverty* (1988), তার এ বক্তব্য সম্ভবতঃ সঠিক নয়; কারণ অন্যান্য আরো কতক গুলো দেশে Gini Coefficient. নিম্নমাত্রায় রয়েছে এবং তাইওয়ানের চাইতেও উত্তম কল্যাণমূলক ব্যবস্হা রয়েছে।

৯৪. With Respect to Japan, see R.B Renedict, Chrysanthemum and the Sword (1946); আরো দেখুন, Yoshihara Kunio, *Japanese Economic Development: A Short Introduction* (1979), pp. 80-2.

৯৫. দেখুন T. Nakamura, tr. J. Kaminski, *The Postwar Japanese Economy: Its Development and Structure* (1981), p. 96.

৯৬. World Bank, *World Tables, 1988-89*, p. vol. 1, 66-9: and Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Republic of Taiwan, *Statistical Yearbook of the Republic of China,* 1988, p. 90.

৯৭. ১৯৮৩ সালে জাপানে শুল্কযোগ্য পণ্যের উপর ৪.৫% হারে এবং অন্যান্য সকল আমদানি পণ্যের উপর ২.৫% হারে ট্যারিফ ধার্য ছিল, যা আমেরিকা ও ইউরোপের চাইতে কম। এমনকি টেক্সটাইলের উপর ট্যারিফ হার ছিল মাত্র ১৩.৮% ভাগ, যা আমেরিকাতে ২২.৭% ভাগ এবং ইউরোপেও প্রায় একই রকম। "An Open and Shut Case", in "Japan: A survey", *The Economist,* 7 October, 1987, p. 50.

৯৮. Lester thurow, "A Time to Dismantle the World Economy", *The Economist*, 9 November 1985, p. 23.

৯৯. Findlay, in Ranis and Schultz (1988), p. 90.

১০০. দেখুন IMF, *Government Financial Statistics Yearbook*, ১৯৮৯, pp. ৯২-৩, জাপান ব্যতীত বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত অন্যান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০১. OECD, *Revenue Statistics of OECD Member Countries*, 1965-89 (1990).

১০২. "Republic of Korea (South Korea)", *The European Yearbook, 1987, pp. 1661-2.*

১০৩. দেখুন Parvez Hasan, *Korea: Problems and Issues in a Rapidly Growing Economy* (1976), p. 23.

১০৪. Data for 1965 from Michael Prowse, "Unequal Society Rethinking its Priorities", *The Financial Times,* 15 June 1989. p. XII; and those for 1987 from the IBRD, *World Development Report,* 1989, p. 223.

১০৫. Liz Mcgregor, "Labour Unrest, the Price of Success", *The International Herald Tribune*, 5 July 1989, p. 7.

১০৬. Prowse (1989).

১০৭. Hasan (1976), p. 23.

১০৮. Kunio (1979), p. 111.

১০৯. জাপানে দশটি বড় ধরনের ব্যাংক রয়েছে যার অধিকাংশই সে দেশের জাইবাৎসু পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যাংকগুলো হচ্ছে : Dail-Ichi Kangyo, Mitsui Taiyo Kobe, Sumitomo, Fuji, Mitsubishi, Sanwa, Tokai, Daiwa, Bank of Tokyo, and Kyowa. এর মধ্যে কয়েকটি ব্যাংক বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংকগুলোর অন্যতম।

১১০. ১৯৮৫ সালে সকল পাইকারী দোকানগুলোর ৪৮ ভাগ এবং খুচরা দোকানগুলোর ৮৩ ভাগকে ক্ষুদ্রায়তন বলে বিবেচনা করা হতো (এ সব দোকানের ৫ জনের কম কর্মচারী ছিল)। অবশ্য মোট পাইকারী বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের পরিমাণ মাত্র ৫ ভাগ এবং খুচরা

বিক্রির ক্ষেত্রে ৩১ ভাগ। (Japan: Ministry of International Trade and Industry, *Commercial Statistics and White Paper on International Trade* (1988).

১১১. জাপানের Gini Coefficient এ এটি প্রতিফলিত হয়েছে যা ১৯৬৫ সালের ০.৩৮০ থেকে ১৯৭১ সালে ০.৪২০ তে বৃদ্ধি পায়।

১১২. Forbes *Magazine,* Cited by *Arab News,* 10 July 1989. p. 14.

১১৩. দেখুন Karel Van Wolferen, *The Enigma of Japanese Power* (1989).

১১৪. Yamaichi Research Institute of Securities and Economics, *Monthly Digest of Statistics,* January and September 1989 and July 1990, p. 1.

১১৫. *Ibid.*, pp. 6 and 126.

১১৬. Nikko Research Centre, *Analysis of Japanese Industries for Investors,* 1990 (January 1990), p. 202.

১১৭. Bill Emmott এর মতে, নব্য ধনীক শ্রেণী অধিকতর দৃশ্যমান বিত্তশালী জীবন-যাপন করে লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্তদের কাছে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। জনগণ যা ব্যয় করে, কেন তারা ক্রয় করে এবং তাদের প্রত্যাশা বা কী, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে ধনবানদের সম্পদ নিম্নের দিকে চুঁয়ে পড়ে। জাপানীদের সমধর্মী পুরাতন মিতব্যয়ী জীবনধারা ভেঙে পড়েছে। Bill Emmott, *The Sun also Sets: Why Japan will not be Number One* (1989)

১১৮. দেখুন "South Korea: Land to the Deweller", *The Economist,* 16 September 1989, p. 80; and "A Dangerous Game in Taipei: Taiwan's Stock Market was once a Sleepy Casino. Now it's Hyperactive", *ibid.*, 9 September 1989, p. 113. আরো দেখুন U Lyb *Financial Times,* 10 October 1989 and 16 May 1990.

১১৯. Meier. "On Getting Policies Right", in Meier, *Pioneers in Development* (1987), p. 70.

১২০. Morawetz (1977), p.71.

১২১. Gary Fields. "Income Distribution and Economic Growth", in Ranis and Schultz (1988), pp. 468-9.

১২২. Morawetz (1977), p. 7.

১২৩. দেখুন Deepak Lal (1984).

১২৪. Meier, Emerging From Poverty (1984), p. 233.,

১২৫. *Ibid.*, p. 228.

১২৬. *Ibid.*, p. 90.

১২৭. *Development Committee, Strengthening Efforts to Reduce Poverty* (1989), p. 3.

১২৮. *Ibid.*, p. 5.

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল

সেকুলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বদর্শনভিত্তিক কর্মকৌশল অবলম্বন করে উন্নয়নশীল এবং ধনাঢ্য পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কী কারণে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি প্রথম চারটি অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। সে কারণে মুসলিম দেশগুলো যদি 'মাকাসিদ আল-শরীয়াহ' হাসিল করতে চায়, তাহলে তাদের এসব কর্মকৌশলকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই; কেননা 'মাকাসিদ আল-শরীয়াহ'-তে স্বাভাবিক মানবকল্যাণের উপাদানসমূহ এতই ব্যাপক যে, অন্য কোনো সেকুলার ব্যবস্থায় তা কল্পনাও করা যায় না। এমনকি কী করতে হবে সে ব্যাপারে কালক্ষেপণের সময়ও মুসলিম দেশগুলোর নেই। ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তারা যদি মাকাসিদ অর্জনের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আর্থ-সামাজিক অসন্তোষ আরো ঘনীভূত হবে। ফলে তাদের সমাজ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়বে।

অতএব মুসলিম দেশগুলোর প্রয়োজন এক ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যে ব্যবস্থা ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণের সকল প্রয়োজনীয় উপাদান নিশ্চিত করতে সক্ষম। এ ব্যবস্থা শুধু ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণেই সক্ষম হবে না, বরং তা সম্পদের এমনভাবে পুনর্বণ্টন করবে, যাতে একই সঙ্গে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই অর্জিত হয়। এ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণ এর নীতিমালাসমূহ মেনে চলবে এবং তাদের সর্বোত্তম গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে। এতে তারা শুধু নিজের স্বার্থই নয়, বরং সমাজের স্বার্থও রক্ষা করবে। এ ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হবে না, যতক্ষণ না তা ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পুনর্গঠনের এ কাজটি দুরূহ হতে পারে, যদি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে এমনভাবে উপযোগী করে তোলা না হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ ব্যবস্থার মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে অবৈধ সুবিধা নিতে পারে।

দুর্লভ সম্পদ ও তার বণ্টনের মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যাতে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই অর্জিত হয়। এ জন্য যা দরকার, তা হলো রাষ্ট্র বা বাজারের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানবগোষ্ঠীর উপর নজর দেয়া। মানুষ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জীবন্ত ও অপরিহার্য উপাদান। লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার সবই মানুষ। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আত্মস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে সংশোধিত ও উদ্বুদ্ধ করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাজার অর্থনীতির 'অদৃশ্য হাত' অথবা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার 'দৃশ্যমান হাত' দ্বারা আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিছুতেই সফল হতে পারবে

না। এককভাবে মানুষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অনুপ্রেরণা পায়। সুতরাং, সংস্কার হতে হবে এমন যা অর্থব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে, জীবনাচার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শক্তিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করে, যাতে সম্পদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমিয়ে আনা যায় এবং অন্যায়, শোষণ ও অস্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ নির্মূল করা না গেলেও ব্যাপকভাবে হ্রাস করা যায়। এগুলো যদি না করা যায়, তাহলে কোনো একক মানুষের সংস্কার কার্যকর হতে পারে না। অতএব মানুষ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ উভয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো ব্যবস্থার কর্মকৌশলে যখন কেবলমাত্র বাজার শক্তি বা রাষ্ট্রের উপর প্রধানত জোর দেয়া হয়, তখন শেষ পর্যন্ত তা মানুষের অধঃপতন ডেকে আনে ও দুর্দশা বৃদ্ধি করে, হতে পারে, তা মানুষের সমস্যার সমাধানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি বিশ্বদর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে মানুষ ঐ ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং তা অর্জনের উপায় হতে পারে না। কারণ এ দর্শন সমস্ত বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে গুরুত্বের ঈর্ষণীয় অবস্থানে মানুষকে পুনঃস্থাপিত করে এবং তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী কোনো বিশ্বদর্শনেই মানুষকে এ ধরনের গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং ডারউইনবাদ বা দ্বান্দ্বিকতাবাদে মানব ভ্রাতৃত্ববোধ, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদের আমানতের প্রকৃতির বিষয়ে যে অন্তর্নিহিত বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন তাও স্থান পায়নি। এতে 'যোগ্যতমরাই সেরা' অথবা 'শ্রেণী সংগ্রাম' এবং 'চাহিদার সর্বোচ্চ তৃপ্তি' বা 'জীবনের বস্তুবাদী অবস্থা' ইত্যাদি বিষয়ের উপর অত্যধিক ও অতিরঞ্জিত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব দর্শনে সমাজের স্বার্থে কাজ করার জন্য মানুষকে নিয়োজিত করার কোনো উদ্বুদ্ধকরণমূলক ব্যবস্থা নেই। সমাজের স্বার্থ কেবল আত্মস্বার্থ সিদ্ধি ও প্রচেষ্টার মাঝেই নিহিত নয়, বরং সে জন্য অন্যের উপকারার্থে ব্যক্তিগত লাভ ও আয়েশ বিসর্জন দেয়ারও প্রয়োজন। এসব বিশ্বদর্শন সংঘাত ও অধিকারের দাবিকেই জোরালো করে এবং শুধু সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অবিচারেরই জন্ম দেয় না, তা স্বপ্নভঙ্গ, অপরাধ, পারিবারিক ও সামাজিক ধস এবং পরিশেষে মানুষের অধঃপতনও ডেকে আনে।

অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিক কালের অর্থনীতির উপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যে, এদের ইতিবাচক সমর্থন ছাড়া কোনো অর্থব্যবস্থা তার শক্তি ও সামর্থ্যকে ধরে রাখতে বা আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। সুতরাং, সকলের জন্য ক্ষতিকর অতিরিক্ত ভোগ, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি যাতে ঘটতে না পারে, তেমনি ভারসাম্যহীনতা ও বাড়াবাড়িকে পরিহারকল্পে অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। সাধারণভাবে এ ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে প্রয়োজন পূরণ করা যায়, উচ্চহারে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপকভিত্তিক মালিকানা নিশ্চিত হয়।

এ ধরনের একটি সুস্থ ও ন্যায়বিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা কি সম্ভব? এ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য এ কথারই ইঙ্গিত দেয় যে, হ্যাঁ, তা করা সম্ভব। এ ব্যবস্থার শিকড় নিহিত থাকবে ইসলামী বিশ্বদর্শনে। একে কিভাবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় রূপান্তরিত করা যায়, সে সম্পর্কে ষষ্ঠ থেকে একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল মাকাসিদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ দর্শন কৌশল মুসলিম দেশগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন, তার একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কার্যকর সমাধানের নীলনকশা প্রদানে সক্ষম। তবে এজন্য ইসলামের শিক্ষাসমূহ অনুসরণ ও সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা জরুরি। যেহেতু বহু মুসলিম দেশের অর্থনীতি এখনো উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেহেতু তাদের অর্থব্যবস্থা ও অর্থনীতির জন্য একটি নতুন নকশা ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। অবশ্য কাল পরিক্রমার সাথে সাথে তা করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়বে।

বিশ্ববীক্ষণ

ইসলাম একটি সাধারণ সহজবোধ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য সার্বজনীন বিশ্বাসের নাম। এর ভিত্তি তিনটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ তাওহীদ (একত্ববাদ), খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব) ও আদল (ন্যায়বিচার)। এ নীতিমালা ইসলামী বিশ্বদর্শনের শুধু কাঠামোই তৈরি করে না, তা মাকাসিদ ও কর্মকৌশলের উৎস হিসেবেও কাজ করে। অতএব, এতে বহুত্ববাদী দল বা সামাজিক শ্রেণীসমূহের পরস্পর বিরোধী দাবির মুখে কোনোরকম জোড়াতালি বা পশ্চাৎ চিন্তার সুযোগ নেই। ইসলামী বিশ্বদর্শন, মাকাসিদ এবং কর্মকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এতে সংগতিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয় এবং এদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে। যারা এসব ধারণার সাথে পরিচিত নয়, তাদের জন্য এবং লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য কিভাবে ইসলামী বিশ্বদর্শন, মাকাসিদ ও কর্মকৌশলকে একটি সংগতিপূর্ণ নীতিতে সমন্বিত করা যায়, সে উদ্দেশ্যে এ তিনটি মৌলিক নীতির অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আবশ্যক।

তাওহীদ

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব ও একতা) ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর। এ ধারণার উপরই গড়ে উঠেছে সামগ্রিক বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল। অন্য সব কিছুই যৌক্তিকভাবে এর থেকে সৃষ্ট। এর অর্থ হচ্ছে, একটি সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এ বিশ্বকে সচেতনভাবে পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করেছেন এবং তা হঠাৎ করে বা দুর্ঘটনাবশত সৃষ্টি হয়নি (কোরআন-৩:১৯১, ৩৮:২৭ ও ২৩:১৫)। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যই এ বিশ্বের অস্তিত্বের অর্থ ও গুরুত্ব বহন করে। মানুষ তারই একটি অংশ। বিশ্ব সৃষ্টির সর্বোচ্চ সত্তা অবসর গ্রহণ করেননি। বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি কার্যক্রম তিনি সক্রিয়ভাবে

দেখাশুনা করছেন (কোরআন-১০:৩ এবং ৩২:৫) এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ও খোঁজ রাখেন (কোরআন-৩১:১৫ ও ৬৭:১৪)।[১]

খিলাফত

মানবসত্তা পৃথিবীতে তার খলিফা বা প্রতিনিধি (কোরআন-২:৩০, ৬:১৬৫, ৩৫:৩৯, ৩৮:২৮ ও ৫৭:৭০) এবং তার উপর অর্জিত দায়িত্ব যাতে কার্যকরভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বস্তুগত সম্পদে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে।[২] খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা করলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করে ভুল বা সঠিক এবং ন্যায় বা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা মানুষের জীবনের অবস্থা, তার সমাজ বা ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে সে ভালো এবং মহৎ (কোরআন-১৫:২৯, ৩০:৩০, ৯৫:৪) এবং যদি যথার্থ শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে থাকে ও যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে নিজের গুণাবলী ও মহত্ত্ব বজায় রাখা এবং সামনের সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সক্ষম হবে। প্রকৃতিগতভাবে ভালো হওয়ায় মানসিকভাবে সে সুখি ও পরিতৃপ্তবোধ করে, যতক্ষণ সে অনড় থাকে অথবা তার অন্তর্গত প্রকৃতির আরো সান্নিধ্যে পৌঁছায়; আর অসুখি ও দুর্দশাগ্রস্ত অনুভব করে, যখন সে এ থেকে বিচ্যুত হয়।[৩]

আল্লাহতায়ালা এ বিশ্বকে যে সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন তা সীমাহীন। দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহার করলে সকলের কল্যাণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তা যথেষ্ট। এসব সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে একজন মানুষ তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। তবে যেহেতু সেই একমাত্র খলিফা নয় এবং কোটি কোটি মানব সন্তান যারা তারই মতো খলিফা এবং তার ভাইও তার সমান, সেহেতু তার সত্যিকারের পরীক্ষা সকল মানুষের কল্যাণে (ফালাহ) আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের দক্ষ ও সমতাভিত্তিক ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত। এটা করা সম্ভব তখনই, যখন তা করা হয় দায়িত্ববোধ ও মাকাসিদ এবং আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞার আলোকে।

তাওহীদ ও খিলাফতের ধারণা সহজাতভাবে অন্যসব ধারণা যেমন: 'জন্মগত ভাবে পাপী' বা 'ইতিহাসে দাবার ঘুঁটি', 'জন্মকালে অলিখিত ফলক' অথবা 'মুক্ত থাকার জন্যই জন্ম'-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। করুণাময় মহান আল্লাহ কেন 'জন্মগতভাবে পাপী'কে সৃষ্টি করবেন এবং নিজের কোনো দোষ না থাকলেও কেন তাকে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত করবেন? কান্ট যথার্থই উল্লেখ করেছেন, 'মানব ইতিহাসে নৈতিক দুর্বৃত্তি ও তার অবিরাম বিস্তার লাভ সম্পর্কে এটি সবচেয়ে বাজে ধারণা যে, তা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের আদি পিতা-মাতার নিকট থেকে এসেছে'।[৪] মূল 'পাপের ধারণা' থেকে অর্থ দাঁড়ায় এটা যে, পাপ-পুণ্য প্রজনন প্রক্রিয়ায় হস্তান্ত রযোগ্য এবং প্রত্যেক মানুষ অন্যের ব্যর্থতা এবং পাপের প্রভাবেই দুনিয়াতে আগমন করে। উপরন্ত, যে 'মূল পাপ' সে নিজে নিজে করেনি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কোনো 'ত্রাণকর্তা'র যদি আসতেই হয় তবে পৃথিবীতে প্রথম মানব

সন্তানের আগমনের সাথে সাথে না এসে কেন সে এত দেরিতে আসবে? মানুষ যদি জন্মগতভাবে পাপী হয় তাহলে কিভাবে তার কৃতকর্মের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে? 'মূল পাপ' এর ধারণাটি এভাবেই পবিত্র কোরআনে দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মফলের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার সঙ্গে প্রবলভাবে সাংঘর্ষিক (উদাহরণ- ৬:১৬৪, ১৭:১৫, ৩৫:১৮; ৩৯:৭ ও ৫৩:৩৮)। লুইস যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন, এ ধরনের ধারণা 'দায়িত্ববোধকে অস্বীকার করে বিরাট ক্ষতি করতে পারে'।[৫] 'মূল পাপ' এর ধারণাটি একজন মুসলমান প্রায়শ যে মহান দয়ালু ও করুণাময় (আর-রাহমান ও আর-রাহীম) আল্লাহর নাম জপ করে, তার গুণাবলীর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। এটা মানুষের বুদ্ধির অগম্য যে, এমন একজন দয়ালু প্রভু কেন তাদের প্রথম পিতামাতার পাপ সমগ্র মানবজাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। তিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল এবং যা কিছু ভালো গুণের কল্পনা করা যায় তার সবই তার মধ্যে আছে। সুতরাং, এ ধরনের কাজ করা তার জন্যে অসম্ভব (কোরআন-৭:১৮০)। আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, প্রায় সকল আধুনিক দার্শনিকদের মতো উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ও রোমান্টিক ব্যক্তিবর্গ মানব প্রকৃতির সহজাত দুর্বলতার মূল পাপের ধারণাটি পরিত্যাগ করেছিলেন।[৬]

অনুরূপভাবে পারিপার্শ্বিক শক্তিকে প্রভাবিত করে নিজ ভাগ্য নির্ধারণে সক্ষম একটি স্বকীয় অমর আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী পশ্চিমা তত্ত্বসমূহের 'বন্ধকী' ও 'জন্মলগ্নে অলিখিত ফলক' ধারণাসমূহ মানবসত্তাকে তুচ্ছতায় পরিগণিত করেছে। এসব তত্ত্বের মর্মকথা হলো, মানুষের মন একটি চিহ্নহীন স্লেটের মতো, যার উপর বহিস্থঃ কার্যকরণগুলো পছন্দ মাফিক ছাপ রেখে যায়। এ মত অনুযায়ী মানবসত্তা অসহায় ও অসাড়; বেঁচে থাকার জন্য তাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই। তাদের জীবন ইতিহাস জড় শক্তি দ্বারা নির্ধারিত অথবা মনস্তাত্ত্বিক (ফ্রয়েড), প্রবৃত্তিজাত (লরেঞ্জ), এবং পরিবেশগত (প্যারলভ, ওয়াটসন, স্কিননার ও অন্যান্য) প্রভাব দ্বারা নিয়োজিত। স্কিননারের সুরে সুর মিলিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি এ সাক্ষ্যই দেয় যে, 'একক স্বাধীনতা একটি অতিকথন'।[৭] নিয়তিবাদ এবং মানুষের দায়িত্বশীলতার মধ্যে সমন্বয় সাধন হতে পারে না।[৮] নিয়তিবাদ মানুষের মর্যাদাকে শুধু অবনমিতই করে না, তা বিরাজমান পরিস্থিতি এবং সম্পদের অন্যায্য ও অদক্ষ বিতরণের জন্য মানুষের দায়িত্বশীলতাকেও অস্বীকার করে।

নিয়তিবাদ বলে, আত্মিক শক্তিসমূহ, সামাজিক কাঠামো এবং জীবনের বস্তুগত অবস্থানের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু মানবসত্তা যদি অসাড় হয় এবং তাদের জীবন যদি নিয়ন্ত্রিত ও পূর্ব-নির্ধারিত হয়, তবে কে এ পরিবর্তন আনবে? তাছাড়া, জীবন যদি পূর্ব-নির্ধারিত হয়, তাহলে 'বিচ্ছিন্নতাবোধ'ও এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বুর্জোয়া বা প্রোলেতারিয়েত কাউকেই এর জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর 'বিচ্ছিন্নতাবোধে'র জন্য কেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে দোষ দেয়া হবে অথবা শ্রমিক

জাগরণের আহবান জানানো হবে? মানব অস্তিত্বের পূর্ব-নির্ধারিত প্রকৃতি সংজ্ঞায়িত করলে মানব প্রচেষ্টা দ্বারা তা অপরিবর্তনীয়। বুর্জোয়া শ্রেণী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎখাত করে তার স্থলে রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মার্কসীয় সুপারিশ পলিটব্যুরো কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া মানব জীবনে আর এক ধরনের নিয়তিবাদের প্রচলন ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

নিয়তিবাদীদের বিপরীত প্রান্তে সার্ত্রের ভোগবাদের অবস্থান।[৯] সেখানে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই এবং মানুষের স্বাধীনতা সীমাহীন; কেবল সে অবিরাম স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে পারে না।[১০] মানুষের মানসিক জীবনের প্রতিটি দিক ইচ্ছাকৃত, নির্বাচিত এবং নিয়ত দায়িত্বাবদ্ধ। নিঃসন্দেহে এ ধারণা নিয়তিবাদের চেয়ে ভালো। তবে সার্ত্রের মতে, এ স্বাধীনতার নিরঙ্কুশ সব কিছুই অনুমোদিত। মানব জীবনের সহজাত কোনো উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই। মানবসত্তার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক বা বিষয়সম্মত মূল্যবোধ নেই, তা সে স্রষ্টার আইন বলি কিংবা স্বর্গীয় প্রেম বা অন্য কিছু বলি না কেন। মানবসত্তা এ পৃথিবীতে বিস্তৃত এবং পরিত্যক্ত, যেখানে তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করবে। মূল্যবোধের একমাত্র ভিত্তি মানুষের স্বাধীনতা অনুসরণের জন্য কেউ মূল্যবোধ বাছাই করে নেবে এর কোনো বাস্তব যুক্তি থাকতে পারে না।[১১] নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার এ ধরনের ধারণা কেবল পুঁজিবাদী ধরনের লেইজে ফেয়ার ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষতার সৃষ্টি করবে। সেখানে সম্মত মূল্যবোধের কোনো প্রশ্নের উদয় হবে না, অথবা ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ঐকতান সষ্টির জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না, অথবা সম্পদের দক্ষ ও সুষম বন্টনের প্রশ্ন দেখা দেবে না, যার কোনো কিছুই বাজার দ্বারা আপনাআপনি ঘটানো সম্ভব নয়।

এ ধারণাসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত খিলাফতের ধারণা বিশ্বে মানবসত্তাকে একটি সম্মানজনক ও মহিমান্বিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে (কোরআন-১৭:৭০) এবং মানব-মানবীর জীবনকে একটি অর্থ ও লক্ষ্য প্রদান করেছে। এ অর্থ একটি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বৃথা নয় বরং একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে (কোরআন-৩:১৯২, ৩:১৯২, ২৩:১১৫)। তাদের জীবনের ব্রত হচ্ছে, স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ঐশী পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামী মতে 'ইবাদত' বা উপাসনা বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে (কোরআন-৫১:৫৬) যার অলঙ্ঘনীয় অনুজ্ঞা হচ্ছে অন্যান্য মানুষের প্রতি কোনো মানুষের দায়িত্ব পালন (হাক্কুল ইবাদ), তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং মাকাসিদকে বাস্তবে রূপদান করা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, কতিপয় মহান ধর্মের মতো ইসলামে অধিকারের চেয়ে দায়িত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১২] এর পিছনে মৌলিক যুক্তি হলো, যদি প্রত্যেকে দায়িত্ব পালন করে, তবে প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অর্জিত হবে এবং সকলের অধিকার নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবে।

এ ব্রতের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচারক, দয়ালু ও করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এবং তার নির্দেশনার প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি। মানবসত্তা অবশ্যই তাকে ছাড়া আর কারো কাছে নত হবে না, আর কারো মূল্যবোধ মানবে না এবং আর কারো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বেঁচে থাকবে না। এ পৃথিবীতে তাদের সকল কর্মের জন্য তারা তার কাছে দায়ী থাকবে। অবশ্যই তারা শুধু নিজের কাজের জন্যই দায়ী থাকবে (কোরআন-৬:১৬৪, ১৭:১৫ ও ৩৫:১৮) এবং তাদের নিজেদের কারণে যতটুকু সুসংঘটিত হয়েছে, ততটুকু ছাড়া অন্যদের অতীত বা বর্তমান, বাকি কোনো কাজের জন্যই দোষী সাব্যস্ত হবে না, যদিও তারা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে (কোরআন-৩:১৮৫, ৪:৭৮, ২৯:৫৭)। তাদের জীবন শুধু এ পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর জীবন একটি পরীক্ষার স্থান। অতএব ক্ষণস্থায়ী। তাদের আসল আবাসস্থল মৃত্যুর পরে, যেখানে এ পৃথিবীতে যেভাবে তারা দায়িত্ব পালন করেছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হবে। আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহিতা এড়াতে তারা কখনোই সফল হবে না। এভাবেই তাদের জীবন 'সৌর ব্যবস্থার বিশাল নক্ষত্রের মতো কালক্রমে নিভে যাবার মতো নয়', এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের হতাশাব্যঞ্জক অনুভব 'মানুষের অর্জনের সমস্ত মন্দিরটি এ বিশ্বে ধ্বংস স্তূপের নিচে তলিয়ে যাবে"।[১৩] এও সত্যিকার বাস্তবতা নয়। খিলাফতের যে ধারণা তার বেশ কিছু সংশ্লেষ বা অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

খিলাফতের অর্থ মানবজাতির মৌলিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। প্রত্যেকেই খলিফা এবং কোনো দেশ, দল বা বিশেষ কোনো জাতির সদস্য বা কোনো বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তি নয়। এটি সাদাকালো, উঁচুনিচু সকল মানবসত্তার সামাজিক সাম্য ও মহত্ত্বকে ইসলামী বিশ্বাসের মৌলিক উপাদানে পরিগণিত করেছে। মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের মানদণ্ড তার জাতি, পরিবার বা সম্পদ নয়; বরং তা হচ্ছে তার চরিত্র ও মানবতার প্রতি সেবা (যা তার বিশ্বাস ও অনুশীলনের প্রতিফলন)।[১৪] রাসূলুল্লাহ (স) সুস্পষ্ট করে বলেছেন, 'সমস্ত মানবসত্তাই আল্লাহর ভৃত্য এবং আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে বেশি প্রিয়, যারা তার ভৃত্যদের মধ্যে সর্বোত্তম'।[১৫]

ভ্রাতৃত্বের এ ধারণাগত কাঠামোর আওতায় অন্যান্য মানবসত্তার প্রতি সঠিক মনোভাব 'জোর যার মুল্লুক তার', 'কেবল আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে সংগ্রাম' অথবা 'যোগ্যতমরা সেরা' নয়, বরং তা হচ্ছে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ, সমগ্র মানবিক সম্ভাবনাকে উন্নত করা এবং মানব জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য পারস্পরিক কোরবানী ও সহযোগিতার মনোভাব।[১৬] প্রতিযোগিতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহিত করা যায় যতক্ষণ তা সুস্থ থাকে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের সার্বিক উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সহায়তা করে। যখনই তা সীমালঙ্ঘন করে, প্রতিহিংসা ও দাম্ভিকতার জন্ম দেয় এবং নৃশংসতা ও পারস্পরিক ধ্বংসের কারণ হয়, তখনই তা সংশোধন করতে হবে।[১৭]

২. সম্পদ একটি আমানত

মানুষের কাছে প্রাপ্ত সকল সম্পদই যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত, সেহেতু খলিফা হিসেবে মানুষ এর মূল মালিক নয়, সে শুধু আমানতদার (আমীন)।[১৮] এ আমানতদারিত্ব (আমানা) যখন 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অস্বীকৃতি' বুঝায় না, তখন তাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লেষ থাকে। এ সংশ্লেষগুলো অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পার্থক্যের সৃষ্টি করে।[১৯]

প্রথমত, সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য নয়, সকলের উপকারের জন্য (কোরআন-২:২৯)। তা অবশ্যই সকলের কল্যাণে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেককে অবশ্যই বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে হবে, যেমনভাবে কোরআন ও সুন্নাহতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এর অন্যথা হলে তা খিলাফতের দায়িত্বের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।[২০]

তৃতীয়ত, সম্পদ বৈধভাবে অর্জিত হলেও তা আমানতের শর্তের বাইরে ব্যয় করা যাবে না। আর এ আমানতদারিত্ব হচ্ছে শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের কল্যাণ নয়, অন্যের কল্যাণও বটে।[২১] একজন আমানতদার হিসেবে মানুষের জন্য এটি শোভন নয় যে, সে স্বার্থপর, সম্পদ লোভী ও বিবেকবর্জিত হবে এবং শুধু নিজের কল্যাণেই কাজ করবে।

চতুর্থত, কেউই আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস বা অপচয় করার অধিকারী নয়। এ ধরনের কাজকে কোরআন ফাসাদ সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছে (দুরাচার, দুর্বৃত্তি ও অসততা)। আল্লাহ ফাসাদকে ঘৃণা করেন (কোরআন-২:২০৫)। যখন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ইয়াযিদ-বিন-আবু সুফিয়ানকে কোনো এক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বাছবিচার না করে হত্যা করতে এবং এমনকি শত্রু দেশের শস্যক্ষেত বা জীবজন্তু ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন।[২২] যুদ্ধকালে শত্রু ভূখণ্ডেই যদি এ ধরনের কাজ অনুমোদিত না হয়, তা হলে শান্তিপূর্ণ সময়ে নিজের দেশে তা অনুমোদিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব মূল্য বৃদ্ধি বা উচ্চমূল্য বজায় রাখার স্বার্থে জ্বালিয়ে দিয়ে বা সাগরে নিক্ষেপ করে উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করার বিন্দুমাত্র কোনো সুযোগ নেই।

৩. সাদাসিধে জীবন পদ্ধতি

আল্লাহর খলিফার জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন পদ্ধতি হবে বিনীত। এতে কোনো ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক ও আড়ম্বর অথবা নৈতিক শৈথিল্য প্রতিফলিত হবে না। এ ধরনের জীবনধারণ পদ্ধতি অপব্যয় ও অপচয়ের কারণ হয় এবং সম্পদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ বাড়ে। ফলে সবার চাহিদা পূরণে সামাজিক সক্ষমতা হ্রাস পায়।

এসবের ফলে অন্যায় পথে উপার্জনের রাস্তা তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক বিতরণ ব্যবস্থার বাইরে আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। অথচ দক্ষতা, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও ঝুঁকির

পার্থক্যের কারণে বিতরণে ইনসাফ বিধান নিশ্চিত করা দরকার। এসবের ফলে ন্যায়পরতার অনুভূতিতেও ধস নামে এবং মুসলিম সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও দুর্বল হয়ে পড়ে।[২৩]

৪. মানব স্বাধীনতা

মানবসত্তা আল্লাহর খলিফা হওয়ায় তারা আল্লাহর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না। সুতরাং, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন, সকল প্রকার দাসত্ব ইসলামে নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (স) এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই মানবজাতিকে বোঝা ও শৃঙ্খলমুক্ত করা- যা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে (কোরআন-৭:১৫৭)। সে অনুসারে কারোর, এমনকি রাষ্ট্রেরও, কোনো অধিকার নেই এ স্বাধীনতা বাতিল করা এবং মানব জীবনকে কোনো প্রকার দাসত্ব বা শৃঙ্খলে বেধে ফেলা। এ শিক্ষাই দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-কে একথা জিজ্ঞেস করতে উৎসাহিত করে, 'মাতৃগর্ভ থেকে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করলেও কখন থেকে তোমরা তাদের দাস বানিয়েছো'?[২৪]

এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ যা চাইবে তাই স্বাধীনভাবে করতে পারবে। তারা শরীয়াহর নিয়মে বাঁধা। শরীয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা। অতএব, তারা ততটুকুই স্বাধীন যতটুকু শরীয়াহর সামাজিক দায়িত্বশীলতা নির্ধারণ করেছে। কোনো ব্যবস্থায় মানবসত্তাকে যদি ভূমিদাসে পরিণত করা হয় অথবা শরীয়াহর মাধ্যমে স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে তা খিলাফতের ধারণায় যে মহত্ত্ব ও জবাবদিহিতা বিমূর্ত হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না এবং তা মানবসত্তার কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আদল (ন্যায়বিচার)

তাওহীদ ও খিলাফতের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার না থাকলে তা একটি অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ধারণায় পর্যবসিত হবে।[২৫] ন্যায়বিচারকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ মাকাসিদ আল-শরীয়াহরও প্রশ্নাতীতভাবে অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তারা এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ন্যায়বিচারহীন কোনো সমাজকে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ হিসেবে কল্পনা করাই অসম্ভব। মানব সমাজ থেকে জুলুমের সকল দিক নির্মূল করার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন। ইসলামের পরিভাষায় জুলুমকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর সাহায্যেই একজন ব্যক্তি অন্য সকলকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অথবা তাদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে না।[২৬]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অবিচার নির্মূল করাকে কোরআনে আল্লাহর রাসূলগণের প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে (কোরআন-৫৭:২৫)। কম করে

হলেও কোরআনে প্রায় শতাধিক স্থানে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে; কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আদল, কিশত, মিজানের মতো শব্দ দ্বারা অথবা বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ বর্ণনা ও বর্ণনাভঙ্গির সাহায্যে। এছাড়া, জুলুম, ইজম, দালাল বা অন্যান্য শব্দের মতো শব্দসমষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে অবিচারের বিরুদ্ধে কোরআনে দুই শতাধিক স্থানে তিরস্কার করা হয়েছে।[২৭] মূলত ইসলামী বিশ্বাসের গুরুত্ব অনুসারে কোরআনে ন্যায়বিচারকে আল্লাহ্ ভীতির পরেই স্থান দেয়া হয়েছে (কোরআন-৫:৮)। আল্লাহ ভীতিই স্বভাবত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর কারণে মানুষ ন্যায়বিচারসহ সকল ভালো কাজে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ন্যায়বিচারের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'অবিচার থেকে সতর্ক হও, কারণ শেষ বিচারের দিনে তা গহীন অন্ধকারে নিয়ে যাবে'।[২৮] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইবনে তাইমিয়া এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, 'অবিশ্বাসী হলেও আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন এবং বিশ্বাসী হলেও অন্যায় আচরণকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন না এবং বিশ্ব অবিশ্বাস ও ন্যায়বিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম অবিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে না'।[২৯] ইসলাম ও অবিচার পরস্পর বিরোধী এবং যে কোনো একটির দুর্বল বা নির্মূল হওয়া ছাড়া একসঙ্গে চলতে পারে না। ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের দৃঢ় অঙ্গীকারের দাবি হচ্ছে, মানবসত্তার নিকট গচ্ছিত আল্লাহর পবিত্র আমানত সকল সম্পদকে মাকাসিদ আল শরীয়াহর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

শরীয়াহ্ সম্পর্কে আলোচনার কাঠামোর মধ্যে চারটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে: (১) চাহিদা, (২) আয়ের সম্মানজনক উৎস, (৩) সম্পদ ও আয়ের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন এবং (৪) প্রবৃদ্ধি ও স্থিতি।

১. চাহিদা পূরণ

ভ্রাতৃত্বের মৌলিক সংশ্লেষ এবং সম্পদের আমানত প্রকৃতির বিষয়টি হচ্ছে, সম্পদ প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং প্রত্যেককে সম্মানজনক ও মানবিক মানের জীবন ধারনের নিশ্চয়তা দিতে হবে, আর তা হতে হবে স্রষ্টার খলিফা হওয়ার কারণে মানুষের সহজাত মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।[৩০] নবী করিম (স) বলেছেন: 'সে লোক ঈমানদার নয়, যে পেট ভরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[৩১] যেহেতু সম্পদ তুলনামূলকভাবে সীমিত, তাই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতা ও সাধারণ কল্যাণের সীমানার মধ্যে[৩২] সম্পদের উপর দাবি করা না হয়। চাহিদা পূরণ অবশ্যই এমনভাবে হতে হবে, যাতে জীবনধারণ খুব সাধাসিধে প্রকৃতির হয় এবং তাতে আরামআয়েশ থাকলে তা যেন অপচয় ও দাম্ভিকতার পর্যায়ে যেতে না পারে। ইসলামে এ ধরনের অপচয় নিষিদ্ধ হলেও মুসলিম দেশগুলোতে এর জোয়ার বইছে।

ইসলামের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদানকে এভাবে দেখা ঠিক হবে না যে, সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে পশ্চিমা সমাজে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামে একে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।[৩৩] এটা প্রমাণিত যে, সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে ফিকাহ ও ইসলামী সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনশাস্ত্রবিদগণ সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, গরীবদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ মুসলিম সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরজে কিফায়া)।[৩৪] মূলত শাতিবীর মতে, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের অস্তিত্ব সমাজের নিজের অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন (raison d'etre)।[৩৫] মওলানা মওদূদী, ইমাম হাসান আল-বান্না, সাইয়্যেদ কুতুব, মুস্তফা-আল-সিবা'ই, আবু জাহরাহ, বাকির আল-সদর, মুহাম্মদ-আল-মুবারক এবং ইউসুফ আল-কারযাভী সহ সকল আধুনিক পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে একমত।[৩৬]

২. সম্মানজনক উপার্জনের উৎস

খলিফার পদবীর সঙ্গে যে মর্যাদা সংযুক্ত করা হয় তার অর্থ হচ্ছে, চাহিদা পূরণ অবশ্যই প্রত্যেকের নিজের চেষ্টায় হতে হবে। সে অনুযায়ী আইনশাস্ত্রবিদগণ নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করাকে প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে জোর দিয়েছেন (ফরজে আইন)।[৩৭] তারা আরো বলেছেন যে, এ দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে কোনো মুসলমান এমনকি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্যও তার দৈহিক ও মানসিক পর্যাপ্ত সুস্থতা ও দক্ষতা রক্ষা করে চলতে পারে না।[৩৮] যেহেতু কোনো মুসলমান কর্মসংস্থান বা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকলে সততার সঙ্গে উপার্জনের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নাও হতে পারে, সেহেতু এ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, যোগ্যতা ও উদ্যোগের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রত্যেকের জন্য সৎ উপার্জনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব।

তা সত্ত্বেও কিছু লোক অবশ্যই থাকবে, যারা কোনো শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজস্ব উদ্যোগে আয় করতে সক্ষম হবে না। এ ধরনের লোক যাতে কোনোরকম উপহাস বা পাল্টা অভিযোগের শিকার না হয়ে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে, সে জন্যে তাদেরকে সাহায্য করা মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক দায়িত্ব (ফরজে কিফায়া)। একটি গভীর বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর এ যৌথ দায়িত্ব পালনের ভার প্রথমে পড়বে পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও আওকাফ বা মানবহিতৈষী সংগঠনগুলোর উপর। এ সমস্ত লোক বা সংস্থা যখন তা করতে সক্ষম হবে না, কেবলমাত্র তখনই রাষ্ট্র সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর একটি ছোট আকারের অর্থনৈতিক বোঝার ভার পড়বে। এসব কর্মসূচির চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে, এভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত লোকেরা যাতে বেশি আয়ের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাতে সাহায্য করা। তবে যতক্ষণ বাস্তবে রূপ না নিচ্ছে, ততক্ষণ এ ধরনের সম্পূরক আয়ের সাহায্য অবশ্যই থাকতে হবে। ইসলামে

এ উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক যাকাত (উশরসহ) এবং সাদাকা ও আওকাফের আকারে স্বেচ্ছাভিত্তিক দানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান প্রাপ্তির একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারের এখাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রাখা উচিত।

৩. আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টন

চাহিদা পূরণ সত্ত্বেও আয় ও সম্পদের চরম বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। একটি মুসলিম সমাজে তখন বৈষম্য মেনে নেয়া যায়, যখন তা প্রথমত কমবেশি দক্ষতা, উদ্দ্যোগ, প্রচেষ্টা ও ঝুঁকির অনুপাতে হয়ে থাকে। যেখানে ইসলামী শিক্ষাসমূহ আন্তরিকভাবে অনুসৃত হয়, সেই সমাজে এগুলো সাধারণভাবে বণ্টিত হতে বাধ্য। চরম বা খুব বড় ধরনের বৈষম্য ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ইসলামী শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হয় যে, সম্পদ কেবল সমগ্র মানবসত্তার জন্য আল্লাহর দানই নয় (কোরআন-২:২৯), তা একটি আমানতও বটে (কোরআন-৫৭:৭)। সুতরাং গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকার কোনো কারণ নেই। বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর কর্মসূচি না থাকলে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি তরান্বিত করার পরিবর্তে ধ্বংসই এনে দেবে। অতএব, ইসলাম মূলত সম্মানজনক উপার্জনের উৎসের মাধ্যমে প্রত্যেকের চাহিদাই পূরণ করতে চায় না, বরং উপার্জন ও সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। কোরআনের ভাষায়, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' (কোরআন-৫৯:৭)।

ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ বিষয়টিকে ইসলামে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতা অপরিহার্য। নবী করিম (স) এর একজন সাহাবী হযরত আবু জর (রা) এ ধারণা পোষণ করতেন যে, কোনো মুসলমানের তার পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হওয়া ঠিক নয়। তবে নবী করিম (স) এর অধিকাংশ সাহাবী তার এ চরম মতের সঙ্গে একমত হননি। অবশ্য আবু জর উপার্জনের সমতার কোনো প্রবক্তা নন। তিনি সম্পদের (সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ) সমতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, এটা অর্জন করা সম্ভব, যদি ধনী লোকেরা নিজেদের প্রকৃত ব্যয় মিটানোর পর সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের কম সৌভাগ্যশালী ভাইদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে।[৩৭] মুসলিম পণ্ডিতগণের সাধারণ ধারণা হচ্ছে, সামাজিক আচরণ পদ্ধতি ও অর্থনীতি ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হলে মুসলিম সমাজে সম্পদ ও আয়ের চরম অসমতা থাকতে পারে না।

৪. প্রবৃদ্ধি ও স্থিতি

মুসলিম উম্মাহর পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে লভ্য সম্পদ ব্যবহার না করে চাহিদা পূরণ ও উচ্চ পর্যায়ের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুক্তিসংগত উচ্চহার অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি সম্পদ ও

উপার্জনের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের লক্ষ্য বিত্তবান লোকদের পক্ষে আরো দ্রুত ও কম মূল্যে অর্জন করা সম্ভব, যদি উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং গরীব লোকেরা আনুপাতিক হারে সেই প্রবৃদ্ধির বৃহদাংশের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্য ও বিনিময় হারের অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশা ও বৈষম্য হ্রাস করে। অতএব একটি মুসলিম সমাজ যা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্যারেটো অপটিমালিটির ধারণার উপর নির্ভরশীল নয় এবং শুধু নিজের প্রয়োজনেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয় না, সেখানে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সর্বনিম্নে রাখার জন্য 'খিলাফাত' ও 'আদল'-এর দাবি পূরণ করা প্রয়োজন।

কর্মকৌশল

এটা সুস্পষ্ট যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ এবং তার অন্তর্নিহিত দর্শনের যৌক্তিক রূপায়ণ। ইসলাম শ্রেণীসমূহ ও বহুত্ববাদী দলগুলোর মধ্যে প্রভাব ও টিকে থাকার সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত বিচ্ছিন্ন উপাদানের মতো কোনো জগাখিচুরি জিনিস তৈরি করে না। এ বিষয়গুলো ইসলামী ব্যবস্থার সঙ্গে এতই অবিচ্ছেদ্য যে, মুসলিম সমাজের ইসলামীকরণ কোন পর্যায়ে উন্নীত, তার পরিমাপের মানদণ্ড এগুলোর দ্বারা নির্ধারিত হয়। অবশ্য এতে বিশ্বদর্শনের সঙ্গে লক্ষ্যসমূহের সমন্বয় যথেষ্ট নয়। এমন একটি কর্মকৌশল থাকা আবশ্যক যা অন্তর্নিহিত দর্শনের যৌক্তিক ফল এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে কাজে লাগালে তা মুসলিম সমাজকে তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করতে পারে। ইসলামে এ ধরনের একটি কর্মকৌশল আছে। এ কর্মকৌশলের মধ্যে রয়েছে চারটি অপরিহার্য ও পারস্পরিক শক্তিসঞ্চারী উপাদান, যার সাহায্যে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা যায়।

ক. একটি সমাজসম্মত বিশোধন কর্মকৌশল;

খ. সমাজ ও নিজের স্বার্থে প্রত্যেকের সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য জোরালো উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা;

গ. সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও 'মাকাসিদ' অর্জনের লক্ষ্যে সমগ্র অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস; এবং

ঘ. সরকারের একটি ইতিবাচক ও দৃঢ় লক্ষ্যাভিমুখী ভূমিকা।

এখন দেখা জরুরি যে, উল্লিখিত কর্মকৌশলের সুনির্দিষ্ট উপাদানসহ ইসলামী বিশ্ববীক্ষণ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিভাবে লক্ষ্য অর্জনের পথে সম্পদ বরাদ্দ ও বণ্টনকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে।

(ক) পরিশোধন পদ্ধতি

সম্পদের উপর সীমাহীন চাহিদার তুলনায় সম্পদের আপেক্ষিক স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশোধন কৌশলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সম্পদের উপর যত দাবি আছে, তা একটি বিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে। এতে দ্বৈত লক্ষ্য

অর্জিত হবে, লভ্য সম্পদ ও চাহিদাকে সমপর্যায়ে আনা যাবে এবং ঈপ্সিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জিত হবে।

পুঁজিবাদ ভোক্তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অগ্রাধিকার অনুসারে সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে যা চায় তাই ভোগ করার অনুমতি দেয়। এ মতবাদ ভোক্তাদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় উৎপাদকের পছন্দ অনুসারে তাদেরকে উৎপাদন করতেও অনুমতি দেয়। এ জন্যে উৎপাদনের যে যে জিনিস ব্যবহার করে তা বাজার নির্ধারিত মূল্যে বিশোধন কৌশল হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রয়াসী ভোক্তা কতটুকু ভোগ করবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা প্রত্যাশী উৎপাদক কী উৎপাদন করবে তা নির্ধারণ করে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটি সমতা আনয়ন করে।

পটভূমিকার শর্তাবলী পূরণ না হওয়ায় বিশোধন প্রক্রিয়া হিসেবে কেবলমাত্র মূল্য ব্যবস্থার ব্যবহার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনকে ব্যর্থ করে দেয়। বাধাহীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অগ্রাধিকার এবং মূল্যবোধহীন প্রচারণা ও ঋণপ্রাপ্তির সহজ সুযোগ সীমাহীন চাহিদার জন্ম দেয়, অথচ একই সময়ে বড় আকারের তীর্যক উপার্জন বণ্টনের ফলে ধনীরা তাদের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য দুর্লভ সম্পদ স্থানান্ত র করতে সক্ষম হয়। এর ফলে প্রয়োজন মিটানোর জন্য লভ্য সম্পদেরই কেবল হ্রাস ঘটে না, সঞ্চয় এবং আমদানি-রপ্তানির মধ্যেও দূরত্ব বৃদ্ধি হয় এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার আরো অবনতি ঘটে। বিশোধন কৌশল হিসেবে মূল্য কৌশলের উপর নির্ভরশীলতা চাহিদা ও সরবরাহের একটি সমতা আনয়নে সহায়তা করে, তবে তা গরীবদের কষ্টের বিনিময়ে তাদের সীমিত উপকরণ দিয়ে উচ্চমূল্যে চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এভাবে তাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হয়।

বাজারব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকৃত বিশোধন কৌশলের পরিবর্তে পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। এতে ব্যবস্থাটি একনায়কতন্ত্রমূলক হবে, অথচ লক্ষ্য অর্জনে কোনো উন্নতি হবে না। আমলাতন্ত্রের হাতে সম্পদ বরাদ্দের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দুর্বল, ধীর ও অদক্ষ হয়ে পড়বে। কারণ ভোক্তাদের অগ্রাধিকার ও উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে তাড়াতাড়ি তথ্য প্রাপ্তির কোনো কার্যকর পথ আমলাতন্ত্রের কাছে নেই। এমনকি আমলাতন্ত্রের কাছে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা বা সমাজসম্মত মূল্যবোধও নেই। সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের কাছে একমাত্র মানদণ্ড হলো তার নিজস্ব বিবেচনাবোধ, যা সমাজসম্মত মূল্যবোধ বা বাজার পরিস্থিতির সাহায্য ছাড়া সম্পদের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা বা চাহিদা পূরণের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় এনে সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারে না। উপরন্তু, ক্ষমতার অবস্থানগুলো এদের উপস্থিতির কারণে তাদের নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারে তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এর ফলে সম্পদের যে বরাদ্দ ও বিতরণ হয়ে থাকে, তা না হয় দক্ষ না হয় ন্যায়ভিত্তিক।

অতএব, সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা প্রয়োগ করার জন্য সর্বোত্তম কর্মকৌশল হচ্ছে, বাজারব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অপসারণ না করা। বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতন্ত্রায়ন ঘটে; এ প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ই অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে অধিকতর দক্ষতার প্রচলন ঘটে। বরং আরো ভালো হবে অন্য কোনো উপায়ে মূল্য কৌশলের পরিপূরণ করা, যাতে সম্পদের উপর অপ্রয়োজনীয় দাবি নির্মূল না হলেও অন্তত নিম্নতম পর্যায়ে থাকবে, এসব দাবি সে ধরনের যা ভারসাম্যহীনতা ঘটায় এবং চাহিদা পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম নৈতিক বিশোধন প্রচলনের মাধ্যমে এ কাজ করে থাকে। বিশোধনের দ্বৈত স্তরের মাধ্যমে সম্পদের বরাদ্দ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। প্রথম স্তরের বিশোধন খিলাফত ও আদলের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারের মাত্রা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎস মুখেই ব্যক্তিমানুষের অন্তর সচেতনতা থেকে উদ্ভূত সীমাহীন চাহিদা ও সমস্যার মোকাবিলা করে। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে সম্পদের উপর তাদের সম্ভাব্য দাবি ইসলামী মূল্যবোধের বিশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া অপরিহার্য করেছে, যাতে বাজারে প্রবেশ করার আগেই তার অনেকগুলো বাদ পড়ে যায়। এভাবে সম্পদের উপর যে দাবি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না বা মানবকল্যাণ অর্জন থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত করে, সেসব দাবি বাজার মূল্যে দ্বিতীয় বিশোধন স্তরে প্রকাশ পাবার আগেই উৎসমুখেই বিলুপ্ত হয়।

নৈতিক বিশোধন সম্পদের উপর দাবিকে মানবকল্যাণের একটি কাজে পরিণত করে এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সম্পদের ব্যবহার অনুমোদন করে না। উদাহরণস্বরূপ, এ বিশোধন নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ সেসব তৎপরতায় সম্পদের ব্যবস্থার অনুমোদন করে না, যেসব তৎপরতায় মানুষ, পশু বা গাছপালা বর্তমান বা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাদের কল্যাণ হ্রাস পেতে পারে। এ প্রক্রিয়া একটি সাধারণ জীবনাচার কামনা করে এবং অমিতব্যয়িতা বা অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা বা জাঁকজমকের জন্য সম্পদের ব্যবহার অনুমোদন করে না। কারণ এ ধরনের ব্যবহার কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রকৃত পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়া সম্পদের ধ্বংস বা অপব্যয়ও বরদাশত করে না (যেমনঃ মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্য পুড়িয়ে ফেলা)। যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও এমনভাবে পুনর্গঠন করা যায় যে, তা বিশোধন প্রক্রিয়ার পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে সম্পদের উপর দাবিকে যথার্থ সীমার মধ্যে রাখা যাবে। সম্পদ, দক্ষতা ও আর্থিক মধ্যস্থতা সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এ নৈতিক প্রক্রিয়াটি সত্যকে এভাবে নমনীয় ও মানবতাসম্পন্ন করে।[৪০] ব্যারিংটন মূর যথার্থই উল্লেখ করেছেন, কোনো মানবসমাজই সব ধরনের মানবিক আচরণ অনুমোদন করতে পারে না, যদি তা করত তবে শিগগিরই সমাজ হিসেবে তা অবলুপ্ত হতো'।[৪১]

যাইহোক, প্রত্যেকটি সমাজের অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের একটি নৈতিক বিশোধন কে দিতে পারবে? একটি নৈতিক পদ্ধতি কি অবশ্যই ঐশ্বরিক সূত্র ভিত্তিক হবে এবং এর পিছনে কি অবশ্যই স্রষ্টার নিকট জবাবদিহিতার বিশ্বাস কাজ করবে? অন্যান্য কয়েকটি ধর্মের মতো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ঐশ্বরিক মঞ্জুরি এবং পরকালে বিশ্বাস উভয়ই জরুরি।

প্রথমত, ঐশ্বরিক বিধিনিষেধের কারণে আচরণবিধি নিরঙ্কুশ ও বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। স্রষ্টার বিধিনিষেধ ছাড়া প্রণীত আচরণ ব্যক্তিগত বিচারে মতভেদের বিষয় হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে পশ্চিমা সমাজে সেকুলার মতবাদ গ্রহণের পর। পরে তাদের মূল্যবোধটিই সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।[৪২] বিভিন্ন সভ্যতা ব্যাপক ও গভীরভাবে পর্যালোচনার পর ডুরান্ট ইতিহাস থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আমাদের সামনে ইতিহাসের এমন কোনো সমাজের উদাহরণ নেই, যেখানে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যতিরেকে সাফল্যজনকভাবে কোনো নৈতিক জীবন পালন করা হয়েছে।[৪৩]

দ্বিতীয়ত, মানব সমাজে এমন কে আছে, যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সকলের কল্যাণে পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারে? যদি মানবসত্তার নিজেদেরকেই এসব নিয়ম তৈরি করতে হতো, তাহলে তা প্রণয়ন করতে তাদের মাঝে এ ধরনের প্রবণতাই কাজ করত, যাতে তা প্রতিপত্তিশালী ও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে যায় এবং যা সকলের কল্যাণ করতে অপারগ। এমনকি নিরপেক্ষতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহই সর্বসম্মতির সুযোগ নস্যাৎ করে দেয়।

তৃতীয়ত, অন্যদের উপর তাদের কাজের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করার জ্ঞান মানুষের নেই, বিশেষ করে অনেক দূর থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, তাদের আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য এমন জ্ঞানী ও বিবেকবান সত্তার প্রয়োজন, যা এ ধরনের প্রতিফল সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে, যাতে তাদের কোনো কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অন্যেরা রক্ষা পায়।[৪৩]

চতুর্থত, সেই পরম সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এককভাবে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন, শক্তি, দুর্বলতা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম এবং তাদের একমাত্র নিয়ন্ত্রক ও সকল মূল্যবোধের উৎস হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা রাখেন। তার সীমাহীন দয়াময়তায় তিনি মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে পথহীন ছেড়ে দেননি; স্বয়ং আদম (আ) থেকে শুরু করে নবীদের এক নিরবচ্ছিন্ন দলের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দিয়েছেন যে পথনির্দেশ সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

এ যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা অকল্পনীয়। মূল্যবোধ কাঠামোর নিরপেক্ষতা কেবলমাত্র সেই ব্যবস্থার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মস্বার্থ বা আত্মকেন্দ্রিক যুক্তিবাদিতাকে মহিমান্বিত করে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামে প্রধানত সামাজিক দায়িত্ব ও সকলের

কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মূল্যবোধ সকল খলিফার দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। তাদের সকলকে 'মাকাসিদ' বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এ মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতি রেখে কাজ করতে হয়। সামষ্টিক মূল্যবোধ বিবেচনা অপরিহার্য এবং এ মূল্যবোধ বিচার থেকে বিরত থাকার যে কোনো প্রচেষ্টা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এবং সকলের কল্যাণ অর্জন ব্যর্থ করে দিতে বাধ্য। সমাজসম্মত মূল্যবোধের বিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের উপর দাবি বিবেচিত হবার পর এভাবে অপ্রয়োজনীয় দাবি পরিত্যাগ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে হলে বাজার মূল্যের এ বিশোধন কৌশল দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রচলনে আরো বেশি কার্যকর হবে।

(খ) সঠিক প্রণোদনা

দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা কেবলমাত্র একটি যথার্থ বিশ্রোধন কৌশলের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। প্রত্যেক মানুষকে সেভাবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করাও প্রয়োজন। পুঁজিবাদের ধারণা হলো ঃ আত্মস্বার্থ একজন মানুষকে তার দক্ষতাকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সাথে সাথে প্রতিযোগিতা আত্মস্বার্থ উদ্ধারের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে এবং সামাজিক স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করবে। এ্যাডাম স্মিথ তাই মনে করেন, বাজারব্যবস্থা আত্মস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মানুষকে বিশ্বাস করেনি এবং এ ধারণা পোষণ করেছে যে, তার স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অবশ্যই সামাজিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব, সামাজিক স্বার্থ রক্ষাকল্পে সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের উপর এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিত এবং কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কিন্তু ব্যক্তি মানুষ কর্তৃক স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবেই খারাপ নয়। মানব উন্নয়নের জন্য অবশ্যই এটি প্রয়োজন এবং অনুমোদিত না হলে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দক্ষতা অর্জনে সফল হবে না। আত্মস্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র তখনই ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যখন তা কতিপয় সীমারেখা অতিক্রম করে এবং ব্যক্তি মানুষ তেমন একটি সমাজ সৃষ্টিতে আগ্রহী হয় না, যে সমাজের মূল লক্ষ্য ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ সামাজিক ন্যায়বিচার। যাইহোক, বিবেকবান মানুষ কোনো সমাজে তার কাজের যথার্থ প্রতিদান পেতে সক্ষম হলে সাধারণত তার নিজের স্বার্থের জন্য তার সাধ্যমতো কাজ করতে আগ্রহী হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে, সমাজের স্বার্থে কাজ করতে কী জিনিস তাকে উদ্বুদ্ধ করে? একজন ভোক্তা কেন সম্পদের উপর তার দাবি 'মানবতার সীমারেখার মধ্যে' সীমাবদ্ধ রাখবে এবং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে এবং কেন একজন ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে না এবং প্রশ্নসাপেক্ষ পথে নিজে ধনী হবে না? এখানেই প্রভুর সম্মুখে জবাবদিহিতা এবং পরকালের বিশ্বাস অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

আত্মস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্য যখন ইহকালের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তা লোভ, বিবেকহীনতা এবং অন্যের স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে বাধ্য। দি ইকনমিষ্ট এর ভাষায় 'যখনই তারা কোনো সুযোগ পায় বিবেকহীন অর্থনৈতিক শক্তিগুলো অন্য সবার ক্ষতির বিনিময়ে নিজেরা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের বাড়তির কারণে যে শক্তি সাধারণত বাজারকে কার্যকর রাখে, তাই বাজার সমাধানকে ব্যর্থ করে দেয়'।[৪৫] সেকুলার তথা ইহলৌকিক সমাজে সচেতনভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, যেখানে তা তাদের ইহলৌকিক কোনো সুবিধা বয়ে আনে না। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে এ ধরনের সমাজে প্যারেটোর সর্বাধিক অনুকূল অবস্থার ধারণাটি একমাত্র যৌক্তিক আচরণ পদ্ধতি। অন্যান্য সেকুলার পন্থীদের মতো ইহলৌকিক কাঠামোর মধ্যে প্যারেটোর চিন্তাচেতনা ভুল ছিল না।

কোনো ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থে কাজ করানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণের কোনো কার্যকর কৌশল পুঁজিবাদের নেই, যদি সেই স্বার্থ আত্মস্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত না হয়। এ দুই স্বার্থ যখন এক নয় ও পটভূমিকার শর্তাবলীও পূরণ করে না, তখন একমাত্র মূল্যব্যবস্থার উপর নির্ভরতার ফলে ধনীরা তাদের গৌণ চাহিদা পূরণের জন্য দুস্প্রাপ্য সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে; ফলে গরীবরা প্রয়োজন মেটানোর জন্য বঞ্চিত হয়। পুঁজিবাদ এভাবে অসাম্যে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্র এর চেয়েও খারাপ। কারণ ব্যক্তি মানুষকে তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার থেকে নিবৃত্ত করতে যেয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে কোনো ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণের কর্মকৌশল এ মতবাদে নেই। এছাড়া এর ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজের স্বার্থে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণও এই মতবাদে কোনো ব্যক্তির জন্য নেই। এভাবে সমাজতন্ত্র দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

যাইহোক, যদি সর্বশক্তিমান সত্তা, যার নিকট থেকে কোনো কিছু লুকানো সম্ভব নয় (কোরআন-৫:৩), তাঁর সামনে জবাবদিহিতা এবং মৃত্যুর পরে জীবনের ধারণা প্রচলিত হয়, তবে উচ্চস্তরের যুক্তিবাদিতা সৃষ্টি হয়। এসব বিশ্বাস সমাজমুখী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং তখন আত্মস্বার্থ এক সীমাহীন দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে পরিণত হয়। এসবের অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির নিজ স্বার্থ শুধু ইহলৌকিক অবস্থার উন্নতিতেই নিহিত নয়, তার জন্য পরলৌকিক অবস্থার উন্নতিও দরকার। অতএব সে যদি বিবেকসম্পন্ন হয় এবং নিজের জন্য যা সর্বোত্তম তাই চায়, তাহলে সে শুধু নিজের স্বল্পমেয়াদী দুনিয়ার কল্যাণের লক্ষ্যেই কাজ করবে না, দেদার ব্যয় করার আর্থিক সংগতি সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়মূলক উপভোগ হ্রাসের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণে কাজ করে নিজের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণও নিশ্চিত করবে। এভাবে সাশ্রয়কৃত সম্পদ বর্ধিত উৎপাদন ও চাহিদা পূরণকারী মালামাল সরবরাহে ব্যবহৃত হতে পারে এবং এভাবে গরীবের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে। অনুরূপভাবে, পরকালের জীবনের তুলনায় ইহলোকের জীবন খুবই নগণ্য-এ

বিশ্বাস কোনো ব্যবসায়ীকে প্রশ্নসাপেক্ষ উপায়ে ধনী হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে এবং এভাবে অন্যদেরকে তাদের সুযোগ সংকুচিত না করে এবং স্বাধীন জীবিকা থেকে বঞ্চিত না করে সাহায্য করতে পারে। কী, কেমন করে এবং কার জন্য উৎপাদন করতে হবে সেসব প্রশ্নের উত্তরে কোনো ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণে একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কৌশল হিসেবে কাজ করতে এসব বিশ্বাস শক্তি রাখে এবং এভাবে তা সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিতরণ ও বরাদ্দ নিশ্চিত করে।

ইসলাম মানুষের কাজের একটি দীর্ঘমেয়াদী জীবনদর্শন প্রদান করে, সে সঙ্গে মানুষ এ দুনিয়াতে তার আত্মস্বার্থ অস্বীকার করুক তাও চায় না। এটা বাস্তবসম্মত হতো না। যে মূল্যবোধ এরূপ ব্যবস্থা করে তা ক্রিয়াশীল হয় না। মূলত ইসলাম চায়, কোনো ব্যক্তি তার সকল অপরিহার্য প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য পূরণ করুক এবং তার নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে দক্ষ হোক এবং তা করতে যেয়ে তার সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে উন্নত করুক। আল্লাহ যেসব ভালো জিনিস দান করেছেন তা পরিহার করার কোনো যুক্তি নেই (কোরআন-৭:৩২)। তবে, যেহেতু সম্পদ সীমিত, সেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য সবার কল্যাণ অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মানুষ হবার মতো চরম পর্যায়ে যাওয়া তাকে মানায় না। এলেক নোভ যথার্থই মন্তব্য করেছেন: 'যেসব সমাজ কেবল লাভ নিয়েই ব্যস্ত, সেগুলো খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। আক্ষরিক ও আলংকারিক অর্থে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে, যেখানে সাফল্যের প্রধান মানদণ্ড টাকা বানানোই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৪৬] অনুরূপভাবে, জোসেফ স্কামপিটার মন্তব্য করেছেন যে, 'কোনো সমাজব্যবস্থাই কাজ করতে পারে না, যেখানে প্রত্যেকেই নিজের একক স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা পরিচালিত হয় না'।[৪৭] একটি নিক্তি (কোরআনের মিজান পরিভাষায় ৫:৭-৯) একান্তই প্রয়োজন, যা সামাজিক কল্যাণ ও মানুষের কর্মক্ষমতার অব্যাহত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

ইসলাম এ ধরনের ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য যা করেছে, তাতে আত্মস্বার্থকে আধ্যাত্মিক এবং দীর্ঘমেয়াদী মাত্রা দিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই দুনিয়ায় তার অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি নজর দেবে, সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী জীবন পরকালের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। এ দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিছুটা স্বার্থপর হয়ত হতে হয়। অবশ্য হতেই হবে এমন নয়। কেননা পরকালের স্বার্থ অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। এজন্য যে সম্পূর্ণ আত্মঅস্বীকৃতির পথ বেছে নিতে হবে তাও নয়। অতএব, একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ সত্তার সামনে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস এভাবে আত্মস্বার্থ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক কল্যাণমুখী আচরণ করতে উদ্বুদ্ধকরণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে জোরজবরদস্তি করে এ কাজ করানো সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র কর্তৃক ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্ছিদ্র নয় এবং ঘুষ দিয়ে বা রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করে অফিসিয়াল শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এভাবে মার্কসীয় তত্ত্বে যা অস্বীকার করা হয়েছে ইসলাম তাকে স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম লাভ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে ব্যক্তির উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, দক্ষতা ও কর্ম অভিযানে ব্যক্তির আত্মস্বার্থের অবদানকে স্বীকার করে। অবশ্য ইসলাম লোভ, বিবেকহীনতা ও অন্যদের অধিকার ও প্রয়োজন অবজ্ঞা করার ক্ষতিকর দিক মোকাবিলা করে, যা পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী, সেকুলার স্বল্পমেয়াদী পার্থিব চিন্তাধারার অনিবার্যভাবেই প্রসার ঘটায়। ইসলাম এভাবে ব্যক্তির নিজের গহীন চেতনায় অভ্যন্তরীণ ও স্বনিয়ন্ত্রিত কর্মকৌশল প্রবিষ্ট করার মাধ্যমে এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, মানব ভ্রাতৃত্ব এবং স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার বিকাশের উপর নিরন্তর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশ্বাসের এ কাঠামো সামাজিক স্বার্থ উদ্ধারের পথ বন্ধ করতে দৃঢ় উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রতিযোগিতা ও বাজার শক্তি বরাদ্দকারী প্রক্রিয়ার দক্ষতা অর্জনে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। কিন্তু সামাজিক লক্ষ্য অর্জন যদি নিশ্চিত করতে হয় তবে এগুলোকে অবশ্যই নৈতিক মূল্যবোধের বিশোধক কর্মকৌশলের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজ করতে হবে। কেবলমাত্র এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই প্রতিযোগিতা 'সুস্থ' এবং বাজার শক্তি 'মানবিক' হতে পারে। দুর্লভ সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহারের জন্য মানবসত্তার মাঝে শক্তিশালী উদ্বুদ্ধকারী প্রণোদনা সৃষ্টিতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসের যে ক্ষমতা রয়েছে, প্রতিযোগিতা বা বাজার শক্তি অথবা কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তা নেই। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণে এবং নিজেদের স্বার্থপর সুবিধায় সম্পদ কাজে লাগানো, প্রভাব বিস্তারে শক্তিশালী সুবিধাবাদী শ্রেণীকে বাধাদান অথবা সমাজকল্যাণের চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় করায় উৎসাহ প্রদানের কোনো অন্তঃকৌশল নেই। অথচ অন্য কোনো কার্যকর ধর্মীয় ব্যবস্থার মতো ইসলামী ব্যবস্থায় তাদেরকে শক্তিশালীভাবে উদ্বুদ্ধ করা হবে। যদি তারা উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে তারা দীর্ঘমেয়াদী আত্মস্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করবে।

(গ) আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

বিশোধন কৌশল এবং উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা দু'টোই ভোতা হয়ে যেতে পারে, যদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুকূল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপূরক না থাকে। সামাজিক পরিবেশ বিশ্বস্ততার বিধি পালনের অনুকূল হওয়া উচিত, যাতে বস্তুগত সম্পদ অর্জন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ভোগ সম্মানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে না পারে। অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনামুখী মানুষ জন্মগ্রহণ না করে এবং জন্মগ্রহণ করলেও যেন বেঁচে না থাকে। যদি সমাজের মূল্যবোধব্যবস্থা অর্থনীতিমুখী মানুষের মর্যাদাকে আহত করে এবং যদি অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করে, তা এমনভাবে আরো শক্তিশালী করা হয় যে, অর্থনীতির বরাদ্দ ও বিতরণকারী শক্তিসমূহ দুর্লভ সম্পদ সেসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার সমর্থন না করে লক্ষ্য অর্জনকে ব্যর্থ করে দেয়, তবে ব্যক্তি

মানুষের ভোগ, আয় ও বিনিয়োগ আচরণে উন্নততর গুণ ও অর্থ সূচিত হতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে এমনভাবে জোরদার করা যায় যে, সমাজের অবৈধ শক্তির কেন্দ্রগুলো আরো দুর্বল হয়ে পড়ে, যাতে কেউ তার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খাটিয়ে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। এ ধরনের পুনর্গঠনের অভাবে সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা ও বৈষম্যই শুধু চিরস্থায়ী হবে না, তা দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যহীনতার আরো অবনতি ঘটাবে।

এ ধরনের পুনর্গঠন এলোপাতাড়ি অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে করা যাবে না। তা হতে হবে অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণের মাধ্যমে একটি সুচিন্তিত, লক্ষ্যাশ্রয়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার কর্মসূচি। পুনর্গঠন কর্মসূচিতে যা বিবেচনায় আনতে হবে তা হলোঃ

ক. ব্যক্তি-মানুষকে তার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তার মাধ্যমে মানব উপাদানকে জোরদার করার লক্ষ্যে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জনে সহায়তা।

খ. সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বর্তমান কেন্দ্রীভবন হ্রাস করা।

গ. অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ভোগ নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসায় সহায়তা করা এবং চাহিদা পূরণ, রপ্তানি এবং বর্ধিত কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে সরকারি রাজস্ব ও আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করা।

অন্য কথায় যা প্রয়োজন তা হলো, মানবসত্তার সংস্কার এবং ভোগের ধরণ বিনিয়োগ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের সার্বিক পুনর্গঠন। সম্পদের স্বল্পতা বা ভারসাম্যতা যত বড় হবে এবং মাকাসিদ ও বাস্তবতার মাঝে দূরত্ব যত বেশি হবে, পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তাও তত ব্যাপক হবে।

পুনর্গঠনের কয়েকটি মৌলিক উপাদান একজন মুসলিমের বিশ্বাসের একটি অখণ্ড রূপ। যেহেতু পরকালে তার ভাগ্য ঐ সব বিশ্বাসের বিশ্বস্ত অনুসরণের উপর নির্ভরশীল, তা করতে তার প্রণোদনা হবে খুব জোরালো। অতএব ইসলামী পরিবেশে পুনর্গঠন সেকুলার পরিবেশের চেয়ে আরো বেশি সফল হওয়া স্বাভাবিক। একবার এ ধরনের পুনর্গঠন কার্যকরভাবে করা গেলে এর থেকে লব্দ ব্যবস্থা পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র অথবা কল্যাণ রাষ্ট্রের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। যাইহোক, এ বইয়ে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামের সকল মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যালোচনা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। এজন্যে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ গ্রন্থাদি রয়েছে। তথাপি চারটি প্রধান পুনর্গঠন উপাদান ইসলামে রয়েছে যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে বা ভুল বোঝা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

ক. আমানতকৃত সম্পদের বিবেক মোতাবেক ব্যবহার;
খ. যাকাত ও অন্যান্য দান-সাদাকার মাধ্যমে সামাজিক সাহায্য;
গ. উত্তরাধিকার; এবং
ঘ. আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন।

মাকাসিদ অর্জনে একটি নীতিমালা প্রণয়নে এসবের গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে সুস্পষ্ট হবে।

(ঘ) রাষ্ট্রের ভূমিকা

অর্থনীতিতে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলে এত ব্যাপক একটি পুনর্গঠন সম্ভব নাও হতে পারে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই ইসলামের মূল্যবোধ ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করতে হবে।[৪৮] এর কারণ হচ্ছে, এমনকি একটি নৈতিকতা সমৃদ্ধ পরিবেশেও কোনো লোক এ ধরনের হওয়া সম্ভব, যে অন্যদের অতি জরুরি প্রয়োজন সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন অথবা দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা এবং সম্পদ ব্যবহারের সামাজিক অগ্রাধিকার সম্পর্কে উদাসীন। তাছাড়া, এমন অনেক কাজ আছে যা সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন, অথচ কোনো ব্যক্তি তা করতে আগ্রহী নাও হতে পারে অথবা বাজারের ব্যর্থতা বা পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহে অপরাগতার কারণে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে তা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এমতাবস্থায়, নৈতিক উন্নতি বা মূল্যব্যবস্থা, তা যত অপরিহার্যই হোক না কেন, সম্পদ বিতরণ ও বরাদ্দে ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার জন্য যে ধরনের পুনর্গঠন প্রয়োজন তা অর্জনে পর্যাপ্ত হতে পারে না। অতএব প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কয়েকটি বিষয়ের আওতায় এটি আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম আল-আহকাম-আল-সুলতানিয়া (সরকারি বিধিবিধান), মাকাসিদ আল-শরীয়াহ, আল-সিয়াসাহ আল-শরীয়াহ (শরীয়াহর রাজনৈতিক নীতি) এবং আল-হিসবাহ (সরকারি হিসাব)।[৪৯]

যাইহোক, ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা 'হস্তক্ষেপ' প্রকৃতির নয়, যেখানে লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদের গন্ধ থাকে। এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উদ্যম নিঃশেষকারী ও স্বাধীনতা হরণকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় বিতরণ ব্যবস্থার প্রকৃতি নেই। এটি ধর্মনিরপেক্ষ কল্যাণ রাষ্ট্রের মতোও নয়, যা মূল্যবোধ বিচারের প্রতি অনীহার কারণে সম্পদের উপর জোর দাবি জানায় এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। বরং এর ভূমিকা ইতিবাচক ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে সকলের কল্যাণ অর্জনে সহয়তা করা, অর্থনৈতিক যন্ত্রযানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। শক্তিশালী সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে বিচ্যুতি থেকে বাধা দেয়া রাষ্ট্রের একটি নৈতিক দায়িত্ব। ইসলামী মূল্যবোধ বাস্ত বায়নে জনগণের প্রণোদনা যত বেশি হবে এবং মাকাসিদ অর্জন এবং সম্পদ ও দাবির মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক সমতা সৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যত বেশি

কার্যকর হবে, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের তত কম ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে রাষ্ট্রের ভূমিকা যাই হোক না কেন, তা স্বেচ্ছাচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; শরীয়াহর বিধিনিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার 'আলাপ আলোচনা'র (শুরা) মাধ্যমে কার্যকরী হওয়া উচিত।

এভাবে ইসলাম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে মূল্য কৌশলের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়, তবে বাজার শক্তিকে অলঙ্ঘনীয় মনে করে না। বাজার শক্তির অন্ধ প্রয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিকভাবে সৃজনশীল, উৎপাদনশীল উদ্যোগকে প্রতিদান দেয় না, শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে না অথবা দুর্বল ও অভাবীদেরকে সাহায্য করে না। অতএব, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে মাকাসিদ অর্জন নিশ্চিত করা। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই পুলিশী রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রকে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শক্তি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই বা অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করা বা তার মালিকানার উপর নির্ভর করারও প্রয়োজন নেই। শরীয়াহ বাস্তবায়নে জ্ঞান, দৃঢ় প্রত্যয় ও কৌশলের অনুসরণ প্রয়োজন (কোরআন-২:২৫৬; ও ১৬:১২৫)। রাষ্ট্র বরং সামাজিক কল্যাণের সীমারেখার মধ্যে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বেসরকারি খাতকে সাহায্য ও উদ্বুদ্ধকরণের চেষ্টা করবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে জনগণের নৈতিক সচেতনতার উপর নির্ভর করতে হবে, যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ত্বরান্বিত হয়। এ জন্য সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রকে তার লক্ষ্য অর্জনে মানবসত্তার মধ্যে যথাযথ আন্তঃসংযোগ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি যথাযথ কাঠামো সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ ভূমিকা আরো সুস্পষ্ট হবে এবং সেখানে ইসলামী মূল্যবোধের নীতিনির্ধারণের মর্মার্থ আলোচিত হবে।[৫০]

একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রস্তাবনা

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের জন্য ইসলাম কোনো যাদুকরী ফর্মুলা, কর্মকৌশল ও প্রক্রিয়ার দাবি করে না। কোনো প্রক্রিয়ার এরকম দাবি সে সমাজের জটিলতা উপলব্ধি ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থকে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ উপলব্ধির অসামর্থ্যের ইঙ্গিত দেয়। তাতে ঐ সব পদ্ধতিতে তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়া, এবং সুবিধাবাদী শ্রেণীর সমৃদ্ধির জন্য 'বৈজ্ঞানিক' যৌক্তিকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

ইসলাম অধিকতর বাস্তবভিত্তিক। ইসলাম দুষ্প্রাপ্যতা থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ অনুভব করে এবং বিভিন্ন পন্থার সমন্বয়ে প্রণীত কর্মকৌশলের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যে কর্মকৌশল সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বিশ্বদর্শন ও মাকাসিদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ ধরনের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির

অনুপস্থিতিতে কার্যকর কোনো কর্মকৌশলের জন্ম হতে পারে না, সেটা হতে পারে সামাজিক শ্রেণীসমূহ ও বহুত্ববাদী দলগুলোর পরস্পর বিরোধী দাবির সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে প্রণীত অসংলগ্ন নীতিসমূহের একটি জগাখিচুড়ি সংমিশ্রণ।

এরপরও কিছু লেখক এ ধরনের একটি মিথ্যা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামী কর্মসূচি তিনটি ব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল– আচরণ, যাকাত ও সুদের নিষিদ্ধতা।[৫১] এ তিনটি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কাঠামো পুণর্বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত অংশ নয়। এমনকি এ তিনটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে যদি এর পিছনে একটি যথার্থ বিশোধনমূলক কর্মপন্থা, একটি জোরদার উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা, কার্যকর পুনর্গঠন এবং সরকারের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকার সাহায্য ও সমর্থন থাকে। এ তিনটি ব্যবস্থা এককভাবে 'মাকাসিদ' অর্জনের বোঝা ও দায়িত্ব বহন করতে পারে না। এটি একটি কঙ্কালের মাথার খুলি, বুক ও পা দেখে সেটিকেই মানুষ বলার মতো। এগুলো মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এগুলোর কোনোটিই একজন মানুষের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এতে একক কোনো উপাদানের সাহায্যে সম্পূর্ণ রন্ধন প্রণালীর পার্থক্য থেকে যায়। পৃথকভাবে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ খাবারের স্বাদ, সুগন্ধ, রং ও অসম্পূর্ণতা দিতে পারে না, তা সমস্ত রন্ধন প্রণালীতে উপাদানগুলো যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন।

ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, মানবসত্তার পরিবর্তনে এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বপূর্ণতার সাথে কাজ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে বিশ্বাস ও আচরণের যে ক্ষমতা রয়েছে, তাকে খাটো করে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মূলত এ ধরনের বিশ্বাস ও আচরণ না থাকলে কোনো ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না, তা তার পিছনে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে শক্তিই থাকুক না কেন। এ ধরনের বিশ্বাস ও আচরণের আদর্শ, এমনকি পুঁজিবাদও, সমাজতন্ত্রের অধীনে টিকে থাকতে পারে না। সেকুলার মতবাদ তাকে নির্মূল করতে পারেনি, কেবল ব্যাপকভাবে দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে। গুরুত্ব না দেয়া সত্ত্বেও তারা সংক্ষিপ্ত পরিধিতে হলেও ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় সাধনে এবং সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনে ন্যায়পরায়ণতার ন্যূনতম পর্যায় সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। এটা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট সমাজগুলো হয় নিজেদেরই টুকরো টুকরো করে ফেলবে অথবা বিপ্লবের আবর্তে নিয়োজিত হবে। তবে এগুলোর চরম অবস্থায় অধিকাংশ ব্যতিরেকে সমাজকল্যাণের মধ্যে তাদের স্বার্থ সেই পর্যায়ে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, যে পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্যামুয়েল বৃটান যথার্থই বলেছেন, 'কঠোর উন্নাসিকের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে, মানব ক্রিয়ায় নৈতিক বৈধতার ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা। আত্মস্বার্থ উদ্ধারের উপর নিয়ন্ত্রণকারী কিছু বিধি ছাড়া কোনো মানব সংগঠনই কাজ করতে পারে না'।[৫২]

যাকাত, উত্তরাধিকার এবং সুদের উচ্ছেদ শুধুমাত্র এমন মূল্যবোধ নয়, যা প্রত্যেক মুসলিমকে ব্যক্তিগত, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলতে হবে। মাকাসিদ অর্জন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়েছে। সরকারের ভূমিকাসহ ইসলামী কর্মকৌশলের অন্যান্য উপাদানসমূহের কার্যকর পুনরুজ্জীবনের পরিপ্রেক্ষিত এদের গুরুত্ব অবমূল্যায়ন করা সঠিক নয়। তবে এগুলো সবই একটি সার্বিক আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের অংশ এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করে তাদের পূর্ণ কার্যক্ষমতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইসলামী কর্মসূচিকে তার সার্বিক কার্যকারিতার জন্য সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, আংশিক গ্রহণ বাস্তবায়ন লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করতে পারে না। এ ব্যাপারে আল-কোরআনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

'তুমি কি পবিত্র গ্রন্থের একটি অংশ মাত্র বিশ্বাস করবে এবং অবশিষ্ট পরিত্যাগ করবে? কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের জন্যে এ দুনিয়াতে বেইজ্জতি এবং হাশরের দিন কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে?' (২:৮৫)

'হে মুসলিমগণ, ইসলামের ভিতর পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কারণ সে তোমার নিশ্চিত শত্রু। (২:২০৮)

'আল্লাহ্ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে'। (১৩:১১)

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (পঞ্চম অধ্যায়)

১. তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, M. Nejatullah Siddiqi, "*Tawhid,* the Concept and the Process'', in K. Ahmad and Z. I. Ansari, *Islamic Perspectives: Studies in Honour of Sayyid Abul A'la Mawdudi* (1979), pp. 17-33.

২. ইসলামের খিলাফত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থবহ ধারণার জন্য দেখুন, 'Abd al Qadir 'Awdah: Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam (1389A.H.), pp. 12-15, এ হচ্ছে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মত এবং ইসলামের প্রথম যুগের ও আধুনিককালের কোরআনের তাফসীরকারগণ ও পণ্ডিতব্যক্তিরা একে সমর্থন করে গেছেন। এর শিকড় কোরআন ও হাদিস উভয়েই আমরা খুঁজে পাই। Sayyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar* (1954), pp. 257-61; Syyid Qutb. *Fi Zilal al-Qur'an* (1986), vol. 1. pp. 50-1; Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Tafhim al-Qur'an* (1967-73), vol. 3. pp. 417-20 and 592, vol. 4, pp. 238 and 483; and Imam Hasan al-Banna, "Al-Insan fi al-Qur'an", in *Hadith al-Thulatha li'l Imam Hasan al-Banna'*. ed. Ahmad 'Isa 'Ashur (1985), pp. 19-25.) যাইহোক, কিছু পণ্ডিতব্যক্তি পূর্বেও ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন যারা মানুষকে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করেন না। এ ধরনের মতাদর্শের

জন্য দেখুন Abdul Rahman Hasan al-Maydani, *Basair li'l Muslim* al-Mu'asir (1988), pp. 152-66; and, Jaafar Sheikh Idris, "Is Man the Vicegerent of God?" *Journal of Islamic Studies,* 1/1990, pp. 99-110.

৩. দেখুন Jafar Sheikh Idris, "Al-Tasawwur al-Islami li'l Insan: Asas li Fasafat al-Islam al-Tarbawiyyah"; and Shaykh Abdul Rahman Hasan al-Maydani, "Mafahim Qur'aniyyah Hawla al-Nafs al-Insaniyyah wa ma Tastamilu 'alyahi". উপরোক্ত উভয় নিবন্ধই ৩১ মার্চ ৮ এপ্রিল, ১৯৭৭ এ মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামিক শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছিল।

মানুষের প্রকৃতির মাঝে যে অপরিহার্যভাবে শুভগুণ রয়েছে তাই ব্যাখ্যা দেয়, কেন ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষের শুভচেতনা ও শুভবুদ্ধি প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং আর্তমানুষের সেবায় তারা বিপদ অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে (দেখুন "A Disaster Brings out the Best in People. Why? Science Has Theories But No Complete Answer", *Newsweek,* 6 November 1989, p. 9.) মানুষ কেন অনেক সময় কোনোরূপ প্রতিদান পাবে না এমন অপরিচিত জনের জন্যও স্বীয় জীবন পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে; একশ্রেণীর মানুষ অন্যশ্রেণীর মানুষ হতে কেন অধিক ত্যাগী-এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিভিত্তিক বিবর্তনবাদী তত্ত্ব প্রদান করতে পারে না। সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা অপর্যাপ্ত এবং উত্তর দানের চেয়ে অধিক প্রশ্নেরই জন্ম দেয়। মানুষের অন্তর্নিহিত মঙ্গলময়তা এবং বিনিময়ে আল্লাহপাক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত পুরস্কার ইসলামের এই ব্যাখ্যা ও উত্তর স্বার্থপর বিবর্তনবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল উত্তর প্রদান করে। অভ্যন্তরীণ মঙ্গলময়তার গুণ থাকা সত্ত্বেও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার জন্য মানুষের সঠিক অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। অভ্যন্তরীণ মানবিক গুণাবলী ও সঠিক প্রেরণা–এ দু'টো যৌথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে স্বীয় জাগতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেন মানুষ অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে।

৪. Maurice Boutin উদ্ধৃত করেছেন Immanuel এর গ্রন্থ- *Religion Within the Limits of Reason Alone* থেকে; "The Fall: Its Factual Acceptance and Practical Meaning in Contemporary Society", in Durwood Foster and Paul Mojzes (eds.), *Society and Original Sin: Ecumenical Essay on the Impact of the Fall* (1985), p. 14.

৫. H. D. Lewis, "Guilt", *The Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 3, 397. তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন Sulayman S. Nyang. "The Islamic Concept of Sin" in Foster and Mojzes (1985), pp. 52-61.

৬. দেখুন, Claude Welch *Protestant Thought in the Nineteenth Century* (1972), vol. 1 (1799-1870), p. 34; আরো দেখুন, Paul Tillich, *A Complete History of Christain Thought* (1968) pp. v, 34 and 47.

৭. B. F. Skinner, Science and Human Behaviour (1953); আরো দেখুন Leslie Stevenson, *Seven Theories of Human Nature* (1974), p. 104.

৮. দায়িত্ব ও নিয়তিবাদের সমস্যা অনেক গ্রন্থকার কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। যেমন Sidney Hook (ed.), *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science* (1958)-হচ্ছে সমকালীন কতিপয় দার্শনিক, Sidney Morgenbesser. এবং James Walsh (els), *Free Will* (1962) এর নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন। এ প্রবন্ধ ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক লেখকদের সতর্কভাবে নির্বাচিত রচনা হতে সংকলিত হয়েছে এবং ছাত্রদের জন্যই প্রধানত এটি প্রণীত হয়েছে। আরো দেখুন, A. J. Alden, *Free Action* (1961) এ গ্রন্থে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) মতবাদ বা বিতর্ককে কেন্দ্র করে ব্যাপক, গভীর ও তীক্ষ্ম আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। যদিও গ্রন্থকার প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) রয়েছে, তবে তিনি নিয়তিবাদ তত্ত্বের অনেক ভিত্তিভূমিকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন।

৯. Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness*, tr. by Hazel Barnes (1957). আরো দেখুন, Stevenson (1974), pp. 78-90; and Anthony Manser, Sartre: *A Philosophic Stud*y (1966).

১০. Sartre (1957), pp. 439 and 615.

১১. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৮।

১২. একজন মুসলমানের নিজের এবং অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, M. Fazlur Rahman Ansari, *The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society* (1973), vol. 2.

১৩. Bertrand Russell, A Free Man's Worship: Mysticism and Logic (1918), p. 46.

১৪. বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের একজন নর এবং একজন নারী হতে সৃষ্টি করে জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। অবশ্যই আল্লাহপাকের সামনে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত" (৪৯:১৩)। মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের স্রষ্টা একজন, তোমাদের পিতা একজন, তোমাদের বিশ্বাস এক, তোমাদের পিতা আদম এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট; একমাত্র সৎকর্মশীলতা ছাড়া একজন অনারবের উপর একজন আরবের অথবা একজন কৃষ্ণকায়ের উপর একজন শ্বেতাঙ্গের কোনো আধিপত্য নেই।" (The Prophet Muhammad (pbuh), in *Majma' al-Zawa'id*, 1352, vol. 8, p. 84. "আল্লাহপাক তোমার সম্পদ বা চেহারা দেখেন না। তিনি দেখেন তোমার হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম" (*Sahih Muslim*, 1955, vol. 4, p.1987:34, from Abu Hurayarh). "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচ্চরিত্রবান"। (*Sahih al-Bukhari,* vol. 8. p. 15, from Abdullah Ibn Umar)। ফলে দেখা যায়, আল কোরআনের আহবান বা বাণী শুধুমাত্র আরব জাতি বা মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্যঃ "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর বাণী বাহক" (৭ঃ১৫৮)।

১৫. *Mishkat al-Masabih* (1966), vol. 2, p. 613:4999.

১৬. মুসলমানের জীবনে আত্মত্যাগের ভূমিকার জন্য দেখুন Khurram Murad, *Sacrifice: The Making of a Muslim* (1985).

১৭. আল-কোরআন উৎসাহ প্রদান করে, "তোমরা ভালো কাজে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর"(২:১৮৪) এবং "পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে নয় বরং দয়া পবিত্রতায় একে অপরের সহিত সহযোগিতা কর" (৫:২)। রাসূলুল্লাহ (সা) গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "একে অপরকে ঘৃণা করো না, অপরকে সাহায্য করা হতে বিরত হয়ো না, জাগতিক বিষয়ে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর না, বরং আল্লাহপাকের বান্দা হিসেবে ভাই ভাই সম্পর্ক বজায় রাখ" (*Sahih Muslim*, 1955, vol. 4, p. 1986: 31, from Abu Hurayrah).

১৮. "এবং আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস কর এবং তা হতে খরচ কর, যার উপর তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন" (আল কুরআন ৫৭:৭)। সম্পদের জিম্মাদারী ও এর তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখুন, Awda,. *Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam,* 1389. A. H., pp. 26-50.

১৯. Munawar Iqbal (ed.) *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (1988), "Introduction", p. 15; আরো দেখুন, Zubair Hasan, "Distributional Equity in Islam", *ibid.*, pp. 41-5, ইসলামে আমানতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও মন্তব্যের জন্য বিশেষভাবে দেখুন, Dr. Erfan Shafey and Said Martan, pp. 63-90.

২০. "অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ অপহরণ করো না, অন্যের সম্পদ আত্মসাতের জন্য সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করো না" (আল কুরআন ২:১৮৮)।

২১. "এবং আল্লাহপাক তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন, তার দ্বারা আখেরাতের সুখের নিবাস অর্জনের চেষ্টা কর, কিন্তু এ পৃথিবীতে তোমার হিস্যার কথাও ভুলে যেওনা এবং অন্যের প্রতি সদাচরণ কর, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা করেছেন এবং বিবাদ সৃষ্টি কর না। কেননা আল্লাহ বিবাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না" (আল কুরআন ২৮:৭৭)। "এবং তারা অন্যদের নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা নিজেরাই হতদরিদ্র" (আল কোরআন ৫৯:৯)। "এবং তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত, বঞ্চিত ও সাহায্যপ্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে" (আল কুরআন ৭০:২৪).

২২. Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* 1969, p. 34.

২৩. অমিতব্যয়িতা ও অপচয়ের বিরুদ্ধে আল- কোরআনের ৭:৩১, ১৭:২৬-২৭ ও ২৫:৬৭ আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য। মহানবী (স) অপচয়ের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং সহজ-সরল জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অভাবের সময়ই শুধু নয়, সমৃদ্ধির সময়ও তিনি সম্পদের অপচয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (*Mishkat*, 1966, vol. 1. p 133:427) আরো দেখুন, Othman Liewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning", *Journal of Research in Islamic Economics,* vol. 1. No. 2. Winter 1984, p. 34)। মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের বিনয়ী হতে হবে যাতে তোমরা কারো ক্ষতি না কর এবং অহংকার না কর-এ মর্মে শিক্ষা আল্লাহপাক আমাকে দিয়েছেন" (*Sunan Abu Dawud,* 1952, vol. 2, p. 572,

from Iyad ibn Himar); এবং "আল্লাহপাক তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, যারা ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী কাপড় পরিধান করে" (*Sahih al-Bukhari,* vol. 7, p. 182, and *Sahih al Muslim,* 1955, vol. 3, p. 1651:42)। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি সক্ষমতা সত্ত্বেও বিনয়ের কারণে দামী পোশাক পরিধান পরিহার করবে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহপাক সমস্ত মানুষের সামনে তাকে ডেকে নিবেন এবং তাকে ইচ্ছামতো সবচেয়ে মর্যাদাবান পোশাক পরিধানের সম্মান দেবেন" (*Jami al-Tirmidhi, Tuhfat al-Ahwadhi,* vol. 3, p. 312-13 from Mu'adh ibn Anas al-Juhani; "পানাহার কর, দানশীল হও এবং অমিতব্যায়ী বা অহংকার প্রকাশকারী পোশাক পরিধান কর না" *Suyuti al-Jami al-Saghir,* vol. 2. p. 96 from ibn Umar, on the authority of Masbad Ahmad. Nisai, Ibn Majah and Mustadak Hakim)। এতে প্রতীয়মান হয়, আল-কোরআন ও আল হাদিস তাঁর অনুসারীদের সহজ সরল জীবনযাত্রার দিকে আহ্বান করছে এবং ফিকাহবিদগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, দুনিয়ায় নিজের শান-শওকত দেখানোর আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন ও এ বিষয়ে একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করা নিষিদ্ধ বা হারাম ("Kitab al-Kasb" of al-Shaybani in al-Sarakhsi, *Kitab al Mabsut,* vol. 30, pp. 266-8).

২৪. Ali al-Tantawi and Naji al-Tantawi, *Akbaru 'Umar* (1959), p. 268.

২৫. ইসলামের আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারের বিভিন্ন দিকের উপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-ljtima'iyyah fi al-Islam* (1964)

২৬. দেখুন, M. U. Chapra, *Towards a Just Monetary System* (1985), pp. 27-8.

২৭. দেখুন, Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (1984), p. 10.

২৮. *Sahih al Muslim* (1955), vol. 4. p. 1996:56, Kitab al Birr wa al silah wa al-Adab, Bab Tahrim al Zum, from Jabir ibn 'Abdullah.- রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে 'জুলুমাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'জুলুমাত' হচ্ছে জুলমাত' বা অন্ধকারের বহুবচন। 'জুলমাত' অন্ধকারের বহুস্তরকে বোঝায়, যা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হওয়াকে বোঝায়। আল-কোরআনের ২৪:৪০ আয়াতে এ দিকে দিকনির্দেশ করা হয়েছে।

২৯. Imam Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (1967), p. 94. অনুবাদকৃত অংশের জন্য দেখুন Muhtar Holland, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (1982), p. 95.

৩০. মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি একটি বৃক্ষ রোপন করে অথবা শস্যক্ষেত্র আবাদ করে এবং একটি পাখি, মানুষ বা প্রাণী তা হতে আহার করে, তবে এ কর্ম দানশীল কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে" *Sahih al-Bukhari* Anas Ibn Malik থেকে বর্ণিত, vol. 3, p. 128, *Sahih al-Muslim* (1955), vol. 3, p.1189:12) শুধুমাত্র মানব প্রজাতি নয়, পশু-পাখির প্রয়োজন পূরণের গুরুত্ব এ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

৩১. Al-Bukhari, from Ibn 'Abbas, *al-Adab al-Mufrad* (1379 A.H.), p. 52:112.

৩২. Abdul Hamid Abu Sulayman, "The Theory of the Economics of Islam", in *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam* (American Trust Publications, (1976), p. 20.

৩৩. দেখুন, Pual Streeten, "A Basic Needs Approach to Economic Development", in Kenneth P. Jameson and Charles, K. Wilker (eds.) *Directions in Economic Development* (1973): Paul Streeten, et al, First Things First: Meeting Basic Needs in Developing Countries (1981); and Frances Stewart, *Basic Needs in Developing Countries* (1985).

৩৪. উদাহরণস্বরূপ দেখুন Abu Muhammad Ali ibn Hazm. *Al-Muhalla,* vol. 6. p. 156:725.

৩৫. Abu Ishaq al-Shatibi, *Al- Muwafaqat fi usul al-Shariah,* vol. 2, p. 177.

৩৬. সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও আলোচনার জন্য দেখুন, M. N. Siddiqi, "Guarantee of a Minimum Level of Living in an Islamic State", in M. Iqbal (1988), pp. 251-303; Abd al-Salam al'Abbadi, *Al'Milkiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (1974-1975), vol. 3, pp. 81-95; Ibrahim Ahmad Ibrahim, *Nizam al-Nafaqat fi al Shari'ah al Islamiyyah* (1349 A.H.) and M. Anas Zarqa, "Islamic Distributive Schemes", in M. Iqbal (1988), pp. 163-219. According to Zarabazo, "A basic need approach is the Islamic approach to development", (Jamal al-Din Zarabozo, "The Need for an Islamic Approach to Economic Development". *Al-Ittihad,* October–December 1980, p. 24).

৩৭. নামাজের পর জমিনের উপর ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে আল-কোরআন মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করে (৬:১০)। মহানবী (সা.) বলেন, "বৈধ জীবিকা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।" (Suyuti, *Aal-Jami'al Saghir,* Anas ibn Malik. থেকে p. 54), এবং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে আরো বলেন, "নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা উপার্জিত অর্থ হতে উত্তম আয় আর কিছু হতে পারে না" (*Sunan Ibn Majah* (1952) vol. 2, p. 723:2138) রাসূল পাক (সা) বলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলমান সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও তদবীর হতে বিরত থাকবে। বস্তুত তাকে সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে এবং একই সাথে উত্তম ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। এক ব্যক্তি তার উটকে না বেঁধে ছেড়ে রেখেছিল এ ভ্রান্ত ধারণার উপর যে উটটি পালিয়ে যেতে পারবে না, কেননা আল্লাহ এর উপর খেয়াল রাখবেন। মহানবী (সা) তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, আগে উট বাঁধ এবং তারপর আল্লাহর উপর আস্থা রাখ ("Kitab al-Kasb' of Muhammad ibnalHasan al-Shaybani in al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsut,* vol. 30, p. 249. খলিফা ওমর (রা) নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করার ইসলামী অনুশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, "তোমাদের কারো জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকা উচিত নয় এবং এরূপ বলা সঙ্গত নয় যে, হে আল্লাহ আমাদের

খাদ্য ও পানীয় দাও।" (Tantawi and Tantaw (1959), p. 268)। তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রদত্ত রিজিক চেষ্টার মাধ্যমে তালাশ কর এবং পরনির্ভরশীল হয়ে থেকো না"। (Yusuf ibn'Abd al-Barr al-Qurtubi, *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadluhu,* vol. 2, p. 15).

৩৮. ফিকাহ্‌শাস্ত্র ও সূত্রের সম্পূর্ণ তালিকা বেশ দীর্ঘ। যাইহোক আগ্রহী পাঠকবৃন্দ বর্ণিত পুস্তকাদি দেখতে পারেন। "Kitab al-Kasb" of Hasan al-Shaybani in al-Sarakahsi, *Kitab al-Mabsut,* vol. 30; p. 245, 250 and 256; Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* vol. 2, pp. 60-4, al-Shatibi, *al-Muwafaqat,* vol. 2, pp. 176-7 and al- 'Abadi (1974-75), vol. 2, pp. 22-5.

রাসূলুল্লাহ (সা) ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে বলেছেন, "কারো কাছে কোনো ভিক্ষা চেয়ো না" (Abu Dawud, 1952, vol. 1, p. 382, Awf ibn Malik থেকে) এবং " নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত অনেক উত্তম" (al-Bukhari, vol. 2, p. 133, Abdullah ibn 'Umar and Hakim ibn Hizam) থেকে মহানবী (সা) সবল সুস্থ এবং প্রকৃত অভাবহীন ব্যক্তিকে দান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (Abu Dawud, 1952, vol. 1, p. 379; Nasa'i, 1964, vol. 5, p.74 and Ibn Majah, 1952, vol. 1, p. 589:1839,

মহানবী নিজের জীবিকা নিজ হাতে উপার্জনকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়ে বলেছেন "যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থেকে নিজ পরিবারের জন্য হালাল রুজির তালাশ করবে এবং প্রতিবেশীদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করবে, সে পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল মুখচ্ছবি নিয়ে আল্লাহর দীদার লাভ করবে" (*Mishkat,* 1381, A.H., vol. 2, 658:5207, Abu Hurayrah on the authority of Bayhaqi's Shu'ab al-Iman থেকে)

৩৯. আবু জার এর মতামত সম্পর্কে দেখুন আল কোরআনের ৯ নম্বর সূরার ৩৪ আয়াত, ব্যাখ্যার জন্য Ibn Kathir (*Tafsir al-Qur'an al-'Azim,* vol. 2, p. 352), and al-Jassas (*Ahkam al-Qur'an,* 1347 A.H., vol. 3, p. 130).

৪০. দেখুন Malik bin Nabi, *Al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisad* (1978), pp. 103-8.

৪১. Barrington Moore, Jr., *Reflections on the Causes of Human Misery and Upon Certain Proposals to Eliminate Them* (1972), p. 81.

৪২. J. G. de Beus, *Shall We make the Year 2000?: The Decisive Challenge to Western Civilisation* (1985), p. 71.

৪৩. Will and Ariel Durant, *The Lessons of History* (1968), p. 81.

৪৪. সুশীল ও সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের কেন ঐশী নির্দেশনার প্রয়োজন–এ বিষয়ের জন্য দেখুন Muhammad Baqir al-Sadr, *Al-Insan al-Mu'asir wa al-Mushkilah al-Ijtima'iyyah* (1388 A.H.), pp. 6-30.

৪৫. "Schools Brief", *The Economist,* 13 December 1986, p. 83.

৪৬. Alec Nove, *The Economics of Feasible Socialism* (1983), p. 87.

৪৭. Joseph Schumpeter, quoted by W. Brus, *Journal of Comparative Economics,* vol. 4, 1980, p. 53.

৪৮. দেখুন, Imam Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna'* (1989), p. 262; Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Islam awar Jadid Ma'ashi Nazariyyat* (1959), pp. 161-2, এবং *Khilafat-o-Mulukiyyat* (1966), pp. 15-102; Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (1981), 721-2; Muhammad al-Mubarak, *Nizam al-Islam: al-Iqtisad, Mabadi' wa Quawa'id al-Ammah* (1972), pp. 106-27; Hasan Turabi, "Priciples of Governance, Freedom and Responsibility in Islam", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* 1/1987, pp. 1-11

৪৯. বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ লেখাসমূহ হচ্ছেঃ Al-Juwayni, *Ghiyath a-Umam fi al-Tiyah al-Zulan;* Al-Mawardi, *Al-Ahkam* al-*Sultaniyyah:* Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah;* Ibn Khaldun, *Muqaddimah;* Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Riyyah,* and *Al-Hisbah fi al-Islam*-এসব মতামতের সংক্ষিপ্তসারের জন্য দেখুন, Rafiq al Misri *Usul al-Iqtisad al Islami* (1989), pp. 66-84. আধুনিক সময়ে অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়ে প্রচুর লেখা রয়েছে। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মতামতসমূহের প্রণেতা হচ্ছেন ঃ ইমাম হাসান আল বান্না, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এবং বাকির আল সদর।

৫০. ইসলামী অনুশাসন প্রয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও কর্মকৌশলের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন গ্রন্থকারের *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy* (1979)।

৫১. দেখুন, Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle Eastern Studies,* 2, 1986, p. 135.

৫২. Samuel Brittan, "There Must be a Better Way", *Financial Times,* 20 November 1987, p. 17.

ষষ্ঠ অধ্যায়

অস্থিরতা

যেহেতু এ বিশ্ব ও জাগতিক কাজকর্ম সম্পর্কে ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তাই এ প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক যে, অন্যান্য দেশের মতো মুসলিম দেশগুলোও কেন একই ধরনের অসাম্য ও ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে? কারণ খুবই স্পষ্ট। মুসলিম বিশ্বের কোথাও ইসলামী ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কার্যকর নেই। রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপস্থিতিই বস্তুত সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। মুসলিম দেশগুলোর নিজস্ব আদর্শ হতে বিচ্যুতি ও বর্তমান দুর্ভোগের জন্য যেসব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক কারণ দায়ী, তার সার্বিক বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়।[১] তবে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সাফল্যের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচির ধরন অনুধাবনে সহায়ক হবে।

রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়

গৌরবের শীর্ষে পৌঁছার পর ক্রমান্বয়ে সময়ের বিবর্তনে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ে এবং প্রেরণা ও গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। প্রথমেই যে জিনিসটি পরিত্যক্ত হলো তা হলো ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থা। এ প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি ছিল ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোত্তম রূপ। এর স্থান দখল করে নেয় একনায়কতান্ত্রিক ও বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা, যা শুরা বা ইসলামের গণতান্ত্রিক পরামর্শ ব্যবস্থার ধারাকে পরিত্যাগ করে। ফলে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কুফল ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।[২] ঈমানের প্রতি আবেগানুভূতি বজায় থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষার অনুশীলনে ক্রমাগত শিথিলতা দেখা দিলো। ইসলামী আদর্শ হতে ক্রমশ বিচ্যুত হয়ে মুসলমানরা চরিত্রের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলল। মুসলিম সমাজের তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য তথা চরিত্রের দৃঢ়তা, ভ্রাতৃত্ববোধের সুদৃঢ় বন্ধন এবং দুর্নীতিহীন ন্যায়পরতা ক্রমাগত বিলুপ্ত হয়ে গেলো। ফলে মুসলমানরা আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। তার জীবনী শক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য হ্রাস পেল। সভ্যতার পতন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক টয়েনবীর অনুসরণে বলা যায়, 'মুসলিম সমাজ তার পারিপার্শ্বিকতার উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারাল'।[৩]

পারিপার্শ্বিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে বৈদেশিক আধিপত্যের দুয়ার উন্মোচিত হলো। প্রাণশক্তিকে তা আরো শুষে নিলো। মুসলিম দেশগুলো কার্যকর জাতিসত্তা হতে বঞ্চিত হলো, বঞ্চিত হলো অর্থনীতির সুষম উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম স্বাধীন ও ইসলামী মনোভাবাপন্ন সরকার হতে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে দখলদার মিত্রশক্তি যে বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করেছিল, সেরূপ ব্যবস্থা না নিয়ে মুসলিম দেশসমূহ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সুবিধাভোগী শ্রেণী বিশেষ করে সামন্ত শ্রেণীর সাথে মিত্রতা গড়ে তুলল।[৪] মিরডালের

ভাষায়, 'এসব সামন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিবস্থার অধীনে তারা ছিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী' এবং এ অবস্থা বজায় রাখতে তারা ছিল খুবই আগ্রহী।[৪] ফলে জনগণের উপর জুলুম, শোষণ ও নিপীড়নের শক্তিসমূহ আরো জোরদার হলো। মুসলিম সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয় দ্রুততর হলো। ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের জনমত ও দাবিকে দাবিয়ে রাখা হলো। এ লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন দূরে থাক, রচনারও কোনো সুযোগ প্রদান করা হলো না।

অর্থনৈতিক পতন

সামাজিক সমতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলিম সমাজ অধিকতর বিভক্ত ও পদমর্যাদামুখী হয়ে পড়ল। সত্যিকার মুসলিম সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি হলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সমান সুযোগ লাভের মধ্য দিয়ে উন্নতি লাভের দ্বার হলো প্রবলভাবে সংকুচিত। বিবেকসম্মত কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্তি ও যোগ্যতার স্বীকৃতির সম্ভাবনা হলো তিরোহিত। ফলে যোগ্য ও দক্ষ লোকের সৃজনশীল কঠোর পরিশ্রম করার স্পৃহা হ্রাস পেল। সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বিলাসী জীবন ও নানা ভোগলিপ্সা পূরণ, এমনকি দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের জন্যও মানুষ ঝুঁকে পড়ল দুর্নীতি ও নানা অবৈধ পন্থার দিকে। সমগ্র সমাজ জীবনে দুর্নীতির সয়লাব বয়ে চলল।

ফলে শুধুমাত্র সমাজ জীবনের সংহতি ও নৈতিক বুননই দুর্বল হলো না, ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয় ক্ষমতাও হ্রাস পেল। শোষণের কারণে দরিদ্র শ্রেণী নিম্নতম জীবিকা হতেও বঞ্চিত হলো। পুঁজি গঠনের পরিমাণ দাঁড়ালো খুবই অপর্যাপ্ত। আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির অবক্ষয়ের সাথে সাথে উদ্যোগ, আবিষ্কার ও সৃজনশীলতা বিপুলভাবে ব্যাহত হলো।

অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত কৃষিতে উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনাময় বর্গাচাষী ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী বস্তুত ভূস্বামীদের ক্রীতদাসে পরিণত হলো। এসব সামন্ত অধিপতিগণ কোনো মূল্যের বিনিময়ে নয়; বরং নানা কারসাজি ও ঔপনিবেশিক প্রভুদের আনুগত্যের মাধ্যমে বিশাল ভূমির মালিকানা লাভ করে। এসব অনুপস্থিত ভূমির মালিকরা উৎপাদিত পণ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করত। ফলে কৃষকদের উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে গেল। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি উন্নয়ন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক শ্রেণী কোনো উৎসাহ পেল না। বস্তুত বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণে তাদের সামর্থ্যই ছিল না। অধিকন্তু ভূস্বামী ও মহাজনদের নিকট হতে নেয়া ঋণের ভারে তারা ছিল পর্যুদস্ত। অনুপস্থিত ভূস্বামীরা নিজেরাও কৃষিতে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, প্রশিক্ষণ তথা উন্নত প্রযুক্তিতে কোনো বিনিয়োগ করত না। উপরন্তু তারা বর্গাচাষী ও ভূমিহীন কৃষকদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যে কোনো পদক্ষেপকে বাধাদান করত। ফলে কৃষি খাত ছিল খুবই পশ্চাৎপদ।

ঐতিহাসিকভাবে সকল দেশে কৃষি বিপ্লব শিল্প বিপ্লবের পূর্বে বা একই সাথে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশসমূহে কৃষির দূরবস্থা টেকসই দ্রুত উন্নয়নের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের ভাষ্য, 'বস্তুত যেসব দেশে কৃষি সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সেসব দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সেসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। যদিও শত শত বছর যাবত উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক চলছে, তবু ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপ, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে একটি গতিশীল সমৃদ্ধ কৃষি খাত শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারা সূচনা করেছে অথবা নিদেনপক্ষে এর সহগামী হয়েছে'।[৫]

মুসলমানদের গৌরব যুগে শিল্প কারখানায় কারুশিল্পী ও দক্ষ শ্রমিকবৃন্দ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের মূল ভূখণ্ড হতে উপনিবেশসমূহে রপ্তানি বৃদ্ধির নীতির দ্বারা তারা হতদরিদ্র হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ মিরডালের ভাষায়, 'তাদের শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসেবে উপনিবেশসমূহকে ব্যবহার করে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ করা, জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে'।[৬] হস্তশিল্প এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভূমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কৃষক শ্রেণী কৃষি আয়ের সাথে কুটির শিল্পের আয় হতে বঞ্চিত হওয়ায় দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা স্বজন পরিজন ভিটেমাটি ত্যাগ করে শহরাঞ্চলে পাড়ি জমায়। শহরেও তারা শোষণের শিকার হয় এবং মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে।

মুসলিম দেশের কৃষক, কারুশিল্পী ও শ্রমিকবৃন্দ অন্যান্য দেশের মানুষের মতোই যৌক্তিক আচরণ করে। অর্থনৈতিক প্রণোদনায় সাড়া দেয়। উদ্যম, সৃজনশীলতা, সচেতনতা, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার যে অভাব বর্তমানে তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তা তাদের চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে বিরূপ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। উপরন্তু কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের ব্যর্থতাবোধের তাড়না এগুলোকে আরো ঘনীভূত করেছে। একটি সমাজের মনোবল, উদ্যম ও সৃজনশীলতার উপর দারিদ্র্য ও অবিচারের চেয়ে বড় ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব আর অন্য কোনো কিছুর নেই। তাই কোনোরকম উপদেশ বা ধর্মীয় সান্ত্বনার প্রলেপে কোনো কাজ হবে না। তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হোক, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হোক, তাদের কর্মক্ষমতা শতগুণ বেড়ে যাবে। আর যদি ন্যায়বিচার করা না হয়, তবে তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া আশা করা যায় না।

হারানো সুযোগ

পরাধীনতা থেকে মুক্তি তথা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন মুসলমানদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করেছিল। আশা করা হয়েছিল, জাতীয় সরকার ইসলামী মূল্যবোধ ও উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে। কিন্তু

এ আশা পূরণ হয়নি। স্বাধীনতা লাভ শুধুমাত্র বিদেশী শাসকদেরই অপসারণ করল। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই তাদের স্থান দখল করে নেয় সামরিক স্বৈরাচার ও জনসমর্থনহীন শাসকগোষ্ঠী। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি এদের কোনো সহমর্মিতা ছিল না। এদের কেউ কেউ সমাজতন্ত্র বা জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে সমগ্র অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে আসে। স্বাধীনতা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক অতীতের অপছায়া সেকুলার, প্রতারক ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠল। ভূস্বামী, বৃহৎ শিল্প পরিবার ও সামরিকতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থের সাথে আমলাতন্ত্র গাঁটছড়া বাঁধল।

স্বাধীনতার পর উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের ভার পড়ল আমলাতন্ত্রের উপর। কিন্তু এ দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পন্ন হয়নি। ইসলাম বা এর বৈপ্লবিক আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির কর্মসূচি প্রণয়ন একটি কঠিন কাজ, তার তুলনায় অনেক বেশি সহজ অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করা। উন্নয়ন অর্থনীতি রচিত হয়েছে পাশ্চাত্যের সেকুলারতার মতবাদের আবহে। আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি এর কোনো সুদৃঢ় অঙ্গীকার নেই। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্রকে নৈতিক মানদণ্ডের ছাকনিতে ছেকে সঠিক পন্থা তথা স্থিতি ও সমতার ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ বেছে নেয়ার কোনো কার্যকর প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য অর্থনীতির মধ্যে স্বভাবত বিদ্যমান নেই। তাই অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো সমাজতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতি লিবারেলিজম ও এন্টি-লিবারেলিজমের ঢেউয়ের দোলায় দোলুল্যমান হয়ে রইল মুসলিম দেশসমূহের অনুসৃত নীতি। সৃষ্টি হলো অনিশ্চয়তা ও অসামঞ্জস্যতা। অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো এসব দেশের অর্থনীতির। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য এসব দেশে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হলো। কিন্তু অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে নৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ করা প্রয়োজন ছিল তা অবহেলা করা হলো। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হলো সম্পদ ঘাটতি। এ ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের দ্বারস্থ হওয়াকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করা হলো। যারা এ ধরনের অসমীচীন নীতির বিরোধিতা করল তাদেরকে আধুনিকতার বিরোধী হিসেবে এমনকি মৌলবাদী অভিধায়, অভিহিত করা হলো। ফলেই যদি বৃক্ষের পরিচয় হয়, তবে সেকুলার উন্নয়ন অর্থনীতি যে ফলের জন্ম দিলো, তা ছিল তিক্ত ও ব্যয়বহুল, যা প্রসব করল বিশাল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক লেনদেন অসমতা, বৈদেশিক ঋণের গুরুভার এবং সামাজিক অস্থিরতা।

স্বাধীনতা লগ্নে দিগন্তরেখায় সাধারণ মানুষ সুবহে সাদেকের যে কিরণ রেখা দেখতে পেয়েছিল, তা ভোরের আলোয় প্রস্ফূটিত হয়ে উঠল না। তাদের সমস্যার জগদ্দল পাথর আগের মতোই রয়ে গেল। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনের ঘানি তারা টানতে লাগল। বৈষম্য আরো উর্ধ্বগামী হলো। আর্থ-সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা স্বপ্নই রয়ে

গেল। অতিরিক্ত বাজেটের ঘাটতির রথ টেনে নেয়ার জন্য দেদার টাকা ছাপাতে হলো। মুদ্রাস্ফীতির দানব গ্রাস করে নিল মুসলিম জনপদসমূহকে। বিশাল বৈদেশিক লেনদেন ঘাটতি বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলল। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর যাতাকলের ফাঁদে আটকে পড়ল মুসলিম দেশসমূহ। এসব বিদেশী পুঁজির বেনিয়াদের রয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডি মনোভাব। ইসলামী নীতিমালা ও কর্মসূচি অবলম্বনকে প্রতিহত করার জন্য এমন কোনো চাপ নেই, যা তারা প্রয়োগ করে না। মুসলিম দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি, ন্যায়নীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ইসলামের যে বিপুল সম্ভাবনাময় ভূমিকা রয়েছে তা উপলব্ধি করার শক্তি তাদের ছিল না।

একটি শান্তিবাদী ও সমৃদ্ধশালী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূর্ণ হলো না। এমনকি অধিকাংশ মুসলিম দেশ কোন পথে ধাবিত হচ্ছে, কী তাদের নিয়তি, তাও অনির্ধারিত রয়ে গেল। ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাহীন যে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তাতে গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন নেই। অথচ হতাশ জনগণ সমাজ পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব। সময়ের দাবি ও দেয়ালের লিখন পড়ে নেবার জন্য মুসলিম নেতৃত্বের এটাই উপযুক্ত সময়। নেতৃবৃন্দের এখন প্রয়োজন জুলুম উৎখাতের জন্য ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করা। সময়ের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যারা সাড়া দেবে, তারা জনতার রুদ্ররোষ হতে রক্ষা পাবে। ইতিহাসে নিজেদের জন্য উজ্জ্বল অবয় স্থান অধিকার করে নিতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, যেসব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামের পক্ষে কথা বলেন, তারাও ইসলামী শাস্তি বা ফৌজদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের বাইরে আর কোনো কথা বলেন না। ফলে কঠোর শাস্তি প্রদানের ভয়ঙ্কর রূপের আড়ালে মানবতাবাদী ইসলামের শান্তিময় তরুছায়া হারিয়ে যেয়ে মানুষের মনে প্রবল ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের ধারণা ও প্রয়োজনীয় নীতির প্রতি এতে সামান্যতম সুবিচারও করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য শাসক শ্রেণী উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি। ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, হক, ইনসাফ ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের সুষম কাঠামো প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তার পূর্বেই শাস্তির ব্যবস্থার কথা বলা বা প্রবর্তন করা বস্তুত ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবারই সমতুল্য।

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

রাজনৈতিক বৈধতা

মুসলিম বিশ্বে পরিবর্তন প্রয়োজন। ইসলামের প্রতি মুসলিম জনতার গভীর আবেগানুভূতি ও আকর্ষণকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা। শুধু প্রয়োজন জনগণের হৃদয়ের স্ফূলিঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত করে এ বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পন্থা উদ্ভাবন এবং মুসলিম চরিত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহকে জাগ্রত করা। সরকার এ কাজ কার্যকরভাবে আনজাম দিতে পারে তার নৈতিক নেতৃত্বের (কুদওয়াহ হাসানাহ) ছত্রচ্ছায়া বিস্তার

করে। শিক্ষা ও অন্যান্য বস্তুগত উপকরণ সরকারের হাতে রয়েছে। তা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় সুস্থ সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব। ইমাম হাসানুল বান্না যথার্থই বলেছেন, 'আর্থ-সামাজিক সংস্কারের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সরকার। সরকার যদি সৎ হয় তবে সকল প্রকার সংস্কার সাধনই সম্ভব'।[৭] সরকার যথাযথ ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করে না বা করতে পারে না, যদি না সে সরকার বৈধ হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিহাসের দীর্ঘসময়ব্যাপী মুসলিম জাহানের ক্ষমতাসীন সরকারসমূহের বৈধতা ছিল না। যতদিন পর্যন্ত সরকারসমূহ বৈধতা অর্জন করতে না পারে, ততদিন ইসলামী লক্ষ্য হাসিলের সকল কর্মসূচি মুসলিম দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শুধু সর্বাঙ্গীন আলঙ্কারিক রূপ বর্ধন করবে।

বৈধ মানদণ্ড

বৈধ সরকারের প্রশ্নে ইসলামের নিজস্ব সুদৃঢ় মানদণ্ড রয়েছে। সর্বপ্রধান মানদণ্ড হচ্ছে, সরকারের প্রথম জবাবদিহিতা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে, যিনি সার্বভৌম আইনদাতা এবং শরীয়াহর সীমারেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ। শরীয়াহর বিধান মেনে চলা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক এবং শরীয়াহ বাস্তবায়ন সরকারের কাজ। এ বিষয়ে আল-কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, "তোমার প্রভু যা প্রেরণ করেছেন তা অনুসরণ করো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনোকিছুর কর্তৃত্ব স্বীকার করো না" (৭:৩) এবং "আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা শাসন কার্য পরিচালনা করে না, নিশ্চয় তারা সীমালঙ্ঘনকারী" (৫:৪৫)।

যেহেতু শরীয়াহর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ সাধন করা, বিশেষ কোনো শ্রেণী বা পরিবারের নয়, তাই সরকারের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব হচ্ছে, সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবহারসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা। মহানবী (স) বলেছেন,

> "তোমাদের প্রত্যেকে একজন রাখাল এবং তোমাদের অধীনস্তদের জন্য তোমাদের দায়ী থাকতে হবে"।[৮]
>
> "জনগণের দায়িত্ব যাকে অর্পণ করা হয়েছে এবং সে যদি আন্তরিকতার সথে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না করে, তবে জান্নাতের সুবাসও তার কাছে পৌঁছাবে না"।[৯]
>
> "শেষ বিচারের দিন সমস্ত মানব সমাজের মাঝে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় এবং মর্যাদায় সবচেয়ে নিকটতম হবে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সবচেয়ে ঘৃণিত ও আল্লাহ হতে দূরবর্তী হবে জালিম শাসক।"[১০]

বৈধতার দ্বিতীয় মানদণ্ড হচ্ছে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহিতা। কেননা সরকার হচ্ছে আমানত। সরকার পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন যুগপৎ আল্লাহ ও জনগণের পক্ষ হতে আমানত। রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে একবার সাহাবা আবু জার

(রা) সরকারের উচ্চপদ আকাঙ্ক্ষা করলে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "হে আবু জার! তুমি দুর্বল, আর এ পদ হচ্ছে একটি আমানত। হাশরের দিন এ পদ ও মর্যাদা দুঃখ ও অপমানের কারণ হবে তাদের জন্য, যারা উপযুক্ততার ভিত্তিতে এ পদ অর্জন করেনি এবং এর দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি"।[১১] তাই এ আমানতের সাথে সংগতি রেখে সরকার যেমন সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী, তেমনি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিষয়েও সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

সরকার জনগণের পরামর্শ ও সমালোচনার প্রতি যদি মুক্তমন না হয়, তবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কার্যকরভাবে পূরণে সরকার সফল হতে পারে না। রাসূলে করীম (স) তাই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'মুসলমানের ঈমানের অন্যতম দাবি হচ্ছে, শাসক শ্রেণীকে আন্তরিক সৎ উপদেশ দেয়া, যে উপদেশ শাসকদের তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সহায়তা করবে'।[১২] কিন্তু জনগণ কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করবে, যদি তাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে; যদি তাদের সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়? যদি শাসকের জনগণের কাছে জবাবদিহিতা না থাকে, যদি তা জনগণের পরামর্শ গ্রহণে উন্মুখ না হয়, তবে কোনো প্রকার সংস্কার সাধিত হতে পারে না। তাই হযরত আবুবকর (রা) যখন প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন, তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ইসলামের এ অপরিহার্য অনুষঙ্গের বিষয়ে বলেছেন, "যদি আমি সঠিক পথে চলি, তবে আমাকে সাহায্য করুন"।[১৩] অধিকার ও দায়িত্বের দ্বিমুখী ধারা এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনকার্য পরিচালনার নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ জনগণের অধিকার এবং জনগণকে সে অধিকার দেয়া শাসকের দায়িত্ব। একইভাবে সঠিক নীতি অনুসরণ ও কাজের ক্ষেত্রে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ শাসকের দায়িত্ব। একইভাবে সঠিক নীতি ও কাজের ক্ষেত্রে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া সরকারের অধিকার। আর ভুল নীতি ও কার্যের ক্ষেত্রে সরকারকে সতর্ক করে দেয়া জনগণের দায়িত্ব।

হযরত আবুবকরের উর্পযুক্ত ঘোষণা কোনো বিরল ঘটনা নয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)ও একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। যখন খলিফাকে কোনো এক ব্যক্তির সমালোচনায় অন্য এক ব্যক্তি বাধা প্রদান করে, তখন হযরত ওমর দৃঢ়তার সাথে ঐ ব্যক্তিকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে বলেন, 'যদি তারা তাদের মনের কথা ব্যক্ত না করে, তবে তারা ভালো লোক নয়; আর আমরা যদি তাদের কথা না শুনি, তবে আমরা ভালো লোক নই'।[৪] সাধারণ মানুষের খলিফাদের সমালোচনা করার এবং খলিফাদের তা হাসিমুখে বরণ করে নেয়ার অসংখ্য উদাহরণ আছে, যা থেকে দ্বিধাহীনভাবে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নেতৃত্বের সমালোচনা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেয়ার মনোভাব ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের

অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি খিলাফতের অবসানের পর যখন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালু হলো, তখনও কিছুকাল যাবত এ ঐতিহ্য বজায় ছিল।

বৈধতার তৃতীয় মানদণ্ড হচ্ছে, আল-কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক পারস্পরিক পরামর্শ বা ইসলামী পরিভাষায় 'শুরা' ব্যবস্থার সাধারণ পরিবেশ বিরাজ করা (৪২:৩৮)। এটা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং বাধ্যতামূলক। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও শেখ মোহাম্মদ আবদুহু সুস্পষ্টভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫] এর অনিবার্য তাৎপর্য হচ্ছে, শরীয়াহর কাঠামোর মধ্যে স্বেচ্ছাচার, সামরিক স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের কোনো অবকাশ নেই। শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে শেখ রশিদ রিদা এর কারণ হিসেবে বলেন, "একজন ব্যক্তির চেয়ে একটি দলের ভুল করার সম্ভাবনা অনেক কম। উম্মতের সকল শাসনভার তাই এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অনেক বেশি বিপদজনক।[১৬] যে পরামর্শ পর্ষদ বা শুরার কথা বলা হয়েছে তা নিছক অলঙ্কারিক নয়। শাসকের স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুমোদনের রাবার স্ট্যাম্পের ভূমিকা পালন করা এর কাজ নয়। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, শরীয়াহর কাঠামোর মধ্যে জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের উপর ভয়, বাধাহীন মুক্ত আলোচনার জন্য সার্বভৌম এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত সকল কর্মসূচির শাসন বিভাগ কর্তৃক আন্তরিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন। শুরা ব্যবস্থা দাবি করে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা নির্ধারিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সর্বাধিক জনগণের অংশগ্রহণ।[১৭] শুরা ব্যবস্থার কাঠামো কী হবে নিজস্ব পরিস্থিতির ভিত্তিতে উম্মাহ্ তা নির্ধারণ করবে।

বৈধতার চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, আইনের চোখে সকল মানুষের সমতার নীতি এবং সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়বিচার। আল-কোরআনের ভাষায়, "এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো, তখন তা ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পাদন কর" (৪:৫৮)। শরীয়াহর বিধান সমাজ বা সরকারের ব্যক্তি বিশেষের পদমর্যাদা, সম্পদ বা অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।[১৮] এর ব্যত্যয় ঘটানোর নাম জুলুম। শেখ মোহাম্মদ আবদুহু যথার্থই বলেছেন, 'জুলুম হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ' (একবাহ্ আল মুনকার)।[১৯] খলিফা আবুবকর (রা) তাঁর প্রথম ভাষণে যা বলেছিলেন তা এখানে স্মরণযোগ্য, "তোমাদের মাঝে দুর্বলতম ব্যক্তি হচ্ছে আমার সামনে সবচেয়ে সবল, যতক্ষণ না তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মাঝে শক্তিশালী ব্যক্তি হচ্ছে আমার সামনে সবচেয়ে দুর্বল, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে আমি অধিকার আদায় করে নিতে পারি"।[২০] এর অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায়, সরকারের দমনমূলক শক্তি থাকা প্রয়োজন শুধুমাত্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং দুর্বল ও দরিদ্রকে তাদের অধিকার আদায়ের সাহায্য করার স্বার্থে।

শর্তসমূহ কখন পূরণ হয়

বৈধতার এ চারটি শর্ত পূরণ হবে না যতক্ষণ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালীরা তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা জনগণের নিকট হতে প্রাপ্ত না হয় এবং তাদের

কার্যকলাপের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট দায়ী না থাকে। একমাত্র মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দ্বারা এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। এরূপ নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে জনগণ আল-কোরআনের ঐ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে: "তাদেরকেই অভিভাবকত্ব দাও যারা যোগ্য" (৪:৫৮)। জনগণের স্বাধীনভাবে তাদের মন মতো যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও ক্ষমতা থাকতে হবে। বলপূর্বক বা বংশানুক্রমিকভাবে শাসন ক্ষমতা দখল বৈধ হতে পারে না।

তাই সমকালীন প্রখ্যাত দু'টি ইসলামী অন্দোলনের নেতা ইমাম হাসান আল-বান্না এবং সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গণতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। হাসান আল-বান্নার মতে, জনগণের নির্বাচিত সরকার ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের স্পিরিটের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপূর্ণ।[২১] অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে মাওলানা মওদূদী বলেছেন, 'জনগণের সাথে গভীর সম্পৃক্তির মাধ্যমে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত। সরকারের গঠন এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে জনগণ খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। একমাত্র জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পাবে। এটা হতে পারে শুধমাত্র এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা গঠন ও কার্যপ্রণালীতে গণতান্ত্রিক'।[২২] তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলন' হিযব আল-ইসতিকলাল' এর সভাপতি শেখ আল্লাল আল ফাসি একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৩] সবার কল্যাণ সাধন এবং দুর্নীতিমুক্ত ইনসাফ কায়েমের জন্য শাসক শ্রেণী শরীয়াহর বিধান মেনে চলবে। এটা শুধুমাত্র জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমান প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি নেই। এতে এসব ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে সামরিক একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করা যায় না। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুসলমানরা ইতিবাচকভাবে যতদূর সংস্কার করতে পারবে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনে অপকৌশল, অর্থ ও পেশীশক্তির প্রভাব যতদূর হ্রাস বা অপসারণ করতে পারবে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইসলামের আদর্শ শুরা ব্যবস্থার তত কাছাকাছি চলে আসবে। সার্বিকভাবে এটি হবে একটি পদক্ষেপ ও অগ্রাযাত্রা। তবে একবারেই এর সংস্কার সাধন সম্ভব হবে এরূপ প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন সময়ে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

উলামাদের ভূমিকা

একদিকে যেমন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রত্যাশিত নৈতিক উচ্চমানের নেতৃত্ব (কুদওয়াহ হাসানাহ) প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, অপরদিকে রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রভূত প্রভাবশালী ধর্মবেত্তা উলামাবৃন্দ ও পেশাজীবী শ্রেণী ঐ কাঙ্ক্ষিত নৈতিক নেতৃত্বের পতাকা বহনে ব্যর্থ হয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ঝাণ্ডা উত্তোলন এবং জনগণের বস্তুগত ও নৈতিক উন্নয়নে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে

তাদের অধিকাংশই চাটুকারিতার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে লিপ্ত রয়েছে। তারা একথা ভুলে গেছে যে, সমাজের ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালীদের উপর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য ইসলাম এক দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ করেছে।[২৪] দুর্নীতি ও বেইনসাফির যে প্রচলিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য এ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের তা সমর্থন করে যাওয়া বা সে ব্যবস্থার অংশে পরিচালিত হওয়াকে শরীয়াহ সামান্যতম অনুমোদন করে না। মহানবী (স) এ ধরনের অবাধ আচরণকে কুফরীর সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন।[২৫] বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে নিঃস্বার্থ ও বিবেকমানদের জন্যও উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখার সুযোগ নেই, বিশেষত যখন নিপীড়নমূলক সরকারসমূহ সংস্কারের ভয়ে শঙ্কিত এবং সংস্কারবাদীদের নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে যৎপরোনাস্তি বদ্ধপরিকর। রাসূল পাক (স) তাই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন,

> "আমার উম্মত সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয়ে শঙ্কিত– উলামাদের বিচ্যুতি ও অমনোযোগিতা, স্বেচ্ছাচারী শাসন এবং জাগতিক ভোগলিপ্সা"।[২৬]

অবশ্য এ অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। গণবিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছে এবং মানুষ পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ। মুসলিম বিশ্বের চলমান গণজাগরণ জনসাধারণের মধ্যে এ উপলব্ধি ও বিশ্বাসকে ক্রমাগত দৃঢ়তর করেছে যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত। ফলে শাসক শ্রেণী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

নীতিমালার পুনর্গঠন

ইসলামের বিশ্ববীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নীতি কতগুলো সুসংবদ্ধ ও সুসমন্বিত নীতিমালার রূপান্তর মাত্র। তাই এখন সময়ের দাবি যাতে ইসলামী আদর্শ কায়েমে আগ্রহী যে কোনো সরকার সে দেশের নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নীতিমালাসমূহ প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম দেশসমূহ শূন্য থেকে শুরু করছে না। তাই তাকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানো তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্র অবশ্যই তীব্র বৈষম্য ও অসমতা দোষে দুষ্ট। ফলে ইসলামী কাঠামোয় এদের রূপান্তর প্রক্রিয়া হয়ত কঠিন ও জটিল হতে পারে। এতদসত্ত্বেও পূর্ববর্তী আলোচনা হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম হতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। সমাজ বাস্তবতা তথা সীমিত সম্পদের মোকাবিলায় বিশেষ শ্রেণীর বল্গাহীন ভোগ ইচ্ছা এটাই দাবি করে যে, শরীয়াহ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে। 'প্যারেটো অপটিমালিটি'র নৈতিক বিবেচনাহীন ধারনাকে পরিহার করতে হবে, যাতে ধনিক ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিলাসী চাহিদায় সম্পদের অপচয়ের পরিবর্তে সীমিত সম্পদকে সকল শ্রেণীর মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করা যায়। যে কর্মসূচি আর্থ-সামাজিক মৌলিক লক্ষ্য পূরণে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধির কথা বলে, অথচ

কোন গৌণ খাতকে কাটছাট করে সম্পদের যোগান দেয়া হবে তা বলে দেয় না, এমন কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

যদি সম্পদ সীমিত না হতো, তবে কোনোরূপ সমস্যা ছাড়াই মানুষের সকল চাহিদা পূরণ করা যেত। এমন ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ভোগের স্বাধীনতাও অন্য কারো কোনো ক্ষতি করত না। কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতো। কিন্তু যেহেতু সম্পদ সীমিত, তাই বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের সুষম ও দক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন। মানুষের প্রবৃত্তির অভিরুচি অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দানের মাধ্যমে সমাজে অসাম্য ও অসমতাকে স্থায়ীত্ব দেয়ার নামান্তর মাত্র। তাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও মানুষের মাঝে সমতা আনয়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার পদ্ধতির উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো অর্থনীতিই চালিত হতে পারে না। ঐশী বিধিবিধানের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। এতদসত্ত্বেও পূর্ববর্তী অধ্যায় হতে সুস্পষ্ট যে, উভয় ব্যবস্থাই ভারসাম্যহীনতা পরিহার করে একই সাথে দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

মুসলিম দেশসমূহের জন্য শরীয়াহর কাঠামোগত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে ইসলামের প্রথম যুগের উদাহরণ হতে পূর্বনজির খুঁজে পেতে হবে এমন কোনো আবশ্যিক শর্ত নেই। এটা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। অবশ্য শরীয়াহর মূলনীতির মাঝে যে কোনো কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক উপাদান ও অনুষঙ্গ মজুদ আছে। তবু প্রায়োগিক কর্মসূচি রচনার জন্য শরীয়াহর মাঝে পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল বিষয়ে বর্ণিত হয়নি। কারণ হচ্ছে, স্থান কালের পরিসরে কঠোর অনমনীয়তা যেন কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর কাঠামো এখানে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হতে সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত লক্ষ্য রাখতে হবে– অন্যদেশ থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়টি শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে 'মাকাসিদ' অর্জনে যেন ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং সম্পদের উপর অতিরিক্ত কোনো চাপ সৃষ্টি না করে। গৃহীত কর্মসূচি, বিশেষত সেসব কর্মসূচি যা পাশ্চাত্যের 'প্যারেটো অপটিমালিটি'র মানদণ্ড সম্মত নয়, তা যদি এ শর্তের নিক্তিতে উতরে যায়, তবে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবে।

কেবলমাত্র একটি সূচারুরূপে বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক সমন্বয় কর্মসূচি মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি আনতে পারে। এরূপ সমন্বয় কর্মসূচি মনে হতে পারে কঠোর ও তিক্ত। কিন্তু এই তিক্ততাকে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে এক করে দেখা সঠিক হবে না। কেননা ইসলাম বৈরাগ্যধর্মী কোনো জীবন ব্যবস্থা নয়। যে ধরনের কৃচ্ছ্রতা বর্তমান বিরূপ পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজন, স্বাভাবিক ও

অনুকূল পরিবেশে ইসলাম তা দাবি করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় কৃচ্ছতার পথ অবলম্বন ছাড়াই ইসলামী অনুশাসনের অনুসরণে দক্ষতা ও ইনসাফ উভয়ই অর্জন সম্ভব। ইসলামের চারিত্রিক পরিশুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা এবং অনুপ্রেরণা এমনই উজ্জীবনকারী যে, অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধনের ফলে যে দায়ভার সৃষ্টি হবে, তার বোঝা গরীবের পরিবর্তে ধনীরাই বহনে সম্মত হবে। মানুষের মানবিক চেতনার স্ফূরণে এটা ইসলামের এক বিশাল অবদান। নিওক্লাসিক্যাল বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেকুলার পরিবেশে নৈতিক চেতনার অভাবে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট আর্থিক গুরুভার গরীবের উপর হতে স্থানান্তর সম্ভব নয়।

পঞ্চনীতিমালা

মুসলিম দেশের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত নীতিনির্ধারক কর্মসূচিগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম কর্মসূচিতে (অধ্যায় ৭) আলোচিত হয়েছে ব্যক্তির স্বীয় ও সমাজের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা ও উজ্জীবিত করার পথ ও পন্থা নিয়ে। দ্বিতীয় কর্মসূচি (অধ্যায় ৮) মুসলিম দেশসমূহের সম্পদের বর্তমান কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাসের প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ কর্মসূচি (অধ্যায় ৯ এবং ১০) ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে মুসলিম দেশসমূহে জনগণের জীবনযাত্রার ধরন, সরকারি আয়ব্যয়, আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন তার বিবরণের সাথে সম্পৃক্ত। উপযুক্ত পরিকল্পনা ব্যতীত এই সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অসম্ভব। তাই পঞ্চম কর্মসূচি (অধ্যায় ১১) যে কৌশলগত পরিকল্পনা এই লক্ষ্য অর্জনে অপরিহার্য সেই প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত।

উল্লিখিত অধ্যায়সমূহে বর্ণিত অনেকগুলো নীতিনির্ধারক কর্মসূচির সাথে উন্নয়ন অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিচিত থাকতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্যান্য সব কিছুর সাথে এখানে সংযোজিত হয়েছে ইসলামের বিশ্ববীক্ষণ ও জীবনবিধানের আলোকে জীবনের বৈষয়িক দিকের সাথে আধ্যাত্মিক দিকের সুন্দর ও সুষম সমন্বয়। এরূপ সমন্বয়ের অভাবে সীমিত সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি ব্যতিরেকে সামাজিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (ষষ্ঠ অধ্যায়)

১. প্রাপ্ত গবেষণা সাহিত্যে মুসলমানদের পতন ও অবক্ষয়ের কারণসমূহের আলোচনা ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। যাই হোক, পাঠকবৃন্দ নিম্নবর্ণিত পুস্তকাবলী হতে উপকৃত হতে পারেন; Abul-Hasan Ali al-Nadwi, *Ma dha Khasira al-'Alam bi Inhitat al Muslimin* (1974); Zakariyya Bashir Imam, *Tariq al-Tatawwur al-Ijtima al-Islami* (1397 A.H.), pp, 47-83; Zaghlul Raghib al-Najjar, *Qdiyyah al-Takhalluf al-I'lmi wa al-Taqni fi al-'Alam-al-*

Islami (1409 A.H.); Amir Shakib Arsalan, *Our Decline and its Causes,* tr., M. A. Shakoor (1962); John J. Saunders, (ed.), *The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion* (1966); Halil Inalcik, "The Heyday and Decline of the Ottoman Empire", এবং Ann Lambton, "Persia: The Breakdown of Society", in P. M. Holt, et al. (eds.), *The Cambridge History of Islam* (1970), pp. 324-31 এবং 430-67: Philip Hitti, *History of the Arabs* (1958), বিশেষ করে দেখনু অধ্যায় ৩৩, ৩৯ ও ৪০।

২. শু'রা পদ্ধতি হতে বংশানুক্রমিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণসমূহের অন্যতম সুনিপুণ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Syyid Abul A'la Mawdudi, Khilafat-O-Mulukiyat (1977), pp. 103-53. আরো দেখুন, Syyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar* (1954), vol. 4, p. 204, and vol. 5. p. 198.

৩. Arnold J. Toynbee, *A Study of History,* (সংক্ষেপিতকরণ করেছেন D. C. Somervell (1946).

৪. Gunnar Myrdal, *Rich Lands and Poor* (1957), p. 59.

৫. IBRD, *World Development Report,* 1982, pp. iii and 39.

৬. Myrdal (1957), p. 57.

৭. Imam Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al*-Banna' (1989), p. 255.

৮. Ibn 'Umar, in al-Mundhiri, *Al-Targhib wa al-Tarhid* (1986), vol. 3, p. 155:1, on the authority of al-Bukhari and Muslim.

৯. Al-Bukhari, from Ma'qil ibn Yasar, vol. 9, p. 80, Kitab al-Ahkam.

১০. Abu Sa'id al-Khudri, in al-Mundhiri (1986), vol. 3. p. 167: 7, on the authority of al-Tirmidhi and al-Tabarani.

১১. Muslim (1955), from Abu Dharr, vol. 3, p. 1457:1825, Kitab al-Amarah.

১২. মহানবী (সা) বলেছেন, "ঈমান বা বিশ্বাস (আল-দ্বীন) হচ্ছে আন্তরিক উপদেশ। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, "কাদের জন্য? হে আল্লাহর রাসূল"। মহানবী উত্তর দিলেন, "আল্লাহপাক, তার কিতাব, শাসকশ্রেণী এবং সাধারণ জনগণের জন্য" Muslim, 1955, from Tamim al-Dari, vol. 1, p. 74:95, Kitab al-Imam).

১৩. Ibn Hisham, *Sirat al Nabawiyyah* (1955), vol. 2, p. 661.

১৪. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (1952), p. 12.

১৫. Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islah al-R'i wa al-*Ra'iyyah (1966), p. 135; and *Tafsir al*-Manar (1954), vol. 4, p. 45. আরো দেখুন Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi al-Nizam al-Siyasi li al-Dawlah al-Islamiyyah,* (1975), pp. 105-17.

১৬. *Tafsir al-Manar* (1954), vol, 4, pp. 199-200.

১৭. দেখুন Abu A'la Mawdudi, *Human Rights in Islam* (1976), p. 37.

১৮. এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা একবার চুরি করেছে এরূপ একজন মাখজুমী মহিলার সমস্যার সম্মুখীন হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উক্ত মহিলার পক্ষে সুপারিশ করতে পারে তারা এমন একজনের খোঁজ করলেন। তারা জানালেন যে, উসামাহ ইবনে জায়েদকে রাসূলুল্লাহ (সা) খুব ভালবাসেন এবং তিনি সুপারিশ করতে সাহস করতে পারেন। উসামাহ রাসূলপাক (সা) এর সাথে কথা বললেন। মহানবী (সা) বললেন, "তুমি কি ঐশী বিধান বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে চাও?" অতঃপর মহানবী উঠে দাঁড়ালেন এবং জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের পূর্বের জনগণ আল্লাহ কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, কারণ যদি কোনো উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি চুরি করত তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো; কিন্তু যদি নিম্নশ্রেণীর কেউ চুরি করত তবে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হত। আল্লাহপাকের কসম! এমন কী মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলব।" ('A'ishanh by al-Bukhari and Muslim-*Mishkat,* 1381 A.H., vol. 2, p. 302:3610).

১৯. *Tafsir al-Manar* (1954), vol. 4 p. 45.

২০. Ibn Hisham (1955), vol, 2, p. 661.

২১. "দেখুন Imam Hasan al-Banna, *Majmu 'ah Rasa'il* (1989), pp. 192-3 and 239-41.

২২. Sayyid Abul A'la Mawdudi, *The Islamic Law and Consititution* (1967), p. 197.

২৩. 'Allal al-Fa'si কর্তৃক ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে Wahran এ অনুষ্ঠিত "Multaqa al-Fikr al-Islami" সম্মেলনে পঠিত Al-Islam wa Mutatallibat al-Tanmiyyah fi al-Mujtama' al-Yawm" শীর্ষক প্রবন্ধ। এতে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনগণ কিভাবে শাসিত হতে চান তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে। এটা তখনই সম্ভব বলে তিনি মনে করেন কেবলমাত্র যখন মুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠিত হয় এবং যে নির্বাচনে ক্ষমতা ও ধনশালী ব্যক্তিরা কোনোরূপ প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় (পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

২৪. মহানবী (সা) এরশাদ করেছেন, "কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কোনো পাপাচার পরিলক্ষিত হয়, তবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দেয়া তার কর্তব্য। যদি তাতে সে সমর্থ না হয়, তবে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করা উচিত। যদি তাও সে না পারে, তবে অন্তত অন্তরে তার একে ঘৃণা করা উচিত এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমান (Muslim, Abu Sa'id al-Khudri থেকে, vol. 1, p. 69:78, *Kitab al-Iman)*। যদি এ ধরনের প্রতিরোধ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হয়, ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি তা বলাই বাহুল্য।

২৫. "সজ্ঞানে ও জ্ঞাতসারে যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর দলে যোগ দেয় এবং তার হাতকে শক্তিশালী করে, সে নিজেকে ইসলামের গণ্ডি হতে বের করে দিল।" (Aws ibn Sharahbil, by al-Bayhaqi in his *Shu'ab al-Iman;*cited by *Mishkat* (1381 A.H.), vol. 2, p. 641:5136)

২৬. 'Awf ibn Malik, in al-Mundhiri (1986), vol. 3. p. 175:33, on the authority of al-Bazzar and al-Tabarani.

মানবসম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন

অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশের লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আর তা হচ্ছে, সম্পদের দক্ষ ও সুষম বন্টনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সে লক্ষ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করা। ব্যক্তি মানুষকে শৃঙ্খলা, সচেতনতা ও সংহতির সাথে দক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। সব কিছু করার জন্য ইচ্ছুক ও আগ্রহী হতে হবে। উন্নয়নের পথে সকল বাঁধা অতিক্রমের জন্য ত্যাগ স্বীকারে ব্রত হতে হবে। কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাস এবং সার্বিক মাকাসিদ অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে মানুষকে তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতা পরিবর্তনে স্বপ্রণোদিতভাবে ইচ্ছুক হতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক কিছু আশা করা যায় না। তাদের যথাযথ যোগ্যতা এবং সক্ষমতা থাকতে হবে, যা আসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান হতে। যদি উভয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা যায়, তবে শুধুমাত্র উপদেশ বা অনুপ্রেরণা দ্বারা মানুষের কর্মক্ষমতার বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগান যাবে না, তথা অর্থনীতিকে বেশি দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না।

প্রেষণা

যদি মানুষকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা না যায় তবে কোনো ব্যবস্থাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অথবা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিতরণে সমতা আনতে পারে না। ব্যক্তি মানুষকে তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক দক্ষতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের আবশ্যিক শর্ত রয়েছে। সে শর্ত হচ্ছে, ব্যক্তি মানুষটির নিজস্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা যেন যথাযথভাবে চরিতার্থ ও সংরক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্র ছিল অবাস্তব ও অতি সরলীকরণ, কেননা এটি আশা করেছিল, মানুষ নিজের স্বার্থ হতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে কাজ করবে। ফলে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদ অবাস্তব, কেননা এটা ধরে নিয়েছে যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থ সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পুঁজিবাদের সেকুলার ও ইহজাগতিক পরিপ্রেক্ষিত এমন কোনো উজ্জীবনী প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটাতে পারেনি, যা মানুষকে সামাজিক স্বার্থে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, বিশেষত যখন ঐ সামাজিক স্বার্থ সরাসরি ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থি হয়।

মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের মাঝে একটি নৈতিকতার অনুভূতি সৃষ্টি করা না গেলে মানুষকে একই সাথে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। মানুষকে নৈতিকতার অনুভূতি দ্বারা উজ্জীবিত করা গেলে তা ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও সমাজস্বার্থকে সে বিঘ্নিত করবে না। কিন্তু মানুষকে নৈতিকতা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে শুধুমাত্র ওয়াজ নসিহতের উপর নির্ভরশীলতা বাস্তবসম্মত নয়। নৈতিক মূল্যবোধের স্ফূরণ ও উজ্জীবন ঘটাবার জন্য প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক অবস্থার এমন পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস, যাতে আর্থ-সামাজিক সুবিচারকে বিঘ্নিত না করেই কেবলমাত্র মানুষ তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে।

আর্থ-সামাজিক সুবিচার

অধিকাংশ মুসলিম দেশে বস্তুগত পারিতোষিকের বণ্টন প্রণালী প্রবলভাবে বৈষম্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ মানুষ তাদের শ্রম, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত। স্বাভাবিকভাবে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। তাদের উদ্যম, উৎসাহ ও দক্ষতা দারুণভাবে ভাটা পড়েছে। দুটি প্রধান কারণ এর জন্য দায়ী। প্রথমত, বাস্তবতাবর্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট সরকারি নীতিমালা; এবং দ্বিতীয়ত, গ্রাম ও নগর উভয় অঞ্চলে মুষ্টিমেয় হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ।

বাস্তবতাবর্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট সরকারি নীতির পৃষ্ঠপোষতায় উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যথার্থ না রেখে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে বিকৃত করা হয়েছে। বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজীবী এবং শ্রমিক শ্রেণীর আয় তাতে ভীষণভাবে কমে গেছে। ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তাদের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের চাহিদা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন উপকরণ তাই স্বল্প আয়ের মানুষের মৌলিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে না। বিত্তশালীদের বিলাসী চাহিদার খাতে তা প্রবাহিত হয়েছে। অংশত সরকারি নীতি, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে গুটিকয়েক হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল চলে আসছে। অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শোষক শক্তিও দূরভিসন্ধিমূলক পারস্পরিক গাঁটছড়া বাধায় অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। জনসাধারণের দুর্দশা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন

কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের (SME) প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ এলাকায় ভৌত ও আর্থিক অবকাঠামো উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। গ্রামীণ এলাকার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর আয় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। উন্নত বীজ, সার ও নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার সামর্থ্য কৃষকের নেই। গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের অভিবাসন বেড়েছে। নগরে মজুরির হার আরো হ্রাস পেয়েছে। জীবনযাত্রা দুরূহ হয়ে উঠেছে।

নগর উন্নয়ন এবং বৃহৎ কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব সুবিদিত। উচ্চ ট্যারিফ হার, কম সুদে বিশাল অংকের ঋণ সরবরাহ ও ভর্তুকির মাধ্যমে প্রাপ্ত তুলনামূলক সুবিধা এদের মুনাফার পাহাড় ফাঁপিয়ে তুলছে। গ্রাম ও শহরে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের প্রতিযোগিতার শক্তি খর্ব হয়েছে। কতিপয় হাতে ক্ষমতা ও সম্পদের কুক্ষিগতকরণ তীব্রতর হয়েছে। এ নগরমুখী শিল্পায়ন হতে সরকারের কর রাজস্ব বাড়তে পারত। কিন্তু শিল্প ও বণিকদের সর্বতোভাবে কর ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টা সরকারকে সে রাজস্ব আয় থেকেও বঞ্চিত করেছে। অপরদিকে শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য মজুরির উপর নিম্নচাপ সৃষ্টি করেছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নে শ্রমিকের বিপুল অবদানের পুরস্কার হতে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট নয় যে, কৃষি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র এবং ব্যষ্টিক শিল্পের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ পরিহার করা প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন আশু প্রয়োজন, যাতে শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারী, রপ্তানিকারক বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়।

ভ্রান্তনীতি সংস্কার

ইসলামী অনুশাসন দাবি করে যে, মালিকপক্ষ শ্রমিক কর্মচারিকে নিজ পরিবারের সদস্যের মতো মনে করবে। শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে আচরণ করবে। তাদের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে। প্রকৃত মজুরি এমন হবে, যাতে শ্রমিক তার পরিবারবর্গ নিয়ে মানবোচিত জীবনযাপন করতে পারে।[১] শ্রমিক মালিকের মাঝে থাকবে দীর্ঘকালীন সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন। শ্রমিকদের প্রদান করা হবে যথাযথ প্রশিক্ষণ, কাজের নিরাপত্তা এবং মুনাফার ন্যায্য হিস্যা।

অথচ বিপরীত চিত্রটাই লক্ষণীয়। প্রত্যহ ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও পারিশ্রমিক এতই সামান্য যে, পরিবার পরিজন নিয়ে সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাতেই শ্রমিককে হিমশিম খেতে হয়। উপরন্তু কর্মেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কর্ম উৎপাদনশীলতা, শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি মজুরির নিম্নহার ও কর্মের নিরাপত্তাহীনতার জন্য দায়ী মর্মে নিওক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ ধারণা দিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। শোষণমূলক ব্যবস্থাই বস্তুত এ দুর্দশার জন্য দায়ী। নৈতিকতা বিবর্জিত শোষক শক্তিসমূহের যোগসাজশ, ইনসাফহীন সরকারি নীতি, সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগের অভাব প্রভৃতি কার্যকারণ এ পরিণতির জন্য দায়ী। শোষক গোষ্ঠীসমূহের শক্তি যদি খর্ব করা না যায়, তবে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ইনসাফ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিকট হতে উদ্দীপনাময় ও দক্ষ কাজও আশা করা যায় না।

শুধুমাত্র ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণয়ন দ্বারা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কেননা প্রথমত এটা কার্যকর করা কঠিন। আর যদি প্রয়োজনে করাও হয়, তাহলে এর দুটি

বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। প্রথমত, মালিকপক্ষ প্রকৃত যে মজুরি দেবে এবং কাগজে কলমে যা দেখাবে তার মাঝে শুভংকরের ফাঁক থেকে যেতে পারে। ফলে একদিকে শ্রমিক তার প্রকৃত আইনানুগ মজুরি পেল না, অন্যদিকে মালিকপক্ষ খাতাপত্রে হিসেবে দেখিয়ে সরকার হতে কর রেয়াত পাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, ন্যূনতম মজুরি ও বেকার সমস্যার আরো অবনতি ঘটতে পারে।

তাই প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের এক নীতিমালা অনুসরণ, যা বর্তমান শোষণযন্ত্রের ধার ভোঁতা করে দেবে। সে পন্থা হবে, প্রথমত শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ; দ্বিতীয়ত, গ্রাম ও শহরে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ। এ ধরনের সৃজনশীল কর্মসূচির মৌলিক উপাদানসমূহ হবে: (ক) উন্নততর বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; (খ) ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পখাতে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ; (গ) সাধারণ মানুষের নৈমিত্তিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এবং আয় ও সম্পদের তীব্র বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে অর্থনীতির সার্বিক পুনর্গঠন। মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারীত্ব ও শিল্প কারখানায় শেয়ার-স্টকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব শ্রমিকের মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী করা যায়।

প্রত্যেক শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের মুনাফার অংশীদারীত্ব প্রদানের জন্য স্কিম প্রণয়ন করতে হবে। মুনাফার একটি নির্ধারিত হিস্যার একাংশ শ্রমিকদের বোনাস হিসেবে প্রদান করতে হবে। বাকি অংশ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, চিকিৎসা সুবিধা, সন্তানের শিক্ষা ভাতা, গৃহায়ন ও খাদ্য ভর্তুকিতে ব্যয় করা হবে। মুনাফা বৃদ্ধির সাথে শ্রমিকের মজুরি নীতি কতগুলো উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে। যেমন– (ক) শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে; (খ) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের অধিকার মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করবে এবং এটা হবে মুসলিম সমাজের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্যের পুনরুজ্জীবন; (গ) উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিল্পকারখানায় সাধারণভাবে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পাবে, ফলে মুনাফা হ্রাস বা লোকসানের সময় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন পড়বে না; (ঘ) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের কারণে মুনাফা সম্পর্কে সঠিক তথ্য শ্রমিকদের জানা থাকবে; এর ফলে মালিক পক্ষের কর প্রদান এড়াবার প্রবণতা হ্রাস পাবে, অবশ্য কর ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করতে হবে; (ঙ) অর্থনীতিতে বাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ ও সামষ্টিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

শিল্প-কারখানায় শ্রমিকের মালিকানা লাভ সম্পদ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। ইকুইটির মালিক হওয়ায় শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ব্যাপারে যত্নবান হবে। মোট কথা মালিকানায় অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হবে। শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস পাবে ও দক্ষ, সচেতন কর্মীবাহিনী গড়ে উঠবে। সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

মানবসম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন

বিনিয়োগ সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্বর্ণ মজুদের মতো অনুৎপাদনশীল কার্যকলাপ হ্রাস পাবে। সমাজে শ্রমিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিকদের মালিকানা লাভের নীতি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মতো পুঁজিবাদী দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মুসলিম দেশে এ ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ সঞ্চার না হবার কোনো কারণ নেই।[২]

ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায্য পাওনা প্রদান

প্রশাসনিক খামখেয়ালীপনা ও বৃহৎ কর্পোরেট শিল্পের দুর্নীতির কারণে মুসলিম দেশে ডিপোজিটর ও শেয়ারহোল্ডারদের কম মুনাফা দেয়া হয়। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো না কোনোভাবে তাদের মুনাফার হিস্যা আদায় করে নেয়। বড় বড় শিল্পপতি ও বণিকরা সঞ্চয়ের সিংহভাগ বিদেশে জমা রাখে। উদ্দেশ্য দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও ট্যাক্স দেয়া হতে রেহাই পাওয়া। উপরন্তু বিদেশী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ হতে অধিক লাভের সুযোগ গ্রহণ করা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব শিল্পপতি ও বণিক সমাজ আবার অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য দেশীয় ব্যাংক হতে অত্যন্ত সুলভ হারে বিপুল ঋণ সুবিধা লাভ করছে। ফলে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য এ হতে সুদের হার বেশি রাখার পক্ষে যুক্তি দেখানো সংগত নয়। কেননা এতে বিনিয়োগ ব্যাহত হবে। বরং যুক্তিসংগত ও সমীচীন আচরণ হবে ইকুইটির মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাকে শরীয়াহর আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা। এর ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা তাদের ন্যায্য পাওনা পাবে। সেই সাথে সম্পদের বিতরণগত দক্ষতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।[৩]

উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও ভোক্তাদের প্রতি ন্যায়বিচার

বৈদেশিক মুদ্রার বাস্তবতাবর্জিত বিনিময় হার ও দ্রব্য মূল্যের অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। উচ্চ ট্যারিফ জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে ভোক্তাশ্রেণীর দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এসব ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ ও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত হয় মর্মে প্রচারণা চালানো হয়। এ প্রচারণা আসলে প্রহসন। বস্তুত এসব যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই। এসব ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ধনিক ও ক্ষমতাশালীদের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করে। এ স্বার্থবাদী মহল মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবানুগ নীতি গ্রহণ, মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী জিনিসের সরবরাহ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণে সরকারকে বাধাগ্রস্ত করে।

যে কর্মসূচি সাধারণ মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকয়েক মানুষের সম্পদের স্ফীতি ঘটায়, শরীয়াহর আলোকে তা সমর্থনযোগ্য নয়। গরীব জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, যাকাত ও

অনুরূপ তহবিল হতে রিলিফ সাহায্য প্রদান, মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য উৎপাদককে সুযোগ-সুবিধা প্রদান, সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি ও নানা সুযোগের সম্প্রসারণ।

নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

শ্রমসাধ্য ও দক্ষ কাজ আদায়ের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক থাকা প্রয়োজন। তবু কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিশ্চিতকরণের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতা প্রভাবিত করার জন্য আরো কিছু প্রয়োজন। বিভিন্ন মুসলিম দেশের ঝোঁক পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র যেদিকেই হোক না কেন, তারা মোটামুটি সেকুলার দর্শনকেই গ্রহণ করে নেয়। মনজিলে মকসুদে পৌঁছার জন্য এসব দেশে বর্তমানে ইসলামের সেই সঞ্জীবনী প্রাণশক্তিসুধা বা কারিশমা নেই, যা মানুষকে অতীতে বিশাল আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৪] মানুষের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনে ইসলামের সেই উজ্জীবনী শক্তিকে ব্যবহার করে বিপুল সম্ভাবনার সেই রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিতে হবে। বৈদেশিক দুঃশাসন ও বহু প্রজন্ম ধরে নৈতিকতার অবক্ষয়ের ফলে মুসলিম জনগণ তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের গভীরতম মর্মবাণীর সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তাই পুনরায় সেই সজীব ঈমানের রক্তবীজকে মহীরূহে রূপান্তর করতে হবে, যা মানবিকতার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেবে।

অনেকে মনে করেন, মানুষের নৈতিক চরিত্রে পরিবর্তন আনয়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া ব্যয় সম্পর্কে অমূলক আশংকা ব্যক্ত করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নৈতিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ আমাদের সমাজেই রয়েছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের প্রান্তসীমায় রয়েছে অন্তত একটি মসজিদ। এসব মসজিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম এবং সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যদি এ লক্ষ্যে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে মানুষের মধ্যে নৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টির কর্মসূচির সুচারু রূপায়ণ ব্যয়বহুল বা অতিরিক্ত সময় সাপেক্ষ হবার কোনো কারণ নেই। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদের ইমাম, কলেজ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সমাজকর্মীদের এ প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। রচনা করতে হবে চরিত্র গঠনমূলক পুস্তিকা ও সাহিত্য। আয়োজন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ প্রশিক্ষণের। প্রয়োজনীয় এ ইসলামী সাহিত্য রচনা কঠিন কোনো কাজ নয়। ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও সুন্নাহ সর্বাবস্থাতেই রয়েছে। উপরন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম চরিত্রের উপাদান, স্রষ্টা ও সৃষ্ট জীবের নিকট জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব তথা ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর অসংখ্য মনীষীর গবেষণালব্ধ অসংখ্য অমূল্য লেখার ভাণ্ডার জমা হয়ে আছে। সরকারের আশু দায়িত্ব হচ্ছে, এসব উপায়-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ব্যবহার করে জনগণের বিপুল কর্মক্ষমতাকে সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নের কাজে লাগানো।

চরিত্র গঠনের সময় সাপেক্ষতার আশংকা অবশ্য বাস্তবানুগ। যদি সমাজ অর্থনীতির উন্নতির জন্য চরিত্রের সংস্কার ও উজ্জীবন প্রয়োজনীয় হয়, তবে সে লক্ষ্যে অবশ্যই কাজ করতে হবে। এ উদ্যোগ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা সমাজ পরিবর্তনের ধারাকেই শুধু বিলম্বিত করবে। মুসলিম দেশসমূহে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী উন্মেষের জন্য সামাজিক আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকারি অবহেলা ও ঔদাসীন্য, সঠিকভাবে বলতে গেলে সরকারের প্রবল বিরোধিতার মুখে তা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বরং এটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল, সরকার নৈতিকতা বর্জিত সেকুলারিজমের নামাবলী ছুঁড়ে ফেলে সমাজ পরিবর্তনে ইসলামী ধারাকে বেগবান করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তা হলেই মানুষের নৈতিক জাগরণ ও মনোবিপ্লব দ্রুততর হতো। ফলশ্রুতি হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাফল্যের শিখরে পৌঁছাত। যদি তা না করা হয় তবে নৈতিক অবক্ষয়ের ক্রমবর্ধমান ধারা মানুষকে আরো বেশি পশুত্বের দিকে নিয়ে যাবে। অথচ সর্বজনবিদিত যে, মানুষের চরিত্র ও গুণাবলীর উপরই সমাজ ও অর্থনীতির উন্নতি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে যথাযথভাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজে ব্যবহার করে ইসলামের মূল্যবোধের পরিপন্থি নানা আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-আচরণ সর্বস্ব অপচয়মূলক বিলাস-ব্যসন, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পদ ধ্বংসকারী অভ্যাসের মূলোৎপাটনে সহায়তা করা যায়। সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধনী-গরীব, অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সম্পদ অপচয়কারী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে হবে এবং সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পারঙ্গমতা

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, নৈতিক সচেতনতা ও উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। তবে দক্ষতা ও ন্যায়পরতা অর্জনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। দু'জন মানুষ সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উভয়ের কর্মদক্ষতা সমান নাও হতে পারে। কর্মক্ষমতার পার্থক্য শুধুমাত্র জন্মগত নয়। সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অর্থসংস্থানের দ্বারা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাই সাধারণভাবে অদক্ষ গরীব মানুষের জন্য শিক্ষা, বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ

মানবসম্পদ উন্নয়ন, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিতকরণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অমূল্য অবদান এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। শিক্ষা সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সুযোগের দুয়ার খুলে দেয়। তাই যথার্থভাবেই শিক্ষাকে 'মানুষের মাঝে 'মহাসাম্য সংস্থাপনকারী' এবং 'সমাজ প্রগতির চালিকাশক্তি' হিসেবে

অভিহিত করা হয়।[৫] কিন্তু শিক্ষা খাতে সম্পদ বরাদ্দে মুসলিম দেশের সরকারসমূহ ক্ষমার অযোগ্য উদাসীনতা দেখিয়েছে। এমনকি মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ সাক্ষরতা কর্মসূচিকেও তেমন অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি। নারী শিক্ষা, যার উপর সুস্থ, সবল ও চরিত্রবান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেড়ে ওঠা নির্ভর করে তাকে নিদারুণভাবে অবহেলা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এ ধরনের অমার্জনীয় অবহেলা মুসলিম সমাজের ভিতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। মুসলিম সমাজে সৃজনশীলতা, কর্মপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতার যে বিপুল ভাণ্ডার সুপ্ত রয়েছে, শিক্ষা তার জীয়নকাঠি। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে ইসলামের মৌলিক ও গভীর গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। তাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

মুসলিম দেশের বর্তমান সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রসমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ও ইসলামী গুণাবলী সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। একই সাথে যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়ও দক্ষ করে তুলতে পারেনি। পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবস্থাপনার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাবে অগণিত প্রতিভাবান ছাত্রের কাছে এসব উচ্চশিক্ষার দিগন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক যুগের সিলেবাস অনুযায়ী চালু কলাবিদ্যার মান্ধাতার আমলের প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ডিগ্রি নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে। অফিস-আদালতের কেরানির চাকরির জন্য এসব ডিগ্রিধারীদের চলছে নিরন্তর প্রচেষ্টা। সেসব পদসমূহও ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। একদিকে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী দক্ষ জনশক্তির প্রকট অভাব, অন্যদিকে বাড়ছে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকারের মিছিল। বিত্তশালীরা দেশে বা বিদেশে তাদের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। অথচ বিত্তহীন মানুষের দরিদ্র সন্তান, যাদের আয় ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য এ ধরনের শিক্ষার আরো বেশি প্রয়োজন, তাদের সামনে সকল সুযোগের দুয়ার রুদ্ধ। ধনী-দরিদ্রের গগনচুম্বী ব্যবধান আরো বেড়ে চলেছে। যেন বিত্তহীন মানুষদের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের অন্ধকূপে ফেলে রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য পূরণ ও যুগের দাবির প্রতি সাড়া দিতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

এসব শিক্ষার সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক ইসলামী মূল্যবোধের দৃঢ় সংযোজন প্রয়োজন। উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা সারাদেশে সুলভ ও সুগম্যভাবে ছড়িয়ে

দিতে হবে, যাতে দূরতম গ্রামের একটি দরিদ্র বিধবার সন্তান বা শহরে বস্তির একটি মাতৃহারা সন্তানও উপযুক্ত শিক্ষার প্রশস্ত সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয়। শিক্ষাব্যবস্থার মানবৃদ্ধি ও সুলভে সবার জন্য দ্বার অবারিত করে দেয়া হবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণের পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণাবলী বিকাশের সুযোগ প্রাপ্তি এবং অর্জিত দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ মৌলিক অধিকার। তদ্রুপ উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সরকারের মুখ্য ও অপরিহার্য দায়িত্ব।

অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা

শিল্প-বাণিজ্যের মালিকানাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আবদ্ধ না রেখে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মাঝে ছাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। দরিদ্র মানুষের জন্য আর্থিক ঋণ ও সাহায্যের দুয়ার খুলে দিতে হবে। ইসলামী সাম্যের যে অমীয় বাণী আমরা শুনতে পাই তা অর্জনে এ পন্থা সহায়ক হবে। সাধারণ মানুষের আর্থিক পুঁজি সরবরাহের প্রতিবন্ধকতাসমূহ যদি অপসারণ করা না যায়, তবে সার্বজনীন ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা মানুষের দক্ষতা ও আয়ের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি মাত্র ঘটতে পারে, কিন্তু সম্পদ বৈষম্য হ্রাসে এ উন্নত শিক্ষা কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। ইসলামী সাম্যের সমাজ গড়ার কথা হবে একটি ফাঁকা বুলি মাত্র। সৌভাগ্যবশত পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধসঞ্জীবিত একটি অর্থব্যবস্থা ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। সে ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সক্ষম। দশম অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (সপ্তম অধ্যায়)

১. আলোচনার জন্য দেখুন M. U. Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order* (1979), pp. 14-16. আরো দেখুন, Hakim Mohammad Said. (ed.), *The Employer and the Employed: Islamic Concept* (1972). আরো দেখুন, Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Islam awr Jadid Ma'ashi Nazariyyat* (1959), pp. 155-6.

২. দেখুন, J. W. Middendorf II, "Employee Share Ownership: An, ESOP's Moral for the Third World", *Financial Times,* 25 March 1987, p-25.

৩. দেখুন M. U. Chapra, *Towards a Just Monetary System* (1985), pp. 107-25. আরো দেখুন Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (1987); Muhammad Ariff, *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (1982); M. Nejatullah

Siddiqi, "Rationale of Islamic Banking". in *Issues in Islamic Banking* (1983), pp. 67-96: এবং Ziauddin Ahmed, *Concepts and Models of Islamic Banking* (1984).

৪. দেখুন, Sayyid Abul A'la Mawdudi, *The Islamic Movement: The Dynamics of Values, Power and Change* (1984), in particular pp. 93-132. আরো দেখুন, Marwan Ibrahim al-Kaysi, *Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Adab* (1986). বিশেষ করে দেখুন ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা ৫৩.

৫. Julian Le Grand, *The Strategy of Equality* (1982), p. 54.

অষ্টম অধ্যায়

সম্পদ কেন্দ্রীকরণ হ্রাস করা

সর্বোচ্চ মাত্রায় 'মাকাসিদ' এর বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোসহ সকল বাজার অর্থনীতির দেশগুলোতে বিদ্যমান উৎপাদন উপকরণের মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়া। শরীয়াহর কাঠামোর মধ্যে অনুমোদনযোগ্য কতিপয় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা পরিশুদ্ধ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক সমাজের বাস্তবায়নে দর্শনীয় অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামী কৌশলের সাথে সমাজতন্ত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সমাজতন্ত্রে বন্টনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বৈষম্য দূরীকরণের নামে সকল উৎপাদন উপকরণের সমষ্টিকরণ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মানুষকে মজুরি দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনে এবং তাদের উদ্যোগকে বিনষ্ট করে দেয়। মালিকানার ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা মর্যাদা, স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা 'খলিফা'র ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এরূপ ব্যবস্থার বিস্তার শহরের মতো গ্রামে এবং কৃষির মতো শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঘটাতে হবে।[১]

ভূমিকা সংস্কার

মুসলিম দেশগুলোর পল্লী অঞ্চলে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বাস করে, সেখানে স্বল্প সংখ্যক অনুপস্থিত ভূস্বামী বিশাল ভূমিখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে এবং একইভাবে স্বল্প সংখ্যক অর্থলগ্নীকারী মহাজনগোষ্ঠী অর্থের উপর একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এ সকল ভূস্বামী ও মহাজনরা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক সেই বিশাল ভূমিখণ্ডের মালিকরা ভূমিহীন বা ক্ষুদ্র এবং কৃষক শ্রেণীর উপর প্রভু সেজে বসে আছে। তারা পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ও এভাবে কৃষকদেরকে তাদের খেয়ালখুশি ও মর্জির দাসত্ব করতে বাধ্য করে। এর ফলে পল্লীর জনগণ শোষণের শিকারে পরিণত হয়, তাদের উদ্যোগ বিনষ্ট হয়, উৎপাদন প্রবৃদ্ধি পঙ্গু হয় এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য চিরস্থায়ী হয়।

পল্লীর জনগণ দারিদ্র্যের কারণে অধিকতর উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ, সার ক্রয়, উন্নতমানের বীজ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং তাদের স্বল্প আয়ের পরিপূরক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে তারা চিরস্থায়ী দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং কর্মবিমুখ, অসৎ ও উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে পল্লীর যুবকরা কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়। সেখানে তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সম্মুখীন হয় এবং স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়ে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং স্বল্প মজুরি ও অন্যান্য হতাশার কারণে অপরাধ ও সামাজিক অস্থিরতার কারণ ঘটায়।

মুসলিম দেশগুলোতে পল্লী এলাকার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে নিষ্প্রভ না করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন অথবা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণ সম্ভব নয়। এটা হচ্ছে একটি কঠিন কাজ, তবে 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে যেহেতু অন্য কোনো আর্থ-সামাজিক সংস্কার কর্মসূচির সুদূরপ্রসারী কার্যকারিতা নেই, সেহেতু দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রয়াসের প্রয়োজন অপরিহার্য। এখন সকল অর্থনৈতিক কর্মসূচির মূলভিত্তি হওয়া উচিত ভূমি ও আর্থিক সংস্কার। মুসলিম দেশগুলোর যে সকল সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত বলে দাবি করে, কিন্তু তাদের কর্মসূচিতে এ সকল সংস্কার কর্মসূচিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে না, তাতে তাদের সে দাবিকে আন্তরিক বলে বিবেচনা করা যায় না।

ভূমি সংস্কারের বিষয়টি ভূমি মালিকানার আকার ও ভূমিস্বত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যতদিন পর্যন্ত না আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে এ সকল বিষয় নিষ্পত্তি করা হবে, ততদিন পর্যন্ত 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করা যাবে না।

ভূমি দখলীস্বত্বের আকার

যদি বৈধ উপায়ে ভূমি মালিকানা অর্জিত হয় এবং ভূমি মালিক নিজে অথবা বর্গাচাষী উপযুক্ত শর্তে চাষাবাদ করে এবং বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামের উত্তরাধিকার নীতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ভূমির দখলীস্বত্ব স্বল্প সংখ্যক পরিবারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে না। যেহেতু শত শত বছর ধরে অবৈধ উপায়ে ভূমির দখলীস্বত্ব অর্জিত হচ্ছে এবং ইসলামের উত্তরাধিকার নীতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হচ্ছে, ভূমির দখলীস্বত্ব বৈষম্যমূলকভাবে বন্টিত হচ্ছে, সেহেতু ফলশ্রুতিতে পল্লীর জনগোষ্ঠী কার্যত দাসত্ব, দারিদ্র্য ও দুর্দশায় নিপতিত হচ্ছে। এরূপ উচ্চমাত্রার বৈষম্যমূলক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভূমির দখলস্বত্বের সর্বোচ্চ মাত্রা (সিলিং) নির্ধারণ করা এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বন্টন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাভাবিক অবস্থায় শরীয়াহ দৃশ্যত বেসরকারি সম্পদের উপর এরূপ সীমা নির্ধারণ করে না।[২] এর কারণ সঠিক পদ্ধতি যদি কার্যকর হয় ও সমতা বিরাজ করে, তাহলে সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য বর্তমানে মুসলিম দেশগুলো যে সমস্যা মোকাবিলা করছে, তা হলো বিদ্যমান অত্যধিক মাত্রার সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণের অবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া। এভাবে শরীয়াহ 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে কর্তৃত্ব প্রদান করে। অবশ্য এরূপ পদক্ষেপসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি।[৩]

বিদ্যমান কেন্দ্রীভূত অবস্থা অব্যাহত রাখা হলে তা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সম্পদের সুষম বণ্টন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য স্থায়ীভাবে হতাশাগ্রস্ত হবে। এখন প্রয়োজন

হচ্ছে, পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ভূমি মালিকানার একটি যুক্তিসংগত সীমা নির্ধারণ করে ভূস্বামীদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অবসান ঘটানো। সীমিত আকারের ভূমির লভ্যতার বিপরীতে পল্লী অঞ্চলে বিশাল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও মাকাসিদ হাসিলের জন্য এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইমাম হাসান আল-বান্না ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মালিকানার সুষম ভারসাম্য পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক স্বার্থরক্ষার জন্য এ ধরনের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৪] যেহেতু ভূমির প্রকৃত মালিকদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা শরীয়তে রাখা হয়েছে, সেহেতু তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে জমি নেয়ার প্রয়োজন নেই; বরং এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা উচিত। পুরো মূল্য কৃষকের আয় থেকে সরকার কর্তৃক কয়েক বছরের মধ্যে আদায় করা যেতে পারে এবং তার অংশ বিশেষ প্রকৃত মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং কিছু অংশ পল্লী উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

প্রজাস্বত্বের শর্ত

জমির আকার ছোট করা ছাড়াও প্রজাস্বত্বের শর্তাবলীও সংস্কার করা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম আইনশাস্ত্রের সকল মতাদর্শের ফকীহগণের কাছে ভূমি মালিক ও প্রজাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও ফিকাহশাস্ত্রে ভূমি প্রজাস্বত্বের প্রকৃতি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে রয়েই গেছে।[৫]

ফিকাহ শাস্ত্রের একটি সংখ্যালঘু অংশ ভাগচাষ বা বর্গাচাষ কিংবা নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব অনুমোদন করেননি। বরং তারা বলেছেন যে, একজন ভূমি মালিক নিজে যতটুকু পারেন ততটুকু তার নিজেরই চাষ করা উচিত; অবশিষ্ট জমি অন্যকে চাষ করতে দেয়া উচিত।[৬] বৃহৎ অংশ আছেন যারা বর্গাচাষ সমর্থন করেন, কিন্তু নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছেন, তাদের যুক্তি ছিল যে, মহানবী (স) গোড়ার দিকে ভাগচাষ ও নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব উভয় ব্যবস্থাকেই নিরুৎসাহিত করলেও পরবর্তীতে ভাগচাষের অনুমতি দেন। মহানবী (স) এর সাহাবীগণ ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ সেটাই অনুসরণ করেছেন।[৭] অবশ্য ফকীহগণের প্রধান অংশ ভাগচাষ ও নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব উভয় ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন এবং তা 'মুদারাবাহ' ও শরীয়াহভিত্তিক লিজিং ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। এর পিছনে যুক্তি হলো, মাদানী জীবনের অধিকাংশ মুসলমানের দারিদ্র্য অবস্থার কারণে ধনীদের কাছে তাদের বেশি দাবি ছিল। তখন তিনি ভাগচাষ এবং নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব উভয় ব্যবস্থাকেই নিরুৎসাহিত করেন এবং ভূমি মালিকরা যা নিজে চাষ করতে পারতো তার অতিরিক্ত জমি কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অন্য চাষীদের চাষ করতে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়, তখন তিনি উভয় ব্যবস্থার

অনুমতি দেন এবং তা নিছক ভাগচাষ ছিল না, যার পক্ষে দ্বিতীয় গ্রুপের ফকীহরা যুক্তি উত্থাপন করেছেন।[৮]

এতদসত্ত্বেও বেশ কিছু ফকীহ মনে করেন যে, যদিও নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্ব অনুমোদিত, কিন্তু তা 'মাকরুহ'।[৯] তাদের মতে ভাগচাষই অধিক পছন্দনীয়, কারণ ভূমি মালিক ও প্রজা চাষাবাদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়েরই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্বের পরিবর্তে এ ব্যবস্থা দু'দিক থেকেই সঠিক। যে সকল আইনবিদ নির্ধারিত ভাড়ায় প্রজাস্বত্বের অনুমতি দিয়েছেন, তারা জমি লিজ প্রদানের বৈধতা সম্পর্কে কতকগুলো শর্তারোপ করে প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম মালিকের মতে, যদি জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় অথবা লিজ গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো প্রাকৃতিক কারণে (যেমন খরা, বন্যা) জমি চাষাবাদ করতে সমর্থ না হন, সেক্ষেত্রে লিজ চুক্তি অতিরিক্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার জন্য ভঙ্গ করা যেতে পারে।[১০] বিষয়টি সম্পর্কে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু আইনবিদ মনে করেন, বিষয়টি ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধির আওতাভুক্ত বিধায় রাষ্ট্র নির্ধারিত ভাড়ায় দখলীস্বত্ব প্রদান অন্তত সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে এবং জনগণের স্বার্থে তাকে পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[১১]

যেহেতু প্রজা ও ভূমিহীন কৃষকরা দুর্বল ও ক্ষমতাহীন এবং যখন উচ্চ ভাড়া ও উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন এভাবেই আরো কিছুকাল থাকার সম্ভাবনা আছে, সেহেতু ভূমিস্বত্বের আকারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, নির্ধারিত ভাড়ায় ভূমির লিজ প্রদান ব্যবস্থা অবিচার ও দারিদ্র্য বজায় রাখার জন্য অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় মুসলিম সরকারগুলোর কাছে এটাই প্রত্যাশা যে, তারা জমি লিজ প্রদানের ক্ষেত্রে ভাগচাষ ব্যবস্থাকে সাধারণ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মালিক ও প্রজাদের মধ্যে উৎপাদনের ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। যতদিন পর্যন্ত পল্লী এলাকায় ক্ষমতার ভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত না হবে এবং ভূমি মালিকদের শাসনের হাতকে কার্যকরভাবে নিষ্ক্রিয় করা না যাবে, ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। মহানবী (স) মদীনায় প্রাথমিক জীবনে যে বৈপ্লবিক কার্যক্রম চালু করেছিলেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষক ও ভূমিহীন চাষীদের কল্যাণে এবং মুসলিম সমাজের সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বলাই বাহুল্য যে, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইসলাম ভূমি সংস্কারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে।[১২] আয়বণ্টন ও দারিদ্র্যের প্রকোপ নিবারণে ভূমিবণ্টন একটি বড় নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও কোস্টারিকার মতো যে সকল দেশে ভূমির দখলীস্বত্বের সুষম বণ্টনসহ যৌথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, সে সকল দেশ আয়ের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত

সাফল্য লাভ করেছে।[১৩] অপরদিকে যে সকল দেশে ভূমির দখলীস্বত্বের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রক্রিয়াকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে সকল দেশে দারিদ্র্যের প্রাদুর্ভাব এবং আয়বন্টনে অধিকতর বৈষম্য অব্যাহত থাকবে। ক্ষুদ্র ও স্বাধীন উৎপাদনকারী কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পল্লীখাত কৃষি কর্মকাণ্ডে বড় ধরনের উৎসাহ প্রদানের জন্য সহায়ক হবে এবং এভাবেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যাবে। ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প কারখানায় এর সম্মিলিত বিস্তৃতি ঘটলে তা কৃষি সংশ্লিষ্ট জনশক্তির শহর এলাকায় স্থানান্তর হ্রাস করবে এবং এর সাথে নগরের অপরাধ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপও কমাবে। আয় ও সম্পদের বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করার মাধ্যমে অধিকাংশ দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কমানো এবং ঐ সকল দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা যেতে পারে।

বর্তমানে যে জাজ্বল্যমান বৈষম্য রয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কার হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা কোনো সরকার কর্তৃক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অর্থবহ ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন করা না হয়, তাহলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হবে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন এ ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন সকল নৈতিক মূল্যবোধ পদদলিত হয়। ভূমি মালিকরা এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভূমিই হারাবে না তাদের সহায়সম্বল এমনকি জীবনও হারাতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের উচিত নিজেদের বৃহত্তর ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থে স্বেচ্ছায় সঠিক ভূমি সংস্কারের চেষ্টা চালানো।

কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি দখলীস্বত্বের আকার কমানো হলে তা কৃষিকাজের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বেশ কিছু প্রায়োগিক সমীক্ষা থেকে এরূপ ধারণা প্রমাণিত হয়নি; তবে এ সমীক্ষাগুলো নিশ্চিত করেছে, কৃষি জমির আকার ও প্রতি একরে উৎপাদনের হার পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর মানে হচ্ছে, ক্ষুদ্র আকারের কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃহদাকার জমির চাইতে বেশি।[১৪] অভিজ্ঞতাসঞ্জাত প্রমাণাদি উল্লিখিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বড় আকারের ভূমিখণ্ডের মালিকরা তাদের সম্পদের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে বৃহদাকার কৃষি ফার্মে বিনিয়োগ (যেমন ভালো বীজ, ঋণ, পানি সরবরাহ ও সার) করার ক্ষমতা রাখে।[১৫] এমনকি বিশ্বব্যাংকের মতে, 'ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষি ফার্মে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা সারা বিশ্বব্যাপী হুমকির সম্মুখীন' –বিশেষ করে সেবা, বাজার ও উৎপাদন উপকরণ, যেমন সার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সীমিত সুযোগ বিদ্যমান।[১৬] এটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা দরকার যে, ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন মানে এই নয় যে, জমির আকার অর্থনৈতিকভাবে টেকসই নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে হ্রাস করতেই হবে।

ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে পল্লীর ভূমি সংস্কারের প্রতিরূপ হচ্ছে, পল্লী ও শহর এলাকায় দক্ষ, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটানো। এ ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ প্রক্রিয়া হ্রাস করে ভূমি সংস্কারের পরিপূরক হবে। ইসলামী মূল্যবোধের কাঠামোতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাদিও এ ব্যবস্থায় রয়েছে।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে বিকাশ সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ হবে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট বড় বড় ব্যবসায়ীরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আরোও বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের পুঁজিবাদী বিশ্বে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা প্রভাবশালী ছিল এখন তার অবসান ঘটেছে।[১৭] এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্র উৎপাদনের সকল উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়। এ ব্যবস্থা মজুরি দাসত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে জোরদার করে। এর ফলে প্রতিযোগিতা দূরীভূত হয় এবং উৎসাহ ও দক্ষতা হ্রাস পায়। এটা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রে তার আকার কী ধরনের হবে।

যদি বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলো অধিকতর দক্ষ হয় এবং সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের দিকে ধাবিত না হয়, তাহলে এরূপ বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে মৌলিকভাবে কোনো দোষ নেই। তথাপি এটা প্রতীয়মান হয় যে, 'মাকাসিদ' অর্জনের সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব একান্ত অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া নীতি হিসেবে সাধারণভাবে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিরুৎসাহিত করা উচিত। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ কমানো ছাড়াও বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। ব্যবসার মালিকানা থাকার ফলে মালিকদের মধ্যে স্বাধীনতা, মর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি করে বিধায় তা সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এর ফলে ঐ সকল মালিকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব ব্যবসার সফলতার জন্য সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের চেতনা সৃষ্টি করবে। এ ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং তা অধিকতর দক্ষতা আনয়নে অবদান রাখবে। এছাড়াও তা দ্রুততর গতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়ক হবে, যা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

সম্প্রসারিত মালিকানা ও কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ

যেহেতু ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সকল প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত হবে না, সেজন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে

কর্পোরেট ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। এতে মালিকানার দ্রুত বিকাশে ইতিবাচক অবদান রাখার ক্ষেত্রে বৃহৎ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। যাইহোক, পাশ্চাত্য জগতে যে কর্পোরেশনগুলো বিদ্যমান সেগুলো সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করছে।[১৮] এতদসত্ত্বেও কর্পোরেশনগুলো অর্থনীতির প্রধান খাতের অন্তর্ভুক্ত এবং মৌলিক পণ্য উৎপাদন, মূল্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এবং তা সমগ্র জাতি তথা বিশ্বকে প্রভাবিত করে থাকে।[১৯] তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে প্রতিফলিত করে না।[২০] কর্পোরেশনগুলো স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়। এর স্টক কতিপয় পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে তার সকল নীতিগত সিদ্ধান্তের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তাদের পক্ষে সম্ভব।[২১] এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি যাতে উঁচু-নীচুর পার্থক্য বৃদ্ধি করে এবং কর্পোরেট ক্ষমতাকে শেয়ারের ভিত্তির উপর পিরামিডের ব্যয় সংকীর্ণ কাঠামো গড়ে তোলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এরূপ উঠানামার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে।

অতএব পাশ্চত্যের কর্পোরেশনগুলো মুসলিম দেশগুলোর জন্য কোনো আদর্শ হতে পারে না। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কমানোর লক্ষ্যে এ ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার করতেই হবে। ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সংগতি রেখে কর্পোরেশনগুলোর মূলধন কাঠামোতে অংশীদারীত্বের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ এবং সুদের বিলোপ সাধন শুধুমাত্র ধনী পরিবারগুলোর প্রভাবকে কমাবে না; বরং তা কর্পোরেট অংশীদারীত্বে মালিকানার সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টনে সহায়ক হবে। এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নাও হতে পারে; কারণ অধিকাংশ শেয়ারহোল্ডার বোর্ড সভায় অংশ গ্রহণ করে না। এমতাবস্থায় বোর্ড পরিচালকদের অবাঞ্ছিত ক্ষমতা কমানোর জন্য অন্যান্য সংস্কারের প্রয়োজন হবে।

যাকাত ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার পদ্ধতির সক্রিয়করণ

আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে উর্পযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ অধিকতর সফল হতে পারে, যদি ইসলামের যাকাত ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সক্রিয় করে সেগুলোকে আরো জোরদার করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক যে, যদিও এ দু'ব্যবস্থার বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের জন্য ধর্মীয়ভাবেই বাধ্যতামূলক, তা সত্ত্বেও সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে।

যাকাতঃ সামাজিক আত্মসাহায্য কর্মসূচি

ইসলাম তার বিশ্বাস কাঠামোতে সামাজিক আত্মসাহায্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এতে প্রত্যেকে 'আল্লাহর খলিফা' ও উম্মাহর সদস্য হিসেবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই মর্যাদা ও যত্নের সমন্বয়ে ভ্রাতৃবোধ গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য

অর্জনের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যারা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের বাইরে অক্ষমতার শিকার এবং নিজেদের সাহায্য করতেও অক্ষম তাদের চাহিদা পূরণ করা মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব। এত বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও প্রাচুর্যের পাশাপাশি যদি দারিদ্র্য বিরাজ করে, তাহলে সে সমাজকে প্রকৃত মুসলিম সমাজ বলা যায় না। মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন, 'সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয়, যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজের উদরপূর্তি করে'।[২২] মহানবী (স) আরো জোর দিয়ে বলেছেন, 'যে জনপদে একজন লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়, সে জনপদ আল্লাহর হেফাজত থেকে বঞ্চিত হয়'।[২৩] চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 'গরীবদের জন্য যা পর্যাপ্ত প্রয়োজন, তা তাদেরকে প্রদান করা ধনীদের জন্য আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। যদি গরীবরা অভুক্ত থাকে অথবা বস্ত্রহীন থাকে বা কষ্টভোগ করে তার কারণ ধনীরা তাদের বঞ্চিত করে। এমতাবস্থায় সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহর জন্য এটাই যথোপযুক্ত যে, তিনি এদের হিসাব নেবেন এবং শাস্তি প্রদান করবেন।[২৪]

যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের এ দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পন্থা বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের অলঙ্ঘনীয় অংশ। যাকাতের বিধান হচ্ছে, ঐশী প্রত্যাশার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন সংকেত এবং তা এটা নিশ্চিত করার জন্য যে যাতে কেউ প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার চাহিদা পূরণের উপায় প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। শাব্দিক অর্থে যাকাত হচ্ছে পরিশুদ্ধতা (তাহারাত), প্রবৃদ্ধি, বরকত এবং স্বীকৃতি[২৫] এবং পারিভাষিক অর্থে যাকাত হচ্ছে একজন মুসলমানের মোট আয় বা কৃষি উৎপাদন যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার অংশ বিশেষ প্রদান করা তার জন্য আর্থিকভাবে বাধ্যতামূলক এবং অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য। এটা হচ্ছে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিত্তবানদের সম্পদ পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃঢ় প্রতিফলন ঘটায়। প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে তা ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহর রিজিকের প্রতি ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁর রহমতও কামনা করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে সকলের কল্যাণ ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণ ঘটে। এভাবে সকলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মুসলমানদের অপরিহার্য আর্থ-সামাজিক অঙ্গীকারের আর্থিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, এতে সরকারি কোষাগারে কোনো বোঝা আরোপ করা হয় না।

যাকাতের মাধ্যমে যে সামাজিক আত্মসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়, তা কর প্রদানের মতো নাগরিক দায়িত্ব নয়। এটা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার নিজের পক্ষ থেকে আরোপিত ধর্মীয় দায়িত্ব এবং তার দেয়া যে সম্পদ বান্দার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, তা থেকে যারা অস্বচ্ছল তাদের সাথে ভাগ করে নেয়া (আল-কোরআন ৫৮:৭)।

এটা হচ্ছে এক প্রকার নির্ধারিত ইবাদত যা ইসলাম শুধুমাত্র সালাত, সিয়াম বা হজ্জ পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেনি; এতে একক ও সম্প্রসারিত পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীসহ মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনের উপর জোর দিয়েছে। বিবেকবুদ্ধিসঞ্জাত যাকাত পরিশোধের উপর আল্লাহতায়ালা কর্তৃক তার প্রার্থনা গ্রহণ করার এবং যে পরকালে তার কল্যাণ নির্ভরশীল, সেদিন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের চেয়েও অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে বড় ধরনের ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা হবে।[২৬] কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়টি হয়ত রাষ্ট্র কর্তৃক উদঘাটিত নাও হতে পারে এবং তার শাস্তি নাও পেতে পারে। কিন্তু যাকাত পরিশোধ না করলে তা হতে পারে না। আল্লাহ সব কিছু দেখেন এবং জানেন। সুতরাং কোনো মুসলমানের পক্ষে যাকাত আদায় এড়িয়ে যাওয়া অথবা কৌশলে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না। যদি সে তা করে, তাহলে সে তার নিজ স্বার্থকেই ক্ষুণ্ন করে।

ধনীদের আদায়কৃত যাকাত গরীবদের প্রতি তাদের কোনো আনুকূল্য নয়। ধনীরা তাদের সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়, তারা কেবলমাত্র জিম্মাদার (ট্রাস্টি) (আল-কোরআন ৫৭:৭)। তাদেরকে অবশ্যই ট্রাস্টের শর্তানুযায়ী ব্যয় করতে হবে। ধনীরা যদি যাকাত পরিশোধ করতে যেয়ে গরীবদের প্রতি কোনো আনুকূল্য প্রদর্শনের চেষ্টা করে, তাহলে তা হবে গরীবদের অনুভূতির প্রতি আঘাত করা, তাদের আন্তরিকতার অভাবের পরিচায়ক এবং এর ফলে তারা আখেরাতে তাদের পুরস্কারকে ধ্বংস করবে (আল-কোরআন ২:২৬১-২৭৪)। দরিদ্ররাও যাকাত গ্রহণ করে এটা মনে করবে না যে, তাদের প্রতি ব্যক্তিগত করুণা করা হলো, কারণ তারা কেবল ধনীদের কাছ থেকে আল্লাহ নির্ধারিত প্রাপ্যই গ্রহণ করে মাত্র (আল-কোরআন ৫১:৯ এবং ৭০:২৫)। অধিকন্তু তারা যাকাত গ্রহণের পর তা কিভাবে ব্যয় করবে, সে বিষয়ে স্বাধীন। এটা তাদের অর্থ এবং তারা তাদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী তা ব্যয় করতে পারে, অবশ্য মুসলিম সমাজে তা শরীয়াহ্ দ্বারা সীমিত। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজে ব্যয়সংস্থান করতে পারে এবং যাকাত লাভের উপযুক্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রহণ করে, তাহলে শেষ বিচারের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কারণ সে অন্যায়ভাবে তা গ্রহণ করেছে এবং অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।[২৭] অতএব মর্যাদাহানিকর, ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক হতে পারে, এমন কোনো ব্যাপকতর পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় তহবিলের অপব্যবহার ও বৈষম্য যাতে না হয়, সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নৈতিকতা দ্বারা চালিত মুসলিম সমাজের আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সীমালঙ্ঘনকারীদের উচ্ছেদ করবে। যারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে সচেতন, তারা কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অভাবী লোকদের জন্য অর্থবহ সহায়তা প্রদানে সমর্থ হবে।

এটা আশা করা যায় যে, যে মুসলমান তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সচেতন এবং তার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ তথা পার্থিব সম্পদে আল্লাহর রহমত এবং পরকালীন জীবনে তারই সন্তুষ্টি কামনা করেন, তিনি যাকাত আদায়ে ব্যর্থ হবেন না। মহানবী (স) বলেছেন যে, 'যাকাত আদায়ে কোনো ব্যক্তির সম্পদ হ্রাস পায় না'।[২৮] যাকাতের বিনিময়ে আল্লাহর অনুগ্রহে তার সম্পদ পরিণামে বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এ কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম স্বত্বাধিকারী, আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (আল-কোরআন ৩:১৮০)।

অবশ্য এতসব শাস্তির বিধান সত্ত্বেও এমন মুসলমানও রয়েছে, যারা যাকাত আদায় করে না। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে এমন জবরদস্ত শক্তি প্রয়োগ করা, যাতে তারা যাকাত পরিশোধে বাধ্য হয়। রাসূল (স) এর তিরোধানের পর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, হযরত আবুবকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুসলমানদের সাধারণ অনুভূতি হচ্ছে যে, ইসলামী মূল্যবোধসঞ্জাত যথাযথ শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে অধিকাংশ মুসলমানই যাকাত আদায় করতে চেষ্টা করবে, উপরন্তু যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের কাছ থেকে তা আদায়ের জন্য সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।

যাকাতের ভিত্তি সম্পর্কে ফিকাহর বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে হানাফী মাজহাবের ধারণা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক এবং জাহিরিয়া মাজহাবের ধারণা সবচেয়ে সংকীর্ণ। অবশ্যই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ নিয়ে বড় ধরনের কোনো পার্থক্য হওয়া সমীচীন নয়।[২৯] এটা এ কারণে যে, জাহিরিয়াসহ অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, যদি শুধু যাকাত দ্বারা দরিদ্রদের অভাবে পূরণ করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য অতিরিক্ত লেভি (কর) আরোপ করতে পারবে। সবচেয়ে সংকীর্ণ বলে বিবেচিত ইবন হাযম-আল-জাহিরের এরূপ ধারণাকে যাকাতের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। তিনি বলেন, প্রতিটি দেশের ধনীদের কর্তব্য হচ্ছে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণ করা এবং যাকাত যদি এ উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো দরিদ্রদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা, শীত ও গ্রীষ্মে বস্ত্র প্রদান করা এবং রৌদ্র, তাপ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; এছাড়া তাদেরকে একান্ত পরিবেশ প্রদান করা।

গরীবের চাহিদা পূরণের জন্য ধনীরা যাকাত, নাকি বিশেষ করের (লেভির) মাধ্যমে সম্পদ প্রদান করলো তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। যারা তাদের ধর্মীয়

কর্তব্যের অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় করে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, অপরদিকে যারা অনিচ্ছায় তা পরিশোধ করে তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার ও তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। একথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক সমাজে যেমন কর্মচারীদের বেতন কর্তন ও চাঁদা থেকে বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়স ও স্বাস্থ্যের জন্য সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যাকাতে সেরূপ কোনো স্বঅর্থায়নের ব্যবস্থা নেই। দুর্যোগের সময় সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য যাকাত থেকে বাজেট বরাদ্দের কোনো সুযোগ নেই। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আয় পুনর্বণ্টন প্রকল্প এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ প্রদানের জন্যও যাকাত তহবিল ব্যবহার করা যাবে না। যাকাত হচ্ছে এমন পূর্ণ ধর্মীয় আঙ্গিকে একটি সামজিক আত্মসহযোগিতার ব্যবস্থা, যাতে উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরও যারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে না সেরূপ গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা হয়, যাতে মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও কৃপণতা দূর হয়। যদি যাকাত আদায়ের পরিমাণ গরীবদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্য উপায় বের করা।

যেহেতু একজন মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের উপার্জন নিজে করা, সেহেতু এটাই সমীচীন হবে যে, যাকাত এমনভাবে বিতরণ করতে হবে যাতে দরিদ্ররা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। যাকাত হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের জন্যই স্থায়ী ব্যবস্থা, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। অন্যদের জন্য যাকাত হবে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা, যা দ্বারা তাদেরকে পর্যাপ্ত উপার্জনের জন্য প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যে সকল ব্যবস্থা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সে সকল ব্যবস্থাসহ যদি এমন এক আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যেখানে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দেয়া হয়, সেখানে লোকদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যাকাত ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং, মুসলিম দেশগুলোতে বিরাজমান বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে যাকাত সফল না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

মুসলিম সমাজে যাকাতের আরো একটি কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে। এতে বিনিয়োগের জন্য তহবিল বৃদ্ধি হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও অব্যবহৃত অর্থসহ সকল সম্পদের উপর যে যাকাত আরোপিত হয়, তা পরিশোধের সুবিধার্থে ঐ সম্পদের মালিকরা আয় বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকে যাতে যাকাত প্রদানের ফলে তাদের সম্পদ হ্রাস না পায়। এভাবে যে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপূর্ণ আত্মীকৃত হয়, সেখানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলস সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যেয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং ফলশ্রুতিতে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হবে। যাকাত ব্যবস্থা কী যাকাত আদায় এড়ানোর জন্য সীমালঙ্ঘনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, নাকি যাকাত গ্রহীতাদের সংখ্যা কমাবে? যে সমাজে সাদাসিধে জীবনযাপন করাই আদর্শ জীবন

হিসেবে গণ্য এবং যেখানে সীমালঙ্ঘনকারী ও মর্যাদা প্রতীকবোধের বরদাশত করা হয় না এবং যে সমাজে নিজ শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করা বাধ্যতামূলক, সে সমাজের চিত্র এটা নয়। এতদসত্ত্বেও 'মাকাসিদ' হাসিলের লক্ষ্যে যাকাতের কার্যকর পরিপূরক হিসেবে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পুনর্গঠন এবং ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপ্তি লাভের বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

উত্তরাধিকার

ইসলাম অধিকতর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পদ বণ্টনের জন্য একটা সুন্দর উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তিতে শরীয়াহ উত্তরাধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাউকে বৈধ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যদি না সে সম্পদের পূর্ব মালিককে হত্যার দায়ে দোষী হয়। এছাড়া কোনো ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি উইল করতে পারে না। এরূপ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ব্যয় করতে হবে দাতব্য সেবায় অথবা এমন ব্যক্তির জন্য যে ঐ সম্পত্তিতে অংশ পাবে না (অবশ্য যদি সকল উত্তরাধিকারী একমত হয়)।

মৃত ব্যক্তির জীবিত মাতা-পিতার জন্যও নির্ধারিত অংশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে শুধু তাদের কল্যাণই নিশ্চিত হয় না, মাতা-পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের মধ্যে মাতা-পিতার অংশ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। স্ত্রীকেও একটি নির্ধারিত অংশ দেয়া হয়। অবশিষ্টাংশ মৃত ব্যক্তির সন্তানদের জন্য নির্ধারণ করা আছে। ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ অন্যদের বঞ্চিত করে কেবলমাত্র একজন সন্তানকে দিতে পারেন না। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে তাহলে নির্ধারিত নিয়মে সম্পত্তির ব্যাপকভিত্তিক ও সুসম বণ্টন করতে হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যাপকভিত্তিক বণ্টন ছাড়া ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিমালার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যদি ইসলামী মূল্যবোধ কার্যকর করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত হয় এবং তা অব্যাহত না থেকে পারে না।[৩১]

অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের যে প্রাথমিক উৎস রয়েছে, সেগুলো থেকেই মুসলিম বিশ্ব সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ধার করেছে।[৩২] সুতরাং এ অধ্যায়ে যে নীতিমালা বাস্তবায়নের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অর্থব্যবস্থা যদি ইসলামী আদর্শের আলোকে পুনর্গঠন করা না হয় তাহলে টেকসই উন্নয়ন, কাঙ্ক্ষিত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ অথবা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হবে।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (অষ্টম অধ্যায়)

১ Theodore Schultz এর মতে ভ্রান্ত উৎসাহ প্রদানের ফলে কৃষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। দেখুন, "Tensions between Economics and Politics in Dealing with Agriculture", in Gerald M. Meier (ed.). *Pioneers in Development, Second Series (1987),* p.33. যখন উৎসাহ প্রদানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় তখন মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র মূল্যই নয়, অন্যান্য আরো কিছু বিষয় রয়েছে যা পল্লী অঞ্চলের জনগণের প্রকৃত আয়কে প্রভাবিত করে।

২ দেখুন 'Abd al-Salam al-'Abbadi, *Al-Milkiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (1974-75), vol. 2, p. 100.

৩ 'Ali al-Khafif, *Al-Milkiyyah, fi al-Shar'ah al-Islamiyyah,* vol. 1 p. 93.

৪ দেখুন Imam Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna'* (1989), p. 266; সাইয়েদ আ'বুল আ'লা মওদূদী তাঁর প্রাথমিক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন যে, ভূমি মালিকানায় যথেচ্ছভাবে কোনো প্রকার সীমা আরোপ করা যায় না, অবশ্য তিনি পরবর্তীতে তার মত পাল্টে বলেন যে, বর্তমান বিশৃঙ্খল ভূমি ব্যবহার পরিপ্রেক্ষিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমা আরোপ করা যেতে পারে (দেখুন, Mawdudi, *Mas'alah Milkiyyat-e-Zamin* (1969), p. 111. আরো দেখুন, Muhammad Qutb, *Al-Insan Bayna al-Maddiyyah wa al-Islam,* (1965), pp. 160-8 and 200-1; Mustafa al-Siba'i, *Ishtirakiyyah al-Islam* (1960), p. 62; 'Abbadi (1974-75), vol. 2, pp. 398-420; এবং Rafiq al-Misri, *Usul al-Islami* (1989), pp. 53-4. আরো অনেকে আছেন যারা একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন, এরা হলেনঃ Alli al-Khafif, Mahmud Abu Sa'ud, Muhammad Yusuf Musa, Wahbah al-Zuhayli, 'Abd al-Hamid Mitwalli, এবং Muhammad Anis Ibrahim.

৫ বিষয়টির উপর অত্যন্ত প্রেরণামূলক সারসংক্ষেপ তৈরি করেছেন Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (1974), pp. 290-301; al-Abbadi (1974-75), vol. 2, pp. 133-28; এবং M. Anas Zarqa, "Al-Siyasat al-Iqtisadiyyah wa al-Takhtit fi al-Iqtisad al-Islami" in *Al-Majma' al-Maliki li Buhuth al-Hadarah al-Islamiyyah, Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Islam* (1990), vol. 3.pp. 1259-63.

৬ এ অভিমতটি বেশ কয়েকটি হাদিসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে জাবীর ইবন আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদিস হচ্ছেঃ মহানবী (সা) এর জন্য ভূমির ভাড়া বা অংশীদারত্ব গ্রহণ করা বৈধ নয়। সহীহ মুসলিম (১৯৫৫), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৮৬:৯০)। জাবীর ইবন আবদুল্লাহ বর্ণিত আরেকটি হাদিস হচ্ছেঃ যার জমি আছে সে নিজেই তা চাষ করবে, যদি সে তা না করে তবে তার ভাইকে তা করতে দাও (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১৭৬-৮৮)। ভূমি ভাড়া ও ভূমি মজুরী সংক্রান্ত একই ধরনের আরেকটি হাদিস দেখুন, পৃষ্ঠা ১১৭৬-৮০ ও ১১৮৪-৫। আওজায়ীর মতানুসারে এ বিষয়ে একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন আতা'শাখুল, মুজাহিদ ও হাসান বসরী। (দেখুন Ibn Hazam, al-

Muhalla, vol. 8, p. 213), আরো দেখুন Abdul Hamid Abu Sulayman, "The Theory of the Economics of Islam", in "*Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam* (1976)," pp. 9-12.

৭ এ যুক্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেখুন, Ibn Hazm, al-Muhalla. vol. 8, pp. 210-14; আরো দেখুন Qaradawi (1974). pp. 295-9.

৮ এ যুক্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেখুন, Abu Yusuf, *Kitab al Kharaj* (1353 A.H.), pp. 88-91; এবং Ibn Taymiyyah, *Al Hisbah fi al Islam* (1967), pp. 28-31; আরো দেখুন Mawdudi (1969).

৯ 'Abbadi (1974-75), vol. 2, p. 127, and Ibn Taymiyyah (1967), p. 30.

১০ দেখুন ড. আনাস জারকার মন্তব্য Ahmad Mustafa and Hossein Askari, "The Economic Implications of Land Ownership and Land Cultivation in Islam", in Munawar Iqbal (ed.), "*Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (1986)," pp. 152-3. ড. জারকার উদ্ধৃত ইমাম মালেকের অভিমত দেখুন, Al-Baji, Al-Muntaqa Sharh al-Muwatta', vol. 5, pp. 146-8.

১১ 'Abbadi (১৯৭৪-৭৫' vol. 2. p. 128 এবং M. Anas Zarqa in M. Iqbal (1986), p. 153. ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যকার সম্পর্কের আইনগত সংস্কারের বিষয়ে মওলানা মওদূদী যে পরামর্শ দিয়েছেন সে জন্য দেখুন, *Islam awr Jadid Ma'ashi Nazariyyat* (Urdu) (1959), pp. 152-4.

১২ N.T. Quan and A. Y. C. Koo, "Concentration of Land Holdings: An Explanation of Kuznet's Conjecture", *Journal of Development Economics,* 18 (1985), pp. 101-17.

১৩ দেখুন C. Gonzales-Vega and V. H. Cespedes, *Growth and Equity: Changes in Income Distribution in Costa Rica* (1983); K. Griffin and A. R. Khan, "Poverty in the Third World: Ugly Facts and Fancy Models", *World Development,* 6 (1978), pp. 1271-80; ILO, *Poverty and Landless in Rural Asia* (1977); A. R. Khan and P. D. Weldon, "Income Distribution and Levels of Living in Java, 1963-70", *Economic Development and Cultural Change,* 25 (1985), pp. 699-711; S. R. Osmani and A. Rahman, *Income Distribution in Bangladesh* (1983); E. Lee, "Egalitarian Peasant Farming and Rural Development; The Case of South Korea", *World Development,* 7 (1979), pp. 493-517; D. G. Rao, "Economic Growth and Equity in the Republic of Korea", *World Development,* 6 (1978), pp. 397-409.

১৪ দেখুন, "R. A. Berry and W. R. Cline, *Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries* (1979) Subrata Ghatak "Agriculture and Economic Development", in Norman Gemmell, a

Surveys in Development Economics of (1987), pp. 355-6; and p. A. Yotopoulos and J. B. Nugent. Economices of Development (1967), p. 6.

১৫ Ghatak, in Gemmell (1987), p. 356.

১৬ দেখুন, IBRD, *World Development Report 1982,* pp. 81 and 91.

১৭ দেখুন, Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order* (1966), p.16.

১৮ দেখুন, C. Wright Mills, *The Power Elite* (1959), p. 117.

১৯ দেখুন, Gabriel Kolko, *Wealth and Power in America* (1964), pp. 68 and 127.

২০ Andrew Hacker, *et al.*, Corporation Business, The new Eneyclopaedia Britannica 15th ed., vol 5, 187.

২১ ১৯৬০ সালে করদাতাদের শতকরা এক ভাগ ৪৮ ভাগ স্টকের অধিকারী ছিল (Reagan, "What 17 million shareholders share", p. 102 cited by Greenberg, *'Serving the Few* (1974), p. 45) (ফরচুন সাময়িকীতে উল্লিখিত ৫০০ এর তালিকায় ১৫০টি কোম্পানির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে এক ব্যক্তি বা একটি পরিবারের সদস্যরা (Robert Sheehan, "Proprietors in the World of Big Business", *Fortune,* 15 June 1967, p. 179).

২২ Al-Bukhari, *Al Adab al-Mufrad* (1379 A.H.) p. 52 :112.

২৩ Al-Nisaburi, *Mustadrak al-Hakim,* vol. 2, p. 12, from Ibn Umar.

২৪ Abu 'Ubayd, *Kitab al-Amwal* (1353 A.H.), p. 784:1909. হযরত আলী (রা) ভিন্ন ভাষায় মহানবী (সা) এর হাদিস বর্ণনা করেন। দেখুন, al-Mundhiri (1986), vol. 1, p. 538:5.

২৫ দেখুন, the root *zakat* in al-Zubaydi's Taj al-'Arus and Ibn Manzur's *Lisan al-Arab.*

২৬ মহানবী (সা) বলেছেন, "যে সালাত আদায় করে, কিন্তু যাকাত দেয় না, তার ইবাদত নিষ্ফল" (Abu 'Ubayd, *Kitab al-Amwal,* 1353 A.H., p. 492:919, from 'Abdullah Ibn Mas'ud. আরো দেখুন, al-Mundhiri, vol. 1. p. 540:10).

আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদিস থেকে মানবতার কোনো ক্ষতি না করা এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। মহানবী (সা) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, 'দেউলিয়া ব্যক্তি কে? সাহাবীরা জবাব দিলেন, যার দায়দেনা পূরণের মতো অর্থ নেই তিনিই দেউলিয়া।' এর পরিপ্রেক্ষিত মহানবী (সা) বলেন, 'দেউলিয়া হলো ঐ ব্যক্তি যিনি হাশরের দিন তার সালাত, রোজা ও যাকাতকে তার আমলানায় দেখতে পাবে না। কারণ সে এগুলোর অপব্যবহার করেছে ও অপবাদ দিয়েছে এবং অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করেছে, অন্যের রক্ত ঝরিয়েছে ও অন্যদের উপর নির্যাতন করেছে। সুতরাং তার সকল নেক আমল তাকে ফেরত দেয়া হবে। যদি তার সকল দায়দেনা পরিশোধে তার সব নেক আমল ফুরিয়ে যায়, তা হলে পাপ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে

নিক্ষেপ করা হবে।' (Reported from Abu Hurayrah by Muslim, 1955, vol. 4, p. 1979:59, "Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab", "Bab Tahrim al-Zulm".)

২৭ মহানবী (সা) বলেছেন, 'যারা ভিক্ষাবৃত্তি অব্যাহতভাবে চালায় তারা হাশরের দিন মহান আল্লাহর সামনে নিগৃহীত অবস্থায় উপনীত হবে।' (Reported by al-Bukhari, Muslim and al-Nasa'i, from Ibn `Umar)।; "যদি তারা জানতো যে ভিক্ষা বৃত্তিতে কী জড়িত রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের কাছে হাত পাততো না"। (al-Nasa'i and al-Tabarani, from 'A'idh ibn 'Amr) দুটো হাদিসই al-Mundhiri (1986), vol. 1. pp. 572:1 and 573:7, থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর অন্য হাদিস দেখুন, pp. ৫৭২-৯২।

২৮ মহানবী (সা) বলেছেন, "দানে সম্পদ কমে না; আল্লাহ ক্ষমাশীলতার বিনিময়ে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন; এবং যে বিনয়ী তাকে ক্ষমা করে দেন।" (Reported from Abu Hurayrah by Muslim, 1955, vol. 4, p. 2001:69, "Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab".)

২৯ দেখুন, Yusuf al-Qaradawi, "Tawsi'Qa'idah Ijab al-Zakat", *Al-Iqtisad al Islami,* Feb. 1982, p. 8.

৩০ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, "Qism al-Sadaqat", vol. 6.p. 156:725.

৩১ ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভের জন্য দেখুন, Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarith* (1963). আরো দেখুন, M. Anas Zarqa, "Islamic Distributive Schemes", in Munawar Iqbal (1986), pp. 179-80; আয় ও সম্পদ বন্টন উত্তরাধিকার ব্যবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে আরো দেখুন, Kenneth E. Boulding, *A Preface to Grants Economics* (1973).

৩২ দেখুন, M. U. Chapra, *Towards a Just Monetary System* (1985), pp. 110 and 140. আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য আর্থিক পুনর্গঠন অধ্যায় দেখুন।

অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন

সম্পদের স্বল্পতা ও সামাজিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণে 'মাকাসিদ' অর্জিত নাও হতে পারে। এজন্য ভোগ এমনভাবে কমাতে হবে, যাতে চাহিদার পরিপূরণ এবং সঞ্চয় ও মূলধন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সম্প্রসারণ ঘটে। এজন্য অর্থনীতির কাঠামো, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতির পুনর্গঠন প্রয়োজন, যাতে 'মাকাসিদ' অর্জনে সম্পদের যে সকল ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই, সে সকল ব্যবহারে সম্পদের সরবরাহ যেন না হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে এরূপ পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে উদারীকরণ দ্বারা এরকম পুনর্গঠন সাধন করা কখনই সম্ভব নয়। ইসলামী জীবন পদ্ধতির সকল উপাদানের সম্মিলিত অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল এ পুনর্গঠন সম্ভব। এরূপ পুনর্গঠনের জন্য কতিপয় সংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তন: দ্বৈত ছাঁকনির ব্যবস্থা

সঞ্চয় ও মূলধন সৃষ্টির জন্য ভোগ সংকুচিত করার উদ্দেশ্য দ্বৈত সমস্যার সৃষ্টি করে। ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্যের দ্ব্যর্থহীন দাবি হচ্ছে, সামগ্রিক ভোগ এমনভাবে কমাতে হবে, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং তা যেন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। সীমিত সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যদি সকলের চাহিদা পূরণ করার সাথে যুগপৎভাবে মূলধন গঠন করতে হয়, তবে সমাজ যতটুকু বহন করতে পারে কেবল ততটুকু ভোগ সীমিত করা সমীচীন। বিশেষ করে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রচলিত জীবনযাপন পদ্ধতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ন্যায় ভোগকে ব্যক্তি জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হওয়াকে অনুমোদন করা যাবে না।

কয়েক দশক ধরে মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের ভোগ পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের ভোগসংস্কৃতির হুবহু অনুকরণ করে চলেছে, যেখানে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও ভোগের পৌনঃপুনিকতা দিয়ে কোনো ব্যক্তির গুরুত্ব পরিমাপ করা হয়। ফলে যে ধরনের বিলাসবহুল জীবনযাপন পদ্ধতি দরিদ্র মুসলিম দেশে মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেরূপ বিলাসী জীবনযাপন অনেক শিল্পোন্নত ধনী দেশেও সম্ভব নয়। এ ধরনের জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত অনৈসলামিক প্রথা ও অনুষ্ঠানাদি পূর্বোক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে অবাস্তব ভোগ প্রবণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা তাদের মূল্যবোধ এবং সামর্থ্যের নিরিখে কাম্য নয়। এই প্রতিযোগিতায় আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অবাস্তব সামর্থ্যের বাইরে জীবনযাপনের

ফলে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করার জন্য দুর্নীতি ও অনৈতিক পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এতে সামগ্রিক ভোগ বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয় পিছিয়ে পড়ে ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ভিত্তিতে মূলধন গঠন অপর্যাপ্ত থেকে যায়। অধিকন্তু প্রায় সকল বিলাস দ্রব্য ও সেবা বিদেশ থেকে আমদানি হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। সম্পদের এ ঘাটতি বৈদেশিক ঋণ দ্বারা পূরণ করতে হয়, যা থেকে উচ্চহারে ঋণভার সৃষ্টি হয় এবং এতে ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ আরো সীমিত হয়ে পড়ে।

নৈতিক ছাঁকনির প্রয়োজনীয়তা

সম্পদের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা থেকে প্রয়োজনীয় চাহিদা পৃথক করার মধ্যে কিভাবে সকলকে অপ্রয়োজনীয় চাহিদা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তার মধ্যেই সমস্যার মূল নিহিত আছে। এজন্য একটি ছাঁকনি কৌশল ও উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি অত্যাবশ্যক।[১]

বস্তুবাদী পরিবেশে মূল্যব্যবস্থা সম্পদের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা ছাঁটাই করতে একদিকে যেমন কার্যকরী নয়, অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ উদ্বুদ্ধকরণেও সক্ষম নয়। যদিও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা সৃষ্টি ও ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে মূল্যব্যবস্থার ব্যবহার অপরিহার্য, কিন্তু ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, বিশেষ করে যে অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার পূর্বশর্ত অনুপস্থিত থাকে। মূল্যব্যবস্থার অধীনে কর, শুল্ক ও মুদ্রামান হ্রাস দ্বারা বিলাস সামগ্রীর মূল্য যতই বাড়ানো হোক না কেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত বিলাসসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হবে। যদি কোনো পরিবারের এসব সামগ্রী থাকে তবে অন্য পরিবার সেগুলোকে অপরিহার্য। বিবেচনা করবে। যারা এসব বিলাসদ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম নয়, তারাও সমানভাবে চলার জন্য সেসব দ্রব্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং এজন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মুলতবী রাখে বা দুর্নীতি ও নৈতিকতা বর্জিত পন্থার আশ্রয় নেয়। উন্নয়নশীল দেশের অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ন কর প্রশাসনের কারণে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য কম দেখানোর (under invoicing) এবং ঘুষ বা চোরাচালানের সাহায্যে উচ্চ শুল্ক বা কর ফাঁকি দেয়া সম্ভব। কিন্তু শুল্ক ও করের ফলে সৃষ্ট উচ্চ মূল্য থেকে উচ্চ মুনাফার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিই কেবল বৃদ্ধি পায় না, বরং এসব বিলাসসামগ্রীর দেশীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মর্যাদার প্রতীকরূপী বিলাসসামগ্রীর দিকে সম্পদের প্রবাহ পরিবর্তিত হয় এবং প্রকৃত চাহিদা পূরণে সম্পদের যোগান হ্রাস পায়। ফলে প্রকৃত চাহিদা পূরণকারী সামগ্রীর মূল্য যা হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়।

এর অর্থ এ নয় যে, মূল্য পদ্ধতির প্রয়োগে আনীত শৃঙ্খলা পরিহার করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো অপ্রয়োজনীয় ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবলমাত্র মূল্য পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। এজন্য নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে অপর একটি

বাছাই পদ্ধতি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা ভোক্তার অগ্রাধিকার তালিকায় পরিবর্তন এনে প্রচলিত মূল্য পদ্ধতিকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি এমন হবে যেন ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে বাজারে প্রভাব বিস্তারের আগেই একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাহিদা বিলোপ করা সম্ভব হবে। তখন সম্পদের সামগ্রিক সরবরাহ ও সামগ্রিক চাহিদার মধ্যে তুলনামূলক নিম্নতর সাধারণ মূল্যস্তরে এক নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যবস্থা প্রকৃত চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করবে।

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে নৈতিক ছাঁকনি বা বাছাই পদ্ধতি ও ভোক্তার স্বাধীনতা না থাকায় সম্পদের বরাদ্দ পলিটব্যুরোর সদস্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের খেয়ালখুশি ও কায়েমী স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অধিকন্তু বাজার পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যব্যবস্থার অনুপস্থিতির ফলে সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের সেকুলার প্রণোদনা দূরীভূত হয়ে যায়। বর্তমানের বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তি মালিকানাসহ বাস্তবভিত্তিক মূল্য পদ্ধতি ও ভোক্তার স্বাধীনতা প্রবর্তন করলেও নৈতিক ছাঁকনি বা বাছাই পদ্ধতি ও উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সম্পদের প্রবাহ ও মূল্য কাঠামো এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যাকে কিছুতেই পুঁজিবাদের চেয়ে উত্তম বলা সম্ভব নয়।

তিন প্রকার শ্রেণীবিন্যাস

যতদিন মুসলিম দেশসমূহ পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে, ততদিন তারা অগুরুত্বপূর্ণ খাতে সম্পদের ব্যবহার প্রতিহত করতে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে বেশি সফল হবে না। প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সম্পদ সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও মাকাসিদ অর্জন করা কঠিন হবে। মুসলিম দেশসমূহের কর্তব্য হবে অপ্রয়োজনীয় থেকে প্রয়োজনীয় চাহিদা পৃথক করা এবং এ লক্ষ্যে সকল সামগ্রী ও সেবাকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা, যা হলো প্রকৃত চাহিদা, বিলাসসামগ্রী এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সামগ্রী। প্রকৃত চাহিদা (মৌলিক প্রয়োজন ও আয়েশের ব্যবস্থাসহ) বলতে এমন সকল দ্রব্য ও সেবাকে বুঝাবে, যা প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করে ও কষ্ট হ্রাস করে এবং মানবকল্যাণের বাস্তব অর্থ প্রকাশ করে। বিলাসসামগ্রী বলতে ঐ সকল দ্রব্য ও সেবাকে বুঝাবে যেগুলো, প্রধানত তাদের সৌখিন প্রকৃতির জন্য প্রত্যাশা করা যায় এবং যা ব্যক্তির কল্যাণের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। মাধ্যমিক পর্যায়ের সামগ্রী বলতে ঐ সকল দ্রব্য ও সেবাকে বুঝাবে, যেগুলোকে প্রকৃত চাহিদা অথবা বিলাসসামগ্রী হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এখানে কিছুটা নমনীয়তা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামী মূলবোধের ভিত্তিতে দ্রব্য ও সেবার এরকম শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব। ফিকাহ শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় (জরুরিয়াত), সুবিধাজনক (হাজিয়াত) ও আরামপ্রদ (তাহসিনিয়াত) দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফকীহগণের

বিশ্লেষিত উপযুক্ত সকল শ্রেণীই আমাদের আলোচনায় প্রকৃত চাহিদার পর্যায়ভুক্ত; এগুলোকে বিলাসসামগ্রী বা মর্যাদার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা যায় না। ফকীহগণের দৃষ্টিতে যা কিছু প্রকৃত প্রয়োজন নয় তাই অমিতব্যয়িতা ও অমিতাচার এবং সেগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[২] ফিকাহশাস্ত্রের এ বিশ্লেষণ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, যাতে মুসলিম দেশসমূহ বিরাজমান ভারসাম্যহীনতা দূরীভূত করে 'মাকাসিদ' হাসিল করতে সক্ষম হয়।

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলাম সংসার ত্যাগের ধর্ম নয় এবং দ্রব্য ও সামগ্রীর পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্তকরণ অপরিবর্তনীয় থাকার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিকে তার প্রকৃত চাহিদা পূরণ করার, এমনকি তার দক্ষতা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে এমন সকল আরামপ্রদ সামগ্রীও ইসলাম অনুমোদন করে। যেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর পূর্বোক্ত ৩টি শ্রেণীবিন্যাস একটি মুসলিম দেশের সম্পদ ও জীবনযাপনের সাধারণ মান অনুসারেই নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি, সেহেতু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাপনের সাধারণ মানের উন্নতির সাথে সাথে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যেতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক মুসলিম সমাজের তুলনায় বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ অধিক সম্পদের অধিকারী এবং উন্নততর জীবনযাপনের মান অর্জনে সক্ষম। অবশ্য এক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ অবশ্যই পূরণ করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না, যদি ব্যক্তিগণের সামাজিক মর্যাদা ও আয়ের পার্থক্য অনুযায়ী ভোগের পার্থক্যকে দেশের সম্পদের সামর্থ্য অতিক্রম করে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারা না যায়। তাদের বিলাসী চালচলন প্রদর্শন করা ও সামাজিক ব্যবধানকে ব্যাপক করে তোলা সমীচীন হবে না। তা ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শিথিল করা ছাড়া আর কিছুই করবে না। মুসলিম সমাজে একঘেঁয়ে ও শ্রেণীহীন সমতা প্রতিষ্ঠা করা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা সৃজনশীলতা ও বৈচিত্র্যের পাশাপাশি জীবনযাপনের আড়ম্বরহীনতা আনয়ন করাও সম্ভব। সুতরাং পূর্বোক্ত তিন প্রকার শ্রেণীর বিন্যাস সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ইনসাফের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামী ভোগ পদ্ধতির নিরিখে নির্ধারিত হওয়া উচিত। যখন বিরাজমান ভারসাম্যহীনতা সহনীয় সীমা অতিক্রম কওে, তখনই ঐ ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ ও অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রকৃত চাহিদাপূরণ সহজীকরণ

পূর্বে আলোচিত তিনটি শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যেই উদারীকরণকে ব্যাখ্যা করা যায়। যে সকল দ্রব্য ও সেবা প্রকৃত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর উৎপাদন, আমদানি ও বন্টন সহজীকরণ করা উচিত। বাজার শক্তিকে তার গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার সুযোগ দিতে হবে। সরকারের উচিত এ শ্রেণীভুক্ত দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভব সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টি করা ও প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করা। এ সকল দ্রব্য ও সেবার উপর যদি কোনো পরোক্ষ কর আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন হয়,

তবে সে ক্ষেত্রে নিম্নহারে ও ঐ দ্রব্য বা সেবার গুরুত্বের বিপরীত হারে (in the reverse order of priority) করা উচিত। নৈতিক প্রচারণা ও তুলনামূলক উচ্চ শুল্ক ও কর দ্বারা মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।

যাইহোক, বিলাসসামগ্রীর পর্যায়ভুক্ত ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয় এরকম দ্রব্য ও সেবার ব্যবহারকে উদারীকরণ করা জরুরি নয়। অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটায় তা নিশ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থার প্রয়োজন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র মূল্য পদ্ধতি এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। নৈতিক সংশোধনের মাধ্যমে ভোক্তার অগ্রাধিকার তালিকায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যদি জনসাধারণ তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও স্রষ্টার সামনে জবাবদিহিতার বিষয়টি বুঝতে পারে, যদি তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, দেশের সীমিত সম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে অন্য লোকেরা তাদের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বঞ্চিত হবে, তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করে দেবে। অবশ্য যখন কোনো ভোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকার ফলে সমাজের মানসিক কাঠামোর অংশে পরিণত হয়, তখন এমনকি নৈতিক প্রণোদনাও অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হতে পারে। এজন্য সমাজের মানবিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। একক ব্যক্তি স্রোতের গতি পরিবর্তন করতে পারে না, বরং তাল মিলাতে বাধ্য হয়।

সুতরাং, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির বৃহত্তর স্বার্থে সরল জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালানো এবং সাথে সাথে এ জাতীয় দ্রব্য ও সেবা, যেমন বিলাসদ্রব্যের আমদানি, আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান, যৌতুক এবং সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনী সরকারি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ইসলামী মূল্যবোধ পুরোপুরি আত্মস্ত হয়ে ওঠেনি এবং ভারসাম্যহীনতা একটি কঠিন সমস্যা হিসেবে বিরাজমান থাকে। ব্যক্তি যেই হোন না কেন, তিনি যত ধনী বা ক্ষমতাধরই হোন না কেন, তার উপর নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করার মধ্যে এক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত। একটি ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম থেকে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ঢল নামতে পারে। এভাবে সম্পদের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা নির্মূল করার ফলে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মুদ্রার বিনিময় হার ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে এ পদ্ধতি সাহায্য করবে। এমনকি মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলো যদি মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ অসংগতিপূর্ণ বিলাসী জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রথমেই আঘাত হানতে না পারে, তবে দুর্নীতি হ্রাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি প্রায়শই মানুষকে অবৈধ উপার্জনের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য করে। যখন তারা উপলব্ধি করবে যে, ব্যয়বহুল ভোগ বিলাসের মাধ্যমে নাম কেনার চেষ্টা তাদের সুনাম বিনষ্ট করবে এবং তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হবে, তখন লোকের অধিক উপার্জনের প্রবৃত্তি ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

সরকারি অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন

অপচয়ে লাগাম দেয়া

নিঃসন্দেহে সরল জীবনযাপন বেসরকারি খাতে সম্পদের উপর চাপ কমাবে এবং বিনিয়োগ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে। তবে এটুকুই পর্যাপ্ত নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় মুসলিম দেশের সরকারসমূহও সম্পদের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের চেয়ে অধিক না হলেও বেসরকারি খাতের অনুরূপ নিন্দনীয়। তারা তাদের সরকারি অর্থায়নের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে এবং ঘাটতি বাজেটের অসুস্থ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। মুদ্রা সম্প্রসারণ এবং অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ দ্বারা এ অতিরিক্ত ঘাটতি অর্থায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে তুলনামূলক উচ্চহারে মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণভার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের এ দুর্দশা দীর্ঘদিন ধরে চলবে।[৩]

ব্যয়ের অগ্রাধিকারসমূহ

মাত্রাতিরিক্ত সরকারি খরচ সত্ত্বেও সরকারসমূহ একদিকে যেমন ভারসাম্যপূর্ণ ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারেনি, তেমনি মাকাসিদ হাসিলের জন্য অপরিহার্য সেবার পর্যাপ্ত সরবরাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। সংখ্যাগুরু জনসাধারণের কল্যাণ যার উপর নির্ভর করে; সেই গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবাও অবহেলিত। সরকারি বাজেটে গুরুত্ব লাভ করা সত্ত্বেও মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তা ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল। চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি এবং সকল স্তরের জনসাধারণের নিকট সমানভাবে শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। স্বাস্থ্যখাতের ব্যয় প্রধানত বড় বড় শহরে, বৃহদায়তন মূলধন-নিবিড় হাসপাতালে ও নিরাময় চিকিৎসা কার্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গ্রামাঞ্চলে বাস করে, যাদের জন্য প্রয়োজন সাধারণ ক্লিনিক, প্যারামেডিক ডাক্তার, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃ সুবিধা ও অপুষ্টি দূর করা।[৪] এদিকে কোনো গুরুত্বই দেয়া হয়নি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের বিষয়টি সরকারি খাতের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়নি বললেই চলে এবং নাগরিক সুবিধাদি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছাড়াই ব্যাঙের ছাতার মতো বস্তি গজিয়ে উঠেছে। সুদক্ষ গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে যাদের নিজস্ব যানবাহন নেই, সেই সব দরিদ্র লোকেরা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে চলেছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম ও তার আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সর্বদাই ফাঁকা বুলি আওড়ানো হয়েছে। এ বেদনাদায়ক অবস্থার ফলে ধীর প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য স্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং সামাজিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মুসলিম সরকারগুলোর জন্য তাদের ব্যয় বরাদ্দ

এমনভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন, যাতে তাদের মোট খরচই শুধু হ্রাস পাবে না, বরং ঐ সকল প্রকল্পে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে, যা তাদেরকে ত্বরিত উন্নয়ন ও মাকাসিদ হাসিলে সাহায্য করবে।

কতিপয় কারণে সরকারগুলো তাদের সীমিত সম্পদ অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহারের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্যোগী হয়নি। যেমন– প্রথমত, তাদের নিকট ন্যস্ত সম্পদসমূহ যে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত-এ বিষয়ে উপলব্ধির অভাব রয়েছে। এ ব্যর্থতার সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যয়বহুল জীবনযাপন সংযুক্ত হয়ে দুর্নীতির জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমাজের নৈতিক সংশোধনসহ জীবন পদ্ধতির পুনর্গঠন ত্রুটি নিরসন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দেশের নিজস্ব সম্পদ ও মূল্যবোধের সাথে সংবেদনশীল দেশজ উন্নয়ন দর্শনের অভাবের ফলে স্থায়ী অগ্রাধিকারের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্পদের অপ্রয়োজনীয় থেকে প্রয়োজনীয় এবং অপচয় থেকে গণউৎপাদনমুখী ব্যবহার বাছাই করার স্বীকৃত মানদণ্ড স্থাপন করা সম্ভব নয়। ইসলামী উন্নয়ন দর্শনের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকার ব্যতীত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

তৃতীয়ত, সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'মূল্য' ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় না এবং সম্পদ, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা সুযোগ পরিব্যয়ের (opportunity cost) চেয়ে কম মূল্যে অর্জন ও বিক্রয় করা হয়। এ ব্যবস্থা সম্পদের অদক্ষ ব্যবহারের কারণ হয়।

চতুর্থত, নির্বাচিত সরকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাবে জনগণ সরকারের সমালোচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। জনগণের নিকট দায়বদ্ধ বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ব্যয়ের নীতিমালা

ইসলামী মূল্যবোধ ও মাকাসিদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্বোক্ত চারটি ক্ষেত্রেই সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে মাকাসিদের প্রতি অঙ্গীকার প্রণয়নের মানদণ্ড দিয়ে প্রচলিত সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। মুসলিম আইনবেত্তাগণ বহু শতাব্দী ধরে ইসলামী আইনশাস্ত্রেরই একটি যৌক্তিক ও সুবিন্যস্ত ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যে যে আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, তা থেকে সঞ্চয়িত ছয়টি ব্যাপকভিত্তিক নীতির প্রতি অবিচল থাকলে 'মাকাসিদ'কে আরো দৃঢ় করা সম্ভব হবে।[৫] আইন সূত্রগুলো হলো ঃ

১. জনগণের কল্যাণই সকল ব্যয় বরাদ্দের মূল নির্ণায়ক হবে (ধারা ঃ ৫৮)।
২. কষ্ট ও ক্ষতি লাঘব করা আরামপ্রদ ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য পাবে (ধারা ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩০, ৩১ ও ৩২)।

৩. সংখ্যালঘিষ্ঠের সংকীর্ণ স্বার্থের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের বৃহত্তর স্বার্থ প্রাধান্য পাবে (ধারা ঃ ২৮)।
৪. জনসাধারণের ত্যাগ বা ক্ষতি এড়ানোর জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগ বা ক্ষতি আরোপ করা এবং বৃহত্তর ত্যাগ বা ক্ষতি নিবারণের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষতি আরোপ করা যায় (ধারা ঃ ২৬, ২৭ ও ২৮)।
৫. যে কল্যাণ লাভ করে সে অবশ্যই ব্যয় বহন করবে (ধারা ঃ ৮৭ ও ৮৮)।
৬. যা ব্যতীত কোনো দায় পূরণ করা যায় না সেটিও দায় বলে গণ্য হবে।[৬]

মুসলিম দেশসমূহে করারোপ ও সরকারি ব্যয়ের সাথে পূর্বোক্ত নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। সরকারি ব্যয় কর্মসূচির উপর এগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত বিবেচনায় আনা সহায়ক হতে পারে।

যেহেতু এক নম্বর সূত্র অনুযায়ী সকল সরকারি ব্যয় বরাদ্দের আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ কল্যাণ সাধন, সেহেতু সূত্র ছয় অনুযায়ী ত্বরিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণ দ্বারা পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সক্ষম, সে সকল বস্তুগত ও সামাজিক অবকাঠামো প্রকল্প অপরাপর প্রকল্পের উপর প্রাধান্য পাবে, যেগুলো অনুরূপ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখে না। এমনকি অপরিহার্য অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের মধ্যে সূত্র দুই এর দাবি হলো, সেই প্রকল্পগুলোর উপর প্রাধান্য দেয়া, যা পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, গৃহহীনতা, মহামারী ও চিকিৎসা সেবা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব করতে সাহায্য করে। একইভাবে একটি সুদক্ষ গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সূত্র তিন মোতাবেক প্রাধান্য পাবে, কারণ এর অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নগরবাসীর কষ্ট হয় এবং দক্ষতা ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং মোটর গাড়ি ও পেট্রোলের অতিরিক্ত আমদানি দরকার হয়ে পড়ে। আবার মোটর গাড়ি সীমিত সংখ্যক উপশহরবাসীর অতিরিক্ত আয়েশ বৃদ্ধি করে। যদি এর আমদানি হ্রাস করে এ বাবদ সঞ্চয়কে গণপরিবহনের যানবাহন আমদানিতে সঞ্চালন করা হয়, তবে তা সূত্র চার অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপই কেবল হ্রাস করবে না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আরামদায়ক পরিবহন সেবা প্রদান করবে এবং যানজট ও পরিবেশ দূষণ কমে যাবে। যদি সূত্র তিন মোতাবেক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তবে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে কম গুরুত্ব প্রদানের কোনো ভিত্তি নেই। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং পল্লী সমাজ ও পরিবার থেকে জনশক্তির ব্যাপক স্থানান্তর আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে, সেহেতু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থান সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন এবং পল্লীবাসীর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। এতে স্বাভাবিকভাবেই যানজট ও সেবাসমূহের উপর চাপ হ্রাসের মাধ্যমে নগর জীবনের উন্নয়ন ঘটবে।

যদি আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করতে হয়, তবে উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহের অর্থ সরবরাহে ব্যাপক ও অধিক সুবিধাজনক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জনক্ষমতা বৃদ্ধি করা সূত্র ছয় অনুযায়ী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর দাবি হচ্ছে, সরকারি ব্যয় কর্মসূচিতে পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন অগ্রাধিকার পাবে, যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন সকল নাগরিকের এতে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এছাড়া অর্থব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন, যাতে পল্লী ও শহরাঞ্চলের সকল ধরনের ও শ্রেণীর উদ্যোক্তাগণ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ পায়।

কোথায় সংকোচন করতে হবে

বর্তমান বাজেট ঘাটতির অসুস্থ অবস্থায় 'মাকাসিদ' হাসিল করা সম্ভব নয়, যদি না পূর্বালোচিত অগ্রাধিকার-সূত্র মোতাবেক সম্পদের পুনঃবরাদ্দ করার সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস করা হয়। সুতরাং কোথায় কোথায় খরচ কমানো যায়, এ বিষয়ে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরূপ ব্যয় হ্রাস করা না হলে, হয় মাকাসিদ হাসিলের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে অথবা প্রত্যেক খাতে ব্যয়প্রাপ্ত সম্পদের সীমা অতিক্রম করে যাবে এবং সামাজিক অর্থনীতি ও বহিঃভারসাম্য অধিকতর সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। এখন প্রশ্ন হলো, কোথায় খরচ কমানো সম্ভব? তাই এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বাছাই করতে হবে যেখানে সঞ্চয় বাড়ানোর সুযোগ আছে।

দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপচয়

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সঞ্চয় অর্জনের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক সুস্পষ্ট পথ হলো, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপচয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা। কারণ সরকারের সীমিত সম্পদ দক্ষতার সাথে ব্যবহারের ক্ষমতাকে এগুলো সাংঘাতিকভাবে ক্ষয় করে দিচ্ছে। ১৯৫৫ সালে তিবর মেনডে লিখেছেন যে, 'সম্ভবত দুর্নীতি অপেক্ষা অন্য কোনো লক্ষণ পাকিস্তানী জনসাধারণকে অধিক হতাশ করে নাই'। অবৈধ কার্যকলাপ এতদূর গেছে যে, 'এর ফলে নতুন অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ যে কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারত, তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়'।[৭] দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকর কোনো ব্যবস্থার অনুপস্থিতি অব্যাহত দুর্নীতি বৃদ্ধি থেকে এমনভাবে প্রতিভাত হয় যে, মেনডে একথা লেখার দুই দশকেরও অধিক পরে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান জোর দিয়ে বলতে বাধ্য হন, 'উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগ আত্মসাৎ হয়ে যায়'। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দেন তা হলো, নির্মাণের কয়েক বছর পরই ত্রুটিপূর্ণ ভবন ধসে পড়ে, একটিমাত্র বর্ষাতেই রাস্তা ধুয়ে যায়, ব্যবহার করার আগেই আমদানিকৃত রেলওয়ে যন্ত্রপাতি লোহালক্কড়ে পরিণত হয়; আমদানিকৃত দ্রব্য পাকিস্তানে পৌঁছার আগেই অন্যত্র বিক্রি হয়ে যায় এবং জাতীয়করণকৃত ব্যাংক কর্তৃক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের নামে প্রদত্ত ঋণ মওকুফ করা হয়।[৮] এ ধরনের ব্যাপক দুর্নীতি কেবলমাত্র পাকিস্তানেই নয়, বরং সকল

মুসলিম দেশেই বিরাজমান, যদিও ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক। যাইহোক, নৈতিক সংশোধন, জীবনযাপন পদ্ধতির পরিমার্জন ও অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া দুর্নীতি হ্রাসের কোনো প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

ভর্তুকি

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয়ের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো ভর্তুকি। যদিও দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, তথাপি মুসলিম সরকারসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত বহু ভর্তুকি (তা সরাসরি হোক বা রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হোক এবং তা স্বচ্ছ হোক বা অস্বচ্ছ হোক) জোরালোভাবে সমর্থন করা যায় না। সাধারণত ইনসাফ বা অর্থনৈতিক বিবেচনায় ভর্তুকি সমর্থন করা হয়। কিন্তু মাকাসিদ হাসিলের লক্ষ্যে এবং পূর্ববর্ণিত সরকারি ব্যয়ের সূত্রসমূহের মানদণ্ডে– এ দুটো কারণের কোনোটির জন্যই ভর্তুকি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না।

যদি ইনসাফ ভর্তুকির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভর্তুকি দ্বারা প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয় পুনর্বণ্টন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ভর্তুকি দ্বারা হ্রাসকৃত মূল্যে (যা সূত্র-পাঁচ অনুযায়ী উৎপাদন খরচ বহন করে) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় ধনীদের বেশি উপকার হয়। কারণ তাদের ভোগের পরিমাণ ও ক্ষমতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় অধিক।[৯] আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ কোনো ব্যবস্থায় এটি সমর্থনযোগ্য নয়। মূল্যবোধ যদি অভিশাপ না হয়, তবে ধনী ব্যক্তি, যাদের মূল্য পরিশোধের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্য বা ভর্তুকির কোনো যৌক্তিকতা নেই। যারা বাস্তবসম্মত মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম, কেবলমাত্র তাদেরকেই সাহায্য করা উচিত। যেহেতু প্রভেদমূলক মূল্য পদ্ধতি (price discrimination) প্রশাসনিকভাবে জটিল এবং এটাই কাম্য যে, প্রত্যেকেই বাস্তবসম্মত মূল্য পরিশোধ করুক, সেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার উত্তম পদ্ধতি হলো, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত তহবিল অথবা সমাজকল্যাণ সংস্থা, যাকাত তহবিল, অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক বা বাধ্যতামূলক দান থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃত্তি, ত্রাণ ও আয় পরিপূরক সাহায্য প্রদান করা। এভাবে সাধারণ ভর্তুকি বাবদ মোট ব্যয়ের মাত্র একটি অংশ দ্বারা সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিক হারে ত্রাণ সাহায্য দিতে সক্ষম হবে। আয় পরিপূরক সাহায্য দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পছন্দ মতো চাহিদার অগ্রাধিকার নিরূপণের সুযোগ দেবে এবং সাধারণ ভর্তুকির ফলে দ্রব্য ও সেবার যে অপচয় হয়, তা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে বাস্তবসম্মত মূল্য সাহায্য করবে।

দক্ষতাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভর্তুকি দ্বারা মাকাসিদ হাসিলে উদ্দীপনা শক্তিশালী হওয়া ও সম্পদের বরাদ্দ অধিকতর কার্যকরভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। কৃষিতে ভর্তুকি প্রধানত বৃহৎ কৃষকদেরকে সাহায্য করে, 'যারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ ভোগ করে এবং অন্য সম্পদের পাহাড় গড়তে তা কাজে লাগায়'।[১০]

শিশু শিল্প বিবেচনায় বৃহদায়তন শহরে শিল্পে যে ভর্তুকি দেয়া হয়, তা খুব কম সময়েই 'নাবালকত্ব' অতিক্রম করতে উৎসাহিত করে। অবশ্যই ভর্তুকি যদি ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক উদ্যোক্তাগণকে উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণ প্রয়োগে এবং তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে, তাহলে 'মাকাসিদ' এর ভিত্তিতে তাকে বিবেচনাপ্রসূত বলা যায়। কিন্তু গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহর ও গ্রামের অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় 'বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে অবিকশিত'।[১১] সুতরাং যেভাবে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী ভূস্বামীগণ উৎপাদকের ভর্তুকি পেয়ে থাকেন, সেভাবে দরিদ্র জনগণ কখনো পায় না। তথাপিও ভর্তুকির জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঠিকই করভার বহন করতে হয়, কারণ এসব দেশে সাধারণত পশ্চাৎমুখী (regressive) কর ব্যবস্থা চালু আছে।

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

সঞ্চয়ের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পর্যায়ক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা। 'সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদন (Performance) হতাশাব্যঞ্জক'।[১২] সরকারসমূহ যেভাবে প্রত্যাশা করেছিল সেভাবে শিল্পায়নকে দ্রুত এগিয়ে নিতে ও দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদের আর্থিক সাফল্যই শুধুমাত্র অনুল্লেখযোগ্য নয় বরং সামাজিক অবদানও নগণ্য। এর কারণ হচ্ছে, তারা কোনো প্রকার প্রতিযোগিতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছে। সরকারও দক্ষতার উপর নগণ্য গুরুত্ব দিয়েছে এবং দেউলিয়া হওয়ার কারণে শাস্তি প্রয়োগের উদাহরণও বিরল। নিম্ন মুনাফার ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে নিজস্ব অর্থায়ন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে প্রায়শই এ প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহৎ বাজেট ঘাটতি, মুদ্রা সম্প্রসারণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৬-৭৯ সালে ২৭টি উন্নয়নশীল দেশে অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে সরকারি বাজেট থেকে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) শতকরা তিন ভাগ।[১৩]

প্রতিরক্ষা

যেখানে ব্যাপক সঞ্চয় সম্ভব সে রকমের চতুর্থ ক্ষেত্র হলো প্রতিরক্ষা। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, 'উচ্চহারে সামরিক ব্যয়ের ফলে আর্থিক ও ঋণ সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতিশীলতা ও সমন্বয় জটিল রূপ ধারণ করেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে'।[১৪] মাকাসিদ কাঠামোর মধ্যে ও পূর্বালোচিত নীতিমালার আলোকে একথা বলা যায়, বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের ভীতিকর পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ প্রতিরক্ষার জন্য সংরক্ষিত রাখার কোনো যুক্তি নেই।[১৫] একথা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে, প্রতিরক্ষা ব্যয় কেবল আর্থিক ব্যয়ই নয়, বরং এর মাঝে অন্য ত্যাগও সংশ্লিষ্ট। এতে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ হ্রাস পায়। ফলে সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়।

কেবলমাত্র কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ঝুঁকির মধ্যে আছে। অন্য প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রই অবাস্তব অনুমানের উপর প্রতিরক্ষা বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। অধিকন্তু যদি সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়, দুর্নীতি দূর করা যায় (যা যে কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে সামরিক বাহিনীতে বেশি) এবং যদি সমঝোতার নীতি গ্রহণ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়ানো সম্ভব হয়, তবে স্বল্প খরচেই উত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব।

মুসলিম দেশসমূহে দারিদ্র্য ও চরম অসাম্য বিরাজমান এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও গণউপযোগের ব্যাপক অভাব রয়েছে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দুর্দশা ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মধ্যে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিপুল সম্পদ খরচ করার কোনো নৈতিক বা অর্থনৈতিক যুক্তি থাকতে পারে না। প্রতিরক্ষা ঝুঁকির অনুপস্থিতি সরকারসমূহকে তাদের নিজেদের ও ধনীদের নিকট থেকে প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও আর্থিক ত্যাগ দাবি করা থেকে বিরত রাখে। বিপরীত ক্ষেত্রে জীবনযাপন পদ্ধতিতেও সরকারি ব্যয়ে যথানিয়মে আনুপাতিক সমন্বয় সাধন করা হয় না এবং এভাবে মুদ্রাস্ফীতি সরকারি ব্যয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের প্রতি স্বল্প গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সামরিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার সম্পূর্ণই শহর ও গ্রামের দরিদ্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

সরকারসমূহ যেরূপ দাবি করে থাকে, সেরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা উচ্চ সামরিক ব্যয় দ্বারা বাস্তবে অর্জিত হয় না। দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শক্তিই হচ্ছে নিরাপত্তার প্রকৃত উৎস। নৈতিক সংশোধন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এটি অর্জন করা সম্ভব। মুসলিম দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার বিরুদ্ধে যে কোনো বিপুল অংকের সামরিক ব্যয় দ্বারা নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং জাতীয় ও ভৌগলিক অখণ্ডতার যে উদ্দেশ্যে সামরিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়, কখনও কখনও অত্যধিক সামরিক ব্যয়ের কারণেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পল কেনেডি যথার্থই বলেছেন, একটি জাতির জন্য সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী শক্ত অর্থনৈতিক ভিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর মৌলিক বিষয়। যে সকল জাতি তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের চেয়ে অধিক সামরিক কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব দেয়, তারা পতনের জন্য অপেক্ষা করছে।[১৬]

সুতরাং, বন্ধুত্ব স্থাপন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সাময়িক ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা মুসলিম দেশসমূহের সরকারি নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রকৃত চাহিদা পূরণে সম্পদের সম্প্রসারণ ঘটানো যায়। যদি এভাবে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করে,

তবে যে সকল প্রতিবেশী দেশ থেকে তারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধভীতি অনুভব করে, সেসব দেশের সামরিক ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে জনমতের চাপ সৃষ্টি হতে বাধ্য হবে। তখন সকল দেশই অধিক সমৃদ্ধ জীবনযাপনে সক্ষম হবে। সুদের উপর ইসলামের নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা মুসলিম দেশের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম দেশসমূহ বন্ধুত্ব স্থাপন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য। রাসূল (স) এর আদর্শ থেকেও তাদের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা উচিত, যিনি শান্তি ও নিরাপত্তার সময় লাভের উদ্দেশ্যে চরম প্রতিকূল শর্ত সত্ত্বেও মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

ন্যায়ানুগ ও সুদক্ষ করব্যবস্থা

কম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক নয় এমন প্রকল্পসমূহ বাতিল করা বা কমিয়ে আনার মাধ্যমে উন্নয়ন ও আর্থ-সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে। তবে এভাবে যে সম্পদ পাওয়া যাবে তা পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অন্য পন্থায়, বিশেষত করব্যবস্থার মাধ্যমে, সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন। মুসলিম দেশসমূহে করব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা দরকার, যাতে সরকার ন্যায়ানুগ ও সুদক্ষ পন্থায় পর্যাপ্ত রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

করারোপের অধিকার

সকল মতের বেশ কিছু ইসলামী আইনবেত্তাগণ 'যাকাত' ছাড়াও করারোপের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদ সংগ্রহের অধিকারকে সমর্থন করেছেন।[১৭] কারণ যাকাতের মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ প্রাথমিকভাবে দুঃস্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। কিন্তু বরাদ্দ, বণ্টন ও স্থিতিমূলক সকল দায়িত্ব কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের তহবিল সংগ্রহের অন্য উৎসও প্রয়োজন। আইনবেত্তাগণ রাসূল (স) এর নিম্নোক্ত উক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের এ অধিকার সমর্থন করেছেন। রাসূল (স) বলেছেন, "তোমাদের সম্পদে 'যাকাত' ছাড়াও আরো বাধ্যবাধকতা রয়েছে"।[১৮] ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইসলামী আইনের ৪ ও ৫ নং নীতিসূত্র দ্বারাও এ অধিকারকে সমর্থন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'বৃহত্তর ত্যাগ এড়ানোর লক্ষ্যে ক্ষুদ্রতর ত্যাগ আরোপ করা যায়'। আবু ইউসুফ জনগণের বহন ক্ষমতা অনুযায়ী শাসক কর্তৃক কর বৃদ্ধি বা হ্রাস করার অধিকার সমর্থন করেছেন।[১৯] মার্গিনানী বলেন, যদি রাষ্ট্রের সম্পদ পর্যাপ্ত না হয়, তবে জনস্বার্থে কাজ করার জন্য জনগণের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যদি এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ হয়, তবে এর ব্যয়ভার বহন করা জনগণেরই কর্তব্য।[২০]

অবশ্য যাকাত ছাড়া করারোপের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পদ সংগ্রহের অধিকার সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আইনবেত্তাগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। হাসান তুরাবীর মতে এ অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হচ্ছে, ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সময় ধরে মুসলিম দেশসমূহে অধিষ্ঠিত সরকারসমূহের 'প্রায় সবাই অবৈধ'।[২১] এ কারণে

আইনবেত্তাগণ আশংকা করেছিলেন যে, করারোপের অনুমতি দেয়া হলে তার অপব্যবহার হতে পারে এবং নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। অবশ্য এ মতকে অলঙ্ঘনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কারজাভী সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'সে সময় রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ছিল সীমিত'। যেহেতু কালের বিবর্তনে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে রাষ্ট্র কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে?[২২]

ন্যায়ানুগ করব্যবস্থার শর্তাবলী

যে সকল আইনবেত্তা কর আরোপকে সমর্থন করেছেন তাদের প্রতি সুবিচার করতে হলে একথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যে, তারা কেবলমাত্র ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি ন্যায়ানুগ করব্যবস্থার কথা বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে একটি করব্যবস্থা কেবলমাত্র তিনটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই ন্যায়ানুগ বিবেচিত হতে পারে। প্রথমত, লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় এমন কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য যখন করারোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, জনগণের বহন ক্ষমতার তুলনায় করভার অতিরিক্ত হবে না এবং কর প্রদানে সক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে করভার ন্যায়পরায়ণভাবে বণ্টিত হয়; এবং তৃতীয়ত, যে উদ্দেশ্যে কর আরোপ করা হয় কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই সুবিবেচনা সম্মতভাবে আদায়কৃত সম্পদ ব্যয় করা হয়। যে করব্যবস্থা উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ করে না, সেই করব্যবস্থাকে নিপীড়নমূলক ও সর্বসম্মতভাবে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলিফাই, বিশেষ করে হযরত ওমর, আলী ও ওমর-বিন আবদুল আজিজ সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা করারোপের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন যে, ন্যায়পরায়ণতা ও নমনীয়তার সাথে যেন কর আদায় করা হয়, জনগণের বহন ক্ষমতার অধিক পরিমাণ কর আরোপ করা না হয় এবং এর ফলে তারা যেন জীবনযাপনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বঞ্চিত না হয়।[২৩] আবু ইউসুফ বলেন, ন্যায়ানুগ করব্যবস্থা কেবল রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে না, বরং দেশকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে।[২৪] মাওয়ার্দি বলেন, ন্যায়ানুগ করব্যবস্থা করদাতা ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার উভয়ের প্রতিই সুবিচার করে, অর্থাৎ এটি এমন অবস্থা যখন অধিক করারোপ জনগণের অধিকারের বিবেচনায় অসম হয়, অন্য দিকে নিম্ন করারোপ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিবেচনায় অবিচারমূলক হয়।[২৫] ইবনে খলদুন তার সময়ের মুসলিম পণ্ডিতগণের কর আরোপ সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে একটি পত্রের উদ্ধৃতি দেন। পত্রটি তাহির ইবনে আল-হুসাইন তার পুত্রকে লেখেন, যিনি একটি প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল–

'সুতরাং, ন্যায়পরায়ণতা ও সুষমভাবে জনগণের মধ্যে কর আরোপ করো। কারো আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের জন্য এমনকি তোমার কর্মচারী, সভাসদবৃন্দ বা অনুসারীগণকেও কর থেকে অব্যাহতি দিও না, এবং সাধারণভাবে সকলের উপর

কর আরোপ করবে এবং কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর আরোপ করবে না'।[২৬]

সামাজিক ন্যায়বিচার ও আয়ের সুষম বণ্টন ব্যবস্থার আলোকে প্রগতিশীল কর পদ্ধতি ইসলামের উদ্দেশ্যের সাথে যথার্থভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।[২৭] যাইহোক, ন্যায়ানুগভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের করারোপের অধিকার কতটুকু, বর্তমানের এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি আইনশাস্ত্রবিদগণের পর্যালোচনার আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কারণ একথা বলা অযৌক্তিক হবে যে, বর্তমানকালেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে পুরাতন আইন শাস্ত্রবিদগণের আলোচিত কর ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অতীতের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং, এমন একটি কর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে, যা পরিবর্তিত বাস্তবতাকে বিবেচনায় এনে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উন্নয়নশীল ও সুদক্ষ আধুনিক অর্থনীতি ও মাকাসিদ হাসিলের প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক ও বস্তুগত অবকাঠামো নির্মাণ চাহিদার আলোকে এ নতুন কর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কর পদ্ধতি বিনির্মাণে একথা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে যে, এটি কেবলমাত্র সুষম হলেই চলবে না; বরং এর কর ব্যবস্থা একদিকে যেমন উপার্জন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করবে না, তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়দায়িত্ব কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা করবে।

করদাতাগণের দায়

মুসলিম দেশের করদাতাগণকে একথা মনে রাখতে হবে যে, কর প্রদানের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্র বা অন্য কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছে না। রাষ্ট্র যাতে তার কার্যাবলী যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হয়, সে লক্ষ্যে তারা তাদের কর্তব্য পালন করছে মাত্র। তাদেরকে অবশ্যই একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, রাষ্ট্রের নিকট তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সেবা লাভ করে থাকে, তার বিনিময়েই তারা কর প্রদান করে থাকে। যেমন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তা, সড়ক, নৌ ও বিমানবন্দর, পানি সরবরাহ, সড়ক পরিচ্ছন্নকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যবস্থা। পূর্বোল্লেখিত পাঁচ নম্বর সূত্র অনুযায়ী সরকারের উচিত এ সকল সেবা ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে 'সমহারে' মূল্য আদায়ের চেষ্টা করা। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে সকল সময় তা করা যায় না। সুতরাং, সরকারি সেবামূলক কাজের ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'কর প্রদানের সামর্থ্য' মোতাবেক আদায় করতে হয়। এক্ষেত্রে সমান্তরাল ও উল্লম্ব সাম্যের দাবি হচ্ছে, সমদেরকে সমভাবে ও অসমদেরকে অসমভাবে বিবেচনা করতে হবে।

যেহেতু কর হলো প্রধানত করদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত সেবার মূল্য, সুতরাং মুসলিম সমাজে কর এড়ানো কেবলমাত্র আইনগত অপরাধ নয়, বরং

আল্লাহ কর্তৃক পরকালে শাস্তিযোগ্য নৈতিক অপরাধ। এছাড়া করদাতাগণের এরূপ কর এড়ানোর ফলে কার্যকরভাবে কর্তব্য সম্পাদনে সরকারের ক্ষমতা যতখানি হ্রাস পায়, মাকাসিদ হাসিল ততখানিই বাধাগ্রস্ত হয়। একটি ইসলামী সমাজে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কী হতে পারে? কাজেই আইনবিশারদগণ যখন রাষ্ট্রকে কর আরোপের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হতে বলেছেন, তখন তারা জনগণকে তাদের কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন। এমনকি ইবনে তাইমিয়া অন্যায় কর পরিশোধ না করাকেও নিষিদ্ধ বলেছেন। কারণ কতিপয় করদাতা কর্তৃক কর পরিশোধ না করার ফলে অন্যদেরকে অন্যায়ভাবে অধিকতর গুরুভার বহন করতে হয়।[২৮]

সুতরাং, এটি পরিষ্কার যে করদাতা ও ইসলামী রাষ্ট্র উভয়ের প্রতিই ইসলাম কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একদিকে যখন কর প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্তব্য, তখন অন্যদিকে দুটি শর্ত পূরণ করা সরকারের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রথমত, সরকার কর্তৃক কররাজস্ব একটি আমানত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যে লক্ষ্যে কর আদায় করা হয়েছে সেই লক্ষ্যে ন্যায়ানুগ ও দক্ষতার স্বার্থে রাজস্ব ব্যয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যারা কর প্রদানে সক্ষম সরকারকে তাদের মধ্যে করভার সমানুপাতিক হারে বণ্টন করতে হবে। যে অবস্থায় করদাতা এ শর্তে নিশ্চিত না হয় যে তারা সরকারকে যে তহবিল প্রদান করছে তা মাকাসিদ হাসিলের জন্য সততা ও কার্যকারিতার সাথে ব্যয় করা হবে, সেই অবস্থায় করদাতাগণকে নৈতিক দায়িত্বের উপর যতই গুরুত্ব দেয়া হোক না কেন, তারা কর সংগ্রহে সরকারের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে বলে মনে করা যায় না।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত এ সকল শর্তাবলী পূরণ করে না। এখানে ব্যয়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ, এমনকি কর ব্যবস্থাও অদক্ষ, অন্যায্য ও দুর্নীতিপরায়ণ। এ অবস্থা সরকারের কর মারফত তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দেয়। নিশ্চিতই মুসলিম দেশসমূহে অধিক করারোপ করা হয়নি। তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা হার হিসেবে কররাজস্ব তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু তারা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই খারাপ কর পদ্ধতির মধ্যে আছে। তাদের কর রাজস্বের সামান্য অংশই প্রত্যক্ষ কর থেকে আসে। ফলে করব্যবস্থা হয়ে পড়েছে পশ্চাৎমুখী। কারণ প্রত্যক্ষ করদাতাদের সংখ্যা নগণ্য। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের কর অব্যাহতি ও রেয়াত। ফলে করভিত্তি সংকীর্ণ ও করব্যবস্থা অনমনীয় হয়ে পড়ে। জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় ও কালো টাকার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলাফল হচ্ছে অপচয় ও মূলধন পাচার। করভিত্তি, করহার, কর এড়ানো ও কালো টাকা হচ্ছে একই দুষ্ট চক্রের অংশ বিশেষ। করভিত্তি যত দুর্বল হবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য করহারও ততই অধিক হবে। আর করহার যত বেশি হবে, ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা ও কালো টাকা ততই বেশি হবে। এ

দুষ্ট চক্র কেবল উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার সৃষ্টি করে না; বরং নেতিবাচক পরোক্ষ করের প্রতি নির্ভরতাও বাড়িয়ে দেয়। এটি সবাই জানে, সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা বিপুল কর ফাঁকি দেয় এবং তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নগণ্য, কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বিপুল। এতে করব্যবস্থা পশ্চাৎমুখী পরোক্ষ করের প্রতি নির্ভর করতে বাধ্য হয়।'[২৯]

সুতরাং, করব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করা এবং এর নমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য এ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন প্রয়োজন। যদি করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয় কর মওকুফ ও রেয়াত বাতিল এবং করহার যুক্তিসংগত পর্যায়ে আনা না হয়, তবে এ ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা ব্যতীত জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করতে এবং কোষাগারে পর্যাপ্ত রাজস্ব প্রদানে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে না। ব্যাপকভাবে করভিত্তি সম্প্রসারণ ও ন্যায়পরায়ণ করদাতাগণের উপর করভার হ্রাস করে এ করব্যবস্থাকে সুবিচারমূলক করতে মুসলিম দেশগুলো যত শিগগির সংস্কার সাধন করতে পারবে, উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে তা ততই সহায়ক হবে। নিঃসন্দেহে এটি কঠিন কাজ, তবে যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে তাহলে অসম্ভব নয়।

সংযত ঘাটতি বাজেট

এতদসত্ত্বেও খরচের কর্মপরিকল্পনা ও করব্যবস্থা সংস্কারের বদলে মুসলিম দেশসমূহ সহজতম পন্থায় অর্থাৎ মুদ্রা সম্প্রসারণ ও ঋণ গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়েছে। এ পদ্ধতি এমন একটি অসংযত আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। এর ফলে তুলনামূলক উচ্চহারে মুদ্রাস্ফীতি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ ও দায় পরিশোধের ভার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এ পদ্ধতি নিজে নিজেই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, অধিকতর মুদ্রামান হ্রাস, অ-টেকসই লেনদেন ঘাটতি ও অধিক উচ্চহারে ঋণভার সৃষ্টি করে। ফলে এ অবস্থায় উন্নয়নের জন্য পুনরায় সম্পদের ঘাটতি সৃষ্টি হয়, প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়, বেকারত্ব ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

মুসলিম সরকারসমূহ ঋণ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রচলিত ধারণার একটি গ্রহণযোগ্য নীতি হলো, চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য নয়, মূলধন ব্যয় নির্বাহের জন্যই ঋণ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে এ সকল সরকার পূর্বোক্ত নীতিকে অগ্রাহ্য করে চলছে।[৩০] এমনকি তারা তাদের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্যও ঋণ গ্রহণ করে থাকে।[৩১] এটি কেবল সাংঘাতিক অব্যবস্থাই নয়, বরং ভাবী বংশধরদের প্রতিও চরম অবিচার, যারা ঋণভার বহন করতে বাধ্য হবে। ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ঋণ দ্বারা দূরীভূত হয় না, কেবল মুলতবি থাকে মাত্র। কিভাবে এটিকে ন্যায়বিচার বলা যায় বা নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় যে, বর্তমান প্রজন্ম তাদের চলতি অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের দায় পরবর্তী প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দেবে?[৩২]

ইসলামী পদ্ধতিতে ঘাটতি ব্যয়

সুদের অবলুপ্তি মুসলিম সরকারসমূহের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়, তা হলো তারা অবশ্যই তাদের ঋণ গ্রহণের পরিমাণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখবে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহে কঠোর শৃঙ্খলা আনয়ন করবে এবং সরকারের ব্যাপ্তি মাত্রাতিরিক্ত সম্প্রসারণ না করবে। সরকারসমূহ তাদের সকল চলতি ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় নির্বাহের জন্য অবশ্যই করের উপর নির্ভর করবে। এমনকি তাদের উন্নয়ন বাজেটের একটি অংশ বিশেষত ইসলামী নীতিমালার অধীনে বিকল্প অর্থায়ন হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তা করবে। ঋণ গ্রহণ ছাড়া ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য একাধিক পন্থায় তাদের প্রায় সকল যুক্তিসিদ্ধ প্রকল্পের অর্থায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে।[৩৩] সরকারি মান নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলো বেসরকারি খাতে অর্থায়ন বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকতর হারে লিজ দেয়া যেতে পারে। এতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কিস্তি ভিত্তিতে বাকিতে বা ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা সম্ভবপর হতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে সফল, কিন্তু যার ব্যবস্থাপনা যুক্তিসংগত কারণে বেসরকরি খাতে ন্যাস্ত করা উচিত নয়, এমন সব প্রকল্পে বেসরকারি খাতকে মূলধন বিনিয়োগে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এ পদ্ধতি অর্থায়নে শৃঙ্খলা আনয়ন করবে এবং সরকারসমূহকে সুদভিত্তিক সহজলভ্য ঋণ গ্রহণ পরিহারের পথে পরিচালিত করবে। দুঃসহ ঋণগ্রস্ত শ্বেতহস্তীরূপী প্রকল্পসমূহ ও অদক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যা অধিকাংশ মুসলিম দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এভাবে এড়ানো সম্ভবপর হতে পারে।

বেসরকারি হিতৈষী কর্মকাণ্ড

সরকারের আরো উচিত বেসরকারি হিতৈষীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বসতবাড়ি, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনা করতে উৎসাহ দেয়া। মুসলিম ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন কারণে ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা ও নড়বড়ে করনীতির কারণে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভূত সম্ভাবনা অব্যবহৃত রয়ে গেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থান সরকারের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থায়নের দায়কে উল্লেযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।[৩৪] ইতঃপূর্বে আলোচিত কর পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থানের পথের প্রধান বাধা দূর হবে। সরকার সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য অত্যন্ত সীমিত আকারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে তা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিতে পারে।[৩৫]

সরকারের ভূমিকার উপর প্রভাব

ঋণ গ্রহণ স্বল্পকালে যেরূপ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে, অর্থায়নের পূর্ববর্ণিত বিকল্প পদ্ধতিগুলোর কোনোটিই সেরূপ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করবে না। তাই সরকার কম সম্পদ দ্বারা অধিক কর্মসম্পাদনে বাধ্য হবে। তাদেরকে সকল প্রকল্পের উপযোগিতা ও ব্যয় সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে। সকল নতুন প্রকল্পের ব্যয় সর্বনিম্ন করতে হবে এবং বর্তমান সকল সুবিধা অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং, সরকারি অর্থব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা আনয়নে ও ঘাটতি বাজেট প্রক্রিয়া হ্রাসকরণে কঠোর প্রচেষ্টা গ্রহণ ব্যতীত মুসলিম সরকারসমূহের জন্য ইসলামীকরণের কথা বলা অবাস্তব।

সরকার অর্থব্যবস্থায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, সুদভিত্তিক অর্থায়নের উপর নিষেধাজ্ঞা আবশ্যিকভাবে সেই ভূমিকাকে সীমিত করে না। ব্যাপক করারোপ ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের উপর মূলত তাদের মাকাসিদ হাসিলের সাফল্য নির্ভর করে না। বরং সরকারি কার্যক্রমে অধিকতর সততা আনয়ন, ব্যয় ও প্রকল্প নির্বাচনে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করা, সরকারি খাতে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণে খরচ তুলে নেয়া পদ্ধতির প্রয়োগ এবং মাকাসিদ হাসিলের জন্য অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের উপর এর সাফল্য নির্ভর করে। অধিক কার্যকর ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা করা ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উপরেও সাফল্য নির্ভরশীল। প্রথমেই বড় ধরনের সংকোচন এড়ানোর জন্য সরকারসমূহ একবারে ঋণ গ্রহণ বন্ধ না করে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তবে ঋণ সংকোচনের লক্ষ্যে তাদের প্রত্যয় বার্ষিক বাজেটে ঘাটতি চূড়ান্তভাবে কমে আসার দ্বারা প্রতিফলিত হতে হবে। অবশ্য জরুরি অবস্থায় ফেরতযোগ্য কর (সুদবিহীন ঋণ) আদায় করা সম্ভব। যখন অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থায়ন সম্ভবপর হয় না তখন মুসলিম সরকারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ আইনগতভাবে অনুমোদিত।[৩৬]

মুসলিম দেশসমূহের বাজেট ঘাটতি হ্রাস করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ বৈদেশিক সাহায্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা সম্ভব নয়। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিম্ন এবং অন্তত মধ্যমেয়াদী সময়ে এ নিম্নহার অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বেকারত্বের হার বেশি থাকায় মুদ্রাস্ফীতি পুনরায় ভীতির সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তাদের বাজেট সীমাবদ্ধতা অব্যাহত থাকতে পারে এবং বৈদেশিক সাহায্যের ভাণ্ডার সম্প্রসারিত নাও হতে পারে। বস্তুতপক্ষে বৈদেশিক সাহায্য প্রকৃত মূল্যে সংকুচিত হয়েই পড়েছে।[৩৭] দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ভীতি কমে যাওয়ায় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে চলে যাওয়ায় মুসলিম দেশসমূহে সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস পেতে পারে। তৃতীয়ত, একথা মনে রাখা দরকার যে, সামান্য পরিমাণ অনুদান ব্যতীত প্রায় সকল সাহায্যই ঋণ।[৩৮] এমনকি, যদিও এ সকল ঋণ পরিশোধ করতে হয় রেয়াতি হারে, তবু

সুদসহ তা পরিশোধযোগ্য। এটি কেবল তখনই সমর্থনযোগ্য, যখন ঋণগ্রহীতা দেশের উৎপাদন ও ঋণভার পরিশোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত মূলধন গঠন ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহৃত হয় না। এ সাহায্য ব্যক্তিগত ভোগ, চলতি সরকারি ব্যয় ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়। [৩৯] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ অভিযোগ করে থাকেন যে, বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির হারে খুব সামান্যই অবদান রাখে, এমনকি তা নেতিবাচকও হতে পারে।[৪০] কারণ বৈদেশিক সাহায্য দাতা দেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প সংশ্লিষ্ট স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং সাধারণভাবে দূরবর্তী দারিদ্র্য দূরীকরণ তাদের উদ্দেশ্য নয়। আরো অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সাহায্য দেয়া হয় সামরিক ও অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে মদদ দেয়ার জন্য, যারা গরীবদের উপর জুলুম করে থাকে।[৪১] এমনকি বহুজাতিক সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোর অলিখিত অভিসন্ধির কথাও বলা হয়ে থাকে। দাতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসে, দরিদ্র দেশগুলোকে অধিকতর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখে এবং তাদের আর্থিক ক্ষমতাকে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থকে পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজে লাগায়।[৪৩]

এ অভিযোগের পেছনে যে সত্যই থাকুক না কেন, দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর সামনে কোনো বিকল্প নেই। তাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং বিশেষত তারা বর্তমানে যে পরিমাণ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা করছে, তার কারণে তাদের পক্ষে সাহায্য গ্রহণ পরিহার করা সম্ভব নয়। তবে তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বার্থে সাহায্যের উপর যতদূর সম্ভব কম নির্ভর করা উচিত এবং যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, তাকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা এবং নিজস্ব অর্থব্যবস্থায় প্রত্যাশিত কাঠামোগত সমন্বয় সাধন করা সমীচীন। যখন এ সমন্বয় সাধনের প্রত্যাশা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে, তখন কষ্টকর সমন্বয় এড়ানোর জন্য অথবা ব্যক্তিগত প্রদর্শনীমূলক ভোগ বা চলতি সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও প্রকৃত ভীতিজনক অবস্থা ব্যতীত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সাহায্য চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। নবী (স) এর হাদিস হচ্ছে, "নিচের হাত অপেক্ষা উপরের হাত উত্তম"। হাদিসটি ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে জাতীয় বিষয়ে অধিকতর প্রযোজ্য।[৪৪]

বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন

প্রতিবন্ধক অপসারণ

উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, প্রকৃত চাহিদা পূরণ করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। ইসলামী ভোগ পদ্ধতি বাস্তবায়নের

ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঞ্চয় আবশ্যিকভাবে মূলধন গঠন নাও করতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এমনকি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বর্তমান নিম্নহারে সংগঠিত সঞ্চয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে (যেমন স্বর্ণ, মূল্যবান রত্ন ও অলংকারাদি) ও মূলধন পাচারে পরিচালিত হয়।[৪৫] অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে মূলধন পাচার একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এগার বছরে মূলধন আমদানিকারক দেশসমূহের ২৫০ বিলিয়ন ডলার মূলধন বহির্গমনের মধ্যে প্রায় ১৫০-২০০ বিলিয়ন ডলার মূলধন পাচার হয়েছে।[৪৬] এরূপ বিপুল মূলধন বহির্গমনের ফলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনকে আরো কঠিন করে তোলে।

মুসলিম দেশসমূহে সঞ্চয় জমা করে রাখা ও মূলধন পাচার নিশ্চয়ই উৎপাদনশীল নিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহদানকারী মূল্যবোধের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্টি হয়নি। পূর্বোল্লিখিত ছয় নম্বর সূত্র অনুযায়ী মাকাসিদ হাসিলে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের একটি সামাজিক দায়িত্ব। উক্ত সূত্রে বলা হয়েছে, 'যা ছাড়া কোনো দায় সম্পাদন করা যায় না, তাও দায় হিসেবে গণ্য'।[৪৭] মহানবী (স) এ কথা বলে বিনিয়োগ না করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, "যে (প্রয়োজন ব্যতীত) কোনো বাড়ি বিক্রয় করে, কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনুরূপ কোনো কাজে বিনিয়োগ করে না, আল্লাহ্ তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে রহমত করেন না"।[৪৮] খলিফা ওমর (রা) বলতেন, "যার সম্পদ আছে, তাকে তা উন্নত (উন্নয়ন) করতে দাও এবং যার জমি আছে তাকে তা চাষাবাদ করতে দাও"।[৪৯] মুসলিম সমাজের এ সকল নীতিমালা মর্যাদার প্রতীকরূপে গণ্য, যা আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের স্থলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। অর্থ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলংকারাদিসহ মোট সম্পদের উপর যে যাকাত ধার্য করা হয়, তা সঞ্চয়কারীদেরকে উপার্জনমূলক আর্থিক ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের মাধ্যমে সঞ্চয়ের উপর ধার্যকৃত যাকাতের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

যথাযথ বিনিয়োগ পরিবেশ

যা হোক, কেবলমাত্র এ সকল মূল্যবোধের উপস্থিতি অথবা জনগণের বিশ্বাস বা দেশপ্রেমের প্রতি আহবান উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণ যদি বিনিয়োগ থেকে যুক্তিসংগত হারে মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে প্রত্যাশা করতে না পারে, তবে তারা দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ তহবিল গঠন করবে না। এজন্য যথাযথ বিনিয়োগ পরিবেশ প্রয়োজন, যে পরিবেশ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে, বাধা ও অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি অপসারণ করে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনীয় সুবিধার যোগান দেয়। যে সকল বিষয় বিনিয়োগের পরিবেশ বিনষ্ট করে, তার মধ্যে কতগুলো হলো ঃ পর্যাপ্ত সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোর অভাব, অসম করব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ে ইতঃপূর্বে

আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অবশিষ্ট তিনটি বিষয় সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে আকস্মিক সরকারি নীতি পরিবর্তনের ভীতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে উদ্যোক্তাকে গুটিয়ে ফেলার ক্ষতি স্বীকার করতে হতে পারে। এ অনিশ্চয়তার কারণ হলোঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি এবং বিভিন্নমুখী কায়েমী স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে শাসক শ্রেণীর পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন। পরিবর্তশীল আনুগত্য রাজনীতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্ম দেয় এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে বাধার সৃষ্টি করে। ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে এবং স্থিতিশীলতার দৃঢ় ভিত্তি রচিত হবে।

ইসলামী শরীয়তে সম্পদে মালিকানার অধিকার ও সীমা সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে। এগুলোকে বৈধভাবে কার্যকর করলে বিনিয়োগকারীদের মন থেকে সম্পদের নির্বিচার আটক ও রাষ্ট্রীয়করণের ভীতি দূর হবে। মহানবী (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন, "তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পত্তি আজকের হজ্জের দিনের মতোই পবিত্র"।[৫০] এর অনুসরণে আইনবিদগণ সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তির যথেচ্ছা বাজেয়াপ্তকরণ ও রাষ্ট্রীয়করণের ধারণার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আবু ইউসুফ এ রায়কে সংক্ষিপ্তভাবে আইনের ভাষায় বলেছেন, "প্রতিষ্ঠিত ও জ্ঞাত অধিকার ব্যতীত কোনো শাসকের কোনো কিছুর স্বত্ব বিলোপ করার অধিকার নাই"।[৫১] এমনকি কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ বা জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলেও সে ক্ষেত্রে আইনগত নীতি অনুসারে শরীয়াহ ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেয়। আইনের সূত্রটি হলো, "জনগণের প্রয়োজন কোনো ব্যক্তিগত অধিকারকে রহিত করে না"।[৫২]

কোন্ কোন্ খাতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হবে এবং কোন্ কোন্ খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করবে, সেসব বিষয়ে আইনগতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করতে শরীয়াহর সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে মুসলিম দেশসমূহের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এরূপ শ্রেণীবিন্যাস ও ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বেচ্ছাচারী নীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসবে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং কর ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নে সরকারের অসামর্থ্যের কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যে কোনোভাবে ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে হবে। একবার শরীয়াহর ভিত্তিতে এরূপ নিরাপত্তা দেশের সংবিধান ও আইন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে যে কোনো সরকারের জন্য তার অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক অবস্থানের কারণে এগুলোকে অবজ্ঞা করা কঠিন হবে।

মুদ্রামান অবমূল্যায়ন ও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ

বেসরকারি ভোগ ও সরকারি ব্যয় ইতঃপূর্বে আলোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী পুনর্গঠনপূর্বক সম্পদের চাহিদা হ্রাস করা ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিম দেশে অব্যাহত মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রতিরোধ করা যাবে না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুসলিম সরকার মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ (আমদানি নিয়ন্ত্রণসহ বৈদেশিক মুদ্রার উচ্চ মূল্য), উচ্চ শুল্ক ও আমদানি বিকল্প শিল্পের উন্নয়নের উপর তাদের মূল্য নির্ভরতা স্থাপন করেছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে অকার্যকর হয়েছে।[৫৩] এতে বৈদেশিক মুদ্রার সরকারি ও কালোবাজারী দ্বৈত বিনিময় হার সৃষ্টি হয়। মুদ্রার সরকারি মূল্যহার কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধির ফলে আমদানি উৎসাহিত এবং রপ্তানি নিরুৎসাহিত হয়। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অধিকতর খারাপ হয়, সম্পদের প্রবাহ বিকৃত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্দা দেখা দেয়। এ অবস্থা ভোক্তা ও রপ্তানিকারকগণের ত্যাগের মূল্যে আমদানিতে ভর্তুকি দেয়ার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবিচারের সহায়ক হয়। কারণ ভোক্তাগণ সাধারণত আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সুযোগ পরিব্যয় অনুযায়ী মূল্য প্রদান করে, কিন্তু রপ্তানিকারকগণ তাদের সামগ্রীর জন্য স্বল্প মূল্য প্রাপ্ত হয়। এতে দুর্নীতি ও অদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রার বাস্তবসম্মত বিনিময় মূল্যের অনুপস্থিতিতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের বোনাস প্রদানের কর্মসূচি কেবলমাত্র অবিচার ও দুর্নীতিকেই বাড়িয়ে তোলে। এ সকল কর্মসূচির উপকার প্রকৃত উৎপাদক পর্যন্ত পৌঁছায় না। ফলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি না পাওয়ায় তারা উন্নত উপকরণ ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। তাদের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের মতোই নিম্নমানের থেকে যায়।

শুল্ক ও আমদানি বিকল্প

উচ্চ শুল্ক হার একধারী তলোয়ারের ন্যায়। যদি কার্যকরভাবে উচ্চ শুল্কহার প্রয়োগ করা যায়, তবে আমদানি নিরুৎসাহিত হয়, কিন্তু রপ্তানি উৎসাহিত হয় না। এতদসত্ত্বেও কোনো উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক মূল্যমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে নৈতিক সংশোধন ছাড়াই অকার্যকর ও দুর্নীতিপরায়ণ শুল্কব্যবস্থার দ্বারা যদি উচ্চ শুল্কহার কার্যকর করা হয়, তবে আমদানিকৃত দ্রব্যের স্বল্প মূল্য প্রদর্শন (under invoicing), চোরাচালান ও কর ফাঁকি দেয়া বৃদ্ধি পায়। এতে উচ্চ করারোপ বাড়ে, কিন্তু চোরাপথে আমদানিকৃত বিলাসদ্রব্যের মুনাফা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকল্পে সম্পদের সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী পন্থা হলো পূর্বালোচিত বিলাসদ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের ধারণা মোতাবেক আমদানি বিকল্প শিল্প ততটা খারাপ নাও হতে পারে, যদি করদাতাগণের বিপুল কষ্টের বিনিময়ে অদক্ষ শ্বেতহস্তী

সৃষ্টি করা না হয়। যখন পৃথিবীর সকল দেশ এ নীতি অনুসরণ করছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে, তখন মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে এ নীতি অনুসরণ না করার কোনো যুক্তি নেই। এটি কেবল কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, বরং এটি রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপক ভিত্তি সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন। তবে আমদানি বিকল্প হিসেবে যে শিল্পকে নির্বাচন করা হবে, জটিল প্রশ্ন তার জন্যই। যথাযথ উন্নয়ন দর্শনের অভাবে এ নির্বাচন স্বেচ্ছাচারী হওয়ার এবং মাকাসিদ হাসিল ও সম্পদ বরাদ্দের জাতীয় নীতির সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজে এ দু'টি বিষয়ই গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

স্বেচ্ছাচারীভাবে নির্বাচিত শিল্পসমূহ ভর্তুকিভিত্তিক অর্থায়ন, উচ্চ শুল্ক সংরক্ষণ, মূলধন ও কাঁচামাল আমদানিতে কর মওকুফ ও রেয়াতি মেয়াদ আকারে সর্বোচ্চ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। সাধারণত এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন হয় এবং শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেহেতু এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলধন-নিবিড় হয়ে থাকে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সেহেতু কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক আয়তনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগুলো পর্যাপ্ত অবদান রাখতে সক্ষম হয় না। এ সকল শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগী পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করার ফলে ভোক্তাগণ কেবল উচ্চ মূল্য দিতেই বাধ্য হয় না; বরং এ সকল শিল্পের জন্য মূলধন, দ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানির লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অনুপার্জিত সম্পদে ধনী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য কম প্রদর্শনের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হয়। জাতীয় সম্পদ যত বেশি এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা হবে, সম্পদের প্রবাহ ততই বিশৃঙ্খল হবে এবং শহরের ও গ্রামীণ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অধিকতর ধনাঢ্য হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। অধিকন্তু ব্যাপক সংরক্ষণ লাভকারী শিল্পে সাধারণত কোনো প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় না।[৫৪]

প্রবৃদ্ধি প্রকৃত চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার বিবেচনায় কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক সংরক্ষণ লাভ করার অধিকারী। কিন্তু এগুলো উপেক্ষিত হয়। এ খাতগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার উচ্চমূল্য, আমদানি ভর্তুকি ও পণ্য সাহায্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ খাতে কার্যরত ইউনিটগুলো আকারে ক্ষুদ্র, অসংগঠিত ও অবিকশিত হওয়ায় কোনো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। ভূমির মালিকানা একীভূত হওয়ায় ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে এ খাতগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হয়। ফলে উপেক্ষা ও দারিদ্র্য এবং উন্নতর প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অসামর্থ্যের মতো একটি দুষ্টচক্র সৃষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা 'মাকাসিদে'র সাথে প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক।

আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় মুসলিম দেশসমূহেও সম্ভবত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বিনিয়োগের প্রধান বাধা। সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নৈতিক সংশোধন ও যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বদলে নিয়ন্ত্রণের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ন্ত্রণের ফলে বিনিয়োগকারীগণের সময় ও শক্তির অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এরূপ অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করা ব্যতীত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা কষ্টকর। ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামোর অধীনে উদ্যোগের স্বাধীনতা হচ্ছে, ইসলামী আদর্শের সাধারণ প্রকৃতি। নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রণ দুর্নীতির অপরিহার্য উৎস। এমনকি ইসলামের নৈতিক সংশোধন সত্ত্বেও কর্মচারীগণ প্রলোভনের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা নাও পেতে পারে। সুতরাং, স্থায়ী উৎপাদন এবং প্রকৃত চাহিদা পূরণকারী পণ্য ও সেবার আমদানি এবং এগুলো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধন সামগ্রীর আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো যুক্তি নেই। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দূরীকরণ ও করব্যবস্থার সংস্কার মজুত সম্পদের উৎপাদনমুখী ব্যবহার ও মূলধন পাচার হ্রাসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন গঠনে সহায়ক হতে পারে।

বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় মসলিম দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহ দান ও সুযোগ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে এটি প্রত্যাশিত হওয়া উচিত, কারণ 'উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধন বিনিয়োগ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে'। এজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাও সম্ভব।[৫৫] যে সকল বৈদেশিক বিনিয়োগ ইসলামী মূল্যোবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং যেগুলো মাকাসিদ হাসিলে সাহায্য করে, সে সকল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ সমর্থন করা কঠিন। এতে বরং এই সুবিধা রয়েছে যে, এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ততা রয়েছে যা মুসলিম দেশগুলোতে উপাদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভাব রয়েছে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে এর দ্বারা বৈদেশিক ধনাত্মক ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। এভাবে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ঝুঁকি গ্রহীতা দেশের এককভাবে বহন করার বদলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর সাথে বিনিয়োগ ঝুঁকি বিভাজন করে নেয়া সম্ভব হয়।

ইসলামের আলোকে অর্থনৈতিক নীতিমালার পুনর্বিন্যাস সাধনের ফলে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তা নিজেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে ইতিবাচক উপাদান গঠন করবে। এজন্য সম্ভবত কোনো অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হবে না। চুক্তির শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলার জন্য ইসলামের অনুশাসন রয়েছে। সুতরাং, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর জন্য এ নিশ্চয়তা প্রয়োজন।

সাধারণ শান্তিপূর্ণ সময়ে সকল চলতি হিসেবের লেনদেনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা ও মুনাফা প্রেরণ পদ্ধতি সহজসাধ্য করা ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামোর আওতায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। মূলধন প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা প্রদান করাও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। একটি রাষ্ট্র কিভাবে একজন ভিনদেশী বিনিয়োগকারীর অধিকার ফেরত পাওয়ায় বাধা দেয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে, যখন উভয় পক্ষের স্বীকৃত শর্ত মোতাবেক মূলধন প্রত্যাহার অনুমোদিত? বিশ্বব্যাংকের মতানুসারে, 'যে সকল দেশ উন্মুক্ত উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করেছে, তাদের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে সমস্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম'।[৫৬] যাইহোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহ অধিক বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য প্রচলিত ঋণগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা অনিবার্য বলে মনে করা যায়। কিন্তু তা একান্তই উৎপাদনশীল ও নিজস্ব আয়ে পরিচালনাযোগ্য (self-liquidating) প্রকল্পের জন্য যেগুলো মাকাসিদ হাসিলের ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে প্রয়োজন।[৫৭]

উৎপাদনের আকৃতি পুনঃনির্ধারণ

বিনিয়োগ পরিবেশের পুনর্গঠন কেবলমাত্র বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিনিয়োগ যেন বিলাসদ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে পরিচালিত না হয়, বরং তা যেন প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকারী ও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য ও সামগ্রী উৎপাদনে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সামগ্রী ও কাঁচামাল উৎপাদনে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থা কতিপয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয় এবং এমনটি করা উচিতও নয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ও অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে, নৈতিক ও সামাজিক সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত চাহিদার অগ্রাধিকার পরিবর্তন করা, প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং উদ্যোক্তাগণকে চাহিদার উৎসাহ ও সুযোগ দান করা, যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এ ধরনের খাতে তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করে। বিলাসদ্রব্য ও মর্যাদার প্রতীক স্বরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও আমদানির উপর প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সুযোগ বা ভর্তুকি, যা এগুলোর উৎপাদন বা আমদানিকে প্রভাবিত করে, অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে। প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকারী ও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য ও সেবা এবং মূলধন গঠনের অনুকূলে সরকারের রাজস্ব, মুদ্রা ও বাণিজ্যনীতি পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণের সাধারণ প্রবণতা এগুলোর সরবরাহে দীর্ঘমেয়াদী স্বল্পতা সৃষ্টি করে। কারণ এ সকল দ্রব্যসামগ্রীর মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় এগুলো উৎপাদনে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিলাসদ্রব্যের দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে সামর্থ্যবান লোকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সুতরাং, জাতীয় জরুরি অবস্থা

(যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ) ব্যতীত স্বাভাবিক এবং যখন বাণিজ্য ব্যবস্থায় একক কারবার, যোগসাজশ বা মজুতদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা না হয়, সেই অবস্থায় শরীয়াহ্ মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ করেছে।[৫৮] অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্পমেয়াদী কষ্ট দূর করা বা হ্রাস করার পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ (একবারে সকল দ্রব্যের উপর থেকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার না করা), প্রত্যক্ষ হস্তান্তরজনিত আয় (transfer payment) ও পূর্বের আলোচিত অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক উদ্যোগের প্রতি আনুকূল্য প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া ইসলামী নীতিমালার আলোকে ব্যাংকব্যবস্থার পুনর্গঠন সমগ্র সংস্কার কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

কৃষি ও পল্লী সংস্কার

যদিও সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাস করার জন্য ভূমি সংস্কার অপরিহার্য, তবুও কেবলমাত্র ভূমি সংস্কার মুসলিম দেশগুলোকে মাকাসিদ হাসিলে বেশি দূর অগ্রসর করবে না, যদি যুগপৎভাবে কৃষি খাতের অন্যান্য অসুবিধাগুলো যা দ্বারা সমগ্র কৃষি সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেসব দুর্ভোগের কারণ ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা না হয়। এ প্রতিকূল অবস্থা কৃষি খাতের দক্ষতা ও উৎপাদন হ্রাস করে, গ্রামীণ বেকারত্ব বৃদ্ধি করে, গ্রামীণ আয়-উপার্জনে মন্দা সৃষ্টি করে এবং বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।

প্রতিকূল অবস্থা দূরীকরণ

সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূলতা হলো একটি কার্যকর অবকাঠামোর বাহ্যিক অর্থনীতির (External Economies) অনুপস্থিতি, যার মধ্যে সেচ ও পানি নিষ্কাশন, সম্প্রসারণ সার্ভিস, সড়ক, বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো থাকার কথা। এর কারণ হলো সরকারি বাজেট ব্যয় বরাদ্দে কৃষি খাতের প্রতি অবহেলা। ধনী শিল্পোন্নত দেশসমূহে যেখানে কৃষকগণকে আমদানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষিখাতের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।[৫৯] তারা বৈদেশিক মূল্য বাড়িয়ে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রশাসনিক পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করে সরকারি ঘাটতি বাজেটজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব হ্রাস করতে চেষ্টা করে। এ পদ্ধতির ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্য কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায়, কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, আমদানির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, রপ্তানি সংকুচিত হয় এবং গ্রামীণ আয়-উপার্জনে মন্দা দেখা দেয়। অন্যায্য ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার সাথে গ্রামীণ আয়-উপার্জনে মন্দাভাবের ফলে বর্গাচাষীর হাতে এমন কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না, যা দ্বারা তারা কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে (যেমন– উন্নত বীজ ও যন্ত্রপাতি, সার,

কীটনাশক)। একই অবস্থা ঘটে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। এর ফলে বেকারত্ব ও আংশিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এভাবে দারিদ্র্য, বিনিয়োগ স্বল্পতা, কম উৎপাদন ও বেকারত্বের এই দুষ্ট চক্রের আবির্ভাব ঘটে। ফলাফল হিসেবে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায়, শহরে শ্রমের মজুরি হ্রাস পায় এবং বস্তির সৃষ্টি হয় যেখানে জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টকর। সুতরাং, Proverty and Hunger গ্রন্থের লেখক সঠিকভাবেই বলেছেন, 'গ্রামীণ এলাকায় কৃষি উৎপাদনের কৌশলের চেয়ে আয় বন্টনই হলো আসল সমস্যা'।[৬০]

অর্থায়ন

কৃষি খাতের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূলতা হলো, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সুযোগের অভাব। যদিও অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, তথাপি কেবলমাত্র ধনী কৃষকগণই সাধারণত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে সক্ষম হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ ক্ষুদ্র কৃষকগণের পক্ষে কঠিন হয়। ফলে তারা উন্নতমানের কৃষি উপকরণ ক্রয় এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে এবং নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ পায় না। এভাবে 'ব্যবসায়ী, অপ্রতিষ্ঠানিক মহাজন, সুদখোর ও আত্মীয়স্বজনদের নিকট অব্যাহতভাবে ঋণগ্রস্ত থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য স্থায়ী রূপ লাভ করে'।[৬২] যদিও সমানুপাতিক ভূমিব্যবস্থা অপরিহার্য, কিন্তু এটি অধিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না, যদি কৃষকদের পর্যাপ্ত অর্থায়ন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। কৃষদের কেবলমাত্র তাদের কৃষিখামারে নিয়োগের জন্য অর্থায়ন করলেই চলবে না, তাদেরকে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যও অর্থায়ন করতে হবে, যাতে তারা বাড়তি আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।[৬৩] স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম প্রদর্শিত সুদমুক্ত ব্যবস্থার বিকল্প কাঠামোর মধ্যে এ কাজগুলো করতে হবে।[৬৪] সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৃহদায়তন শহুরে প্রতিষ্ঠানকে দশকের পর দশক ধরে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে। তারা যদি ভারসাম্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কৃষি খাতে এবং ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানকে রেয়াতি পন্থায় বা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মাধ্যমে অর্থায়ন না করে, তবে হয়ত পূর্বোক্ত কাজগুলো করা সম্ভবপর হবে না। কিভাবে এগুলো করা সম্ভব তা পরিবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

আর্থ–সামাজিক পরিবর্তন

গ্রামীণ খাত যে সকল প্রতিকূলতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো দূর করা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করা হলে কেবলমাত্র যে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশ ঘটবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে শহর থেকে জনসংখ্যা গ্রামে স্থানান্তর হতে সাহায্য করবে

এবং নগর জীবনের ভিড় ও দুষ্কৃতি হ্রাস পাবে। যদি এ সুযোগগুলো সরল জীবনযাপন প্রণালীর সাথে একত্রে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্রামের সমৃদ্ধি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হবে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের ফলে কৃষকেরা ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবে তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। এতদসত্ত্বেও গ্রামীণ জনসাধারণের মনোভাব ও কর্মঅভ্যাসে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হবে। এটি অধিকতর স্বল্প সময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে যদি ইসলামকে সামাজিক পরিবর্তন ও সংশোধনের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মসজিদগুলোকে গ্রামীণ জীবনে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুললে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারে।

বেকার ও আংশিক বা অপূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিতদের জন্য নতুন ব্যবসা/ পেশা

মাকাসিদ হাসিলের অন্যতম গঠনমূলক পন্থা হলো, মুসলিম দেশগুলোর জনশক্তিকে এমনভাবে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করা, যাতে প্রত্যেক নারী ও পুরুষ তার সৃজনশীল ও শৈল্পিক যোগ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যদি বিরাজমান উচ্চহারে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বা আংশিক কর্মে নিয়োজিতরা বহাল থাকে তবে, এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বেকারত্ব ও এইধারা হ্রাস করার জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং মূলধননিবিড় বৃহদায়তন ও ব্যষ্টিক আয়তনের শহুরে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাকে কৌশল হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে।

চাহিদা সম্প্রসারণ সীমা

মোট চাহিদা সম্প্রসারণের প্রচলিত নীতি নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এটি পর্যাপ্ত নয়। বরং একে অন্যান্য নীতিমালা দ্বারা শক্তিশালী করা দরকার। বর্তমানে সরকারের প্রচলিত নগরমুখী নীতিমালা, আয় ও সম্পদের অত্যধিক বৈষম্য, পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালীর প্রদর্শনী– এ সকল নীতিমালা প্রধানত ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকেই সাহায্য করে এবং প্রদর্শনীমূলক ভোগের উদ্দ্যেশ্যে দ্রব্য ও সেবার আমদানিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিচালিত হয়। শেষ পর্যন্ত এর পূর্ণ উপকারিতা দেশজ কারিগর ও শিল্পকর্মীগণের নিকট পৌঁছায় না। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং এর ফলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়। অবশ্য যদি এ নীতি প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ এবং ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হতো, তাহলে এর উপকারিতা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হতো।

ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা

বৃহদায়তন মূলধননিবিড় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে বেশি জনগণকে সার্থকভাবে কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম নয়। যেহেতু দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আছে, কিন্তু মূলধন ও বৈদেশিক মুদ্রার

এবং জটিল প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের শিক্ষাগত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, সেহেতু ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা তাদের জন্য উত্তম হবে। ইমাম হাসান আল-বান্না ইসলামী আদর্শের আলোকে অর্থনৈতিক সংস্কার আলোচনায় কুটির শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, কুটির শিল্প দরিদ্র পরিবারের সকল সদস্যের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে।[৬৫] মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক উদ্যোগের অনন্য বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেন, 'দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ কোনো ভালো পন্থা নয়' এবং আত্ম-কর্মসংস্থান 'ব্যক্তিগত সম্পদ ভিত্তিক উন্নয়নের মজুরিভিত্তিক নিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর'।[৬৬] যেহেতু সকল জনশক্তিকে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে- এরূপ প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত নয়, সেহেতু মজুরিভিত্তিক নিয়োগ একদম বাদ দেয়া যাবে না। সুতরাং, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরি পায়, ভ্রাতৃসুলভ সম্মানজনক ও মানবিক আচরণ পায় এবং তাদেরকে যেন সৃজনশীল ও শৈল্পিক গুণাবলী বিকাশের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে বৃহৎ যন্ত্রের চাকার মর্যাদায় অবনমতি করা না হয়।[৬৭] ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানে যত বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের সাফল্যের সম্ভাবনা ততই অধিক হবে।

সম্প্রতি এ সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি হয়েছে যে, 'বিগত দশক ধরে চলে আসা বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পায়ন পদ্ধতি পৃথিবীর অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে'।[৬৮] মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃক কয়েকটি দেশে পরিচালিত এক গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠান বিপুল অবদান রাখতে সক্ষম। এগুলো কেবল প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাই নয়, বরং পরোক্ষভাবে আয়, দ্রব্য ও সেবার চাহিদা, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের চাহিদা এবং রপ্তানিও বৃদ্ধি করে। এগুলো শ্রমঘন প্রতিষ্ঠান এবং এজন্য স্বল্প মূলধন ও স্বল্প বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও অব্যবহৃত আয়ের উপর নির্ভর করে এবং বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধা কম প্রয়োজন হয়। এগুলো নতুন পণ্য উদ্ভাবন করে, হারানো দক্ষতা ফিরিয়ে আনে এবং অর্থনীতিকে নতুন কর্মের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাপক এলাকায় সম্প্রসারিত হতে পারে। ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে এবং গৃহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করে। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাপক নগরায়ণ ও সামাজিক পরিবেশের উপর ক্ষতিকর অবদান রাখে। অধিকন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠান অন্ততপক্ষে বৃহদায়তন শিল্পের মতো দক্ষতায় কাজ করতে সক্ষম।[৬৯] মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, এ সকল প্রতিষ্ঠান সর্বদাই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মূলধনের একক প্রতি অধিক উৎপাদন করে।[৭০] লিটল,

স্কিটভস্কি ও স্কট মন্তব্য করেছেন, "ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদায়তন আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণত কম লাভজনক মূলধন ও স্বল্প-কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবেচনায় অধিকতর ব্যয়বহুল।[৭১] কতিপয় বিশেষজ্ঞ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ও মূলধন ঘাটতি বিরাজমান থাকায় এ সকল দেশে বৃহদায়তন শিল্প আদৌ উপযোগী কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৭২] সুতরাং, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানকে 'প্রবৃদ্ধি ও ইনসাফ–উভয় অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পন্থা' হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়।[৭৩]

এমনকি ওইসিডি দেশসমূহ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরেছে।[৭৪] বিগত দশক ধরে এ দেশগুলোতে আনুপাতিক হারে অধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এসব শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ও বেকারত্বের হার কমাতে অধিক সাফল্য অর্জন করেছে।[৭৫] ক্ষুদ্র শিল্প দীর্ঘদিন ধরে বণিক সম্প্রদায়ের নিকট অস্বীকৃত থাকেনি, বরং সকল মতাবলম্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিগণই একে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে থাকেন।[৭৬] ইটালিতে কারিগরবৃন্দ প্রধানত পারিবারিক ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন এবং এটি ইটালীর অলংকার, স্বর্ণ, রৌপ্য, চামড়া শিল্প, নকশা, কাঁচের কাজ, আসবাবপত্র, মৃৎশিল্প, জুতা তৈরি ও পোশাক শিল্পের মতো খাতগুলোর উন্নয়নের পশ্চাতে প্রধান কারণ হিসেবে অবদান রেখেছে।[৭৭] জার্মানীতে পারিবারিক মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং সেখানে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে।[৭৮]

জাপানের রপ্তানি সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার শক্তি। জাপানের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে।[৭৯] জাপানের অভ্যন্তরীণ বাজারেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাপানের মোট শিল্প-উৎপাদনের ৫০% উৎপাদন করে এবং ৭৫% কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।[৮০] জাপানে এখনো খুচরা বিক্রয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষত্ব প্রাপ্ত খুচরা বিক্রেতা ও পারিবারিকভাবে পরিচালিত ক্ষুদ্র দোকানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এগুলো আইনের দ্বারা সংরক্ষিত।[৮১] এ ব্যবস্থা এবং ব্যাপক লভ্যাংশে অংশগ্রহণ পদ্ধতির (profit-sharing system) কারণেই সম্ভবত শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানের বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম।[৮২] যে সকল উন্নত দেশে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যগতভাবে দুর্বল, সে সকল দেশে বেকারত্বের হার বেশি। এজন্য ঐ সকল সরকারসমূহ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের বিকাশে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ফলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে বহু উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং কম মূলধননিবিড় ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্ভবত মুসলিম দেশসমূহে গ্রামীণ ভূমিহীনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে লাভজনকভাবে কর্মে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। শুধু তাই নয়, স্বল্পভূমির মালিকানা বিশিষ্ট পরিবারসমূহের কর্মে আংশিকভাবে নিয়োজিত সদস্যদেরকেও (স্বামী, স্ত্রী, মাতাপিতা, সন্তান) লাভজনকভাবে কাজে নিয়োগ করার জন্যও এটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ নীতি হবে পূর্বের আলোচিত কৃষি সংস্কারের পরিপূরক এবং গ্রাম উন্নয়নে সহায়ক। এ দ্বারা গ্রামীণ জনগণের আয় এবং উন্নত বীজ, সার ও প্রযুক্তি ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর দ্বারা কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যা স্থানান্তর হ্রাস পাওয়ায় পারিবারিক সংহতি রক্ষা পাবে এবং নৈতিক উন্নয়ন ও দুষ্কৃতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় মুসলিম দেশগুলোও তাদের উপনিবেশিক প্রভুরদেরকে সমালোচনা করে যে, তারা সমাজের সকল ভিত্তি ও সূত্র পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু তারা স্বাধীনতা লাভের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত দক্ষতা ও হস্তশিল্প কৌশল পুনরুদ্ধারের জন্য কমই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।[৮৩] প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানকে অবদমন করা এবং ব্যাপক সংরক্ষণ সুবিধা, উদার আমদানি লাইসেন্স, রেয়াতি আর্থিক সুবিধা, ভর্তুকি মূল্যে উপকরণ প্রদান ও কর রেয়াতের সময় দেয়ার মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প ও বাণিজ্যকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ মন্তব্য এমন বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো রায় নয়, যেগুলো অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাতে অপরিহার্য। যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে এগুলো উৎসাহিত করা ও প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, তবে শর্ত এটাই যে এগুলোর ব্যয় অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক সুফল অবশ্যই অধিক হতে হবে এবং স্থায়ী ও ব্যাপক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে না।

ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন

কিন্তু দেশের সকল স্থানে কিভাবে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের বিকাশ উৎসাহিত করা সম্ভব? এজন্য আর্থ–সামাজিক পরিবেশে অনেকগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথমত, জীবনযাপনের ধরনে এমন পরিবর্তন আনতে হবে, যা মর্যাদার প্রতীকরূপী আমদানি দ্রব্য থেকে মুক্ত এবং দেশে উৎপাদিত; সাধারণ পণ্যের প্রতি আসক্ত যেগুলো প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করে ও ব্যাপকহারে শ্রমশক্তি ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবর্তন করতে হবে যাতে সেগুলোকে অদক্ষ ও ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাতিল করা না হয় এবং অতীতের ন্যায় যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিহিত করে পরিত্যাগ করা না হয়। বরং তাদের বিপুল সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উৎসাহ দান ও সহযোগিতা করতে হবে। তৃতীয়ত, এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উত্তম উপকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি, কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল ও অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক সেবাসমূহ

সংগ্রহে সাহায্যের মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদিত ও আমদানিকৃত দ্রব্যের সাথে মান ও মূল্যে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। চতুর্থত, উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মকুশলতা উন্নত করতে সক্ষম করে তুলতে হবে। এজন্য কর্মকুশলতা প্রকৃত চাহিদা ও প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যকার বৈসাদৃশ্য দূর করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণাঙ্গ পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। পঞ্চমত, তাদের অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে, কারণ এদের উন্নয়নে অর্থায়নের অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা। সবশেষে, বর্তমানে প্রচলিত বৃহদায়তন শিল্পের প্রতি ঝোঁক যদি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী করা সম্ভব না হয় তবে বিলুপ্ত করতে হবে। কারণ ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে এটি অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

যদি ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে অধিকতর দক্ষ প্রযুক্তি অর্জনে সাহায্য করা না হয়, তাহলে তাদের মাধ্যমে আমদানি বিকল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অর্জিত নাও হতে পারে। যাই হোক, যদি এ প্রযুক্তি সহজ হয় তবে ভালো। কারণ এতে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে। এতে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এভাবে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ কাজে নিয়োজিত করা যাবে। এতে উচ্চ দক্ষতার চাহিদা সর্বনিম্ন করবে এবং মুসলিম দেশগুলোর স্বাক্ষরতা কারিগরী দক্ষতার তুলনামূলক নিম্নমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এতে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাবে। স্থানীয়ভাবে এর উন্নয়ন ও উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফলে আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ ছোট শহর ও পল্লী অঞ্চলেও চালু হতে পারবে। ফলে মূলধননিবিড় ও জটিল প্রযুক্তিসম্পন্ন বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল সমস্যা সৃষ্টি করে সেগুলো হ্রাস পাবে। যেমন ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তৃতি দ্বারা আঞ্চলিক আয়ের ব্যবধান কমে আসবে এবং কতিপয় বৃহৎ শহরে জনসংখ্যার কেন্দ্রীকরণ সর্বনিম্ন হবে। স্যুমাখার এর ভাষায় এটি হলো, technology with a human face.[৮৪] এরূপ সহজ ও কম ব্যয়বহুল প্রযুক্তির মধ্যে 'অনুন্নত দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি' করার মতো সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।[৮৫] সুতরাং, এর দ্বারা কেবল আয় ও জীবনযাপনের মানই বৃদ্ধি পাবে না, বরং সম্পদের পুনর্বণ্টনও এর দ্বারা সাধিত হবে।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (নবম অধ্যায়)

১. ভূমিকায় পাদটিকা নং ৩ দেখুন যেখানে 'প্রয়োজন' এবং 'চাহিদা', সম্পদের উপর 'প্রয়োজনীয়' এবং ''অপ্রয়োজনীয়' দাবির উপর আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু অর্থ সীমিত, প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তাই অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে কিভাবে এ অগ্রাধিকার নিরূপণ করা যায়। বিষয়টি Maslow এর তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষের মনস্তত্ত্বের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না (A. Maslow, *Motivation and Personality,* 1970)। যদি তা করা হয়, তবে বিশেষ

ব্যক্তিবর্গের বিশেষ করে ধনীক শ্রেণীর উন্মাসিকতা তথা তাদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী সীমিত সম্পদের অপচয় ঘটবে। বিলাসিতা চরিতার্থে সম্পদের অপচয় রোধের জন্য সামাজিক অগ্রাধিকার অনুযায়ী ভোক্তাশ্রেণীর অগ্রাধিকার পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং তদানুযায়ী ভোগ-আচরণ পরিবর্তনে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র এবং জবরদস্তি ব্যতীরেকে কিরূপে এটা করা সম্ভব? তাই এখানেই অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা দেয় সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধের ছাঁকনির দ্বারা ছেঁকে নেয়ার প্রক্রিয়া এবং এ মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য ভোক্তাশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করার পদ্ধতি। Dodgson উল্লেখ করেছেন, "একদিকে সকল প্রয়োজনীয় কর্তৃপদীয় বা ব্যক্তি অনুভব হতে উদ্ভূত, অপরদিকে একটি সর্বজ্ঞ কল্যাণকামী রাজনৈতিক দল বা একনায়ক সকল প্রয়োজন নিরূপণ করতে সক্ষম– এ ধরনের ভ্রান্ত মেরুপ্রবণ চিন্তা পরিহার করা প্রয়োজন। 'প্রয়োজন' এর একটি গতিশীল ও মুক্ত ধারণা নির্দেশ করে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ 'প্রয়োজন' নির্ণয়, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করবে, তা হবে স্থিতিস্থাপক এবং ব্যক্তিগত দাবি ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে *Geofferry Dodgson, Economics and Institutions* (1998), p. 25.1)। এ ধরনের মেরু প্রবণতাকে উদারনীতিবাদ বা রক্ষণশীলতা কোনো কাঠামোর মধ্যেই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রয়োজন নির্ণয় ও পূরণ উভয়ের মধ্যেই একটি নৈতিক প্রেক্ষিত যোগ করতে হবে। টাকার পাল্লা ভারী ভোক্তাদের লাগামহীন ভোগবাসনা দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং ভোক্তাদের ব্যাপারে নৈতিক ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ হয়ে আসতে হবে।

২. ফিকাহশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দসমূহের সংজ্ঞার জন্য দেখুন, al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'*ah, vol. 2, pp. 8-12; and Anas Zarqa, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", in K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980), pp. 13-15. আহম্মদ-আল-নাজর এবং আনাস জারকা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে ভোক্তা কিংবা উৎপাদক কোনোভাবেই কোনো কিছুর ব্যবহারে নৈতিকভাবে মুক্ত নয়, এমনকি ভোগ্য বস্তুটি অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়হীন হলেও। আরো (দেখুন, Ahmad al-Najjar, *Al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam*, (1973), pp. 32 ff; and Anas Zarqa, (1980), p. 13). আরো দেখুন, Imam Hasan *al-Banna, Majmu'ah* Rasa'il (1989), p. 268, and *Hadtih al-Thulatha'* (1985), p. 410; and Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Islam awr Jadid Ma'ashi Nazariyyat* (1959), pp. 136-40.

৩. দেখুন, *IMF Survey*, 'April 1987, pp. 98-9.

৪. দেখুন, Thomas Mckeown, *The Role of Medicine: Dream, Mirage or* Nemesis? (1979), and Alastair Gray, "Health and Society: Reflections on Policy", *IDS Bulletin,* October 1983, pp. 3-9.

৫. *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* গ্রন্থটি যা সংক্ষেপে *Majallah* নামে পরিচিত, তার ভূমিকায় ফিকাহ শাস্ত্রের ১০০টি প্রবচন বর্ণিত হয়েছে। C,R Tyser *et al.* কর্তৃক Majallah ইংরেজি অনুবাদ ১৯৬৭ সালে *The Mejelle* নামে All Pakistan Legel Decisions, নাহবা রোড, লাহোর হতে প্রকাশিত হয়। যদিও *Majallah* অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময়ে সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশিত গ্রন্থ, তবুও সকল মাজহাবের ফিকাহবিদগণ সার্বজনিনভাবে এ প্রচলনগুলো ব্যবহার করেছেন। আরো দেখুন, Mustafa A. al-

Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid* (1967), vol. 2, pp. 945-1060; and Ali Ahmad al-Nadwi, *al Qawa'id al-Fiqhiyyah* (1986). প্রত্যেক উদ্ধৃত মূলনীতির শেষে বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যা 'Majallah' ঐ নিবন্ধকে নির্দেশ করে যা হতে মূলনীতিটি সংকলিত হয়েছে।

৬. দেখুন, al-Shatibi, *Al-Muwafaqat,* vol. 2, p. 394; আরো দেখুন Mustafa al-Zarqa (1967), vol. 2, pp. 784 and 1088.

৭. Tibor Mende, *South East Asia between Two Worlds* (1955), p. 227.

৮. পাকিস্তানের উন্নয়ন তহবিলের অধিকাংশই অপব্যয় হয়েছে: আলী শাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যা সৌদি গেজেটে ২১ জুন ১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৯. ১৯৮৪ সালে মরক্কোতে ভর্তুকিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের মাত্র ১৬% সর্বনিম্ন উপার্জনকারীদের হাতে পৌঁছায়। (বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাবসিডির জন্য ছয় দফা পরিকল্পনা পেশ করেছে, *BIS Review*, 8 April 1987, p. 5.

১০. Ibid., pp. 4-6; আরো দেখুন, IBRD, *World Development Report*, 1986, pp. 90-104.

১১. IBRD, *World Development Report,* 1986, p. 92.

১২ "Privatisation in the Third World", *Financial Times* ৩ September 1987.

১৩. IBRD, *World Development Report, 1983*, p. 74. ১৯৮২ সালে নাইজারের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে জাতীয় আয়ের ৪% লোকসান দিয়েছে (প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা ৬৭)। ১৯৭৭-৭৯ সময়কালে তুর্কী রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসানের মাত্রা গড়ে জাতীয় আয়ের ৩.৯% (প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৭৮)। একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায়, যে সব দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বিনিয়োগ অধিক, সে সব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিম্ন (দেখুন, IBRD, *World Development Report,* 1987, pp. 66-7.)

১৪. IBRD, *World Development Report,* 1988, p. 106.

১৫. যদিও ১৯৮৭ সালে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের গড় সামরিক ব্যয় ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের যথাক্রমে ১৬.০২% এবং ১৩.১৬%; কতিপয় মুসলিম দেশের ব্যয় ছিল নিম্নরূপ: পাকিস্তান ২৯.৪৮% (১৯৮৬), মালয়েশিয়া ১৪.৩৮% (১৯৮৭), মিসর ১৯.৪৫ (১৯৮৭), ওমান ৩৮.১৬% (১৯৮৮) এবং ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র ৩১.২১% (১৯৮৮)। দেখুন, IMF, *Government Financial Statistics Yearbook,* (1989), pp. 58-9.

১৬. Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers* (1988).

১৭. যাই হোক, তারা কর বা ট্যাক্সের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন যথা: দারাইব, ওসাইব, খারাজ. নওয়াইব এবং কিলাফ আল সুলতানিয়া। আল কারজাভী এ বিষয়ে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফিকাহর মতামত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে আল আবাদি এ বিষয়ে আ-গাজ্জালী, আবু আল ওয়ালিদ আল বাজী, আবু আবদুল্লাহ আল ফারা, ইয আল দ্বীন আবদ আল সালাম, আল নাওয়ায়ী, আল শাতিবী, আল মালিকী এবং আল আনসী (যাইদী) এর মতামত উদ্ধৃত করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ এ বিষয়ে দেখতে পারেন, Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (1969), vol. 2, pp. 1100-2 and al-'Abbadi (1974-75), vol. 2, pp. 288-97. ট্যাক্সের বিরুদ্ধে মতামতের বিষয়ে এক নজরে ধারণা লাভের জন্য দেখা যেতে পারে Monzer Kahf, "Taxation Policy in

an Islamic Economy", in Ziauddin Ahmed, *et al.*, *Fiscal Policy and Resource Allocation in an Islamic State* (1983), pp. 145-53. পাঠকগণ পৃষ্ঠা ১৫৪-৬১ এর আলোচনায় দেখতে পারেন যেখানে আলোচকগণ ইসলামী উম্মাহর স্বার্থে ইসলামী রাষ্ট্রের কর আদায়ের ক্ষমতাকে খর্ব বা সীমাবদ্ধ করে দেয়ার বিরুদ্ধে অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৮. Al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (1349 A.H.), vol. 1, p. 385; and Abu 'Ubayd, *Kitab al-Amwal,* p. 495: 926. এ হাদিসের উপর মূল্যবান আলোচনার জন্য দেখুন, Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (1969), vol. 2, pp. 963-92.

১৯. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (1353 A.H,), p.85.

২০. Al-Marghinani, *Al-Hidayah* (1965), vol. 4, p. 105.

২১. Hasan Turabi, "Principles of Governance, Freedom and Responsibility in Islsm", *The American Journal of Islamic Social Sciences, September* 1987, p. 7.

২২. Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (1969), vol. 2, p. 1074.

২৩. Abu Yusuf (1353 A.H.), pp. 14, 16 and 86.

২৪. *Ibid*, p. 111.

২৫. Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (1969), p. 209.

২৬. Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* p. 308.

২৭. প্রগতিশীল কর পদ্ধতি সমর্থনে ইমাম হাসান আল বান্না'র মতামতের জন্য দেখুন' *Al-Banna, Majmu'ah Rasa'il* (1989), p. 267. আরো দেখুন Muhammad Hashim Awad, "Al-Haykal al-Daribi al-Mu 'asir fi Daw' al-Mabadi' al-Daribiyyah al-Islamiyyah", in Monzer Kahf (ed.), *Mawarid al-Dawlah al-Maliyyah* (1989), p. 86.

২৮. Ibn Taymiyyah, *Majmu, Fatawa* (1383 A.H. = 1963), vol. 30, p. 339.

২৯. Gunnar Myrdal, "Need for Reforms in Underdeveloped Countries", *Quarterly Economic Journal* (National Bank of Pakistan), January-March 1979, p. 29.

৩০. দেখুন, Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (1959), p. 560.

৩১. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৮৪-৮৫ সাল হতে ফেডারেল সরকারের চলতি ব্যয় কর ও করবহির্ভূত উৎস হতে আহরিত রাজস্ব হতে বেশি ছিল। ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরে এ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ মোট রাজস্ব আয়ের ৮.৭% এবং জিডিপির ১.৫%। (Gorvernment of Pakistan, Ministry of Finance, *Economic Survey,* 1987/ 88, p. xxi.).

৩২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অপ্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ না করার ইচ্ছাসূচক ঋণ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি প্রায়ই প্রার্থনা করেছেন, "আমি কুফর এবং ঋণ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "হে রাসূলুল্লাহ! ঋণ করা কি কুফরের সমান?" রাসূলুল্লাহ্ প্রত্যুত্তরে বললেন, "হ্যাঁ" (আল নাসাঈ এর সূত্রে আবু সাঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত এবং প্রামাণ্য হাদিস হিসেবে স্বীকৃত।) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা নিয়ে ঋণ করে, আল্লাহ পাক তাকে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করবেন। আর যে ব্যক্তি ঋণ

পরিশোধ না করার অশুভ ইচ্ছা নিয়ে ঋণ করবে, আল্লাহ তার কৃত ঋণের অর্থের মধ্যে বরকত প্রদান করবেন না। (আল বোখারী ও ইবনে মাজাহ-এ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত। এই উভয় হাদিস 'আল মুনধিরী' হতে পুনঃ উদ্ধৃত করা হয়েছে (১৯৮৬), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৬-৭, ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ৭, এই অধ্যায়ে ঋণের উপর অন্যান্য হাদিসের জন্য দেখুন-পৃষ্ঠা ৫৯৬-৬০৮)। মহানবী আরো বলেন, "ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সত্ত্বেও অহেতুক বিলম্ব করা জুলুম" (Al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, 1381 A.H., vol. 2, p. 109: 2907).

৩৩. ১৯৯০ সালের ২৬-২৮ মে বাহরাইনে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে M. Anas Zarqa কর্তৃক উপস্থাপিত "Islamic Financing of Mute Social Infrastructure: A Suggested Mode Based on Istisna" শীর্ষক প্রবন্ধ; Chapra, Towards a Just Monetary System (1985), pp. 132-9 and 166-73; and M. Ariff and M. A. Mannan, *Developing a System of Financial Instruments* (1990).

৩৪. দেখুন, M. Akarm Khan's review of J. R Barnes', An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire" (1986), *in the Muslim World Book Review,* 2/1988, pp. 34-6.

৩৫. দেখুন, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, (1979), pp. 14-15.

৩৬. এই অভিমত কতিপয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত ভিত্তিক। কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতিতে এসব দ্রব্যের ব্যবহার অনুমোদন করা হয়েছে। তিনি পঁচা মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহপাকের নাম ছাড়া জবেহ করা হয়েছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যাই হোক, কেউ যদি সীমা লঙ্ঘন না করে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতার জন্য নয় বরং প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে এসব ভক্ষণ করে তাহলে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (২:১৭৩)। এ বিষয়ে আল কোরআনে আরো কতিপয় আয়াত রয়েছে (৫:৩, ৬:১৪৫, ১৬:১১৫, ৬:১১৯)। এই মূলনীতি প্রয়োগের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে, তবে অত্যন্ত জরুরি ক্ষেত্রে সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, গৃহীত ঋণের পরিমাণ সর্বনিম্ন পরিমাণের বেশি হবে না।

৩৭. ১৯৮৬ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ ১৫% হ্রাস পেয়েছিল (বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, OECD, *Financing and External Debt of Developing Countries-1986- Survey*, বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১/২ দশক যাবত উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক ঋণ প্রবাহের মাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে (IBRD, *World Bank Dvelopment Report*, 1989, p. 96).

৩৮. দেখুন, OECD, "Financial Resources for Developing Countries: 1986 and Recent Trends", OECD Press Release, 19 June 1987, Table 2, p. 8.

৩৯. Muhammad Anisur Rahman, "The Welfare Economics of Foreign Aid", *Pakistan Development Review,* Summer 1967, pp. 141-59; আরো দেখুন, "Foreign Capital and Domestic Savings: A Test of Haavelmo's Hypothesis with Cross Country Data", *Review of Economics and Statistics,* February 1968, pp. 137-8; Thomas E. Weiscopf, "The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Savings in Underdeveloped Countries", *Journal of International Economics,*

February 1972, pp. 25-38; Keith Griffin, *International Inequality and National Poverty* (1978), and "Doubts about Aid", (অপ্রকাশিত) Magdalen College, Oxford University, June 1984.

৪০. Griffin (1978).

৪১. Dudley Seers, *The Political Economy of Nationalism* (1983).

৪২. Teresa Hayter, *Aid is Imperialism* (1969).

৪৩. Cheryl Payer, *The Debt Trap: The IMF and the Third World* (1972), and *The World Bank : A Critical Analysis* (1982).

৪৪. Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih,* vol. 2, p. 133; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba* (1964), vol 5, pp. 45-6.

৪৫. কিন্ডলবার্জার ১৯৩৭ সালে এক দেশ হতে অন্য দেশে পুঁজি পাচারকে ভয় ও সন্দেহের জটিল জটাজাল হতে উদ্ভূত 'অস্বাভাবিক' প্রবাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। Charles P. Kindleberger, *International Short-term Capital Movements,* 1937, p. 158. আরো সাম্প্রতিক কালে ডেপলার ও উইলিয়ামসন একে অনাধিবাসিদের উপর দাবির স্বত্ব জন্মানো হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেটা মালিকদের এ উদ্বেগ হতে সৃষ্টি হয়েছে যে, তার সম্পদের মূল্যবান ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, যদি তার স্বত্ব কেবল স্বদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে। (Michael Deppler and Martin Williamson, "Capital Flight: Concept, Measurement, and Issues", in *Staff Studies for the World Economic Outlook* (August 1987), p. 41).

৪৬. দেখুন, Stephen Fidler, "Third World's Missing Millions", *Financial Times*, 7 September 1987. আরো দেখুন, C. L. Ramirez-Rojas, "Monetary Substitution in Developing Countries", *Finance and Development,* June 1986, pp. 35-8. নিউইয়র্কের একজন ব্যাংকার J.P. Morgan এর মতে ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে ১৫টি ঋণগ্রস্ত দেশের ব্যাংক-বহির্ভূত বেসরকারি খাতের ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিদেশে রক্ষিত। ("Brady's; Fading Plan", *The Economist*, 12 August 1989, p. 18.)

৪৭. Al-Bukhari, vol. 3, p. 128; Muslim, *Sahih Muslim* (1955), vol. 3, p. 1189: 12; al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, *al-Jami 'al-Sahih* (1956), vol. 3, p. 666: 1382.

৪৮. Al-Suyuti, *al-Jami ' al-Saghir,* vol. 2, p. 167, on the authority of al-Tabarani; বন্ধনির মধ্যে উল্লেখিত বক্তব্য অপর একটি হাদিসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যা আলসুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন। আরো দেখুন, al-'Abbadi (1974-75), vol. 2, pp. 96-107.

৪৯. M. H. Haykal, *Al-Faruq 'Umar* (1964), vol. 2, p. 229.

৫০. Muslim (1955), vol. 2, p. 889: 147; and Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (1952), vol. 2. p. 1297:3931.

৫১. Abu Yusuf (1353 A.H.), pp. 65-6. এ নীতিমালা *Majallah* এর ৯৭ নম্বর নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (দেখুন নোট ৫)।

৫২. *Majallah* এর ৩৩ নম্বর ধারা (দেখুন নোট ৫)।

৫৩. দেখুন, Ramirez-Rojas (1986), p. 37.

৫৪. OECD, *The Costs of Restructuring Imports-The Automobile Industry* (1987).

৫৫. IBRD, *World Development Report, 1985*, p. 125.

৫৬. *Ibid.*, p. 129.

৫৭. এই অভিমতের স্বপক্ষে নোট ৩৬ এ যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

৫৮. দেখুন, Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (1967), pp. 22-4; al-Marghinani (1965), vol. 4, p. 93; al- 'Abbadi (1974-75), vol. 2, pp. 301-15; al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram* (1974), pp. 266-73: and Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order* (1979), p. 20-1.

৫৯. IBRD, *World Development Report, 1986*, pp. 85-109.

৬০. IBRD, *Proverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries, 1986;* আরো দেখুন, "Can Better Farming Feed the World? '*The Economist*' 5 July 1986, p. 73.

৬১. IBRD, *World Development Report,* 1982, p. 76.

৬২. U.S. House of Representatives, *Report of the Select Committee on Hunger* (May 1986), p. 1.

৬৩. জাপানে প্রতি চারটি কৃষি পরিবারের মধ্যে তিনটি এখন কৃষির বাইরে থেকে ইনকাম পেয়ে থাকে। দেখুন, "When the Salt of the Earth Loses its Savour ", *The Economist, 20* February 1988, pp.43-4.

৬৪. বিকল্প ব্যবস্থায় সমবায় সমিতি, বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকে সরকারি সহায়তাপুষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যবস্থাকে হতে হবে সুদমুক্ত এবং লাভ-লোকসানের অংশীদারভিত্তিক (মুদারাবাহ বা মুশারাকাহ), মুরাবাহা (কষ্ট-প্লাস ফিনান্সিং), লিজ ভিত্তি বা বা'সালাম। বা'সালাম হচ্ছে এমন একটি বিক্রয় পদ্ধতি যাতে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি/চুক্তির বিপরীতে পূর্ণ বিক্রয় মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। এটা ফটকা বাজারের অগ্রিম বিক্রয়ের মতো নয়। কারণ এখানে আংশিক নয় বরং পূর্ণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করা হয়। পূর্বোল্লিখিত ব্যবস্থাপনায় একজন কৃষক তার প্রত্যাশিত পণ্য উৎপাদনের কিছু অংশের অগ্রিম বিক্রয়ের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করতে পারে। এ ব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিত কম উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষককে পণ্য সরবরাহ সমস্যার সম্মখীন হতে হবে না। বা'সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'Abd al-Raaman al-Jaz iri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (1938), vol. 3. pp. 3-20 and vol. 2, pp. 302-18. দেখুন, IRTI, *Khuttah al-Istithmar fi al-Bunuk Al-Islamiyyah* (1990). আরো দেখুন, Chapra, *Towards a Just Monetary System* (1985), pp. 71-3, 163-74, 177-8.

৬৫ Al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il* (1989), p. 267.

৬৬. Muhammad Yunus, "The Poor as the Engine of Development", reproduced from *The Washington Quarterly,* Autumn 1987, in *Economic Impact,* 2/1988, p. 31.

৬৭. দেখুন, Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order* (1979), pp. 14-17; and Hakim Mohammad Said (ed.), *The Employer and the Employee-Islamic Concept* (1972).

৬৮. Carl Liedholm and Donald Mead, "Small-Scale Enterprise: A Profile", reproduced from their "Small-Scale Industries in Developing Countries: Empirical Evidence and Policy Implications", a Michigan State University Development Paper, in *Economic Impact,* 2/1988, p. 12.

৬৯. এ অভিমতের প্রতিফলন দেখা যায় International Labour Organisation (ILO), *Employment, Incomes and Equality* (1972).

৭০. U.S. House of Representatives, *Report of the Select Committe on Hunger* (1986), p. 4.

৭১. Ian Little, Tibor Scitovsky, and Maurice Scott, *Industry and Trade in Some Developing Countries* (1970), p. 91.

৭২. দেখুন, Mariluz Cortes, Albert Berry and Ashfaq Ishaq, *Success in Small and Medium-Scale Enterprises* (1987), p. 2.

৭৩. Liedholm and Mead (1988), p. 12.

৭৪. ক্ষুদ্র ব্যবসায় শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Graham Gudgin, *Industrial Location Processes and Employment Growth* (1978); David Birch, *The Job Generation Process* (1979); Steven Solomon, *Small Business USA* (1986); David Storey, *et al., The Performance of Small Firms* (1987); David J. Storey and Steven G. Jhonson, *Job Creation in Small and Medium Sized Enterprises* (1987); and Paul Burns and Jim Dewhurst, *Small Business in Europe* (1987).

৭৫. OECD, *Employment Outlook* (1986).

৭৬. Burns and Dewhurst (1987), p. 193.

৭৭. দেখুন, Alan Friedman, "Italian Small Business: The Backbone of the Economy Explored", *Financial Times,* 15 September 1987.

৭৮. দেখুন Small Business", *Financial Times,* 29 April 1987, Section III, p. 1.

৭৯ দেখুন, "Worker-Friendly Programmes", *The Economist,* 27 September 1986, p. 20.

৮০. Steven Solomn (1986), pp. 283-4.

৮১. দেখুন, "Why Japaness Shoppers are Lost in a Maze", *The Economist,* 31 Junuray 1987, p. 64.

৮২. জাপানে মুনাফা-অংশীদারীত্বের বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, Martin L. Weitzman, *The Share Economy* (1984)। বিস্ময়কর যে, মুনাফা অংশীদারীত্বের বিষয়টি যখন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন পাশ্চাত্য আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু পুঁজির সাথে মুনাফা-অংশীদারীত্বের ব্যাপারে তারা আগ্রহী নয়।

৮৩. Paul Baran, *The Political Economy of Growth* (1957), p. 149.

৮৪. Schumacher, Small is Beautiful (1973), p. 18.

৮৫. দেখুন, The Report by the United Nations Department of Economic Affairs, *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries* (1951), p. 29.

দশম অধ্যায়

আর্থিক পুনর্গঠন

আধুনিক বিশ্বে অর্থব্যবস্থা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্ত্র। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে তাদের মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক সীমিত সম্পদের বিলিবন্টনে অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতায়ও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থনীতিতে ব্যক্তি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিতও অর্থব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই দেখা যায়, অর্থব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এর কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও কর্মপদ্ধতির সার্বিকভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন, যাতে অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনাময় সকল শক্তিকে আর্থিক সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবহারের কাজে লাগানো যায় এবং অর্থনীতির উন্নতির পথে সকল বাধাবিঘ্নকে অপসারণ করা যায়।

ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি আসে সাধারণ জনগণের ডিপোজিট বা আমানত হতে। পানির ট্যাংক হতে যেমন পানির সরবরাহ হয়, তেমনি জনগণের উৎস হতে ব্যাংকের আমানত সঞ্চিত হয়।[১] শুধু বিত্ত ও ক্ষমতাশালীদের জন্য নয়, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যাংক আমানত ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পানির সরবরাহের তুলনায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত অনেক বেশি দুষ্প্রাপ্য। তাই সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সুষ্ঠতার সাথে এর ব্যবহার কাম্য। ব্যাংক আমানত ব্যবহারের সার্বিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ঃ (ক) সর্বাধিক সংখ্যক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান; এবং (খ) সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও সুষ্ঠ বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ। সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থা এ দু'লক্ষ্যের কোনোটিই পূরণ করতে পারেনি। ব্যাংক আমানতের ব্যবহার ও ঋণ দান পদ্ধতিতে প্রচলিত ব্যবস্থা চরম বৈষম্য ও অদক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

সুষম মধ্যস্থতা

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় যে ইনসাফ পরিপন্থী নীতি অনুযায়ী চালিত হচ্ছে তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। আর্নি বিগস্টেনের মতে, 'ভূমি বৈষম্য হতেও পুঁজি ও ঋণ বিতরণ ব্যবস্থায় বৈষম্য অধিকতর প্রকট; বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা পুঁজি বিতরণ বৈষম্যকে আরো প্রকটতর করে তুলেছে'।[২] এ অবস্থা কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়, বরং সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বাভাবিক কুফল। যে অর্থনীতিতে সম্পদ বৈষম্য পাহাড় সমতুল্য, সেখানে ব্যাংক বা ঋণদানকারী সংস্থা চায় ঝুঁকিমুক্তভাবে প্রদত্ত ঋণ হতে নিশ্চিত মুনাফা অর্জন করতে; সেখানে

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিত্তশালীদের যে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে, সেই একই শর্তে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীকে ঋণ প্রদান করবে, তা আশা করা যায় না।[৩] প্রচলিত প্রথায় ব্যাংক তাদের ঋণ দেয়, যাদের অতিরিক্ত জামানত (Collateral) প্রদানের সামর্থ্য আছে; অথবা লেস্টার থুরোর ভাষায়, 'যাদের কলকারখানায় বিনিয়োগের জন্য প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে'। অন্য কোনো যোগ্যতা বিবেচনায় আনা হয় না।[৪] যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যাংক মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানিও স্বীকার করেছে, তাদের ব্যাংক বিশাল ও বিত্তশালী কোম্পানীকেই ঋণ দিতে অধিক আগ্রহী। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ও কোম্পানীসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক সুদের হারে ঋণ প্রদানে তাদের অনাগ্রহ সুস্পষ্ট।[৫] এ প্রবণতা সমাজের জন্য এক গভীর সংকটের পূর্বাভাস। কেননা স্পষ্টতই একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা আস্থাশীল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে যে বিশাল উদ্যোক্তা প্রতিভার ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে, তার সম্ভাবনাকে যথাযথ ব্যবহারে বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা উদাসীন।[৬]

ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পে অর্থায়ন

বৈষম্যমূলক প্রচলিত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা এক তিক্ত বাস্তবতা। ঋণ বিতরণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সংশোধন করা প্রয়োজন। নচেৎ আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এসব শিল্পে অর্থায়নের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া না হলে এ লক্ষ্য অর্জন স্বপ্নই থেকে যাবে। ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের উন্নয়নের পথে অর্থসংস্থানই সবচেয়ে বড় বাধা। গরীব গরীব নয় এ কারণে যে, তারা কঠোর পরিশ্রমে অনাগ্রহী বা তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধনীদের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। তাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার তারা করতে পারে না। তাদের সমস্যা হচ্ছে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য তাদের অর্থের কোনো সংস্থান নেই। যারা মজুরিভিত্তিক চাকরি করে তাদের ক্ষেত্রেও তাদের চাকরি তাদের দক্ষতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। মজুরির পরিমাণও এমন যে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, তারা নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাই যথার্থই বলেছেন, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে সর্বপ্রথম মৌলিক অধিকার যা অন্যান্য মানববাধিকার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।[৭]

Select Committee on Hunger-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে সামান্য পরিমাণ ঋণ সরবরাহ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থানীয় অর্থনীতির প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারে। কমিটি আরো অভিমত ব্যক্ত করে যে,

উন্নয়নশীল দেশসমূহে শহর ও গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করার অন্যতম উপায় হচ্ছে, অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে তাদের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণকালেই ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব দেশের প্রতিষ্ঠানিক ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ স্বল্পবিত্ত মানুষের উদ্যোগে চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতায় আস্থাশীল নয়।[৮] তাই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের মৌলিক ভিত্তি হওয়া উচিত অর্থব্যবস্থার সংস্কার।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। গরীব জনসাধারণের মাঝে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোগ গ্রহণে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে তখন কাজে লাগানো যাবে। আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সমৃদ্ধ অবদান রাখতে পারে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভাগ্যের উপর নির্ভর করার অনিশ্চিত অবস্থা হতে রক্ষা পাবে। দুঃসময়ে কোমর ভাঙা সুদের ভার বহনের পরিবর্তে তারা সুসময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অধিক মুনাফার ভাগ দিতে প্রস্তুত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সময় অধিক মুনাফা অর্জন করে তারা মন্দাকালীন দুঃসময় দেউলিয়া হবার ভয় না করে ঝুঁকি বহনে সক্ষম।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ

আর্থিকব্যবস্থা ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ ও মুনাফা অর্জন উভয়ের ভিত্তিতেই তা চালিত হয়। শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয়। ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প ও কৃষকদের ঋণদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা বা ব্যর্থতার যে দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে, তা অপসারণ করতে হবে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি খাতকে নানা গুরুতর অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, বর্তমান কাঠামো ও পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ব্যবস্থা ব্যয় ও ঝুঁকিবহুল।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন শহরকেন্দ্রিক বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারি নীতির পক্ষপাতিত্ব দূর করা এবং এর পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প ও কৃষকদের জন্য সরকারি সহায়তার দুয়ার খুলে দেয়া। যথোপযুক্ত সরকারি নীতি ও বাজেট সহায়তার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প ও কৃষকদের ঋণদানে আগ্রহী ও আস্থাশীল হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতাটি হচ্ছে, ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প ইউনিটগুলোকে ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কঠিন শর্তের ও চড়া দামের সিকিউরিটি বা জামানত দাবি করে, যা এদের সাধ্যের বাইরে। ফলে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনাময় এ খাতের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে

ধনী ও বিত্তশালীদের ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে জামানত বা কোলেটারালেই সন্তুষ্ট থাকে। সম্পদশালী হবার কারণে এ সহজ শর্তের জামানত তারা কোনো প্রকার অসুবিধা ছাড়াই পূরণ করতে পারে।

যেসব শিল্পোন্নত দেশে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে, দেখা গেছে সেসব ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের মুনাফার হার তুলনামূলকভাবে ভালো।[৯] সুতরাং সংগতভাবে আশা করা যায় যে, সরকারি সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট হলে এসব ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের লাভজনক অবস্থা দেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসবে। মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এক সমীক্ষা অনুযায়ী, এমনকি উন্নয়নশীল দেশে যেখানে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পগুলো কঠিন বিরূপ পরিস্থিতির শিকার, সেসব দেশে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকৃত প্রতি একক পুঁজির উৎপাদন মাত্রা ও দক্ষতা বেশি। ফলে দেখা যায়, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফার মাত্রাও অধিক।[১০]

ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর অন্যতম উপায় হতে পারে, যদি সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যৌথভাবে দায়ভার বহন করে একটি 'ঋণ গ্যারান্টি স্কিম' চালু করে।[১১] অবশ্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ গ্যারান্টি স্কিম প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মতো সুদে-আসলে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। তবে এ স্কিম বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের বিপরীতে নৈতিক দায়ভার বহন করবে। ঋণ প্রার্থী ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পসমূহের প্রাক-পরিচিতি, অবস্থান, মুনাফা অর্জনের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি সঠিকভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করে সরকারি এ স্কিম বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট এদের পক্ষে জামানত হিসেবে কাজ করবে। এভাবে প্রচলিত পদ্ধতির সিকিউরিটি ছাড়াই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ লাভে সমর্থ হবে। নৈতিক স্খলন বা প্রতারণামূলকভাবে যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধ না করে, তবে সরকার- প্রবর্তিত এ স্কিম হতে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের সুবিধা পাবে (অবশ্য সরকারও ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে)। আর যদি বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে লোকসান ঘটে, তবে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথভাবে বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে লোকসানের ভার বহন করবে।

ঋণ গ্যারান্টি স্কিমের কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকৃতপক্ষে অমূলক। কেননা এ স্কিমকে সম্ভাব্য লোকসানের সম্পূর্ণ ভার বহন করতে হবে না। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংক উভয়কে নৈতিক ঝুঁকি ও ব্যবসার ঝুঁকি নিতে হবে। অবশ্য এ স্কীমে গতানুগতিক পদ্ধতির মত বড় ধরনের বোঝা বহন করতে হবে না। ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD) তাদের অভিজ্ঞতা হতে মন্তব্য করেছে যে, উদ্যমী দরিদ্র মানুষ তাদের প্রদত্ত ঋণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে খেটে দ্রুত পরিশোধ করে দেয়।[১২] 'সিলেক্ট কমিটি অন হাংগার' এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসা ইউনিটের যথাসময়ে ঋণ পরিশোদের হারের রেকর্ড

উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশংসনীয়।[১৩] বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মলগ্ন হতে ঋণ পরিশোধের হার ৯৯% বলে দেখা গেছে।[১৪] অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রকল্পে ঋণদান কর্মসূচির ফলাফলও অনুরূপভাবে ইতিবাচক। তাই এরূপ অর্থব্যবস্থা বা ঋণদান কর্মসূচি সম্পর্কে অযথা ও অমূলক আশংকা প্রকাশ করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

তাছাড়া ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প ইউনিটকে ঋণদান প্রক্রিয়াকরণে যদি কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হয়ও, ইসলামী ন্যায়নীতির নিরিখে ও অগ্রগতির স্বার্থে তা গ্রহণযোগ্য। বিশেষত যখন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ স্বল্প সুদে ঋণ, ভর্তুকির মাধ্যমে নিম্নমূল্যে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি বিপুল সরকারি সুবিধা ভোগ করে আসছে। সুতরাং, অত্যন্ত সংগতভাবেই সরকারের এখন ক্ষুদ্র, ব্যষ্টিক শিল্প ও কৃষকদের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ এখন অর্থনীতির সার্বিক স্বার্থে এদের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ ঋণ প্রদানের ঝুঁকি ও ব্যয়ভারের একাংশ অবশ্যই ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংককে যৌথভাবে বহন করতে হবে। একবার ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্প এবং কৃষি খাতের দক্ষতা ও লাভজনক দিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং নতুন ঋণদান ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা লাভ করলে, এ ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে যে অর্থ বরাদ্দ করতে হতো তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

দক্ষ মধ্যস্ততা

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণদান পদ্ধতি, আর্থিক সম্পদের বিনিয়োগ ও বিলিবন্টনে যে অদক্ষতা প্রকট তা বিদ্যমান ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ফসল। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় জামানতের ভিত্তিতে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সুদ প্রদানের সামর্থ্যের বিবেচনায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। আর সরকারি খাতকে ঋণ দেয়া হয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার বিবেচনায়। এভাবে সরকারি বা বেরসকারি খাতের কোনো ঋণের আবেদনপত্রকেই যথাযথ মানদণ্ডে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কী উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়া হচ্ছে ব্যাংকের পক্ষ হতে তা যথাযথ বিচার বিবেচনায় নেয়া হয় না। সুদ প্রদানের সামর্থ্য ও সিকিউরিটিভিত্তিক বর্তমান ব্যাংকের ঋণদান ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক ঋণ লাভ করা যায়। ভোগবিলাস ব্যয় বা ফটকাবাজারীর জন্য বেসরকারি খাত ঋণ লাভ করছে। যুদ্ধংদেহী প্রতিরক্ষা ও শ্বেতহস্তী ধরনের প্রকল্প নির্মাণের জন্য সরকারি খাত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণের বিপুল প্রবাহ টেনে নিচ্ছে। সমাজের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ী আমানত এভাবে অপচয়মূলক ও উৎপাদনশীল খাতে বিনষ্ট হচ্ছে। উপরন্তু অপ্রয়োজনীয়ভাবে সরকারকে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের উপর সৃষ্টি হচ্ছে অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় টানাপোড়েন। ফলশ্রুতিতে অত্যাবশক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন উপকরণ সম্পদের সামাজিক ন্যায়নীতির পরিপন্থি, এ ধরনের বিলিবণ্টন ব্যবস্থাকে কোনোভাবে দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা বলা যায় না।

মুনাফা ও লোকসানের দায়ভার সমভাবে বহনের ন্যায়নীতিমূলক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও টেকসই প্রকল্প প্রস্তাব উভয়দিকই যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হবে। ফলে চাহিদা ও সরবরাহ উভয়দিক থেকেই ঋণ বন্টনব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতা অর্জন করবে। চাহিদার দিক থেকে নবম অধ্যায় আলোচিত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নীতিমালা বাস্তবায়ন অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা হ্রাস করবে। সরবরাহের দিকে, লাভ-লোকসান উভয় বহনের দায়বদ্ধতা বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প টেকসই হবে কিনা তা যথাযথ বিচার বিশ্লেষণে অধিকতর সতর্ক ও যত্নশীল করে তুলবে। এভাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই শুধুমাত্র উৎপাদনশীল প্রকল্পগুলোই ঋণ লাভ করবে। জামানত বা সুদ প্রদানের সামর্থ্য ঋণ মঞ্জুরের প্রধান মানদণ্ড হবে না। ভোগ্যপণ্যের জন্য ঋণ প্রদান অবশ্য সম্পূর্ণ তুলে দেয়া হবে না। তবে তা হবে শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে এবং কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক স্থায়ী ভোগ্যসামগ্রী কেনার জন্য। ফলে অনুৎপাদনশীল খাতে অপচয়মূলক ঋণপ্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। ইসলামী অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এভাবে অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং দক্ষতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আনয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

গ্রামীণ এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর একাংশের সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা এবং এভাবে তাদের প্রতি ব্যাংকের অনাগ্রহের ফলে উল্লেখযোগ্য গ্রামীণ সঞ্চয়কে ব্যাংক কাজে লাগাতে পারছে না। ইসলামী শরীয়াহর আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হলে গ্রামীণ এ বিশাল সঞ্চয়কে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। অলসভাবে পড়ে থাকা গ্রামীণ সঞ্চয় সচল হবে এবং অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে প্রবৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক হবে। গ্রামের মানুষের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে স্বর্ণ মজুতের যে প্রবণতা রয়েছে তা হ্রাস পাবে। নতুনভাবে আস্থাশীল গ্রামের জনসাধারণ তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখতে উৎসাহিত হবে।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (দশম অধ্যায়)

১. উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণত কর্পোরেট বর্হিভূত সেক্টরেই অভ্যন্তরীণ বেসরকারি খাতের ৬০% সঞ্চয় জমা হয়। একমাত্র এ খাতেই বিনিয়োগের চেয়ে সঞ্চয় বেশি হয় (V. V. Bhatt, "Improving the Financial Structure", *Finance and Development*, June 1986, p. 20)

২. Arne Bigsten, "Poverty, Inequality and Development", in Gammell, *Surveys in Development Economics* (1987), p. 156. Stanley Lebergott ধনী ব্যক্তিবর্গকে "তথাকথিত যুক্তিসংগত" ঋণ প্রদানের প্রচলিত প্রথাকে সমাজে মূলধনের বৈষম্যমূলক অবস্থার জন্য অন্যতম মৌলিক কারণ বলে মনে করেন। দেখুন, Stanley Lebergott, "The Shape of the Income Distribution", *American Economic Review*, June 1959, pp. 328-47.

৩. E. S. Mishan, *Cost Benefit Analysis* (1971), p. 205.

৪. Lester Thurow, *Zero-Sum Society* (1980), p. 175.

৫. Morgan Guarantee Trust Company of New York, *World Financial Markets*, January 1987, p. 7.

৬. দেখুন, Charles Lead bearer, "Rags to Riches-Fact or Fiction", *Financial Times,* 30 December 1986, p. 5.

৭. Muhammad Yunus, "The Poor as the Engine of Growth", reproduced from *The Washington Quarterly*, Autumn 1987, in *Economic Impact,* 2/1988, p. 31.

৮. U. S. House of Representative, *Banking for the Poor: Alleviating Poverty through Credit Assistance in Developing Countries, Report of the Select Committee on Hunger* (1986), p. v.

৯. দেখুন Alan Friedman, "Italian Small Business: The Backbone of the Economy Explored", *Financial Times*, 29 April, Section III, p. I.

১০. U. S. House of Representatives, *Report of the Select Committee on Hunger* (1986), p. 4 and Chart 2 on p. 5.

১১. প্রকৃত প্রস্তাবে যেসব শিল্পোন্নত দেশ, যারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে এবং তাদের উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিয়েছে, সেসব শিল্পোন্নত দেশে লোন গ্যারান্টি স্কিম চালু রয়েছে। কতিপয় ইউরোপীয় দেশে এরূপ স্কীম সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য দেখুন, Paul Burns and Jim Dewhurst, *Small Business in Europe* (1987), pp. 199-200.

১২. দেখুন, *Economics,* 16 February 1985, p. 15.

১৩. দেখুন, U. S. House of Representatives, *Report of the Select Committee on Hunger* (1986), p. 7.

১৪. দেখুন, M. Yunus, *Group-Based Savings and Credit for the Rural Poor* (1984), p. 12.

একাদশ অধ্যায়

কৌশলগত নীতি প্রণয়ন

সীমিত সম্পদের মধ্যে মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে মাকাসিদ অর্জন করা সম্ভব হবে না, যদি না তারা চাহিদা ও সম্পদের তালিকা মিলিয়ে দেখে এবং তাদের অনুধাবন করতে হবে যে, তারা কোথায় আছে এবং তারা কোথায় যেতে চায়। এটা অধিকতর কার্যকরভাবে করা সম্ভব, যদি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত নীতি প্রণয়ন করা হয়। এরূপ পরিকল্পনা প্রণীত হলে রাষ্ট্রের পক্ষে লভ্য ভৌত ও মানবসম্পদ বিবেচনায় আনা সম্ভব হবে এবং এ আলোকে সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার প্রস্তুত করাও সম্ভব হবে। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের পূর্ণ অবদানকে কাজে লাগানোর স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সরকারের নীতি নির্ধারণ, ব্যয় কর্মসূচি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

এরূপ কৌশলে পরিকল্পনা ব্যাপকভিত্তিক হবে না এবং রেখাচিত্রের গোলকধাঁধায় আবদ্ধ, বিধিগত নিয়ন্ত্রণ, সকল ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যের ভারসাম্য বিধানের এবং অর্থনীতির ব্যষ্টিক পর্যায়ে তার বরাদ্দ নিয়েও সাফল্য লাভের চেষ্টা হবে না। পরিকল্পনায় একমাত্র সরকারকেই বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনায় আনা হবে না। এটা সম্ভবও নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। এরূপ পথে অগ্রসর হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অর্থনীতিতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোগকে রুদ্ধ করে দেবে এবং এরকম পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে সংঘাত ও সংকট দেখা দিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। মুসলিম দেশগুলোর জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ছাঁকনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের উপর দাবি প্রতিষ্ঠা এবং মাকাসিদ হাসিলের লক্ষ্যে সীমিত সম্পদের সর্বাধিক দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহারের জন্য নৈতিক ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার তথা অর্থনৈতিক উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করা।

ইসলামের ছাঁকনি প্রক্রিয়ার বাস্তব রূপদানের বিষয়টি একান্তই অপরিহার্য। এর ফলে অর্থনীতির অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনের উপায় নিরূপণে সহায়ক হবে। শরীয়াহর কাঠামোর আওতায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হলে তা বিদ্যমান সম্পদ বরাদ্দের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনের খুঁটিনাটি দিকগুলো চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে।

এছাড়াও প্রয়োজন হবে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং কর্মের নৈতিকতার রূপায়ণ এবং এসবের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি করা। এ পরিকল্পনায় পণ্য ও সেবাকে তিনটি শ্রেণী– প্রয়োজন, বিলাস ও মধ্যম পর্যায় হিসেবে বিভক্ত করতে হবে যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন হবে। যেখানে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতায় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন, সেখানে তাদেরকে এজন্য উদ্বুদ্ধ করা ও অধিকতর দক্ষ হতে বলাটাই যথেষ্ঠ নয়। এজন্য আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারী, শিল্পোদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও সঞ্চয়কারী যিনি যেখানে আউটপুটের ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন, তাকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দিতে হবে। যদিও মূল্য ও মজুরি স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেখানে সম্পদ ও ক্ষমতা কতিপয় হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এবং তারা একচেটিয়া বা একচেটিয়াধর্মী বাজারের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায়, সেখানে এ ব্যবস্থাটি সঠিক নয়। সুতরাং তারা জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশকে তাদের চালনা শক্তি, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও শিল্পোদ্যোগকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখছে। পরিকল্পনায় বিদ্যমান এ সকল অবিচারমূলক ব্যবস্থা দূর করার জন্য নীতি ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের নির্দেশনা থাকতে হবে।

পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনীতি ও বহিঃভারসাম্যহীনতা না ঘটিয়ে অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ, বেকারত্ব হ্রাস ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এ ধরনের পরিকল্পনায় আরো থাকতে হবে বিদ্যমান আয় ও সম্পদের মধ্যকার বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা সংস্কার কর্মসূচি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপকভিত্তিক মালিকানা পদ্ধতি ও আয়বর্ধক সম্পদ। ইসলামী আদর্শের আলোকে ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য পরিকল্পনাবিদদের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হবে, কারণ সম্পদের সুদক্ষ ও সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রদেরকে ভালো মুসলমান ও অধিতর উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার আনার প্রয়োজন হবে। মোটকথা, পরিকল্পনা বিশেষ কোনো একটি পদক্ষেপের প্রতি কেন্দ্রীভূত হবে না এবং যা অবৈধ নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করবে না। বরং মাকাসিদ অর্জনের জন্য সুবিস্তৃত নীতি ও উদ্যোগ কাজে লাগাতে হবে। এতে উন্নয়ন দর্শন ও কৌশলে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। সকল নীতি অর্থ, মুদ্রা, আয়, আমদানি ও উৎপাদন এই কৌশলগত নীতির কাঠামোর আওতায় তৈরি করতে হবে। উৎপাদন, আমদানি, বন্টন ও ভোগ সংক্রান্ত বিষয়াদি যা কিছুই কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে খাপ খায়, তাকেই আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মূল্যব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনার অনুমতি দিতে হবে। চলতি হিসাব পরিচালনায় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারসহ নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র

ততটুকু ও ততক্ষণ হবে যতক্ষণ তা অপরিহার্য। সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপের নীতি বস্তুগত পারিতোষিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে, উন্নয়নের জন্য জনগণের নিজস্ব চালিকাশক্তিকে উজ্জীবিত করবে এবং তা শুধু দুর্নীতি হ্রাস ও অধিকতর দক্ষতাই বৃদ্ধি করবে না, বরং উদ্ভাবন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতেও সহায়ক হবে। অবশ্য ব্যক্তি ধনী বা সম্পদশালী হোক বা নাহোক যা পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় তার অনুমতি দেয়া যাবে না। কোনো নীতিগত পদক্ষেপ দরিদ্রদের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেললে বিশেষ বিবেচনায় এনে উক্ত নীতি সংশোধন করতে হবে এবং তার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কোনো দেশের সম্পদের পরিপ্রেক্ষিত, চাহিদা ও লক্ষ্য ঘন ঘন পরিবর্তিত হয় না বিধায় নীতির ক্ষেত্রেও ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে তা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। বারবার নীতির পরিবর্তন করা হলে কেবল অনিশ্চয়তাই বাড়ে এবং এর ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদেরকেই তা সুবিধা এনে দেয়। তবে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি দেখা গেলে তা অবিলম্বে মুক্ত মন নিয়ে সংশোধন করা উচিত। যেহেতু মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ বিভিন্ন ধরনের বলে তাদের মাকাসিদ হাসিলের লক্ষ্য এক হলেও কৌশলগত নীতি পরিকল্পনাও একই রকম হবে এমন কোনো কথা নেই।

যদি সরকার শরীয়াহ থেকে প্রেরণা লাভ না করে এবং বিশেষ কোনো শ্রেণীর পরিবর্তে জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়, তাহলে এটা প্রত্যাশা করা অবাস্তব হবে যে, সরকার নিজেই এরূপ কৌশলগত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আগ্রহী হবে। সরকার নিজেই যদি বৈধ না হয় তাহলে তার পক্ষে এটা সম্ভব নয় অর্থাৎ সরকারকে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের ম্যান্ডেট নিতে হবে এবং সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং মুসলিম দেশগুলোর সকল সংস্কারের মূল কথা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কার। এরূপ সংস্কার ছাড়া ইসলামের আদর্শ ও মুসলিম বিশ্বের বিরাজমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যদি তারা অনুসরণ করে, তাহলে অন্তত একধাপ অগ্রসর হতে পারবে যা সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে করে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়
উপসংহার

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর দিকে তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের সেদিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।

আল কোরআন ৮:২৪

যদি শহরের লোকগুলো কেবলমাত্র বিশ্বাস করত এবং সে অনুসারে জীবনযাপন করত, তাহলে আমরা তাদের জন্য জান্নাত ও দুনিয়ার আশাবাদের দুয়ার খুলে দিতাম।

আল কোরআন ৭: ৯৬

আমরা কঠিন সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু করার নেই। স্বল্পমেয়াদী ব্যবসাচক্র সম্বন্ধে বির্তকের মতো ভাসাভাসা বিষয়সমূহ অথবা রিপাবলিকান বনাম ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক দর্শন অথবা আয়কর নীতিতে পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে না।

জে ফরেস্টার[১]

Paradox : হেঁয়ালি

মুসলিম দেশগুলো যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে তা হলো, তাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষের জন্য 'ফালাহ' ও 'হায়াতে তাইয়্যিবা'র ইসলামী দর্শন বাস্তবে রূপদান করা। এর জন্য কেবলমাত্র নৈতিক উন্নয়নেরই প্রয়োজন নয়, সেই সাথে প্রয়োজন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার। আর তা অর্জন করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না দুর্লভ সম্পদ দারিদ্র্য দূরীকরণ, চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসায় ব্যবহৃত হয়। এর পরিবর্তে মুসলিম দেশগুলো অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো বিশ্ব অর্থনৈতিক ও বহিস্থ ভারসাম্যহীনতার এক কঠিন গোলকধাঁধায় নিপতিত হয়েছে। ফলে তারা লক্ষ্যের নাগালের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছে না। এ গ্রন্থে একথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় তারা যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, এ পরিস্থিতি হচ্ছে তারই যৌক্তিক পরিণতি। যদি তা না হতো তাহলে যেসব দেশ এসব পদ্ধতি অনুসরণ করছে, তারা তাদের জনগণের জন্য উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হতো। কিন্তু তারা তা পারেনি। এটাই হচ্ছে সম্পদের হেঁয়ালি। 'ধনী দেশ মাত্রই গরীব দেশের চেয়ে সুখি নয়'– রিচার্ড ইস্টারলিন ১৯টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ৩০টি গবেষণার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌছান।[২] তাই ডাহরেনডরফ এর যুক্তিসংগত জিজ্ঞাসা-'চার দশকের শান্তি ও সমৃদ্ধির পরেও ধনী সমাজের এত লোক কেন অসুখি; সেখানে কেন এরকম এত কষ্ট, শুধু অর্থের অভাবে নয় বরং প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিশৃঙ্খলা'।[৩]

দু'টি কারণ

এ হেঁয়ালির দু'টি প্রাথমিক কারণ আছে। প্রথমত, সুখ বস্তুগত উন্নতি ও শারীরিক পরিতৃপ্তি থেকে আসে বলে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্রের সেকুলার মতাদর্শগুলো খুব জোর দিয়ে যা বলেছে তা সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, সম্পদের বস্তুগত কল্যাণও অর্জন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ লভ্য সম্পদ দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহৃত না হচ্ছে।

আজকাল একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, সুখ হচ্ছে মনের প্রশান্তির প্রতিফলন (কোরআনের ভাষায় আল নাফ্স আল-মুত'মা ইন্নাহঃ ৮৯:২৭) যা কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন কোনো মানুষের জীবন তার আত্মিক প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। এটা ঘটে যখন তার ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পরিতৃপ্ত হয়। যেহেতু বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সত্তা পৃথক নয়, ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি তখনই সম্ভব, যখন সকল বস্তুগত লাভ-লোকসানের পিছনে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সমাজের সকল সদস্যের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সম্পদের অপব্যবহার নির্মূল বা কমিয়ে ফেলা যায় এবং অন্যায়ের উৎস সকল আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশোধন হয়। তবে এটাও সম্ভব হবে না, যদি প্রত্যেক মানুষ সম্পদ ব্যবহারে সামাজিক অগ্রাধিকারকে অবজ্ঞা করে এবং কেবল তাদের আর্থিক সংগতি ও ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধাকে বিবেচনায় আনে। অতএব প্রত্যেককেই উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে সম্পদ ব্যবহারে সামাজিক অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয় এবং সে অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে সে সচেতন থাকে। তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে যাতে নিজের কল্যাণ্যের চেষ্টা চালানোর সময় অন্যদের 'কল্যাণের' ব্যাপারেও চিন্তা করে। এ ধরনের জবাবদিহিতা ছাড়া সহায়ক আর কী হতে পারে। এমন ধরনের শৃঙ্খলার একটি কাঠামোর আওতায় বস্তুগত সম্পদ তাদের নিজেদের কোনো মূল্য বহন করে না। তাদের মূল্য ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তারা মূল্যবোধ ব্যবস্থার বর্ণনা অনুসারে সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণ করে। এ ধরনের মনোভাব দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারে একটি স্বয়ংক্রিয় বাধা সৃষ্টি করে, যে বাধা অপ্রয়োজনীয় দাবি সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনে এবং দুস্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও সকলের প্রয়োজন পূরণ সম্ভব করে তোলে। আর এভাবেই মানব ভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। এতে সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ হ্রাস পায়।

নৈতিক আবেদনের অনুপস্থিতিতে বস্তুগত সম্পদ অর্জন ও চাহিদা পূরণই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে। পরিতৃপ্তি তখন আর চাহিদা পূরণের বিষয় থাকে না। বরং তার চেয়ে বেশি অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা, জাঁকজমক ও সকলকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আদর্শ আচরণ ধারায় পরিণত হয়। তবে দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ কেবল

অস্থায়ী পরিতৃপ্তি দেয়। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া ফ্যাশন ও মডেল একটির পরিবর্তে আরেকটি শূন্যতার অবতারণা করে। জোর কেনাকাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই সৎ বা অসৎ পথে সম্পদ অর্জনে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা সময়ের উপরে চাপ সহ্য করার ক্ষমতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। ফলে মনের শান্তি ব্যাহত হয়। উৎপাদনের সমগ্র যন্ত্র ঐ বেশি পরিমাণ চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত হয়। যদি ব্যাংকব্যবস্থা সহযোগীর ভূমিকা পালন করে, তবে মানুষ তার আয়ের চেয়েও বেশি ব্যয় করতে সক্ষম হয়। অতএব সম্পদের চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, ভারসাম্যহীনতা বাড়ে এবং এ সংগ্রামে যারা সমানতালে চলতে পারে না তারা পিছিয়ে পড়ে। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য উর্ধ্বমুখী হয়। প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য ক্রমাগত ব্যাহত হয়। অসন্তোষ ও সামাজিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

ভবিষ্যতের কর্মসূচি

শিল্পোন্নত দেশগুলো যে সমস্যার সম্মুখীন, মুসলিম দেশগুলোর সমস্যা তার চেয়ে আরো বেশি কঠিন। তাদের সম্পদ আরো দুর্লভ। তাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক ভারসাম্যহীনতা হ্রাসের জন্যে সামাগ্রিক চাহিদা হ্রাসের প্রয়োজন। মাকাসিদ অর্জন করতে হলে এর বিপরীত অবস্থানের প্রয়োজন– তা হলো কতিপয় অপরিহার্য অথচ অবহেলিত লক্ষ্যের জন্য বর্ধিত ব্যয়। মুসলিম দেশসমূহের সামনে চ্যালেঞ্জই হচ্ছে কিভাবে এ সংঘাতের সমাধান করা সম্ভব। ব্যর্থ কর্মকৌশল অনুসরণ করে তারা সাফল্যজনভাবে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে না, ব্যর্থ কর্মকৌশল শুধু ব্যর্থতার দিকেই নিয়ে যায়।

মুসলিম দেশগুলোর যা করা প্রয়োজন, তা হলো নিজস্ব কর্মকৌশল উদ্ভাবন, যা 'হায়াতে তাইয়্যেবা'র দাবি অনুসারে দুস্প্রাপ্য সম্পদ দক্ষতা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে বিতরণে তাদেরকে সাহায্য করে। এটি তাদেরকে অন্য দেশের জন্য যোগ্য উদাহরণ 'কুদওয়াহ হাসানাহ' হওয়ার নৈতিক বাধ্যবাধকতা পূরণে সাহায্য করবে। এটি এমন উদাহরণ যা তারা তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে অনুসরণ করতে পারে। যে কর্মকৌশল উন্নয়ন করতে হবে, তাতে যে তিনটি উপাদান থাকতে হবে সেগুলো নিয়ে এ বইয়ের সকল আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। যেমন : (ক) সমাজসম্মত বিশোধক কর্মপদ্ধতি যা দিয়ে অদক্ষ অন্যায় ব্যবহার থেকে দুর্লভ সম্পদের দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার আলাদা করা যায়; (খ) এ বিশোধক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে এসব সম্পদ ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধকারী ব্যবস্থা; এবং (গ) হায়াতে তাইয়্যেবার দাবি অনুসারে সম্পদ বিতরণ ও পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত দুটি উপাদানকে জোরদার করার জন্য আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন।

ব্যর্থ কর্মকৌশলসমূহ

ধনতন্ত্র

সম্পদ বরাদ্দে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জন এবং সার্বিক চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশোধক কর্মপদ্ধতি ও উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসেবে মূলত মূল্য ও ব্যক্তিগত মুনাফার উপর ভর করা ছাড়া ইহুদী-খৃস্টিয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ধনতন্ত্রের কোনো গত্যন্তর ছিল না। যুক্তি দেখানো হয় যে, বাজার-নির্ধারিত মূল্য শুধু সার্বিক চাহিদাই নিয়ন্ত্রণ করে না, অসমতার সঙ্গে মুনাফাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক ক্ষেত্র থেকে অধিকতর লাভজনক ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর করে। দাবি করা হয় যে, বাজার শক্তিসমূহের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আনীত চাহিদা ও সরবরাহের এ সমন্বয় একটি নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং এতে সরকারি হস্তক্ষেপ বা মূল্য বিচারের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সর্বোচ্চ দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জন করা যায়।

সম্পদ বরাদ্দের একমাত্র কর্মকৌশল হিসেবে মূল্য পদ্ধতির ব্যবহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করে, তবে আয় ও সম্পদের সমবণ্টন ও নির্ভেজাল প্রতিযোগিতাসহ কতিপয় পূর্বশর্ত পূরণ না হলে দক্ষতা ও ইনসাফ অর্জন সম্ভব হয় না। যেহেতু এসব শর্তসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় পূরণ হয় না এবং হতে পারে না, সেহেতু ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার অনুসারে চাহিদার সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধনীদের অধিকতর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয়, যদিও সম্পদের উপর তাদের দাবি নিয়ন্ত্রণ করতে মূল্য ছাড়া আর কোনো কর্মপদ্ধতি ব্যবহৃত না হয়। চাহিদার সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সম্পদের উপর চাপের ফলে সকল প্রকার জিনিস ও সেবার তুলনামূলক উচ্চ মূল্য অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এ উচ্চ মূল্য প্রয়োজন পূরণের জন্য যেসব জিনিস ও সেবা আছে তার ক্ষেত্রে ঘটে।

ধনীরা যখন যা ইচ্ছা তা পয়সা দিয়ে কিনতে পারে। কিন্তু গরীবরা সাধারণত তাদের অপর্যাপ্ত আয় নিয়ে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতালে চলতে পারে না। এভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবায় মূল্য পরিশোধে তাদের ক্ষমতা আরো হ্রাস পায়। ফলে চাহিদা পূরণ অপর্যাপ্ত থেকে যায়। এতে তাদের দক্ষতা ও বঞ্চনার অভিশপ্ত চক্রে আরো বেশি আবদ্ধ হতে হয়। যদি ভারসাম্যহীনতা অপসারণে ও সম্পদ বিতরণে কেবলমাত্র মূল্য পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়, তাহলে আয় ও সম্পদের বৈষম্য যত বেশি হবে, গরীবদের চাহিদা পূরণ থেকে সম্পদ অন্যত্র অপসারণে ধনীদের ক্ষমতা তত ব্যাপক হবে। গতানুগতিক সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। কারণ এ ব্যবস্থা সমাজের সঞ্চয়সমূহ প্রধানত ধনীদের কাছেই দেয়া হয়, কেননা তারা জামানত দিতে পারে। ফলে তারা আরো ধনী ও আরো ক্ষমতাধর হয় এবং প্রয়োজন পূরণ থেকে দুর্লভ সম্পদ আরো দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নিতে পারে।

প্রত্যেক সমাজেই, যেখানে সম্পদের অসম বিতরণ বিরাজ করছে, সেখানে ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থা চালু করার যে কোনো উদ্যোগ ধনীদেরকে আহত করতে বাধ্য। ধনীরা কেন 'প্যারেটো অপটিমালিটি' শক্তির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সেকুলার, মূল্যবোধমুক্ত সমাজে খারাপ থাকতে রাজি হবে? অন্যদের কল্যাণের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত খারাপ থাকতে তাদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমাজসম্মত মূল্যবোধ, যার প্রতি প্রত্যেকেই নিবেদিত থাকবে, কেবল প্রয়োজন তাই নয়, বরং এমন একটি উদ্বুদ্ধকারী ব্যবস্থা দরকার, যাতে তাদেরকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে বলা হচ্ছে, তার একটি আকর্ষণীয় প্রতিদান নিশ্চিত করা যায়।

সেকুলার মতবাদ যদি নীতিনির্ধারক দর্শন হয় তবে সমাজসম্মত মূল্যবোধ পাওয়া সম্ভব নয়। সেকুলার মতবাদ যা করে তা হচ্ছে, ধর্ম প্রদত্ত সামষ্টিক বিধিনিষেধের মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করা। এ ধরনের বিধিনিষেধ ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে একটি সামাজিক ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন। আর এ ঐকমত্য দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারে সেসব সামাজিক অগ্রাধিকারের একটি পর্যায়ে লক্ষ্য ও মূল্যবোধ উপনীতকরণে প্রয়োজন, সে অগ্রাধিকার জনগণ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মেনে নিতে প্রস্তুত। উপরন্তু সেকুলার মতবাদের স্বল্পমেয়াদী, ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই মানব জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। যদি সে ইহজাগতিক আত্মস্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে, তবে তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত খারাপ থাকতে সম্মত হওয়া যুক্তিসম্মত হবে না।

পুঁজিবাদ যদিও বহিরাবরণে ধর্মের মানবিক লক্ষ্যসমূহ অক্ষুণ্ন রাখে, কিন্তু কর্মকৌশলের কারণে তাকে গুলিয়ে ফেলেছে। দুর্লভ সম্পদ বিতরণ ও বণ্টনে নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা মূল্য পদ্ধতির উপর প্রাথমিক নির্ভরতা ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর অসংগত গুরুত্ব প্রদানের ফলে ভোঁতা হয়ে গেছে। এভাবে বাজার শক্তির অন্ধ সক্রিয়তা যত রকমের বৈষম্য সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা করার বাধাহীন সুযোগ পেয়েছে। সুদের উপর ইহুদী-খৃস্টান বন্ধন প্রত্যাহারের ফলে অসমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্য ও কর্মকৌশলের মধ্যে সংঘর্ষ এভাবে মানবতাবাদী নিষ্পাপ ছদ্মাবরণে সামাজিক দ্বান্দ্বিকতার জন্ম দিয়েছে।

এভাবে বাজারব্যবস্থার কর্মকৌশল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের সুযোগ প্রদান করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জনে সক্ষম হলেও সামাজিক স্বার্থ পূরণ করতে সক্ষম হবেনা, যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ এক না হয়। এতে আংশিকভাবে বোঝা যায় যে, বাজারব্যবস্থা কেন দক্ষতা ও ন্যায়পরতা উভয় মানদণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যবস্থা তার নিজের শক্তিবলে সকলের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কোথাও তেমন আকারের পণ্য ও সেবা উৎপাদন অথবা আয় ও সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বিতরণ করতে সক্ষম হয়নি। অতএব যে

কেউ একথা বলতে পারে যে, সেকুলার মতবাদ যে নৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে বাজারব্যবস্থার পক্ষে পূর্ণ বন্টনসহ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না সার্বিক পটভূমির পরিস্থিতি সৃষ্টিতে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, যেমনটি দখলদার বিদেশী শক্তি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে করেছিল। এমনকি এ ধরনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য স্বল্প হতে পারে, যদি তা টিকিয়ে রাখার জন্য একটি কর্মকৌশল অনুসৃত না হয়।

সমাজতন্ত্র

কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিসমূহের সাফল্য উল্লেখযোগ্যভাবে খুব ভালো কিছু নয়। একটি স্বল্পমেয়াদী জীবনমুখী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার প্রেষণার অবলুপ্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতা বিনষ্ট করে। এতে দক্ষতা হ্রাস পায় এবং অর্থনীতির সরবরাহের দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও যৌথ মালিকানা সাম্য বিস্তারেও সফল হয় না, বরং তা পলিটব্যুরোর গুটিকতক সদস্যের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এটা এমনকি একচেটিয়া ধনতন্ত্রের চেয়েও খারাপ। ধনতন্ত্রে সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় বটে, তবে তা সমাজতন্ত্রের মতো এত কঠোর নয়, কারণ সাধারণ বাজারের বিকেন্দ্রীকৃত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে থাকে। তাছাড়া সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার সহজাত সেকুলার ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সমাজসম্মত মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত করে। নৈতিক মূল্যবোধ ও মূল্যব্যবস্থা উভয়ের অনুপস্থিতিতে সম্পদ বরাদ্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একমাত্র যে বিশোধক কর্মপদ্ধতি অবশিষ্ট থাকে, তা হচ্ছে ক্ষমতাধর পলিটব্যুরো সদস্যদের ব্যক্তিগত খেয়াল। এভাবে এ ব্যবস্থায় ধনী ও উচ্চপদস্থ লোকেরা যা চায় তাই করার সুযোগ পায়, যেমন পায় পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও। অথচ গরীব লোকেরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণেও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, একনায়ক ব্যবস্থাসমূহ বস্তুগত বঞ্চনা ও মানবিক দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছে এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই গণবিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

কল্যাণ রাষ্ট্র

বাজারব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে কল্যাণ রাষ্ট্র মূল্য পদ্ধতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি, বিশেষত সাম্য নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কর্তৃক কল্যাণ ব্যয় একত্র করার চেষ্টা করেছে। মূল্যবিচার এবং প্যারিটো অপটিমালিটির স্ব-আরোপিত মানদণ্ডের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়-এ দুটির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা বা আর্থিক সংগতি পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কল্যাণ রাষ্ট্র সরকারি খাতে বর্ধিত ব্যয়ের মাধ্যমে ধনী-গরীব সবার জন্য কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের চেষ্টা করেছে। প্রথমে তা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এই বলে যে, বরাদ্দ ও বিতরণ উভয় সমস্যারই সার্বিক সমাধান করা হয়েছে। আসলে সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি; কাজটির জন্য কর্মকৌশলটি ছিল অপর্যাপ্ত। সরকারি

খাতে বর্ধিত ব্যয়ের পাশাপাশি সম্পদের উপর অন্যান্য দাবি হ্রাসের মতো ব্যবস্থা না থাকায় করের ভারী বোঝা সত্ত্বেও বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পায়, যেহেতু ভোক্তা সংস্কৃতি একই সাথে বেসরকারি খাতের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটায় সেহেতু বেসরকারি খাতে তার সমন্বয়ের জন্য কোনো সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটেনি। বরং আনুপাতিকভাবে মজুদ ব্যাংকব্যবস্থায় মুদ্রার অত্যধিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ ব্যাংকব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাত যত বেশি ঋণ নিতে আগ্রহী, তত বেশি ধার দেয়া হয় জামানত ও নিম্নস্তরের ঝুঁকির ভিত্তিতে এবং সেক্ষেত্রে ঋণের অর্থ কী কাজে ব্যয় করা হবে, তার প্রতি কোনো তোয়াক্কা করা হতো না। এভাবে সম্পদের উপর দাবির আরো অবনতি ঘটেছে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও দারিদ্র্য ও বঞ্চনার সমস্যা অব্যাহত রয়েছে এবং তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। প্রয়োজন অপূর্ণ রয়ে গেছে। বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংকট

কল্যাণ রাষ্ট্রের সামনে এখন সমস্যা হচ্ছে, যে ভারসাম্যহীনতা সে সৃষ্টি করেছে তা কিভাবে দূর করবে। মূল্য ছাড়া যার সাহায্যে সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তেমন কোনো স্বীকৃত বিশোধক পদ্ধতি না থাকায় বর্তমান ভারসাম্যহীনতাকে দূর করার জন্য প্রাথমিকভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হচ্ছে। বাজারব্যবস্থায় বিশ্বাসের এ পুনরুজ্জীবন বাজারের ব্যর্থতা ও বৈষম্য এবং বাজার সংশ্লিষ্ট মূল্য পরিশোধে গরীবদের অক্ষমতাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে এনেছে। কল্যাণ রাষ্ট্র এভাবে এক হতবুদ্ধিকর সংকটের সম্মুখীন। যদি প্রাথমিক গুরুত্ব বাজারের উপর দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকা ভারসাম্যহীনতা অপসারণে প্রত্যাবর্তিত হয়, তাহলে কল্যাণ রাষ্ট্র যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়– সে তিমিরটি ধনতন্ত্রের, যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। অতএব এখন কি করণীয়? গরীবদের স্বস্তি দেয়ার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রের হাতে একমাত্র প্রধান অস্ত্র যা থাকে, তা হচ্ছে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার। তবে প্রবৃদ্ধির হার উচ্চ হলেই যে আয় বণ্টন উন্নত হবে তা কিন্তু নয়। আদেলম্যান ও মরিস যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর উপাত্তের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন, 'উন্নয়নের পাশাপাশি গরীবদের গড় আয়ের নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক হ্রাসের অবস্থান থাকে'।[৪] উপরন্তু, নিকট ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, যদি মুদ্রাস্ফীতি না হয় এবং অন্যান্য ভারসাম্যহীনতার অবনতি ঘটে।

অবশ্যম্ভাবী উপসংহার হচ্ছে, বিরাজমান তিনটি ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোর জন্য আদর্শ হতে পারে না। সেকুলারপন্থী হলে আত্মিক সুখ তারা দিতেই পারবে না– যে সুখের দাবি হচ্ছে মানবসত্তার আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উভয় চাহিদার পরিতৃপ্তি। যদি তারা মূল্যনিরপেক্ষ হয়, তবে তারা সম্পদের উপর সামগ্রিক দাবি এমনভাবে হ্রাস করতে সক্ষম হবে না, যেমনভাবে সকলের চাহিদাই কেবল পূরণ হয় না, উচ্চতর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজি সৃষ্টির পর্যাপ্ত পর্যায়ও বজায় থাকে। বাজার শক্তির

উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা একই সাথে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক ও বাহ্যিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে সহায়তা প্রদান এবং 'হায়াতে তাইয়্যেবা'র চাহিদানুযায়ী পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করতে পারবে না। অতএব মুসলিম দেশগুলোর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে তাদের অর্থনীতিকে ইসলামীকরণ।

ইসলামীকরণ

ইসলামীকরণের অর্থ সকল জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বস্তুগত কল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী কর্মকৌশলের কঠোর বাস্তবায়ন, যা ইসলামের বাণীর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক দিকে, আত্মিক সুখের জন্য অপরিহার্য মনের যে শান্তি তা সৃষ্টিকর্তার কাছে মানবসত্তার নৈকট্য ব্যতিরেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ নৈকট্য ইসলাম আনয়ন করতে সক্ষম, কিন্তু সেকুলার মতবাদ তা কল্পনা করতেও পারে না। বস্তুগত দিকে ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত সকল সম্পদের বরাদ্দ ও বিতরণ এমন দক্ষতা ও ইনসাফের সঙ্গে দাবি করে, যাতে 'মাকাসিদ' অর্জিত হয় এবং সকলের জন্য 'হায়াতে তাইয়্যেবা' নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এটা করতে হলে সম্পদের লভ্যতা ও লক্ষ্য অর্জনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সামগ্রিক দাবি উত্থাপনের জন্য ইসলামী কর্মকৌশলের সমস্ত সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবহার প্রয়োজন, অবশ্য ইসলামীকরণের অর্থ উদারীকরণের অনুপস্থিতি নয়। অবশ্য এর অর্থ একটি প্রকৃতির উদারীকরণ, যাতে সরকারি খাতের সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাজার শৃঙ্খলা পরীক্ষার মুখোমুখি করার আগে নৈতিক মূল্যবোধের বিশোধকের ভিতর পরীক্ষিত হয়।

সমস্ত উপাদনের সুষম ব্যবহার

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরের সচেতনতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী নৈতিক ব্যবস্থা সম্পদের আমানতদারিতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাকে সচেতন করে এবং দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক বরাদ্দ ও বিতরণের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ণয় করে। এ ব্যবস্থা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে তার অবশ্যম্ভাবী জবাবদিহিতা সম্পর্কেও সচেতন করে তোলে এবং এভাবে তা একটি দৃঢ় উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। এতে কোন ব্যক্তি সামাজিক কল্যাণ অর্জন ব্যাহত করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার ও অগ্রাধিকার পূরণের জন্য উদ্যোগী হয় না। এ ব্যবস্থা বাজারে আসবার আগেই পণ্য ও সেবার উপর দাবির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কেটে ফেলতে সাহায্য করে। বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ মূল্যব্যবস্থা যদি তখন কার্যকর হয়, তাহলে সম্পদ বরাদ্দ আরো বেশি দক্ষ হতে পারে। তবে একটি নৈতিক ব্যবস্থাও অকার্যকর হতে পারে, যদি একই সাথে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন না হয়। এটা হয় এজন্য যে, কিছু লোক মূল্যবোধের তোয়াক্কা করতে চায় না, যতক্ষণ না আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাদের জন্য কঠিন ও অলাভজনক না হয়। তাছাড়া মূল্যবোধ ব্যবস্থার প্রতি নিবেদিত ব্যক্তিরাও সামাজিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং কেবল মানুষ নিজেরা

নিজেদের ক্ষেত্রে নয়, বরং যখন দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দিয়ে 'মাকাসিদ' অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থব্যবস্থা কী দিতে পারে এবং কী পারে না, সে সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারে।

সরকারের যদি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হয়, তবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন আরো কার্যকরভাবে চালু করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক অর্থনীতির সম্পদ ও প্রয়োজন মূল্যায়ন করা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ভোগ ও বিনিয়োগ প্যাটার্নে পরিবর্তনের পরিধি নির্ধারণ করে কৌশলগত নীতি নির্ধারণী পরিকল্পনা এ কাজে সাহায্য করতে পারে। একটি যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তখন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোগত সংস্কারের নকশা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এসব সংস্কার বিভিন্ন ইসলামী পুনর্বণ্টন স্কিমের কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরো জোরদার করা যেতে পারে, যা ছাড়া কোনো সংস্কারের লক্ষ্যে কোনো প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হবে না। এসব কৌশলের সম্মিলিত ব্যবহারে বৈষম্য ও ভারাসাম্যহীনতা দূরীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। অপচয়মূলক ও অপ্রয়োজনীয় ভোগ থেকে সৃষ্ট সম্পদের উপর চাপ অপসারণ এবং এর ফলে সম্ভব উচ্চতর বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বর্তমানে বহু মুসলিম দেশে মুদ্রাস্ফীতির যে চাপ ও মুদ্রা অবমূল্যায়নের যে ধারা চলছে তা রোধে সাহায্য করবে।

ইসলামিক উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় যদি সমতাবাদী (egalitarian) নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তবে তা ধনীদের পক্ষ থেকে তেমন বাধার সম্মুখীন হবে না, যেমনটি তা প্যারেটো অপটিমালিটির প্রতি নিবেদিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। এ নীতিসমূহ আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাসে সাহায্য করতে এবং মুসলিম দেশসমূহের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনেও অবদান রাখতে পারে। যে সমস্ত দেশে ভোগসামগ্রীর মারাত্মক অভাব এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভগ্নদশা কাজের মান নিচে নিয়ে যাচ্ছে, সে সমস্ত দেশে ভরপেট খাওয়া মানুষ, স্বাস্থ্যবান এবং ভালোভাবে শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ জনগণ শ্রমশক্তির মান উন্নত না করে পারে না।

ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মর্যাদার লড়াই বন্ধ করার মাধ্যমে অধিকতর সামাজিক সাম্য কেবল ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধনই বৃদ্ধি করে না, অধিকতর সঞ্চয়ও ঘটায়। সঞ্চয়ের একটি অংশ যদিও গরীবদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য লভ্য হতে পারে এবং শ্রমশক্তি, মান উন্নয়ন ও উদ্বুদ্ধকরণের সাহায্যে তা অধিকতর দক্ষতা ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। অতএব 'অধিক সাম্য' এর মানে কম প্রবৃদ্ধি নয়। বিভিন্ন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও সাম্য যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে, 'তাদের অর্থনৈতিক সাফল্য ও যে বৈষম্য তারা সহ্য করেছে তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই'।[৫] সে অনুসারে, সাম্যের দিকে অগ্রগতি কমানো হলে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বলে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, তাকে 'কঠিন অর্থনৈতিক উপাত্তবিহীন ধুম্রজাল'[৬] বলে

বাতিল করা যেতে পারে। তথাপিও বেশ কিছু দেশের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে অনুসৃত ঘরোয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের ফলে কেবল বৈষম্যই বৃদ্ধি পায়নি, বরং দারিদ্র্য আরো প্রকট হয়েছে।[৭]

ইসলামীকরণ এভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বাজার শক্তির প্রয়োগকে মানবিকীকরণ এবং দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। নৈতিক শুদ্ধি এবং কৌশলগত নীতিনির্ধারণী পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক গঠন সম্পদ ব্যবহারে মানবিক দিকটিকে আরো বেশি বিবেকবান করতে পারে, যাতে সামাজিক স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম না করেও ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জিত হয়, এমনকি সে ক্ষেত্রেও যেখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ একরকম নয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সরকারি রাজস্বের সংস্কার সরকারি খাতে করারোপ ও ব্যয় এবং বাজেট ঘাটতি হ্রাসে অধিকতর দক্ষতা ও সাম্য প্রচলনে সাহায্য করতে পারে। এভাবে অপচয়মূলক ও অনুৎপাদনশীল ব্যবহার থেকে চাহিদা পূরণ এবং উচ্চহারে মূলধন গঠন, রপ্তানি ও প্রবৃদ্ধিতে সম্পদ ব্যয়িত হবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুনাফা প্রবণতার স্বীকৃতি এবং সে সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক বস্তুগত প্রতিদান এবং চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ও বিবেকপূর্ণ কাজ শ্রমিকদের অধিকতর দক্ষতা এবং বর্ধিতহারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রণোদনা সৃষ্টি করবে। ভূমি সংস্কার, পল্লী উন্নয়ন ও দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক শিল্পের বৃদ্ধি উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার সম্প্রসারণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সাহায্য করবে। বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি এবং বিনিয়োগ ও রপ্তানির জন্য উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান উন্নয়ন তরান্বিতকরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে অপচয়মূলক ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকতে এসব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে। এভাবে এসব প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায়ী প্রতিভাকে অধিক হারে অর্থ যোগান দিতে সক্ষম হবে।

এর ফলে ভারসাম্য হ্রাসের প্রচেষ্টাই শুধু শক্তিশালী হবে না, তা ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা সম্প্রসারণের লক্ষ্য অর্জন এবং দ্রুতগতিতে উন্নয়নের জন্য জনগণের বৃহত্তর অংশের শক্তি ও সৃজনশীলতা কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ কারেন্ট একাউন্ট ঘাটতি হ্রাস এবং বিনিময় হারের অব্যাহত অধঃগতিরোধ প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তথাপিও যেসব দরিদ্র লোক স্বাবলম্বী নয়, তাদের স্বার্থ কেবল সাধারণ ভর্তুকির মাধ্যমে না দিয়ে সংঘবদ্ধ ও অধিকহারে ত্রাণ ও সম্পূরক আয় প্রদানের মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে। এসব অর্থ সরকার ও সামাজিক সংস্থাগুলো যাকাত, ওয়াকফ, স্বেচ্ছাভিত্তিক দান এবং বাজেটে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ থেকে মিটাবে। ইসলামী উত্তরাধিকার

ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক বৈষম্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখার উদ্যোগকে সহায়তা করবে।

নিওক্লাসিক্যাল সমন্বয়

উপরে যে কর্মকৌশল আলোচিত হলো তার বিপরীতে বৃহদাকারের অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে নিওক্লাসিক্যাল উদারনৈতিকতাবাদেও সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর আওতায় যে সমন্বয় কর্মসূচির পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তাতে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের সম্পৃক্ততা নেই। এটি সরলভাবে অনুভূত, যে অর্থনীতির উদারীকরণ শুধু ভারসাম্যহীনতা অপসারণেই সাহায্য করবে না, অধিকতর দক্ষতা ও ন্যায়পরতা অর্জনেও সহায়ক হবে। প্রাথমিক সমন্বয়গুলো হচ্ছে, বাজেট ঘাটতি হ্রাস এবং মূল্য বিকৃতির সংশোধন, বিশেষত বিনিময় হার ও সুদের হারে।[৮] সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের সমন্বয়সমূহ ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং এমনকি দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলো কি আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার সম্প্রসারণে নিজেদের সাহায্য করবে? বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বাজেট ঘাটতি দূরীকরণ এবং বাজার সংশ্লিষ্ট মূল্য প্রচলন সমন্বয়ের বড় বোঝাটি গরীবদের কাঁধেই চাপিয়ে দেয়, যতক্ষণ না তা সমান্তরালভাবে ন্যায়বিচার সম্প্রসারণের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে করা হয়। উচ্চতর মূল্য ধনীদের চাহিদায় উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি করে না, তারা যা চায় তা ক্রয় অব্যাহত রাখে। অথচ গরীব আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর ফলে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় এবং সরকার তখন তাদের অনুসৃত ব্যবস্থাগুলো গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

নিওক্লাসিক্যাল সমন্বয় কর্মসূচি এভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ উদার মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ঐতিহ্যের আওতায় প্রাথমিকভাবে সমস্যাটিকে তার স্থিতি ও নামমাত্র দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে থাকে এবং সাম্যের প্রতি কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান করে। যাইহোক, স্থিতিকরণ কর্মসূচি যদি দক্ষতা ও ন্যায়পরতা উভয় লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত হতো, তবে তার সফল হবার অধিকতর সুযোগ থাকত। কিন্তু এ ধরনের কর্মসূচি একটি মূল্যবোধনিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে তৈরি করা যায় না, যদি তা তৈরি করা হয় তবে তা একটি কার্যকর উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না। সেই ব্যবস্থা এমন যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণের সীমারেখার মধ্যে তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

কাজের গুরুত্ব ও ত্বরা

অতএব উপসংহারে বলা যায়, অর্থনীতি ও সমাজের ইসলামীকরণ ব্যতিরেকে ইসলাম যে ধরনের উন্নয়ন কল্পনা করে, মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণের সাহায্যে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। মুসলিম সরকারগুলো এ পর্যন্ত ইসলামকে কেবলমাত্র শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছে, ব্যর্থ হয়েছে তাদের অস্তিত্ব

রক্ষা করতে এবং সামাজিক ও অর্থনীতির উন্নতিতে যে ইতিবাচক অবদান ইসলাম রাখতে পারে তা অর্জনে। খুরশীদ আহমদ যথার্থই উল্লেখ করেছেন, 'এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, নীতিনির্ধারকরা ইসলাম থেকে সত্যিকার অর্থে কোনো উৎসাহ নিয়েছেন এবং তার অর্থনৈতিক আদর্শসমূহকে উন্নয়ন নীতিতে বাস্তবায়িত করেছেন'।[৯] এমনকি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিতে পরিবর্তন সত্ত্বেও সমন্বয় পুনর্গঠনের কাজ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হতে বাধ্য। নীতিনির্ধারকগণ যত তাড়াতাড়ি সময়ের চিহ্ন পড়বেন ততই তা তাদের ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হবে।

যাইহোক, সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামীকরণ সামান্য সমন্বয়ের চেয়ে আরো কঠিন কাজ। এতে আরো জোরদার ও সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তথাপি সাধারণ জনগণ তার জন্য আবেগপ্রবণভাবে প্রস্তুত বলে মনে হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস এটা দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ সাধন করতে পারবে। কায়েমী স্বার্থবাদী লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সরকারগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রধান প্রতিবন্ধক। ইসলাম যে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের কথা বলে, তা তাদের স্বল্পমেয়াদী স্বার্থকে (দীর্ঘমেয়াদী নয়) শংকাগ্রস্ত করে তোলে। এটাই অন্যতম কারণ, যে জন্যে গণতন্ত্রকে পর্যন্ত এসব দেশে শিকড় গাড়তে দেয়া হয়নি। গণতন্ত্র সরকারগুলোকে ইসলামীকরণে বাধ্য করত।

বিশেষ সুবিধাভোগী লোকদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, তারা ইসলামের মানবতাবাদী ধারণার মহাকর্ষীয় আকর্ষণকে দৃঢ় জনসমর্থন অর্জনে বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন যে গতি লাভ করেছে তা অবশ্যই আরো গতি সঞ্চার করবে এবং প্রতিরোধের সকল শক্তি মোকাবিলা করবে। সুবিধাভোগী শক্তি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হবে; যেমন কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, "ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা অবশিষ্ট থাকে" (১৩ : ১৭)। একইভাবে কেইনস মন্তব্য করেছেন, 'আমি নিশ্চিত যে চিন্তাধারা যেভাবে ধীরে ধীরে জায়গা দখল করে, তার তুলনায় সুবিধাভোগী শ্রেণীর শক্তিকে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। অবশ্যই এখনি নয়, তবে কিছু বিরতির পর সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, বরং চিন্তাধারাই ভালো বা মন্দের জন্যে মারাত্মক হবে'।[১০] অতএব ধনী ও শক্তিশালী শ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থেই উচিত হবে সমাজ সংস্কারের প্রবল স্রোতকে বাধা না দেয়া, বরং সংস্কারকে মেনে নেয়া।

তবে ইসলামীকরণকে মুসলিম দেশসমূহের সকল সমস্যার প্রতিষেধক হিসেবে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতন, বিপথগামী ঘরোয়া নীতিসমূহ এবং অসুস্থ বহিঃপ্রভাবসৃষ্ট সমস্যাসমূহের কিছু কিছু অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করবে এবং এও অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, ইসলামীকরণ একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া যা শক্তি প্রয়োগ বা কড়াকড়ি করে তাৎক্ষণিকভাবে অর্জন করা যায় না। আল-

কোরআনের প্রক্রিয়ায় (১৬ : ১২৫) 'জ্ঞান ও বোধই হতে হবে ইসলামীকরণের স্তম্ভ। এমনকি নবী করীম (স) নিজে উদাহরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনকে উৎসাহিত করেছেন।

দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশ ইতোমধ্যেই যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং এর ফলে দারিদ্র্য, অসমতা, অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, বৈদেশিক ভারসাম্যহীনতা ও বিরাট বৈদেশিক ঋণের জন্ম দিয়েছে তাতে খুব বেশি সময় দেয়ার সুযোগ নেই। এমনকি যদি উল্লেখযোগ্য নীতিনির্ধারণী উদ্যোগও গৃহীত হয়, যে বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা রয়েছে তা অবিলম্বে উল্টিয়ে ফেলা যাবে না। তাছাড়া সোভিয়েত হুমকির হ্রাস মুসলিম দেশগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব এবং ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক সাহয্যের আগমন কমিয়ে দিতে পারে। এতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য আর্থ-সামাজিক সংস্কারে গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা আরো জরুরি হয়ে পড়েছে তাদের অধিকতর ইতিবাচক ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে। যত আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে তারা এ ভূমিকা পালন করবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যত বেশি সক্রিয় সমাজ সংস্কার কাজে নিয়োজিত সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে, রূপান্তরের জন্য সময় লাগবে তত কম। পবিত্র কোরআনে যেভাবে বলা হয়েছে তা থেকে তাদের অবশ্যই উৎসাহ গ্রহণ করতে হবে।

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন" (২৯: ৬৯)।

নোট ও তথ্যনির্দেশিকা (দ্বাদশ অধ্যায়)

১. Jay W. Forrester, cited by Alfred Malabre, Jr., *Beyond Our Means* (1987), p. xii,

২. Richard Easterlin, "Does Money Buy Happiness?" *The Public Interest,* Winter 1973, cited by Robert L. Heilbroner and Lester C. Thurow, in *The Economic Problem* (1975), p.
১৯২৮-৮৮ এর মধ্যে ষাট বছরে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও যুক্তরাজ্যের প্রকৃত জিডিপি যথাক্রমে ৬.০, ৭.১ এবং ৩.৪ গুণ বেড়েছে। অথচ ১৯৩০-৮৮ এই সময়সীমায় জাপানের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে ১৭.৮ গুণ। দেখুন, "The Next Ages of Man: A Survey", The Economist, 24 Decmber 1988, pp. 5-6 of the Survey Section)। ১৯২৮-৮৫ সালর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৬.৫ গুণ (Gur Offer, "Soviet Economic Growth: 1928-1985", *Journal of Economic Literature*, December 1987, Table 1, p. 1778)-গ্রন্থে ১৯২৮-৮৫ সালের সময়কালের প্রবৃদ্ধির হারের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে)। যাই হোক, আয় ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এসব দেশসমূহে সুখ-শান্তির প্রসার ঘটেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ-শান্তি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে মর্মে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছে।

৩. দেখুন, Ralf Dahrendorf, *The Modern Social Conflict: An Eassy on the Politics of Liberty* (1988). আরো কতিপয় লেখক একই ধরনের প্রশ্ন

উত্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ Leonard Silk এর লেখার উদ্ধৃতি, 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিই যদি দারিদ্র্য নিরসনের সার্বিক সমাধান হয়ে থাকে, তবে গত দুই দশকে কেন মার্কিন দারিদ্র বেড়ে গেছে' (Leonard Silk, "Dismal Scientists Adopt Kinder, Gentler Stance", *International Herald Tribune*, 31 December 1988, p. 13).

৪. I Adelman and C. T. Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries* (1973), p. 189.

৫. Lester C. Thurow, "Equity, Efficiency, Social Justice, and Redistribution", in OECD, *The Welfare State in Crisis* (1981), p. 137.

৬. *Ibid*, p. 140, আরো দেখুন, Gunnar Myrdal, "Need for Reforms in Underdeveloped Countries", *Quarterly Economic Journal* (National Bank of Pakistan), March 1979, p. 29.

৭. দেখুন, Rene Dumont, *False Start in Africa (1966);* IBRD, *World Development Report,* 1984; and ILO, *Poverty and Landless in Rural Africa* (1677).

৮. দেখুন, IMF, *Theoretical Aspect of the Design of Fund-Supported Adjustment Programs* (Occassional Paper 55, 1987); Said El-Naggar (ed.), *Adjustment Policies and Development Strategies in the Arab World* (1987); Paul Streeten (ed.), *Beyond Adjusment; The Asian Experience* (1988); Vittoria Corbo, *e al.* (eds.), *Growth-Oriented Adjustment Programs* (1987).

৯. K. Ahmad, "Economic Development in an Islamic Perspective", in K. Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (1980), p. 173. ড. আমিনের মতে এমন কি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাতে যে প্রেরণা কাজ করে তা'ও এক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি বলেন, 'দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শনের পরিবর্তে আরব দেশগুলোর সরকারসমূহ বিস্ময়করভাবে দুর্বল অভিপ্রায় ব্যক্ত করে... অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে অধিক বেশি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার বাসনা"। Galal A. Amin "The Modernization of Poverty", *Social Economic and Political Studies of the Middle East* (1980), vol. 8, p. 108);

১০. J. M. keynes, quoted by Julian Le Grand, *The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Services* (1982), p. 139.

শব্দকোষ

আদালাহ : ন্যায়বিচার

আ'হাদিস : হাদিসের বহুবচন।

আমানাহ : ট্রাস্ট (আমানত)।

আমিন : ট্রাস্টি (আমানতদার)।

আওকাফ : ওয়াকফ এর বহুবচন।

ফালাহ : মানবসত্তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে যে কল্যাণ সাধিত হয়। আরো দেখুন 'হায়াতে তাইয়্যেবা'।

ফারদ আইন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা।

ফারদ কিফায়া : মুসলিম সমাজের সামষ্টিক কর্তব্য।

ফাসাদ : দুষ্কর্ম, দুষ্টচক্র ও দুর্নীতি; অর্থাৎ যা কিছু সালাহ এর বিপরীত।

ফিকহ : মুসলিম আইনশাস্ত্র; এতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ জীবনের সকল দিক আলোচিত হয়। এতে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা (নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব) ছাড়াও পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, সামাজিক কর্তব্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, ফৌজদারী আইন, সাংবিধানিক আইন ও যুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ফিকহের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে ঃ আল-কোরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বিতীয়ত ঃ ইজমা (ঐকমত্য) ও ইজতেহাদ (শাস্ত্রীয় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়াস)।

ফুকাহা : ('ফকিহ' শব্দের বহুবাচক)। যে সকল আইনজ্ঞ আল-কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন এবং এর মধ্যে ফিকহ শাস্ত্রের উন্নয়নের কাজ করেন।

হাদিস : (বহুবচনে আ'হাদিস)। মহানবী (স) এর ভাষ্য, কাজ ও মৌন সম্মতি বিষয়ক কাজ।

হালাল : যা কিছু শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত।

হারাম : যা কিছু শরীয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ।

হায়াতে তাইয়্যেবা : মানবসত্তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে যে কল্যাণ সাধিত হয়। অন্য সংস্কৃতিতে 'উত্তম জীবন' বলতে 'আনন্দ-স্ফূর্তি' মিলাদ, নারী ও সুরা-এর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া, হায়াতে তাইয়্যেবার অর্থ মোটেই তার সমার্থক নয়।

হকুক আল-ইবাদ : অন্য মানুষের প্রতি একজন ব্যক্তির কর্তব্য, যেমন তাদের অধিকার।

ইবাদাহ : উপাসনা। ব্যাপক অর্থে ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন।

ইমাম : এ পুস্তকে প্রচলিত অর্থে যিনি নামাজে ইমামতি করেন তাকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য শব্দটি মুসলিম আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের কিংবা আলী ইবনে আবু তালেবের প্রখ্যাত অনুসারীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিয়া ধর্মবেত্তাদেরও বুঝানো হয়ে থাকে। হাদিস শাস্ত্রে শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

খলিফাহ : প্রতিনিধি।

খিলাফাহ : প্রতিনিধিত্ব।

মাকাসিদ : মাকাসিদ আল শরীয়াহর সংক্ষিপ্ত রূপ।

মাকাসিদ আল শরীয়াহ : শরীয়াহর লক্ষ্যসমূহ।

কুদওয়াহ্

হাসানাহ : উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

কোরআন : রাসূলুল্লাহ (স) এর ২৩ বছরের নবুয়তের জীবনে মহান আল্লাহ তার কাছে যে বাণীসমূহ নাজিল করেছেন তার সমন্বিত গ্রন্থ যা মুসলমানদের জন্য পবিত্র। পবিত্র কোরআনে ইসলামী আকিদা বা বিশ্বাসের মৌলভিত্তি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে, মুসলিম জীবনের বিশ্বাস ও পদ্ধতির বিবরণ। এসব বিষয় আবার পরবর্তীতে সুন্নাহর দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল-কোরআনের উদ্ধৃতি অত্র গ্রন্থে দেয়া হয়েছে (যেমন-৩০:৪১), তার প্রথম সংখ্যাটি দ্বারা সূরা (বা অধ্যায়) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি 'আয়াত' (বা পংক্তি) বুঝানো হয়েছে।

সাদাকাত : কোনো ব্যক্তির বৈধ আয় থেকে সকল প্রকার দাতব্য কাজের জন্য ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে।

শরীয়াহ : আল-কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রদত্ত ঐশী নির্দেশনা যাতে বিশ্বাস ও কর্মসহ ইসলামী সকল দিককে বুঝানো হয়।

শুরা : অর্থ পরামর্শ, তবে বিশেষ অর্থে এটা হচ্ছে মুসলিম সরকারের জন্য অবশ্যকরণীয় যে, তারা জনগণ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোনো নীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করবে না।

সুন্নাহ : পবিত্র কোরআনের পরেই সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং বিশেষ করে মহানবী (স) এর আমলী জিন্দেগী বা ব্যবহারিক জীবনের বর্ণনা এতে রয়েছে।

সূরা : পবিত্র কোরআনের এক একটি অধ্যায়। বিভিন্ন আকারের ১১৪টি সূরা আল-কোরআনে রয়েছে। অত্র গ্রন্থে আল-কোরআনের যেসব দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে (যেমন- ৩০ : ৪১) তাতে প্রথম সংখ্যাটি দ্বারা সূরা এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বারা আয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

তাওহীদ : একত্ববাদ ও আল্লাহর একক সত্তা।

ওলামা : ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ। ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা সকল উচ্চ শিক্ষিত ও পেশাদারী ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়।

উম্মাহ : জাতি। বিশেষ অর্থে ইসলামে গুরুত্বহীন বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়।

উশর : প্রধানত গরীব ও দুঃস্থদের সাহাযার্থে যাকাতের মতো একজন মুসলমান কর্তৃক তার উৎপাদিত কৃষি পণ্য থেকে শতকরা ১০ ভাগ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ) ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রদান করা।

ওয়াকফ : বিশেষ কোনো দাতব্য কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে যে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয়।

যাকাত : প্রধানত গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে একজন মুসলমান কর্তৃক তার মোট সম্পদের একটি অংশ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রদান করা।

যুলুম : ইসলামী পরিভাষায় ব্যাপক অর্থে সকল প্রকার বৈষম্য, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন ও দুষ্কর্ম বুঝানো হয় যা দ্বারা কোনো লোক অন্যকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অথবা অন্যের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে না।

গ্রন্থপঞ্জী

Bibliography

PART I: THE UNSUCCESSFUL SYSTEMS

Abramovitz, Moses, "Economics of Growth", in B. F. Haley (1952), vol. 2, pp. 132-82.

Adam, Jan (ed.), *Employment Policies in the Soviet Union and Eastern Europe* (London: Macmillan, 2nd ed.,1987).

Adams, Charles, Paul Fenton and Flemming Larson, "Differences in Employment Behaviour among Industrial Countries", IMF, *Staff Studies for the World Economic Outlook*, July 1986.

Adelman, I., "Development Economics: A Reassessment of Goals", *American Economic Review*, Papers and Proceedings, 1975.,

—, *Redistribution Before Growth* (Leiden: University of Leiden,1979).

— and C. T. Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries* (Stanford, California: Stanford University Press, 1973).

— and Erik Thorbecke (eds.), *Theory and Design of Economic Development* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1966).

Aganbegyan, Abel, *The Challenge: Economics of Perestroika* (London: Century Hutchinson, 1988).,

—, *Inside Perestroika: The Future of the Soviet Economy* (New York: Harper & Row, 1989).

Armstrong, Philip, *et al.*, *Capitalism Since 1945* (Oxford: Basil Blackwell,1991).

Arndt, H. W., "Development Economics before 1945", in Jagdish Bhagwati and Richard Eckaus, *Development and Planning: Essays in Honour of Paul Rosenstein-Rodan* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1972), pp. 13-29.,

—, *Economic Development: The History of an Idea* (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

Arnold, Thurman W., *The Folklore of Capitalism* (New Haven: Yale University Press, 1959).

Arrow, K. J., *Social Choice and Individual Values* (New York: John Wiley, 2nd ed., 1963).

Aslund, Anders, Gorbachev's Struggle for Economic Reform (Lon don: Pinter, 1989).

Australian Bureau of Agricultural and Research Economics, Japan;-Agricultural

Policies, Policy Monograph No. 3, Canberra 1988.

Ayers, Robert L., Banking on the Poor (Cambridge, Mass.: MIT Pres-1983).

Balassa, Bela, *et al., Development Strategies in Semi-Industna. Economies* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1982).

Bank for International Settlements, 59th Annual Report - April 1988-March 1989 (Basle: BIS, June 1989).

—, *60th Annual Report,* April 1989-March 1990 (Basle: BIS. June 1990).

Baran, Paul A., "On the Political Economy of Backwardness", The Manchester School of Economic and Social Studies, Januan 1952, pp. 66-84.

—, *The Political Economy of Growth* (New York: Monthly Review Press, 1957).

— and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order* (New York: Modem Reader Paperbacks, 1966).

Bardhan, Pranab, "Symposium on the State and Economic Development", Journal of Economic Perspectives, Summer 1990, pp. 3-7.

Barnett, Richard J. and Ronald E. Muller, Global Reach: The Power of the Multinational Corporations (New York: Guinon & Schuster, 1974).

Barr, N., The Economy of the Welfare State (London: Weidenfeld and Nicolson, 1987).

Barzun, Jacques, Darwin, Marx, Wagner (New York: Doubleday, 1958).

Batra, Raveendra N., *The Downfall of Capitalism and Communism: A New Study of History* (London: Macmillan, 1978).

Bauer, Peter T. and Basil S. Yamey, *The Economics of Underdeveloped Countries* (Chicago: The University of Chicago Press, 1957).

—, *Dissent on Development* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972).

Baum, Warren C. and Stokes M. Tolbert, *Investing in Development* (Washington, D.C.: The World Bank, 1985).

Bean, Charles, *et al. (eds.), The Rise in Unemployment* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

Bell, Daniel, The Cultural Contradictions of Capitalism (New York: Basic Books, 1976).

— and Lester Thurow, The Deficits: How Big? How Long? How Dangerous? (New York: New York University Press, 1985). Benedict, R., The Chrysanthemum and the Sword (Boston: Houghton Mifflin, 1946).

Bergson, Abram, "Income Inequality Under Soviet Socialism", Journal of Economic Literature, September 1984.

Berle, Adolf A. Jr., The Twentieth Century Capitalist Revolution (New York: Harcourt, 1954).

Berry, R. A. and W. R. Cline, Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979).

Beus, J. G. de, Shall We Make the Year 2000?: The Decisive Challenge to Western Civilisation (London: Sidgwick & Jackson, 1985).

Bhagwati, J. and A. Kruger, "Exchange Control, Liberalisation and Development", American Economic Review, 2/1973, pp. 419- 27.

— and Richard Eckaus, Development Planning: Essays in Honour of Paul Rosenstein-Rodan (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1972).

Bhatt, V. V., "Improving the Financial Structure", Finance and Development, June 1986.

Birch, David, *The Job Generation Process* (Cambridge, Mass.: MIT, Programme on Neighbourhood and Regional Change, 1979).

Boonekamp, Clemens, "Industrial Policies of Industrial Countries", *Finance and Development,* March 1989.

Boulding, Kenneth E., Beyond Economics: Essays on Society, Religion and Ethics (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968).

—, *A Preface to Grants Economics: The Economy of Love and Fear* (New York: Praeger, 1973).

—, Human Betterment (London: Sage Publications, 1985).

Bracewell, Milnes, *The Wealth of Giving* (London: The Institute of Economic Affairs, 1989).

Brady, Nicholas *E. et al., Report of the Presidential Task Force on Market Mechanics* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, January 1988).

Brandt Commission, *North-South: A Programme for Survival* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980).

—, *Common Crisis: North-South Cooperation for World Recovery* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983).

Briggs, Asa, "The Welfare State in Historical Perspective", *Archives Europeennes de Sociologie,* 1961.

Brinton, Crane, "Enlightenment", in *Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan and the Free Press, 1967), Vol. 2.

Britnell, G. E., "Factors in the Economic Development of Guatemala", *American Economic Review,* May 1953, pp. 104-14.

Brittan, Samuel, *Two Cheers for Self-interest: Some Moral Prerequisites for a Market Economy* (London: The Institute of Economic Affairs, for the Wincott Foundation, 1985;

—, *The Role and Limits of Government: Essays in Political Economy* (Aldershot, Hampshire: Wildwood House In: Impression, 1987).

Bruce, Maurice, *The Coming of the Welfare State* (London: Batsford, Fourthed., 1968).

Brunberg, Abraham (ed.), *Russia Under Khruschev* (New York : Praeger, 1962).

Bruton, Henry, *Inflation in a Growing Economy* (Bombay: University of Bombay, 1961).

—, "The Two-gap Approach to Aid and Development", *American Economic Review,* September 1 966.

Buck, Trevor and John Cole, *Modern Soviet Economic Performance* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

Burton, John, *Why No Cuts: An Inquiry into the Fiscal Anarchy of Uncontrolled Government Expenditure* (London: The Institute : Economic Affairs, 1985).

Burtt, Edwin A., *The Metaphysical Foundations of Modern Science* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1955).

Chapel, Rothko, *A New Strategy for Development* (New York : Pergamon Press, 1979).

Chenery, Hollis, *Structural Change and Development Policy* (Oxford University Press, for the World Bank, 1970).

—, with A. Strout, "Foreign Assistance and Economic Development", *American Economic Review,* September 1966.

— *et al., Redistribution with Growth: An Approach to Policy* (Oxford University Press, 1974).

— and T. N. Srinivasan (eds.), *Handbook of Development Economics* (Amsterdam: North-Holland, vol. 1: 1988, vol. 2. 1989).

Churchill, Winston, *The Hinge of Fate* (Boston: Houghton Mifflin 1950).

Clark, C. H. D., *Christianity and Bertrand Russell* (London, 1958). Cline, William R., *Potential Effects of Income Redistribution on Economic Growth* (New York: Praeger, 1973).

Collard, D., R. Lecomber and M. Slater (eds.), *Income Distribution: The Limits to Redistribution* (Bristol: John Wright, 1980).

Colman, D. and F. Nixson, *Economics of Change in Less Developed Countries* (Oxford: Philip Allan, 2nd. ed., 1986).

Commission of the European Communities, *European Economy,* Supplement A on Highlights on Employment and Unemployment, December 1989.

—, "Economic Transformation in Hungary and Poland", *European Economy,* No. 43, March 1990.

—, "Stabilisation, Liberalisation and Devolution: Assessment of the Economic Situation and Reform Process in the Soviet Union", *European Economy,* No. 45, December 1990.

Commons, John R., *Legal Foundations of Capitalism* (Madison: The University of Wisconsin Press, 1968).

Corbo, Vittoria, Morris Goldstein and Mohsin Khan, *Growth-Oriented Adjustment Programmes: Proceedings of a Symposium Held in Washington, D.C., February 25-27, 1987* (Washington, D.C.: IMF/IBRD, 1987).

Coser, Lewis A., "Socialism", *The New Encyclopedia Britannica*, 15th ed. (1973-4), vol. 16.

Crosland, C. A. R., *Socialism Now* (London: Jonathan Cape, 1974).

—, *The Future of Socialism* (London: Jonathan Cape, 1963 ed. reprinted in 1985).

Dahrendorf, Ralf, *The Modern Social Conflict: An Essay on the Politics of Liberty* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1988).

Dalton, George, *Economic System and Society* (Kingsport, Tenn.: Kingsport Press, 1974).

Danziger, S., P. Gottschalk and E. Smolensky, "American Income Inequality: How the Rich have Fared", *American Economic*

Review, May 1989, pp. 310-14. Dasgupta, Partha, "Well-being and the Extent of its Realisation in Poor Countries", *The Economic Journal*, Supplement 1990, pp.1-32.

Datta, Anindya, *Growth and Equity: A Critique of the Lewis-Kuznets Tradition* (Calcutta: Oxford University Press, 1986).

Datta-Chaudhuri, Mrinal, "Market Failure and Government Failure", *Journal of Economic Perspectives*, Summer 1990, pp. 25-39.

Desai, Padma, *The Soviet Economy in Crisis* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

Development Committee, *Strengthening Efforts to Reduce Poverty* (Washington, D.C.: World Bank, 1989).

Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Republic of Taiwan, *Statistical Yearbook of the Republic of China, 1988.*

Dixon, John, *The Chinese Welfare System, 1949-1979* (New York: Praeger, 1981).

Dobb, Maurice, *Studies in the Development of Capitalism* (London: Routledge & Kegan Paul, 1963).

Dorn, James A. and Wang Xi (eds.), *Economic Reform in China: Problems and Prospects* (Chicago: University of Chicago Press, 1990).

Dosser, Douglas, "General Investment Criteria for Less Developed Countries", *Scottish Journal of Political Economy*, June 1962, pp. 93-8.

Dumas, Lloyd Jeffry, *The Overburdened Economy: Uncovering the Causes of Chronic Unemployment, Inflation and National Decline* (Berkeley, California: University of California Press, 1986).

Durant, Will, *The Story of Civilisation* (New York: Simon & Schuster, 1953).

—, *The Story of Philosophy* (New York: Washington Square Press, 1970).

— and Ariel, *The Lessons of History* (New York: Simon & Schuster, 1968).

Edgeworth, F. Y., *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Science* (London: Kegan Paul, 1881).

Edwards, Paul, "Life, Meaning and Value of", *Encyclopaedia of Philosophy* (New York: Macmillan and the Free Press, 1967), vol. 3, pp. 467-77.

Ellis, Howard S., *Economic Development for Latin America* (London: Macmillan, 1961).

Ellman, M., *Planning Problems in the USSR* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973).

—, *The USSR in the 1990s: Struggling out of Stagnation* (London: Economist Intelligence Unit, 1990).

Ellsworth, P. T., "Factors in the Economic Development of Ceylon", *American Economic Review,* May 1953, pp. 115-25.

Emmerij, Louis, "The Social Economy of Today's Employment Problem in Industrial Countries", in *Unemployment in Western Countries: Proceedings of a Conference held by the International Economic Association at Bichenberg, France* (London: Macmillan, 1980).

— (ed.), *Development Policies and the Crisis of the 1980s* (Paris: Development Centre of the OECD, 1987).

Emmott, Bill, *The Sun also Sets: Why Japan will not be Number One* (Hemel Hempstead, U.K.: Simon & Schuster, 1989).

Fairbank, John K., *The Great Chinese Revolution J800-1985* (New York: Harper & Row, 1986).

Feldt, Kjell-Olof, "The Acceptable Face of Socialism", *Financial Times,* 16 June 1988, Section IV, p. iv.

Feuer, Lewis S., "Marx", *The New Encyclopaedia Britannica* (Chicago: Helen Hamingway Benton), 15th ed. (1973-74), vol.11.

Fine, Sidney, *Laissez-Faire and the General Welfare State* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1966).

Fishlow, Albert, "The Latin American State", *Journal of Economic Perspectives,* Summer 1990, pp. 61-74.

Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom* (Chicago: The University of Chicago Press, 1972).

—, "The Methodology of Positive Economics", in F. Hahn and M. Hollis (1979).

— and Rose, *Free to Choose* (London: Seeker & Warburg, 1980).

Furniss, Norman and Timothy Tilton, *The Case for the Welfare State: From Social Security to Social Equality* (Bloomington, Indiana: International Union Press, 1977).

Galbraith, John K., *The Affluent Society* (Boston: Houghton Mifflin, 1958).

—, *American Capitalism: The Concept of Countervailing Power* (Boston: Houghton Mifflin, 1962).

—, *Economic Development in Perspective* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962).

—, *The New Industrial State* (New York: New American Library, 1972).

—, *Economics and the Public Purpose* (New York: New American Library, 1975). See also the review on this book, "Economics *Sans* Man *Sans* Purpose", by Gaafar Idris in *Impact* (London), 11 July 1974,p. 8.

—, *Economics in Perspective* (Boston: Houghton Mifflin, 1987).

Galenson, W. and H. Leibenstein, "Investment Criteria, Productivity and Economic Development", *Quarterly Journal of Economics,* August 1955, pp. 343-70.

Gemmell, Norman, *Surveys in Development Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

George, Henry, *Progress and Poverty* (New York: Robert Schalken- bach Foundation, 1955).

Geras, Norman, *Marx and Human Nature: Refutation of a Legend* (London: Verso, 1983).

Gersovitz, Diaz, Ranis and Rosenweig (eds.), *The Theory and Experience of Economic Development* (London: Allen & Unwin, 1982).

Gilbert, Neil, *Capitalism and the Welfare State: Dilemmas of Social Benevolence* (New Haven: Yale University Press, 1983).

Girvetz, Harry K., "Welfare State", *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York: Macmillan and the Free Press,1968), vol. 16.

Goldman, Marshal I., *U.S.S.R. in Crisis: The Failure of an Economic System* (New York: Norton, 1983).

Gonzales-Vega, C. and V. H. Cespedes, *Growth and Equity: Changes in Income Distribution in Costa Rica* (New York: United Nations,1983).

Gorbachev, Mikhail, *New Thinking for Our Country and the World* (New York: Harper & Row, 1987).

Gottlieh, Mannuel, *A Theory of Economic Systems* (Orlando: Harcourt Brace, 1984).

Government of India, Planning Commission, *The First Five Year Plan: A Summary* (New Delhi, 1952).

Government of Pakistan, National Planning Board, *The First Five Year Plan 1955-60* (Karachi, December 1957).

—, *The Second Five Year Plan (1960-65)* (Karachi, June1960).

—, *The Constitution of the Republic of Pakistan* (Karachi,1962).

Grand, J. and S. Estrin (eds.), *Market Socialism* (Oxford University Press, 1989).

Gray, Alastair, "Health and Society: Reflections on Policy", *IDS Bulletin,* October 1983, pp. 3-9.

Greenberg, Edward S., *Serving the Few: Corporate Capitalism and the Bias of Government Policy* (New York: John Wiley, 1974).

— and Richard Young, *American Politics Reconsidered* (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1973).

Gregory, Paul R. and Robert C. Stuart, *Soviet Economic Structure and Performance* (New York: Harper & Row, 3rd ed., 1986).

Griffin, Keith, *International Inequality and National Poverty* (London: Macmillan, 1978).

— and A. R. Khan, "Poverty in the Third World: Ugly Facts and Fancy Models", *World Development,* 6/1978, pp. 1271-80.

Gudgin, Graham, *Industrial Location Processes and Employment Growth* (London: Gower, 1978).

Haberler, Gottfried, "Liberal and Illiberal Development Policy", in Meier (1987).

Hacker, Andrew *et al.,* "Corporation, Business", *The New Encyclopaedia Britannica,* 15th ed. (1973-74), vol. 5.

Hagen, E. E., *On the Theory of Social Change* (Homewood, 111.: Dorsey Press, 1962).

Hahn, Frank and Martin Hollis (eds.), *Philosophy and Economic Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1979).

Haley, B. F., *A Survey of Contemporary Economics* (Homewood, 111.: Richard D. Irwin, 1952).

Hancock, D. Arnold and Gideon Sjoberg, *Politics in the Post Welfare State* (New York: Columbia Press, 1972).

Haq, Mahboobul, *The Strategy of Economic Planning: A Case Study of Pakistan* (Karachi: Oxford University Press, 1963).

— and Moin Baqai (eds.), *Employment, Distribution, and Basic Needs in Pakistan, Essays in Honour ofJawaid Azfar* (Lahore: Progressive Publishers, 1986).

Harrington, John J. Jr., "Converting from Western to Islamic Banking" (Pakistan), *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* (Villanova, PA), 2/1988, pp. 3-20.

Harrington, Michael, *Twilight of Capitalism* (London: Macmillan, 1977).

Harris, Ralph, *Beyond the Welfare State: An Economic, Political and Moral Critique of Indiscriminate State Welfare and a Review of*

Alternatives to Dependency (London: Institute of Economic Affairs, 1988).

Harrison, Alan, *Distribution of Income in Ten Countries,* Background Paper No. 7, Royal Commission on the Distribution of Income and Wealth (London: Her Majesty's Stationery Office, 1979).

Hasan, Parvez, *Korea: Problems and Issues in a Rapidly Growing Economy* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press - published for the World Bank, 1976).

Hattersley, Roy, *Economic Priorities for the Labour Government* (London: St. Martin's Press, 1987).

Hayek, F. A. von, *Individualism and Economic Order* (Chicago, 1948).

Hayter, Teresa, *Aid is Imperialism* (Harmondsworth: Penguin Books, 1969).

Heilbroner, Robert L., *The Limits of American Capitalism* (New York: Harper & Row, 1966).

— and Lester C. Thurow, in *The Economic Problem* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1975).

—, *The Making of Economic Society* (London: Prentice Hall, 6th ed., 1980).

Hemming, Richard and Ali M. Mansoor, *Privatisation and Public Enterprise* (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1988).

Hewett, A. (ed.), *Reforming the Soviet Economy* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1988).

Hicks, N., "Growth vs. Basic Needs: Is there a Trade-Off?" *World Development,*7/1979.

— and P. Streeten, "Indicators of Development: The Search for a Basic Needs Yardstick", *World Development,* 7/1979.

Hirsch, Fred, *Social Limits to Growth* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976).

Hirschman, Albert O., "The Welfare State in Trouble: Systematic Crisis or Growing Pains", *American Economic Review,* May 1980.

—, "The Rise and Decline of Development Economics", in *Essays in Trespassing* (New York: Cambridge University Press, 1981).

Hodgson, Geoffrey, *Economics and Institutions* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988).

Hofstadter, Richard, *Social Darwinism in American Thought,* revised edition (Boston: Beacon Press, 1962).

Hollis, Martin and Edward Nell, *Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

Holmes, Sir Frank (ed.), *Economic Adjustment: Policies and Problems* (Washington, D.C.: IMF, 1987).

Hook, Sidney (ed.), *Determinism and Freedom in the Age of Modern Science* (New York, 1958).

—, "Welfare State - A Debate that Isn't", in C. I. Schottland (ed.), *The Welfare State* (New York: Harper & Row, 1967).

—, *Revolution, Reform and Social Justice: Studies in the Theory and Practice of Marxism* (New York: New York University Press, 1975).

Hoselitz, Bert F., *The Progress of Underdeveloped Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1952)., *Sociological Aspects of Economic Growth* (New York: TheFree Press, 1960).

— *et al., Theories of Economic Growth* (Gleneve, 111.: Free Press, 1960).

Hough, Jerry, *Russia and the West: Gorbachev and the Politics of Reform* (New York: Simon & Schuster, 1988).

Howe, Irving (ed.), *Twenty-Five Years of 'Dissent': An American Tradition* (New York: Methuen, 1979).

IBRD, *The Basis of a Programme for Columbia* (Washington, D.C.: IBRD, 1950).

—, *World Development Report,* for all years since the first issue in 1978.

—, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries, 1986.*

—, *World Debt Tables: External Debt of Developing Countries, 1989-90* and *1990-91.*

ILO, *Employment Objectives in Economic Development: Report of a Meeting of Experts* (Geneva, 1961).

—, *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya* (Geneva: ILO, 1972).

—, *Poverty and Landless in Rural Asia* (Geneva: ILO, 1977).

IMF, *Fund-Supported Programmes, Fiscal Policy, and Income Distribution,* Occasional Paper No. 46 (Washington, D.C.: IMF, September 1986).

—, *Staff Studies for the World Economic Outlook* (Washington, D.C.: IMF, August 1987).

—, *Theoretical Aspects of the Design of Fund-Supported Adjustment Programs,* Occasional Paper No. 55 (Washington, D.C.: IMF, 1987).

—, *The Implications of Fund-Supported Adjustment Programmes for Poverty: Experience of Selected Countries,* Occasional Paper No. 58 (Washington, D.C.: IMF, 1988).

—, *Government Financial Statistics Yearbook* 1989 and previous years.

—, *International Financial Statistics.*

—, *World Economic Outlook,* May 1990.

Jameson, Kenneth P. and Charles K. Wilker (eds.), *Directions in Economic Development* (Notre Dame: Notre Dame University Press, 1973).

Jansen, Marius B., "Japan, History of", *The New Encyclopaedia Britannica,* 15th ed. (1973-74), vol. 10.

Japan, Ministry of International Trade and Industry, *Commercial Statistics and White Paper on International Trade* (1988).

Jay, Elizabeth and Richard Jay, *Critics of Capitalism: Victorian Reactions to Political Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Jegen, Mary E. and Charles K. Wilbur, *Growth with Equity* (New York: Paulist Press, 1979).

Jevons, W. S., *The Theory of Political Economy* (Reprint of the 1871 edition) (New York: A. M. Kelly, 1965).

Johnson, Elizabeth S. and Harry J. Johnson, *The Shadow of Keynes* (Oxford: Basil Blackwell, 1978).

Johnson, Harry G., *Money, Trade and Economic Growth* (London: George Allen & Unwin, 1962).

Jonas, Paul, Essays on the Structure and Reform of Centrally Planned Economic Systems *(Boulder: Col.: Social Science Monographs, 1990).*

Karen, Michael, "The New Economic System in the GDP: An Obituary", Social Studies, *April 1973, pp. 554-87.*

Keynes, J. M., The Collected Writings of John Maynard Keynes *(London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1972).*

Khan, Jaliluddin Ahmad, Alternatives for the Destiny of European Civilization *(Karachi: International Islamic Publishers, 1982).*

—, Atheistic Materialism: A Reaction to Orthodox Christianity *(Karachi: International Islamic Publishers, 1982).*

Knight, Frank H., "Social Economic Organisation", reprinted from his book, The Economic Organisation, *pp. 3-30, in W. Breit,* et at., Readings in Macroeconomics *(St. Louis: Times Mirror/ Mosby, 1986).*

Kohler, Heinz, Welfare and Planning: An Analysis of Capitalism Versus Socialism *(New York: Robert E. Kreiger, 2nd ed., 1979).*

Kolakowski, Main Currents of Marxism, *3 vols., tr. P. S. Fallan (Oxford: Clarendon Press, 1978).*

Kolko, Gabriel, Wealth and Power in America: An Analysis of Social Class and Income Distribution *(New York: Praeger, 1964).*

Kontorovich, V. (1986), "Soviet Growth Slowdown: Econometric Versus Direct Evidence", American Economic Review, *May 1986.*

Kornai, Janos, Economics of Shortage *(Amsterdam: North-Holland, 1980).*

—, *"The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality",* Journal of Economic Literature, *December 1986, pp.1687-737.*

Krueger, Anne O., "Government Failures in Development", Journal of Economic Perspectives, *Summer 1990, pp. 9-23.*

—, Economic Policy in Developing Countries *(Oxford: Basil Blackwell, 1991).*

Kunio, Yoshihara, Japanese Economic Development: A Short Introduction *(Tokyo: Oxford University Press, 1979).*

Kuznets, Simon, "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review, *March 1955.,*

"Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: Distribution of Income by Size", Economic Development and Cultural Change, *January 1963.*

—, Modern Economic Growth *(New Haven: Yale University Press, 1966).*

Lace, Lawrence J. (ed.), Models of Development: A Comparative Study of Economic Growth in South Korea and Taiwan *(San Francisco: ICS Press, 1986).*

Laird, Sam and Alexander Yeats, 'Non-tariff Barriers of Developed Countries, 1966-68", *Finance and Development,* March 1989, pp. 12-13.

Lal, Deepak, *The Poverty of Development Economics* (London: Hobart Paperback No. 16, 1984).

Lampman, Robert J., *The Share of Top Wealth-Holders in National Wealth, 1922-1956* - A Study by the National Bureau of Economic Research (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1962).

Lange, Oscar, *Political Economy* (New York: Macmillan, 1963).

Lappe, Frances M. and Joseph Collin, *World Hunger: Twelve Myths* (London: Earthsean, revised ed., 1988).

Layard, Richard, *How to Beat Unemployment* (Oxford: Oxford University Press, 1986).

Lebergott, Stanley, "The Shape of the Income Distribution", *American Economic Review,* June 1959, pp. 328—47.

—, "Income Distribution II (Size)", *International Encyclopedia of the Social Sciences* (1968), vol. 7.

Lee, E., "Egalitarian Peasant Farming and Rural Development: The Case of South Korea", *World Development, 1* (1979), pp. 493-517.

Leeman, Wayne A. (ed.), *Capitalism, Market Socialism and Central Planning: Readings in Comparative Economic Systems* (Boston: Houghton Mifflin, 1963).

Le Grand, Julian, "Who Benefits from Public Expenditure?" *New Society,* vol. 45, No. 833, 1978.

—, *The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Services* (London: Allen & Unwin, 1982).

Leibenstein, Harvey, *Economic Backwardness and Economic Growth* (New York: John Wiley, 1957).

—, "Notes on Welfare Economics and the Theory of Democracy", *Economic Journal,* June 1962, pp. 299-317.

—, *Beyond Economic Man* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976).

Lekachman, R., *Economists at Bay* (New York: McGraw Hill,1976).

Lerner, Warren, *A History of Socialism and Communism in Modern Times: Theorists, Activists and Humanists* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1982).

Lewis, Russell, *The Survival of the Capitalist System: Challenge to the Pluralist Societies of the West* (London: Institute for the Study of Conflict, 1977).

Lewis, W. Arthur, *The Theory of Economic Growth* (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1955).

—,"A Review of Economic Development", *Manchester School,* May 1965, pp. 1-16.

Lichtheim, George, *Marxism* (New York: Praeger, 1961).

—, *A Short History of Socialism* (Glasgow: Collins, 1978).

Lindemann, Albert S., *A History of European Socialism* (New Haven: Yale University Press, 1983).

Lipton, D. and Sachs, J., "Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland", *Brookings Papers on Economic Activity,* vol. I, pp. 75-145.

Little, Ian M. D., *Economic Development: Theory, Policy and International Relations* (New York: Basic Books, 1982).

Lockwood, William W., *The Economic Development of Japan: Growth and Structural Change* (Princeton: Princeton University Press, 1968).

Lovejoy, Arthur, *The Great Chain of Being* (New York: Harper & Brothers, 1960).

Lundberg, Ferdinand, *The Rich and the Super Rich: A Study in the Power of Money Today* (New York: Bantam Books, 1969).

Lutz, M. A. and K. Lux, *The Challenge of Humanistic Economics* (Menlo Park, Calif.: Benjamin/Cummings, 1979).

Luxemburg, Rosa, *Reform or Revolution* (Oxford: Oxford University Press, 1963).

Magdoff, Harry and Paul M. Sweezy, *The Deepening Crisis of U.S. Capitalism* (New York: Monthly Review Press, 1981).

Malabre, Alfred, Jr., *Beyond Our Means* (New York: Random House, 1987).

Malinvaud, E. and Jean-Paul Fitoussi (eds.), *Unemployment in Western Countries* - Proceedings of a Conference held by the International Economic Association at Bischenberg, Franca (London: Macmillan, 1980).

Malthus, T., *An Essay on the Principle of Population* (London: J. Johnson, 2nd ed., 1803).

Mandelbaum, K., *The Industrialisation of Backward Areas* (Oxford: Basil Blackwell, 1945).

Manser, Anthony, *Sartre: A Philosophic Study* (London: Athlone Press, 1966).

Marsh, David, *The Future of the Welfare State* (London: Penguin, 1964).

Marx, Karl, *Selected Writings in Sociology and Social Philosophy,* (tr. T. B. Bottomore) T. B. Bottomore and M. Rubel (eds.), (London: Penguin, 1963).

— and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (New York: International Publishers, 1948).

—, ed., Lewis Feuer, *Basic Writings on Politics and Philosophy* (Garden City, N.Y.: Anchor, 1959).

Masai, Yasuo, "Japan", *The New Encyclopaedia Britannica,* 15th ed. (1973-74), vol. 10, p. 49.

Maslow, Abraham, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1970).

Mason, Edward S., "Corporation", *International Encyclopaedia of Social Sciences* (1968), vol. 3.

—, (ed.), *The Corporation in Modern Society* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980).

— *et al., The Economic and Social Modernisation of the Republic of Korea* (Cambridge: Harvard University Press, 1980).

Mathews, R. C. O. and G. P. Stafford, *The Grants Economy and Collective Consumption* (London: Macmillan, 1982), p. 77.

McInnes, Neil, "Karl Marx", *The Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 5.

McKeown, Thomas, *The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis?* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979).

McKibben, Bill, *The End of Nature* (New York: Viking, 1989).

Meadows, D. H. *et al., The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind* (London: Pan Books, 1974).

Medvedev, Roy, *Let History Judge*, tr. George Shriver (New York: Columbia University Press, 1989).

Meier, Gerald M., *Leading Issues in Development Economics: Selected Materials and Commentary* (New York: Oxford University Press, 1964).

— and Dudley Seers (eds.), *Pioneers in Development*, First Series (New York: Oxford University Press, 1984).

—, *Emerging from Poverty: The Economics that Really Matters* (New York: Oxford University Press, 1984).

—, (ed.), *Pioneers in Development*, Second Series (New York: Oxford University Press, 1987).

Miller, George A., *Psychology: The Science of Mental Life* (New York: Harper & Row, 1962).

Millhand, Ralph, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books, 1969).

Mills, C. Wright, *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1959).

Mincer, Jacob, "The Distribution of Labour Incomes: A Survey with Special Reference to the Human Capital Approach", *Journal of Economic Literature*, March 1970, pp. 1-26.

Minford, P., *Unemployment, Cause and Cure* (Oxford: Basil Black-well, 2nd ed., 1985).

Mini, Pier, V., *Philosophy and Economics: The Origins and Development of Economic Theory* (Gainsville: The University Presses of Florida, 1974).

Minsky, Hyman P., *Stabilising an Unstable Economy* (New Haven: Yale University Press, 1986).

Mintz, Morton and Jerry S. Cohen, *America, Inc.: Who Owns and Operates the United States* (New York: The Dial Press, 1971).

Mises, Ludwig von, *Socialism: An Economic and Sociological Analysis*, tr. from the Gennan by J. Kahane (London: Jonathan Cape, 1974).

Mishan, E. J., *The Costs of Economic Growth* (Harmondsworth: Penguin Books, 1973).

—, *Cost Benefit Analysis: An Introduction* (New York: Praeger, 1971).

Moore, Barrington, Jr., *Reflections on the Causes of Human Misery and Upon Certain Proposals to Eliminate Them* (London: Allen Lane, the, Penguin Press, 1972).

Morawetz, David, *Twenty-five Years of Economic Development: 1950 to 1975* (Washington, D.C.: IBRD, 1977).

Myers, Milton L., *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobhes to Adam Smith* (Chicago: University of Chicago Press, 1983).

Myers, Robert L. (ed.), *The Political Morality of the International Monetary Fund* (New York: Transaction Books, 1987).

Myint, Hla, "Comparative Analysis of Taiwan's Economic Development with Other Countries", *Academic Economic Papers,* March 1982.

Myrdal, Gunnar, *Economic Theory and Underdeveloped Regions* (London: Buckworth, 1957).

—, *Rich Lands and Poor* (New York: Harper & Row, 1957).

—, *Beyond the Welfare State* (New Haven: Yale University Press, 1960).

—, *Asian Drama* (New York: The Twentieth Century Fund, 1968).

—, "Need for Reforms in Underdeveloped Countries", *Quarterly Economic Journal* (National Bank of Pakistan), January-March 1979.

Nakamura, T., tr. J. Kaminski, *The Postwar Japanese Economy: Its Development and Structure* (Tokyo: University of Tokyo Press, 1981).

Nelson, Joan M. (ed.), *Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World* (Princeton, N.J. Princeton University Press, 1990).

Nikko Research Centre, *Analysis of Japanese Industries for Investors, 1990* (Tokyo: Nikko Research Centre).

Nolan, Peter and Suzanne Paine (eds.), *Rethinking Socialist Economics: New Agenda for Britain* (New York: St. Martin's Press,1986).

Nordhaus, N. D., "Soviet Economic Reform: The Longest Road", *Brookings Papers on Economic Activity,* 1990, vol. 1, pp. 287-307.

Novak, Michael, *The Spirit of Democratic Capitalism* (New York: Simon & Schuster, 1982).

Nove, Alec, *The Soviet Economic System* (London: George Allen & Unwin, 1977).

—, *The Economics of Feasible Socialism* (London: George Allen & Unwin, 1983).

Nurkse, Ragnar, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (Oxford: Basil Blackwell, 1953).

—, "The Structuralist Approach to Economic Development", *American Economic Review,* May 1965.

O'Connor, James, *The Fiscal Crisis of the State* (New York: St. Martin's Press, 1973).

OECD, *The Welfare State in Crisis, An Account of the Conference on Social Policies in the 1980s,* Paris, 20-23 October 1980, (Paris: OECD, 1981).

, *Employment Outlook* (Paris: OECD, 1986).

—, "Financial Resources for Developing Countries: 1986 and Recent Trends", *OECD Press Release,* 19 June 1987.

—, *Financing External Debt of Developing Countries — 1986and Survey* (Paris: OECD, 1987).

—, *The Costs of Restructuring Imports - The Automobile Industry* (Paris: OECD, 1987).

—, *National Policies and Agricultural Trade* (Paris: OECD,1988).

—, *OECD Economic Outlook* Nos. 44 and 47 (Paris: OECD, 14 December 1988 and 20 June 1990 respectively).

—, *Revenue Statistics of OECD Member Countries, 1965-89* (Paris: OECD, 1990).

—, *A Study of the Soviet Economy,* study undertaken by the IMF, the IBRD, the OECD and the EBRD (Paris: OECD, 1991). Offer, Gur, "Soviet Economic Growth: 1928-1985", *Journal of Economic Literature,* December 1987.

Offer, Claus, *Contradictions of the Welfare State,* ed. John Keane (London: Hutchinson, 1984).

Okun, Arthur, *Equality and Efficiency: The Big Trade-off (Washington,* D.C.: The Brookings Institution, 1975).

Packard, Vance, *The Hidden Persuaders* (Harlow, Essex: Longman, 1957).

Passmore, John, "Logical Positivism", *Encyclopaedia of Philosophy* (1967), vol. 5.

Payer, Cheryl, *The Debt Trap: The IMF and the Third World* (New York: Monthly Review Press, 1972).

—, *The World Bank: A Critical Analysis* (New York: Monthly Review Press, 1982).

Pechman, Joseph A., "The Rich, the Poor and the Taxes They Pay", *The Public Interest,* Fall 1969.

— and Benjamin A. Okner, *Who Bears the Tax Burden?* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1974).

—, *The Rich, the Poor and the Taxes They Pay* (Boulder, Co.: Westview Press, 1986).

—, *World Tax Reform: The Progress Report* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1988).

Perkins, Dwight H., "Reforming China's Economic System", *Journal of Economic Literature,* June 1988, pp. 601-45.

Plamenatz, John, *Karl Marx's Philosophy of Man* (Oxford: Clarendon Press, 1975).

Polanyi, Karl, *The Great Transformation* (New York: Reinhart,1944).

Posner, Richard A., *The Economics of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981).

Qureshi, M. L., *Strategy of Industrial Planning and Development in Pakistan* (Karachi: Government of Pakistan, 1965).

Rafiuddin, M., *The Fallacy of Marxism* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1969).

Ranis, Gustav and Paul T. Schultz (eds.), *The State of Development Economics: Progress and Perspectives* (Oxford: Basil Blackwell, 1988).

Rao, D. G., "Economic Growth and Equity in the Republic of Korea", *World Development,* 6/1978, pp. 397-409.

Rawls, John, "Justice as Fairness", *Philosophical Review,* vol. 67/1958, pp. 164-94.

—, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973).

Rees, Albert E., *Wage Inflation* (New York: National Industrial Board, 1957).

Rees-Mogg, William, *The Reigning Error: The Crisis of World Inflation* (London: Hamish Hamilton, 1974).

Reich, Michael, "The Evolution of the U.S. Labour Force", *The Capitalist System* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1972).

Reich, Robert, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism* (New York: Knopf, 1988).

Reisman, David, *Galhraith and American Capitalism* (London: Macmillan, 1980).

Reynolds, Bruce L. (ed.), *Chinese Economic Reform: How Far, How Fast?* (London: Academic Press, 1988).

Reynolds, Lloyd G., "The Spread of Economic Growth to the Third World: 1850-1980", *Journal of Economic Literature,* September 1983, pp. 941-80.

Robbins, Lord, *The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought* (London: Macmillan, 1968).

Robinson, William F., *The Pattern of Reform in Hungary* (New York: Praeger, 1973).

Rosenstein-Rodan, P. N., "Notes, on the Theory of the 'Big Push'", in Howard S. Ellis (ed.), *Economic Development for Latin America* (London: Macmillan, 1961).

Rostow, W. W., "Take-off into Self-sustained Economic Growth", *Economic Journal,* March 1986.

Russell, Bertrand, *A Free Man's Worship: Mysticism and Logic* (New York, 1918).

—, *A History of Western Philosophy* (New York: Simon & Schuster, 1945).

The Impact of Science on Society (New York: Simon & Schuster, 1953).

Sachs, Jeffrey, *Social Conflict and Populist Policies in Latin America* (Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, Paper No. 2897).

Samuelson, Paul A., *Economics* (New York: McGraw Hill, 11th ed., 1980).

Sartre, Jean-Paul, *Being and Nothingness,* tr. Hazel Barnes (London: Methuen, 1957).

Saunders, Peter and Friedrich Klau, *The Role of the Public Sector: Causes and Consequences of the Growth of Government* (Paris: OECD, 1985).

Sawhill, Isabell V., "Poverty in the U.S.: Why is it So Persistent?" *Journal of Economic Literature,* September 1988.

Schadwick, Owen, *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

Schneider, W., *Adam Smith's Moral and Political Philosophy* (New York, 1948).

Schottland, C. I. (ed.), *The Welfare State* (New York: Harper & Row, 1967).

Schultz, Charles, *The Public Use of Private Purpose* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1957).

Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Development* (New York: Harper, 1950).

Scitovsky, Tibor, *The Joyless Economy* (New York: Oxford University Press, 1976).

—, "Economic Development in Taiwan and South Korea", *Food Research Institute Studies,* 1985.

Seers, Dudley, "The Meaning of Development", *International Development Review,* December 1969.

—, *The Political Economy of Nationalism* (Oxford University Press, 1983).

Seligman, Ben, *Main Currents in Modern Economics* (Chicago: Quadrangle paperback, 1971).

Sen, Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981).

—, *On Ethics and Economics* (Oxford: Basil Black well, 1987). Sheehan, Robert, "Proprietors in the World of Big Business", *Fortune,* 15 June 1967.

Shmelev, N. and V. Propov, *The Turning Point: Revitalising the Soviet Economy* (London: Tauris, 1990).

Short, Peter, *Appraising the Role of Public Enterprises: An International Comparison* (Washington, D.C.: International Monetary Fund Occasional Papers, 1983).

Sidgwick, H., *Outlines of the History of Ethics* (London, 1946).

Silver, Morris, *Foundations of Economic Justice* (Oxford: Basil Blackwell, 1989).

Simons, Henry C., *Personal Income Taxation* (Chicago: University of Chicago Press, 1938).

Sire, L., *Economic Revolution in Eastern Europe* (Harlow, Essex: Longman, 1969).

Skinner, B. F., *Science and Human Behaviour* (New York: Macmillan, 1953).

Skinner, Quentin (ed.), *The Return of Grand Theory in the Human Sciences* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Solo, Robert A. and Charles W. Anderson (eds.), *Value Judgement and Income Distribution* (New York: Praeger, 1981).

Solzhenitsyn, Alexander, *A World Split Apart* (New York: Harper & Row, 1978).

Soule, George, *Ideas of the Great Economists* (New York: Mentor, 1952).

South Korea, *Agriculture in Korea* (Seoul: Ministry of Agriculture and Forestry, 1970).

Spengler, Joseph P., "IBRD Mission Growth Theory", *American Economic Review,* May 1954, pp. 586-7.

Staley, Eugene, *The Future of Underdeveloped Countries* (New York, 1954).

Steidlmeier, Paul, *The Paradox of Poverty: A Reappraisal of Economic Development Policy* (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1987).

Stepelevich, L. S. (ed.), *The Capitalist Reader* (New York: Arlington House Publishers, 1977).

Stevenson, Leslie, *Seven Theories of "Human Nature* (Oxford: Clarendon Press, 1974).

Stewart, Frances, *Basic Needs in Developing Countries* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985).

Stigler, G., *Production and Distribution Theories: The Formative Period* (New York: Macmillan, 1941).

Strayer, Paul J., "The Individual Income Tax and Income Distribution", *American Economic Review,* vol. 45, No. 2.

Streeten, Paul, *Development Perspectives* (London: Macmillan, 1981).

— *et al., First Things First: Meeting Basic Needs in Developing Countries* (Oxford: Oxford University Press, 1981).

—, "Basic Needs: Some Unsettled Questions", *World Development,* 1984.

— (ed.), *Beyond Adjustment: The Asian Experience* (Washington, D.C.: IMF, 1988).

Sumner, William G., *The Challenge of Facts and Other Essays,* ed. Albert G. Keller (New Haven: Yale University Press, 1914).

Sweezy, Paul M., "Lessons of Soviet Experience", *Monthly Review,* November 1967, pp. 9-21.

Tawney, R. H., *The Acquisitive Society* (New York: Harcourt Brace. 1948).

Thoenes, Piet, *The Elite in the Welfare State* (London: Faber 1966).

Thomas, Roy, *Japan: The Blighted Blossom* (London: Tauris 1989).

Thorp, Willard, "Some Basic Policy Issues in Economic Development", *American Economic Review,* May 1951, pp. 407-17. Thurow, Lester, *Zero-Sum Society* (New York: Basic Books, 1980).

—, "A Time to Dismantle the World Economy", *The Economist, 9* November 1985.

Titmuss, Richard M., *Essays on the Welfare State* (London: Unwin, 1963).

— *Commitment to Welfare* (London: George Allen & Unwin, 2nd ed., 1976).

Toynbee, Arnold J., *A Study of History,* abridgement by D. C. Somervell (Oxford: Oxford University Press, 1957).

Trotsky, Leon, *The Revolution Betrayed* (New York: Pathfinder Press, 1972), originally published in 1937.

U.S. Congress, Joint Economic Committee, *East European Economies: Slow Growth in the 1980s* (Washington, D.C.: US GPO,1986).

U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, *Statistical Abstract of the United States, 1986 and 1988.*

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Trade and Development Report, 1985* (New York: United Nations, 1985).

United Nations, Department of Economic Affairs, *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries* (New York: United Nations, 1951).

United Nations, ECAFE, "Criteria for Allocating Investment Resources among Various Fields of Development in Underdeveloped Countries", *Economic Bulletin for Asia and the Far East,* June 1961.

Viner, Jacob, *International Trade and Economic Development* (Glencoe, 111.: The Free Press, 1952).

Ward, Benjamin, *What is Wrong With Economics?* (London: Macmillan, 1972).

—, *The Ideal Worlds of Economics: Liberal, Radical and Conservative Economic Worldviews* (London: Macmillan, 1979).

Wesson, Robert G., *Why Marxism?: The Continuing Success of a Failed Theory* (New York: Basic Books, 1976).

Westphal, Larry E., "Industrial Policy in an Export-Propelled Economy: Lessons from South Korea's Experience", *Journal of Economic Perspectives,* Summer 1990, pp. 41-59.

Wilczynski, J., *The Economics of Socialism* (London: George Allen & Unwin, 3rd ed., 1978).

Wilensky, Harold, *The Welfare State and Equality* (Berkeley, California: University of California Press, 1975).

Wilhelm, Donald, *Creative Alternatives to Communism: Guidelines for Tomorrow's World* (London: Macmillan, 1977).

Williamson, J. G. and P. H. Lindert, *American Inequality: A Macro-Economic History* (New York: Academic Press, 1980).

—, *Did British Capitalism Breed Inequality?* (London: Allen & Unwin, 1985).

—, "The Historical Content of the Classical Labour Surplus Model", *Population and Development Review,* June 1985, pp. 171-91.

Inequality, Poverty, and History (Oxford: Basil Blackwell, 1991).

Winglee, Peter, "Agricultural Trade Policies of Industrial Countries", *Finance and Development,* March 1989.

Winiecki, Jan, *Economic Prospects, East and West* (London: Centre for Research into Communist Economies, 1987).

—, *The Distorted World of Soviet-Type Economies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1988).

Witt, S. F. and G. D. Newbould, "The Impact of Food Subsidies", *National Westminster Bank Quarterly Review,* August 1976, pp. 29-36.

Wolf, T. A., "Economic Stabilisation in Planned Economies", *IMF Staff Papers,* 1/1985, pp. 78-131.

Wolferen, Karel von, *The Enigma of Japanese Power* (London: Macmillan, 1989).

Yamaichi Research Institute of Securities and Economics, *Monthly Digest of Statistics,* January and September 1989 and July 1990.

Yanowitch, Murray, *Social and Economic Inequality in the Soviet Union* (London: Martin Robertson, 1977).

Yotopoulos, P. A. and J. B. Nugent, *Economics of Development* (New York: Harper & Row, 1976).

Young-Kyun, Oh, "Agrarian Reform and Economic Development: A Case Study of Korean Agriculture", *Koreana Quarterly,* 1969.

Zwass, A., *Money, Banking and Credit in the Soviet Union and Eastern Europe* (London: Macmillan, 1984).

PART II: THE ISLAMIC RESPONSE

Qur'an Commentaries

Al-Jassas, Abu Bakr, *Ahkam al-Qur'an* (Cairo: Matba'ah al-Bahiyyah al-Misriyyah, 1347 A.H.).

Ibn KathTr, Abu al-Fida' Isma'Tl, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

Mawdudi, Sayyid Abul A'la, *Tafhim al-Qur'an* (Lahore: Maktabah
Ta'mTre Insariiyyat, 1967-73).

Qutb, Sayyid, *Fi Zildl al-Qur'an* (Jeddah: Dar al-'Ilm, 1986).

Rida, Sayyid Muhammad RashTd, *Tafsir al-Manar* (Cairo: Dar al-Manar, 4th ed., 1954).

Hadith Collections

Abu Dawud al-SijistanT, *Sunan Abu Dawud* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1952).

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'Tl, *Al-Adab al-Mufrad* (Cairo: Qusay Muhibb al-DTn al-Khatib, 2nd ed., 1379 A.H.).

—, *Al-Jami' al-Sahih* (Cairo: Muhammad 'Ali Subayh, n.d.).

Al-Darimi, 'Abdullah ibn 'Abdal-Rahman, Sunan al-Darimi (Damascus: Matba'ah al-I'tidal, 1349 A.H.).

Al-Haythami, Nur al-Din, *Majma' al-Zawd'id wa Manba' al- Fawd'id* (Cairo: Maktabah al-Qudsi, 1352 A.H.).

Ibn Majah, *Sunan lbn Majah* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1952), vol. 2, p. 1297:3931.

Al-Mundhiri, Ibn 'Umar, in *Al-Targhib wa al-Tarhib,* ed. Mustafa M. 'Ammarah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

Muslim, *Sahih Muslim,* ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1955).

Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman ibn Shu'ayb, *Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba* (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi,1964).

Al-Nisaburi, Abu 'Abdullah Muhammad, *Mustadrak al-Hakim* (Riyadh: Maktabah wa Matabi'al-Nasr al-Hadithah, n.d.) vol. 2, p. 12 -narrated by Ibn 'Umar.

Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Jami' al-Saghir* (Cairo: 'Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, n.d.) vol. 2, p. 96.

Al-Tabrizi, Wali al-Din, *Mishkat al-Masabih* (Damascus: al-Maktab al-Islami, 1381 A.H.), ed. M. Nasir al-Din al-Albani.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa, *Jami' al-Tirmidhi* with commentary, *Tuhfat al-Ahwadhi* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.).

Others

Abazah, Ibrahim Dusuqi, *Al-Iatisdd al-Isldmi: Muqawwimatihi wa Mandhijihi* (Cairo: Al-Ittihad al-Duwali li al-Bunuk al Islamiyyah, n.d.).

Al-'Abbadi, 'Abd al-Salam, *Al-Milkiyyah fi al-Shari'ah al- Isldmiyyah* (Amman, Jordan: Maktabah al-Aqsa, 1974-1975).

Abbasi, S. M. Madni, *Lawful Earning in Islam* (Karachi: International Islamic Publishers, 1985).

'Abd al-Rasul, 'Ali, *Al-Mabadi' al-Iqtisadiyyah fi al-Isldm wa al-Bina al-Iqtisadi li al-Dawlah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1968).

'Abduh, 'Isa, *Al-Iqtisdd al-Isldmi: Madkhal wa Minhdj* (Cairo: Dar al-I'tisam, 1973).

'Abdullah, Ahmed, "Islamic Banking", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1987, pp. 31-56.

Abe, T., *A Comparative Study of Islamic Ownership: Conceptual Frameworks of Ownership in Islamic and Western Value Systems* (Niigata: Institute of Middle Eastern Studies, 1987).

Abul-Fadl, Mona, *Paradigms in Politics: Critical Options and Muslim Perspectives* (Herndon, VA.: The International Institute of Islamic Thought, 1989).

Abu Sa'ud, Mahmud, *Khutut Ra'isiyyah fi al-Iqtisdd al-Isldmi* (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 2nd ed., 1967).

—, *About the Fiqh of Zakat* (Ohio: Zakat and Research Foundation, 1988).

—, *Contemporary Zakat* (Ohio: Zakat and Research Foundation, 1988).

Abu Sulayman, Abdul Hamid, "The Theory of the Economics of Islam", in *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam* (Bloomington, Indiana: MSA, 1976).

Abu 'Ubayd, Qasim ibn Sallam, *Kitdb al-Amwal,* ed. Muhammad Khalid al-Harrad (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah ai-Kubra, 1353 A.H.).

Abu Wahid, N. M., "A Theoretical Justification of Islamic Banks", *Islamic Quarterly,* 3/1986, pp. 192-300.

Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitdb al-Khardj* (Cairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 2nd ed., 1353 A.H.). The English Translation of this book by Ben Shemesh was published by Brill, Leiden, in 1969.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkdm al-Tarikdt wa al-Mawdrith* (Damascus: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963).

—, *Al-Takdful al-Ijtima'i fi al-Isldm* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.).

'Afr, M. 'Abd al-Mun'im, *Nahwa al-Nazariyyah al-Iqtisddiyyah fi al-Isldm: Al-Athmdn wa al-Aswdq* (Cairo: Matabi' al-Ittihad al-Duwali li al-Bunuk al-Islamiyyah, 1981).

—and Yusuf Kamal, *Usul al-Iqtisdd al-Isldmi* (Jeddah: Dar al-Bayan al-'Arabi, 1985).

Ahmad, 'Abdul Rahman Yusri, *Al-Tanmiyyah al-Iqtisddiyyah wa al-Ijtimd'iyyah fi al-fslam* (Alexandria: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, 1401 A.M.).

Ahmad, Afazuddin, "Economic Significance of Zakat", *Islamic Literature* (Lahore), August 1952, pp. 5-11.

Ahmad, Ausaf, *Development and Problems of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI, IDB, 1987).

—, *Income Determination in an Islamic Economy* (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1987).

Ahmad, Hasan, "Social Justice in Islam", *Islamic Studies* (Islamabad), 3/1971, pp. 209-19.

Ahmad, Khurshid, "Islam and Simple Living", *Criterion* (Karachi), July-August 1970, pp. 5-12.

—, "The Third World's Dilemma of Development", *Nonaligned Third World Annual, 1970,* pp. 3-18.

— (ed.), *Islam - Its Meaning and Message* (London: Islamic Council of Europe, 1975).

—, *Social Justice in Islam* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1975).

— and Z. I. Ansari (eds.), *Islamic Perspectives: Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abut A'la Mawdudi* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979).

— (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980), p. 173.

Ahmad, Mumtaz (ed.), *State, Politics and Islam* (Indianapolis: American Trust Publications, 1987).

Ahmad, Salahuddin, "Patterns of Consumption and Saving Behaviour in an Islamic Economy", *Thoughts on Economics,* Winter 1966.

—(ed.), *Thoughts on Economics: Special Issue on Islamic Banking* (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 2/1987).

—(ed.), *Thoughts on Economics: Conference Issue on Distribution of Income and Wealth in Islam* (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 4/1987).

Ahmad, Shaikh Mahmud, *Economics of Islam* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1952).

—, *Towards Interest-Free Banking* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989).

Ahmed, Badar Durrez, "Riba in Islamic Law", *Islamic and Comparative Law Quarterly,* 6/1986, pp. 51-70.

Ahmed, Manzooruddin, *Islamic Political System in the Modern Age Theory and Practice* (Karachi: Saad Publications, 1983).

Ahmed, Ziauddin, *et al.* (eds.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983).

— *et al.* (eds.), *Money and Banking in Islam* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1983).

—, *Concepts and Models of Islamic Banking* (Karachi: Institute of Bankers in Pakistan, 1984).

—, "Islam and Fulfilment of Basic Needs", *Islamic Order,* 2/1987, pp. 53-64.

—, "Interest-Free Banking", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1987, pp. 8-30.

—, "Islamic Banking at the Crossroads", *Journal of Islamic Economics* (Kuala Lumpur), 1/1989, pp. 23-44.

Ahsan, A. S. M. Fakhrul, "Some Issues on the Promotion and Mobilization of Savings Through Islamic Banks", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 1987, pp. 25-34.

—, "Islamic Banking in Perspective", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1990, pp. 39-54.

Ahsan, M. Manazir, "Bayt al-Mal and its Role in the Islamic Economy", *Criterion* (Karachi), September 1975, pp. 14-27.

Akkas, S. M. Ali, "Size Distribution of Income and Wealth in an Islamic Economic Framework", *Thoughts on Economics,* 34/1987, pp. 68-75.

Alatas, Syed Farid, "An Islamic Common Market and Economic Development", *Islamic Culture,* 1/1987, pp. 28-38.

Alden, A. J., *Free Action* (London, 1961).

Ali, Abdal Kadir, "Land, Property and Land Tenure in Islam", *Islamic Quarterly* (London) April-July 1959, pp. 4-11.

Ali, Ali Abdulla, "How to Reach the Small Farmer?: An Islamic Formula", International Foundation for Development Alternatives, Nyon, Switzerland, January-April 1990, pp. 35-44.

Ali, M. Sultan Abu, *"Al-Mushkilat al-Iqtisddiyyah al-'Alamiyyah al-Mu'dsirah wa Halluhd al-Isldmi",* paper presented to the International Centre for Studies in Islamic Economics, Jeddah, 1401 A.H.

Ali, Mahfooz, *"Sharakat* and *Modarabat* as Basis of Interest-Free Banking",

Journal of Islamic Banking and Finance, July-September 1986, pp. 67-79.

Ali, Muazzam, *Islamic Banks and Strategies of Economic Cooperation* (London: New Century Books, 1982).

Ali, Shamsher, "Structure and Functions of *Sadaqah* and *Zakah* in Islam", *The Australian Minaret* (New South Wales), 3 (1988), pp. 27-30.

Alrai, Mohammad Saeed, "The Concept of Tawhid and Social Welfare in Islam", *Hamdard Islamicus* (Karachi), 4/1988, pp. 73-6.

Amin, Galal A., "The Modernization of Poverty", *Social, Economic and Political Studies of the Middle East* (Leiden: E. J. Brill, 1980), vol. 8.

Al-Amin, Hasan Abdullah, "Al-Istithmar al-Laribawi fi Nitaq 'Aqd al-Murabahah", *Al-Muslim al-Mu'dsir,* 1403 A.H.

Amirahmadi, Hooshang and Parvin Manoucher (eds.), *Post Revolutionary Iran* (Boulder: Westview Press, 1988).

Ansari, Javed Akbar, "The Poverty of Islamic Economics", *The Universal Message* (Karachi), 10:9 and 10:10, 1989, pp. 11-18 and 39-48.

—, "Pakistan's Economic Policy: An Islamic Alternative to the Fund and the Bank", *The Universal Message* (Karachi), 2/1990, pp. 19-25.

Ansari, M. Fazlur Rahman, *The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society* (Karachi: The World Federation of Muslim Missions, 1973).

Anwar, Muhammad, "Islamic Justice in a Monetary System: A Modest Proposal", *American Journal of Islamic Social Sciences,* September 1987, pp. 135-40.

—, "Reorganization of Islamic Banking: A New Proposal", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* 2/1987, pp. 295-304.

Modelling an Interest-Free Economy: A Study in Macro- Economics and Development (Herndon, VA.: International Institute of Islamic Thought, 1987), 119 pp.

Al-Arabi, M. A., *The Islamic Economy and Contemporary Economy: Proceedings of the First Conference of the Academy of Islamic Research* (Cairo: al-Azhar, 1964).

Ariff, Muhammad, *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982).

—, "Toward the *Shan'ah* Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientfic Revolution", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* July 1985, pp. 79-99.

—, "Islamic Banking", *Asian-Pacific Economic Literature* (Canberra, Australia), 2:2, 1988, pp. 48-64.

— (ed.), *Islamic Banking in Southeast Asia* (Pasir Panjang, Singapore:

Institute of Southeast Asian Studies, 1988), pp. 194-213.

— and M. A. Mannan, *Developing a System of Financial Instruments* (Jeddah: IRTI, 1990).

Arsalan, Amir Shakib, *Our Decline and its Causes,* tr. M. A. Shakoor (Lahore: S. M. Ashraf, 1962).

Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1981).

El-Ashkar, Ahmad A., "On the Islamic Theory of Consumer Behaviour: An Empirical Inquiry in a Non-Muslim Country", *Arab Banker,* July-August 1986.

—, *The Islamic Business Enterprise* (London: Croom Helm,1987), 288 pp.

'Assal, Ahmad and 'Abd al-Karlm Fathl, *Al-Nizdm al-Iqtisddi fi al-lsldm: Mabddi'ihi wa Ahddfihl* (Cairo: Maktabah Wahbah, 3rd ed., 1980).

Association of Muslim Social Scientists of the USA and Canada, *Outlines of Islamic Economics: Proceedings of the First Symposium on the Economics of Islam in North America,* Indiana, 6-7 March 1977 (Plainfield: American Trust Publications, 1977).

—, *Some Aspects of Zakat: Proceedings of the Conference on Economics of Zakat,* Indiana, 13-14 April 1979 (Plainfield: American Trust Publications, 1980).

Atiyeh, George and Ibrahim M. Oweiss (eds.), *Arab Civilization: Challenges and Responses* (New York: State University of New York Press, 1988).

'Awad, Ahmad Safi al-Din, *Usul 'Urn al-lqtisad al-lsldmf* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, n.d.).

Awad, Muhammad Hashim, "Al-Haykal al-Darlbl al-Mu'asir fi Daw' al-Mabadi' al-Darlbiyyah al-Islamiyyah", in Kahf 0989).

Awan, Akhtar A., *Equality, Efficiency, and Property Ownership in the Islamic System* (New York: Lanham, for University Press of America, 1983).

'Awdah, 'Abd al-Qadir, *Al-Mal wa al-Hukm fi al-lsldm* (Jeddah: Dar al-Saudiyyah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1389 A.H.).

Al-'Awwah, Muhammad Salim, *Fi al-Niiam al-Siydsi li al-Dawlah al-lsldmiyyah* (Alexandria: Al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1975).

Azad, Ghulam Murtaza and S. M. Zaman, "The Question of *Milk* (Ownership) in *Waqf', The Muslim World League Journal* (Makkah), 11-12/1988, pp. 17-20.

Azam, Khan Muhammad, *Economics and Politics of Development: An Islamic Perspective* (Karachi: Royal Book Co., 1988).

Al-'Azbawi, Hasan M., *Al-Mawdrid al-Mdliyyah al-lsldmiyyah wa al-Daraib al-Mu'dsirah* (Cairo: 1976).

Azid, Toseef, "Unemployment and its Solution in Islam", *Journal of Rural Development and Administration* (Peshawar), 1/1989, pp. 65-77.

Azmin, Zulfikri Haji Ulul, "Ownership of Land in Islam", *The Law Majallah* (The Law Society, International Islamic University, Malaysia), 1987, pp. 65-80.

Badawi, Jamal, "Concept of Development from Islamic Perspective", *Al-Nahdah* (Kuala Lumpur), 1/1989, pp. 20-4.

Al-Badoor, Radi, "The Profit Maximization Behaviour of Islamic Banks and Conventional Banks: A Comparative Study", *The Kashmir Economic Review* (Muzaffarabad, Azad Kashmir), 2/1986, pp. 21-40.

—, "Economics of Profit Sharing: Conceptual and Theoretical Issues", paper presented at the Workshop on Investment Strategy in Islamic Banking - Applications, Issues and Problems, held in Amman, Jordan, 18-21 June 1987.

Badr, Gamal Moursi, "Interest on Capital in Islamic Law", *American-Arab Affairs* (Washington, D.C.), Summer 1989, pp. 86-95.

Al-Baji, *Al-Muntaqa Sharh al-Muwatta* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1332 A.M.).

Al-Banna, Imam Hasan, *Hadith al-Thulatha' li'l Imam Hasan al-Banna* (ed.) Ahmad 'Isa 'Ashur (Cairo: Maktabah al-Qur'an, 1985).

—, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Hasan al-Banna* (Alexandria: Dar al-Da'wah, 1989).

Barnes, J. R., *An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire* (Leiden: E. J. Brill, 1986).

Bamett, A. Doak and Ralph N. Clough (eds.), *Modernising China: Post-Mao Reform and Development* (Boulder: Westview Press, 1986).

Bamett, Tony and Abbas Abdelkarim (eds.), *Sudan: State, Capital and Transformation* (London: Croom Helm, 1988), pp. 121-40.

Basar, Hasmet (ed.), *Management and Development of Awqaf Properties,* proceedings of a Seminar held from 4-16 August, 1984 (Jeddah: IRTI, IDB, 1987).

Bashir, B. A., "Portfolio Management of Islamic Banks: Certainty Model", *Journal of Banking and Finance* (Amsterdam), 1983, pp. 39-54.

Baysan, C., "Agricultural Development Index for the Islamic Countries", *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries,* 3-4/1988, pp. 27-85.

Bums, Paul and Jim Dewhurst, *Small Business in Europe* (London: Macmillan, 1987).

Chapra, M. Umer, *The Economic System of Islam - A Discussion of its Goals and Nature* (London: The Islamic Culture Centre, 1970). The first two chapters of this have been published separately under the title *Objectives of the Islamic Economic Order* and a revised version of the last chapter has been published under the title *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy.*

—, *Objectives of the Islamic Economic Order* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979).

—, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979).

—, "Mokhtar M. Metwally: Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy" (Comments), *Journal of Research in Islamic Economics,* 1 (1985), pp. 75-82.

—, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1985).

—, "The Mechanics and Operations of an Islamic Financial Market", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 3/1988, pp. 31-6.

—, "Towards an Islamic Financial System", *Journal of Islamic Economics* (Malaysia), July 1988, pp. 1-30.

—, "Economic Development in Muslim Countries: A Strategy for Development in the Light of Islamic Teachings", paper presented to the Seminar on Islamic Economics, Cairo, 6-9 September 1988 held under the auspices of the International Institute of Islamic Thought, Washington, D.C. and the Al-Azhar University, Cairo.

—, "The Need for a New Economic System", *Review of Islamic Economics,* 1/1991, pp. 9-47.

—, "Some Pre-requisites for the Establishment of an Islamic Banking System", in Karachi Chamber of Commerce and Industry, *Islamic Economic System and the Position of Income Tax in the Shari'ah: Collection of Articles of Eminent Islamic 'Ulama and Scholars* (Karachi: Chamber of Commerce and Industry, n.d.), pp. 9-58.

Chishti, Salim U., "Relative Stability of Interest-Free Economy", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1985, pp. 3-12.

Choudhary, M. Khairat, "Poverty and Income Distribution in Bangladesh", *The Kashmir Economic Review,* July-December 1985, pp. 59-72.

Choudhury, Masudul Alam, "Principles of Islamic Economics", *Middle Eastern Studies,* January 1983, pp. 93-104.

—, *Contributions to Islamic Economic Theory* (New York: Macmillan, 1986).

—, "Micro-Economic Foundations of Islamic Economics", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* 2/1986, pp. 231-45.

—, "The Blending of Religious and Social Orders in the Islamic Economic Order", *International Journal of Social Economics,* 4/1986, pp. 60-70.

—, *Islamic Economic Cooperation* (London: Macmillan, 1989).

—, "The Concept of Islamic Socio-Economic Development in Contemporary Perspectives", *The Journal of Development Studies,* 1990, pp. 1-10.

Cizakca, Murat, *Origins and Evolution of Islamic Banks: Research Papers* (Istanbul: Bogazici Universitesi, 1986), 26 pp.

Cockburn, Patrick, "Doubts Over Prices: Soviet Prices Chief Calls for Overhaul", *Financial Times,* 14 July 1987, p. 2.

Commission of the European Communities, *Job Creation in Small and Medium Si:ed Enterprises,* vol. 1: Main Report by David J. Storey, Steven G. Johnson (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1987).

Cortes, Mariluz, Albert Berry and Ashfaq Ishaq, *Success in Small and Medium-Scale Enterprises* (Published for the World Bank by Oxford University Press, 1987).

Council of Islamic Ideology, *Report of the Council of Islamic Ideology on the Elimination of Interest from the Economy* (Islamabad: Government of Pakistan, 1980); reproduced in Z. Ahmed, *et al., Money and Banking in Islam* (1983), pp. 103-200; see also the comments on this report by M. Umer Chapra and M. N. Siddiqi, pp. 212-32, as well as the discussion on pp. 233-57.

Dar, Muhammad Ilyas, "Islamic Economic System", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 3/1988, pp. 37-52.

Davies, Merryl Wyn and Adnan Khalil Pasha (eds.), *Beyond Frontiers: Islam and Contemporary Needs* (London: Mansell, 1989).

Deppler, Michael and Martin Williamson, "Capital Flight: Concepts, Measurement, and Issues", in *Staff Studies for the World Economic Outlook* (Washington, D.C.: IMF, August, 1987).

El-Din, Ahmad Kamal, "Ten Years of Islamic Banking", *Journal of Islamic Banking and Finance,* July-September 1986, pp. 49-66.

Doak, Ervin John, "Islamic Interest-Free Banking and 100 Percent Money", *International Monetary Fund Staff Papers,* 3/1988, pp. 534-6.

Donhue, J. and E. John (eds.), *Islam in Transition* (New York: Oxford University Press, 1982).

Dumont, Rene, *False Start in Africa* (New York: Praeger, 1966).

Dunya, Shawqi Ahmad, *Al-Islam wa al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1979).

—, *Durits fi al-lqtisad al-Islami: Al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah min Manzur al-Isldml* (Riyadh: Maktabah al-Khirayji, 1984). Easterlin, Richard, "Does Money Buy Happiness?" *The Public Interest,* Winter 1973.

Elgari, M. A., "Some Islamic Insights on the Theory of Consumer Behaviour", *Journal of Objective Studies* (Aligarh, India), 1/1990, pp. 1-9.

Esposito, John L., *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change* (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1982).

Al-Fa'si, 'Allal, "Al-Islam wa Mutatallibat al-Tanmiyah fi Mujtama' al-Yawm", a paper presented at a Conference, "Multaqa al-Fikr al-Islami", held in Wahran, July 1971.

Al-Fanjari, M. Shawqi, *Al-Madhhab al-Iqtisadi fi al-Isldm* (Jeddah: Ukkaz li al-Nashr, 1401 A.H.).

Faridi, F. R., "On Wages in an Islamic Economy", *Islamic Thought* (Aligarh, India), April 1960, pp. 61-6.

—, "Fiscal Policy in an Islamic State", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1983, pp. 17-35.

Faridi, Hazrat Shahidullah, *Inner Aspects of Faith* (Karachi: Mehfile Zauqia, 1979).

Faruqi, Jalees Ahmad and Shahid Habibullah, *Islamisation of Banking in Pakistan* (Karachi: United Bank Limited, 1984).

Faruqi, Jalees Ahmad, "Pre-requisites and Consequences of Islamization of Banking in Pakistan", *Journal of Islamic Banking and Finance,* 3, 3 (July-September 1986), pp. 43-8.

Faruqi, Kamal A., "Islam and Social Justice", *Criterion* (Karachi), July-August 1972, pp. 34-45.

Ferdinand, Klaus and Mehdi Mozaffari (eds.), *Islam: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), pp. 89-102.

Foster, Durwood and Paul Mojzes (eds.), *Society and Original Sin: Ecumenical Essays on the Impact of the Fall* (New York: Paragon House, 1985).

Friedman, Alan, "Italian Small Business: The Backbone of the Economy Explored", *Financial Times, 29* April 1987 and 15 September 1987.

Gauhar, Altaf, *The Challenge of Islam* (London: Islamic Council of Europe, 1978).

Ghatak, Subrata, "Agriculture and Economic Development", in Norman Gemmell (1987), pp. 355-6.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustasfd* (Cairo: al- Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937).

—, *Ihya 'Ulum al-Dln* (Cairo: Maktabah al-Mashhad al- Husayni, n.d.).

—, *Al-lsldm wa al-Awdd' al-Iqtisddiyyah* (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, n.d.).

Ghazali, Aidit, *Development: An Islamic Perspective* (Selangor, Malaysia: Pelanduk, 1990).

— and Syed Omar (eds.), *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Selangor, Malaysia: Pelan-duk, 1989).

Ghifari, Nur Muhammad, *Social Security in Islam* (Lahore: Atiq Publication House, 1989).

Gilani, Shaukat J., "The Qur'an on Charitable Giving and Contemporary Social Values", *Journal of Research in Islamic Economics,* 1985, pp. 63-74.

Government of Pakistan, Federal Bureau of Statistics, *Survey of Social and Economic Impact of Zakat and 'Ushr on Individuals and Households* (Karachi, 1988).

Government of Pakistan, Ministry of Finance, *The Zakat Manual* (Islamabad: Central Zakat Administration, 1982).

—, *Economic Survey, 1987-88* (Islamabad, June 1988).

Gusau, Sule Ahmed, "Some Issues in Islamic Banking", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 2/1987, pp. 1-24.

Al-Habshi, Syed Othman, "The Role of Ethics in Economics and Business", *Journal of Islamic Economics* (Malaysia), 1/1987, pp. 1-15.

Haffar, Ahmad R., "Economic Development in Islam in Western Scholarship", *Islam and the Modern Age* (Delhi), May and August 1975.

Al-Hamashri, Mustafa, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam min 'Ahd al-Rasul (SAWS) ild Nihayat 'Asr Bam Umayyah* (Riyadh: Dar al-'Ulum, 1985).

Hamdulay, Jamaluddin Ahmed, *Islam: The Future Economic System* (Athlone, S.A.: Bookworld Publishers, 1986).

Hamidullah, Muhammad, *The Prophet's Establishing an Islamic State and His Succession* (Hyderabad, India: Habib & Co., 1986).

Hamoud, Sami Hassan, *Islamic Banking* (London: Arabian Information, 1985).

Haniff, Ghulam M., "The Human Resources Path to Development: A Challenge to Muslims", *Islamic Studies,* Summer 1990, pp. 131-42.

Hannan, M. A., "Towards an Appropriate Model of Rural Development by the Islamic Bank in Bangladesh", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 2/1987, pp. 73-6.

Haque, Nadeemul and Abbas Mirakhor, "Saving Behaviour in an Economy Without Fixed Interest", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 3/1989, pp. 24-38.

Hasan, A., "Social Justice in Islam", *Islamic Studies* (Islamabad), September 1971, pp. 209-19.

Hasan, Zubair, "Determination of Profit and Loss Sharing Ratios in Interest-Free Business *Finance", Journal of Research in Islamic Economics,* 1/1985, pp. 13-30.

—, "Comments on Macro Consumption Function in Islamic Framework", *Journal of Research in Islamic Economics,* 3/1986.

Hasanuzzaman, S. M., *The Economic Functions of the Early Islamic State* (Karachi: International Islamic Publishers, 1981).

Al-Hasb, Fadil 'Abbas, *Ft al-Fikr at-lqtisadi al-Isldmi* (Cairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 2nd ed., 1981).

Hassan, Abdullah Alwi Haji, "The Arabian Commercial Background in Pre-Islamic Times", *Islamic Culture* (Hyderabad), 2/1988, pp. 70-83.

Hassan, Tariq, "Interest-Free System of Banking and Finance in Pakistan", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January- March 1986, pp. 7-17.

—, "Legal Process for Establishing Rules for Murabahah Contracts", *Journal of Islamic Banking and Finance,* October-December 1987, pp. 71-4.

Hassani Al-Hassani, Bakir, *Iqtisad: The Islamic Alternative for Economics* (Lanham, MD.: Imamia Centre, 1988).

Haykal, M. H., *Al-Faruq 'Umar* (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1964), vol. 2, p. 229.

Holland, Muhtar, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1982).

Holt, P. M. *et al.* (eds.), *The Cambrige History of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).

Hosseini, Hamid, "Islamic Economics in Iran: Is a New Economic Paradigm in the Making?" *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* (Villanova, PA), 12:2, 1988, pp. 21-44.

Huq, M. Azizul (ed.), *Readings in Islamic Banking* (Dhaka: Bangladesh Islamic Bankers' Association, 1982).

—, "Islamization of Domestic Banking of Pakistan", *Thoughts on Economics,* 3, 1986, pp. 27-54.

—, "Islamic Banking and Rural Development - A Case Study of Sudanese Islamic Bank (SIB)", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 2/1987, pp. 59-72.

—, "Some Thoughts on Islamic Framework for Rural Development and Appropriate Banking Model" (in the Context of Bangladesh), *Thoughts on Economics* (Dhaka), 2, 1987, pp. 48-58.

Husain, Irtiza, "Need for Accounting Standards for Islamic Banks", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1988, pp. 154-9.

Husain, Muzaffar, *Motivation for Economic Achievement in Islam* (Lahore: All Pakistan Educational Congress, 1974).

Hussain, Ch. Muhammed, *Development Planning in an Islamic State* (Karachi: Royal Book Co., 1987).

Hussain, M. M., *Islam and Socialism: A Critical Study of Socialism, Capitalism and Fascism as Contrasted with the Quranic Concept of a New World Order* (Lahore: Ashraf, 1970).

Hussein, Raef T. A., "The Early Arabian Trade and Marketing", *Islam and the Modern Age,* May-August 1987, pp. 163-72.

Hussein, Tan Sri Datuk Jaffar, "Facing the Challenge of Islamic Finance", *Al-Nahdah Muslim News and Views,* 4/1987, pp. 23-8.

Ibn Hazm, Abu Muhammad 'AIT, *Al-Muhalla* (Beirut: Al-Maktab al-Tijari, n.d.).

Ibn Hisham, *al-Sirah al-Nabawiyyah,* Mustafa al-Saqqa, *et al.* eds., (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955).

Ibn Khaldun, 'Abd al-Rahman, *Muqaddimah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.). Tr. by Franz Rosenthal (London: Routledge and Kegan Paul, 1958).

Ibn Taymiyyah, *Majmii' Fatdwa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah* (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1383 = 1963), ed. 'Abd al-Rahman al-'Asimi.

—, *Al-Siyasah al-Shar'iyyahfi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah,* ed. Muhammad al-Mubarak (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1966).

—, *Al-Hisbah fi al-Islam,* ed. 'Abd al-Aziz Rabah (Damascus: Maktabah Daral-Bayan, 1967), tr. under the title *Public Duties in Islam,* by Muhtar Holland (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1982).

Ibrahim, Anwar, "Development, Values and Changing Political Ideas", *Sojourn* (Pasir Panjang, Singapore), 1/1986, pp. 1-7.

Ibrahim, Ibrahim Ahmad, *Nizam al-Nafaqat fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1349 A.H.).

Ibrahim, Sohair Ahmed, "Economics of Education as a Case Study for the Islamization of Knowledge", *Islamic Order,* 1, 1988, pp. 21-39.

Idris, Ja'far Sheikh, "Al-Tasawwur al-IslamT li'l Insan: Asas li Falsafat al-Islam al-Tarbawiyyah", paper presented at the First Islamic Educational Conference, Makkah, 31 March-8 April 1977.

—, "Is Man the Vicegerent of God", *Journal of Islamic Studies,* 1/1990, pp. 99-110.

Imam, Zakariyyah Bashir, *Tariq al-Tatawwur al-Ijtima'i al-Islamf* (Jeddah: Dar al-Shuruq, 1397 A.H.).

Imtiazi, I. A., *et al.* (eds.), *Management of Zakdt in Modern Muslim Society* (Jeddah: IRTI, IDE, 1989).

International Centre for Research in Islamic Economics, *Dirdsdt fi al-Iqtisad al-Islami: Buhuth Mukhtdrah min al-Mu'tamar al-Duwali al-Thdni li al-Iqtisdd al-Isldmi* (Jeddah: King Abdulaziz University, 1985).

International Institute for Labour Studies, *Islam and a New International Economic Order: The Social Dimension* (Geneva: IILS, 1980).

Iqbal, Munawar, "Zakat, Moderation and Aggregate Consumption in an Islamic Economy", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1985, pp. 45-62.

—, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1988).

— and M. Fahim Khan, *A Survey of Issues and a Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1981).

Iqbal, Zubair and Abbas Mirakhor, "Islamic Banking: Major Issues of Transition", *Journal of Islamic Banking and Finance,* October- December 1987, pp. 47-60.

—, *Islamic Banking,* Occasional Paper 49 (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1987).

IRTI, Islamic Development Bank, *Economic Cooperation and Integration Among Islamic Countries: International Framework and Economic Problems* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1986).

—, *Khuttah al-Istithmdrfi al-Bunuk al-Isldmiyyah: al-Jawdnib al-Tatbiqiyyah wa al-Qaddyd wa al-Mushkildt,* proceedings of a conference held in Amman, 16-21 June 1987 (Jeddah: IRTI, 1990).

Ishaque, Khalid M., "Islamic Principles of Economic Management", *Al-'Ilm,* January 1987, pp. 14-49.

Islahi, A. Azim, "Ibn Taimiyyah's Concept of Market Mechanism", *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1985, pp. 55-64.

—, *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1988).

Islahi, Amin Ahsan, *Islami Riydsat: Kdrkunon kl Dhimmah Ddriydn awr un kay Awsdf* (Lahore: Maktabah Jama'at Islami, 1950).

Islam, Mohammad Zohurul, *Islamic Economics* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987).

Islamic Council of Europe, *The Muslim World and the Future Economic Order* (London: Islamic Council of Europe, 1979).

Islamic Development Bank, *Proceedings of the Islamic Development Bank's Symposium on Agricultural Development and Food Security in QIC Member Countries* (Jeddah: Islamic Development Bank, 1989).

Islamic Economics Research Bureau, *Thoughts on Islamic Economics* (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 1980).

—, *Thoughts on Islamic Banking: Proceedings of a Seminar on Islamic Banking,* Dhaka, 15-17 December 1980 (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 1982).

Ismail, Syed Muhammad, *Critical Analysis of Capitalism, Socialism and Islamic Economic Order* (Lahore: Oriental Publications, 1989).

Issawi, Charles A. (ed.), *An Economic History of the Middle East, 1800-1914* (Chicago: University of Chicago Press, 1966).

—, *An Economic History of the Middle East and Africa* (New York: Columbia University Press, 1982).

Jafarey, N. A., "Islamic Financing: Multi-dimensional Efforts a Must for Worthwhile Results" (In Pakistan Context), *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1988, pp. 77-80.

Jaffar, Kamarudin, "Role of Muslim Youth in National Development", *Al-Nahdah Muslim News and Views.* 4/1987, pp. 12-15.

Al-Jamal, M. 'Abd al-Mun'im, *Mawsu'ah al-lqtisadal-Islami*(Cairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1400 A.H.).

Jami'ah, al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, *Atharu Tatbiq al-Nizam al-Iqtisadl al-Islaml: min al-Buhuth al-Muqadammah li Mu'tamar al-Fiqh al-Islami fi al-Riyad, 1396 A.M.* (Riyadh: Imam Muhammad University, 1984).

Al-Jarhi, Mabid Ali M., "Towards an Islamic Macro Model of Distribution: A Comparative Approach", *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1985, pp. 1-29. See the comment on this by K. A. Naqvi, pp. 67-71.

—, "The Relative Efficiency of Interest-Free Monetary Economies: The Fiat Money Case", in: Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), pp. 37-74.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, *I'ldm al-Muwaqqi'in* (Cairo: al Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1955).

Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhdhib al Arba'ah* (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938).

Johansen, Baber, *The Islamic Law on Land Tax and Rent* (London: Croom Helm, 1987).

Kabbara, A., "The Islamic State and Economic Intervention", *Arab Banker*, 6/1986, pp. 26-31.

Kabbara, Haitham, "Islamic Banks and Industrial Financing", *Finance and Industry* (Kuwait), 9/1988, pp. 27-42.

Kader, Steven Abdul, "In Search of Financial Identity: Financing Our Future", *Islamic Horizons* (Illinois), 3-4/1988, pp. 27-35.

Al-Kaff, Syed Hamed Abdul Rahman, *Al-Murabaha in Theory and Practice* (Karachi: Islamic Research Academy, 1986).

Al-Kafrawi, 'Awf Mahmud, *Siydsah al-Infaq al-'Am fi al-Isldm* (Alexandria: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, 1402 A.H.).

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic System* (Plainfield, Indiana: The Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978).

— (ed.), *Mawarid al-Dawlah al-Maliyyah fi al-Mujtama' al-Hadith min Wujhat al-Nazar al-Isldmiyyah* (Jeddah: IRTI, 1989).

—, "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh", *Journal of Islamic Economics* (Kuala Lumpur), 1/1989, pp. 1-22.

Karim, Rifaat Ahmed Abdel and Amal El-Tigani Ali, "Towards an Understanding of the Use of Financing Mechanism of Islamic Banks", *The Arab Journal of the Social Sciences (London)*, 3:1, 1988, pp. 55-67.

Karsten, Ingo, "Islam and Financial Intermediation", *IMF Staff Papers*, March 1982, pp. 108-42.

Al-Kaysi, Marwan Ibrahim, *Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Adah* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1986).

Kazarian, E. and A. Kokko, *Islamic Banking and Development* (Lund: National Ekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet, 1987).

Al-Kazaz, Aziz, "The Islamization of Banking and Finance in Pakistan and its Effects on Savings and Investment", *Economics*, vol. 36 (1987), pp. 61-88.

Kazemi, Farhad and R. D. McChesney (eds.), *A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honour of Richard Bayley Winder* (New York: New York University Press, 1988).

Kazi, A. G. N., "Islamic Banking in Perspective", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1984, pp. 7-21.

Kennedy, Paul, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict, 1500-2000* (New York: Random House, 1988).

Khadduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University, 1984).

Al-Khafif, 'All, *Al-Milkiyyah fi al-Shan'ah al-Islamiyyah,* vol. 1, p. 93.

Khan, A. R. and P. D. Weldon, "Income Distribution and Levels of Living in Java, 1963-70", *Economic Development and Cultural Change* (1985), pp. 699-711.

Khan, Abdul Hamid, "Islamization of System in Agricultural Development Bank of Pakistan", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1986, pp. 60-9.

Khan, Abdul Jabbar, "Elimination of Beggary from Pakistan: Some Suggestions", *The Universal Message,* February 1988, pp. 26-7.

Khan, Ghulam Ishaq, "Islamic Economic Reform as a Vehicle of Social Change" (Inaugural Address to a Conference in Pakistan). *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1989, pp. 7-13.

Khan, M. Akram, "A Survey of Contemporary Islamic Thought on the Institution of Interest", *Islamic Education* (Lahore), July/August 1973.

—, *Inflation and Islam* (Lahore: Islamic Book Centre, 1980).

—, *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu* (Vols. 1 and 2) (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1983; 1991).

—, *Issues in Islamic Economics* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1983).

—, *Challenge of Islamic Economics* (Lahore: All-Pakistan Islamic Education Congress, 1985).

—, "Role of the Auditor in an Islamic Economy", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1985, pp.31-44.

—, "Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economy" *Journal of Islamic Economics* (Malaysia), July 1988, pp. 31-55. See also the comments on this paper by Syed 'Abdul Jabbar Shahabuddin, pp. 71-6.

—, "A Survey of Critical Literature on Interest-Free Banking", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1989, pp. 45-61.

—, *Economic Teachings of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1989)

—, "Elimination of Poverty in the Islamic Economic Frame work", *Islamic Studies,* Summer 1990, pp. 143-62.

—, *Glossary of Islamic Economics* (London: Mansell, 1990).

Khan, M. Fahim, "Macro Consumption Function in an Islamic Framework", *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1984, pp. 1-24. See also the comments on this paper by Seif E. I. Tagel-Din S. Iqbal Mahdi and Zubair Hasan in the Summer 1984 and Winter 1985 issues of this journal, pp. 57-61,73-7 and 79-81 respectively.

— (ed.), *Distribution in Macroeconomic Framework: An Islamic Perspective* (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, 1989), pp. 111-44.

Khan, Mehr Muhammad Nawaz, *Islam and Other Economic Systems* (Lahore: Islamic Book Service, 1988).

Khan, Mohsin S., "Islamic Interest-Free Banking", *Journal of Islamic Banking and Finance,* October-December 1986, pp. 31-53.

— and Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987).

—, "Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan", *Economic Development and Cultural Change* (Chicago, 111.), 2/1990, pp. 353-76.

Khan, Shahrukh Rafi, "Political Economy of an Islamic System", *Hamdard Islamicus,* 4/Winter 1985, pp. 3-34.

—, *Profit and Loss Sharing: An Islamic Experiment in Finance and Banking* (Karachi: Oxford University Press, 1987).

—, "Profit and Loss Sharing as a Substitute for Interest in Islamic Banking", *Saving and Development,* 3/1987, pp. 317-27.

—, "The Pakistani Experiment with Islamic (Profit and Loss
Sharing) Banking", *The Banking Development Studies* (Dhaka),
15:4, 1987, pp. 131-48.

—, "Henry George and an Alternative Islamic Land Tenure System", *Economic Development and Cultural Change,* 4/1988, pp. 721-30.

Khan, Tariqullah, *Islamic Economics: A Bibliography* (Jeddah: IRTI, IDB, 1984).

Khan, Waqar Masood, *Towards an Interest-Free Islamic Economic System* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1985).

Khawaja, Jamal, "The Concept of Islamic Economic System", *Khuda Bakhsh Library Journal* (Patna, India), No. 46, 1988, pp. 1-38.

Khouri, Rami G., "Islamic Banking: Knotting a New Network", *Aramco World Magazine,* May-June 1987, pp. 14-27.

Kindleberger, C. P., *International Short-term Capital Movements* (New York: Augustus Kelley, 1937).

—, "Review of the Economy of Turkey: The Economic Development of Guatemala; Report on Cuba", *Review of Economics and Statistics,* November, 1952, pp. 391-2.

Kister, M. J., "The Market of the Prophet", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* (Leiden), January 1965, pp. 272-6.

Klein, Lawrence R., *The Keynesian Revolution* (New York: Macmil-lan, 1954).

Kuran, Timur, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle Eastern Studies,* 2/1986, p. 135.

Al-Lababidi, *Islamic Economics: A Comparative Study* (Lahore: Islamic Publications, 1980).

Lahsaeizadeh, Abdolali, "Land Reform and Social Change in Rural Iran", *Land Reform* (Land Settlement and Co-operatives), 1-2 (1987), pp. 22-57.

Laliwala, J. H., *An Outline of Islamic Economic and Financial System* (New Delhi: The Indian Institute of Islamic Studies, 1989).

Lecker, M., "On the Markets of Medina (Yathrib) in Pre-Islamic and Early Islamic Times", *Jerusalem Studies in Arabic and Islam,* No. 8, Part 1 (1986), pp. 133-47.

Lewis, H. D., "Guilt", *The Encyclopaedia of Philosophy* (New York: Macmillan and the Free Press, 1967), vol. 3, p. 397.

Liedholm, Carl and Donald Mead, "Small-Scale Enterprise: A Profile", reproduced from their "Small Scale Industries in Developing Countries: Empirical Evidence and Policy Implications", a Michigan State University Development Paper, in *Economic Impact,* 2/1988, p. 12.

Little, Ian M. D., Tibor Scitovsky and Maurice Scott, *Industry and Trade in Some Developing Countries* (London: Oxford University Press, 1970).

Llewellyn, Othman A., "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning", *Journal of Research in Islamic Economics,* Winter 1984, pp. 25-49. See also the comments on this paper by A. Safi El-Din Awad and the author's rejoinder in the Summer 1985 issue of this Journal, pp. 83-90.

Mahdi, Syed Iqbal, "Islamic Approach to Model Building in Economics and Other Social Sciences: A Methodological Framework", *Journal of Objective Studies* (Aligarh, India), 1/1990, pp. 83-94.

Majd, Mohammad G., "Land Reform in Iran", *American Journal of Agricultural Economics,* November 1987, pp. 843-8.

Al-Majma' al-Malikl li Buhuth al-Hadarah al-Islamiyyah, *Al-Idarah al-Maliyyah fi al-Isldm* (Amman: Mu'assassat Al-Bayt, 1990).

Malik, Abu 'Abdullah ibn Anas, *Al-Muwatta'* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1951).

Malik, M. Shafi, "Wages in an Islamic Economy", *Islamic Thought* (Aligarh), July 1960, pp. 62-7.

Mallat, Chibli (ed.), *Islamic Law and Finance* (London: Centre of Near and Middle Eastern Studies, School of Oriental and African Studies, 1988).

Manisali, Erol (ed.), *The Middle East and Eastern Mediterranean: Recent*

Economic and Political Developments (Istanbul: Istanbul University, Middle East Business and Banking, 1987).

Mannan, M. A., *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* (Cairo: International Association of Islamic Banks, 1984).

—, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge, U.K.: Hodder & Stoughton, Islamic Academy, revised ed., 1986).

—, *Economic Development and Social Peace in Islam* (London: Ta-Ha Publishers, 1989).

Manzoor, S. Parvez, "Islamic State: Between the Mystique of *Khilafa* and the Logic of *Mulk*" (Review Article), *Muslim World Book Review* (Leicester), 1/1988, pp. 1-13.

Al-MarghTnanI, Abu al-Hasan, *Al-Hiddyah* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1965), vol/4, p. 105.

Martan, Sa'id Sa'd, *Madkhal li al-Fikr al-lqtisddifi al-Isldm* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986).

Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'AIi ibn Muhammad, *Al-Ahkdm al-Sultaniyyah* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1969).

Mawdudi, Sayyid Abul A'la, *Islam awr Jadid Ma'dshi Nazariyydt* (Lahore: Islamic Publications, 1959).

—, "Economic and Political Teachings of the Qur'an", in M. M. Sharif (ed.), *A History of Muslim Philosophy* (Wiesbaden: Otto Harassowitz, 1963), pp. 178-90.

—, *Khildfat-o-Mulukiyyat* (Lahhore: Islamic Publications, 1966).

—, *Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 3rd ed., 1967).

—, *Mas'alah Milkiyyat-e-Zamin* (Lahore: Islamic Publications, 3rd ed., 1969).

—, *Economic Problem of Man and its Islamic Solution* (Lahore: Islamic Publications, 2nd ed., 1970).

—, *Human Rights in Islam* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1976).

—, *Isldmi Riydsat* (Lahore, Pakistan: Islamic Publications,1982).

—, *The Islamic Movement: The Dynamics of Values, Power and Change,* tr. and ed. Khurram Murad (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1984).

—, *The Islamic Way of Life,* Khurshid Ahmad and Khurram Murad (eds.). (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1986).

Al-Maydani, Shaykh Abdul Rahman Hasan, "Mafahim Qur'aniyyah Hawla al-

Nafs al-Insaniyyah wa ma Tashtamilu 'alyahi", paper presented to the First Islamic Educational Conference, Makkah, 31 March-8 April 1977.

—, *Basa'ir li'l-Muslim al-Mu'dsir* (Damascus: Dar al-Qalam, 1988).

Mdaghri, Driss Alaoui, "Towards an Islamic Common Market", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1988, pp. 73-8.

Meenai, S. A., *The Islamic Development Bank: A Case Study of Islamic Cooperation* (London: Kegan Paul, 1989).

Memon, Noor Ahmed, "Leasing - A Flexible Mode of Financing", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1989, pp. 18-21.

Mende, Tibor, *South-East Asia between Two Worlds* (London: Turnstile Press, 1955).

Metawally, M. M., *Macro-Economic Models of Islamic Doctrines* (London: J. K. Publishers, 1981).

—, "The Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy", *Journal of Research in Islamic Economics,* Summer 1984, pp. 21-30. See also the comments on this paper by M. U. Chapra in the Summer 1985 issue of this same Journal (pp. 25-81).

Mika'ilu, A. S., "On the Prohibition of Riba (Interest) and its Implications for Optimum Economic Performance", *Hamdard Islamicus* (Karachi), 12:1, 1989, pp. 57-64.

Mintjes, H., *Social Justice in Islam* (Amsterdam: Institute for the Study of Religion, Free University, 1977).

Mirakhor, Abbas, "Islamization of the Disciplines: Muslim Scholars and the History of Economics", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* 2/1987, pp. 245-76.

—, "The Economic System in an Islamic Society", *Middle East Insight,* August-September 1987, pp. 32-45.

Al-Misri, 'Abd al-Saml', *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1975).

Al-Misri, Rafiq Yunus, *Usul al-Iqtisad al-Islami* (Damascus: Dar al-Qalam, 1989).

Molla, Rafiqul Islam, *et al.* (eds.), *Frontiers and Mechanics of Islamic Economics* (Sokoto, Nigeria: University of Sokoto, 1986).

Moreland, W. H., *The Agrarian System of Moslem India* (Delhi: Kanti Publications, 1988).

Morgenbesser, Sidney and James Walsh (eds.), *Free Will* (Englewood Cliffs, N.J., 1962).

Moustafa, Saad Moustafa, "Man and Work in Islam", *Al-Azhar Magazine* (Cairo), 6/1988, pp. 679-82.

Mubarak Al-Mubarak, Muhammad, *Nizam al-Islam: al-Iqtisad, Mabadi' wa Qawd'id al-'Ammah* (Damascus: Dar al-Fikr, 1972).

Mudawi, M. Baqir, "Medium and Long-Term Finance by Islamic

Financial Institutions" *Journal of Islamic Banking and Finance,* April-June 1986, pp. 16-35.

Muhammad, Yar, *Cooperation Among the Muslim Countries of the World* (Peshawar, Pakistan: Institute of Development Studies, 1987).

Muhammad, Yusuf Kamal, *Fiqh al-Iqtisad al-Islami* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988).

Murad, Khurram, *Sacrifice: The Making of a Muslim* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1985).

Muradpuri, Muhammad Akbar, *Conflict between Socialism and Islam* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1970).

Musgrave, Richard A., *The Theory of Public Finance: Study in Public Economy* (New York: McGraw Hill, 1959).

Muslehuddin, Muhammad, *Economics and Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1974).

Al-Nabhan, M. Faruq, *Abhath fi al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986).

Nabi, Malik bin, *Al-Muslimfi 'Alam al-Iqtisad* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1978).

Al-Nadwi, Abul Hasan Ali, *Ma dha Khasira al-'Alam hi Inhitat al-Muslimin* (Doha: Matabi' Ali bin Ali, 10th ed., 1974).

Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1986).

El-Naggar, Said (ed.), *Adjustment Policies and Development Strategies in the Arab World* (Washington, D.C.: IMF, 1987).

Al-Najjar, Ahmad, *Al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973).

Al-Najjar, Zaghlul Raghib, *Qadiyyah al-Takhalluf al-'Ilmi wa al-Taqni fi al-'Alam al-Islami* (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Shar'iyyah wa al-Shu'un al-Diniyyah, 1409 A.H.).

Najmabadi, Afsaneh, *Land Reform and Social Change in Iran* (Salt Lake City: Utah University Press, 1988).

Naqvi, S.N.H., "Economics of Human Rights: An Islamic Perspective", *Hamdard Islamicus* (Karachi), Summer 1981, pp. 31-51.

—, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1981).

—, "The Margins of State Intervention in an Islamic Economy", *Hamdard Islamicus,* Autumn 1983, pp. 47-61.

Naseef, Abdullah Omar (ed.), *Today's Problems, Tomorrow's Solutions* (London: Mansell, 1988).

Nasr, S. H., *Ideals and Realities of Islam* (London: Allen & Unwin, 1966).

—, *Islam and the Plight of Modern Man* (London: Longman, 1975).

Nasr, Seyyed Vali Reza, "Islamic Economics: Novel Perspectives", *Middle Eastern Studies* (London), 4/1989, pp. 516-30.

—, "Towards a Philosophy of Islamic Economics", *Hamdard Islamicus* (Karachi), 4/1989, pp. 45-60.

Nasser, El-Gharib, "The Role of Islamic Banks for Initiating an Islamic Common Market', *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1988, pp. 119-38.

Nassief, Nabil, "Islamic Banking Around the World", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1990, pp. 55-64.

National Bank of Pakistan, *Economic System of Islam: Proceedings of a Seminar* (Karachi: National Bank of Pakistan, 1980).

Nienhaus, Volker, *Literature on Islamic Economics in English and German* (Koln: Al-Kitab Verlag, 1982).

—, "Islamic Economics, Finance and Banking: Theory and Practice", *Journal of Islamic Banking and Finance,* April-June 1986, pp. 36-54.

—, "Islamic Banking: Microeconomic Instruments and Macro-economic Implications", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 1-2/1988, pp. 66-86.

Nisse, Jason, "No Interest?" *The Banker* (a *Financial Times* Publication), October 1987, pp. 35-44.

Al-Nowaihi, Muhammad, "Fundamentals of Economic Justice in Islam", in *Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam* (Gary, Indiana: MSA, 1973).

Nurbakhsh, Muhsin, "The Introduction of Usury-Free Banking in Iran", *Al-Tawhid,* 4/1987, pp. 89-96

Ogwumike, F. O. and P. K. Odubogun, "Alleviation of Poverty Through the Provision of Basic Needs in Nigeria", *The Indian Journal of Economics* (Allahabad), 1989, pp. 257-69.

Okyar, Osman, "Economic Growth in the Ottoman Empire, 1800-1914", *Asian and African Studies,* March 1987, pp. 87-118.

Oran, Ahmad, "Fiscal Policy in an Islamic State", *Journal of Islamic-Banking and Finance* (Karachi), 4/1988, pp. 7-55.

Osman, Muhammad Fathi, *Some Fundamentals of Islamic Political Thought* (Beirut: Muassasah al-Risalat, 1979).

Osmani, S. R. and A. Rahman, *Income Distribution in Bangladesh* (New York: United Nations, 1983).

Ozal, Turgut, "Islam and the West", *Journal of Islamic Banking and Finance,* 3, 3 (July-September 1986), pp. 7-16.

Pal, Izzud-Din, "Pakistan, Islam and Economics", *Journal of Contemporary Asia,* 2/1987, pp. 187-207.

Parker, Mushtak,' 'Why Islamic Banking is Catching on", *The Middle East* (London), October 1986, pp. 50-5.

Patel, Zainal Abedin, *Small Kindnesses: Islamic Viewpoint on the Cause and Solution of Global Poverty* (Nuneaton, U.K.: Muslim Venture Publications, 1990).

People Against Interest Debt (PAID), *Usury: The Root Cause of the Injustices - Seminar Transcripts* (Norwich: PAID, 1989).

Poliak, A. N., "Classification of Land in Islamic Law and its Technical Terms", *American Journal of Semitic Languages and Literatures,* 1957, pp. 50-62.

Presley, John R. (ed.), *Directory of Islamic Financial Institutions* (London: Croom Helm, 1988).

Pryor, Frederic L., "The Islamic Economic System", *Journal of Comparative Economics,* 1985, pp, 197-223.

Al-Qadi, Wadad, "The Term *Khalifa* in Early Exegetical Literature" *Die Welt Des Islams* (Leiden), Vol. 28, 1988, pp. 392-411.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Irshad, 1969).

—, *Al-Haldl wa al-Haramfi al-Islam* (Cairo: Dar al-Itisam, 8th ed., 1974).

—, *Mushkilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajahd al-Islam* (Cairo: Maktabah Wahbah, 3rd ed., 1977).

—, *"Tawsi' Qa'idah Ijab al-Zakat", Al-Iqtisdd al-Isldmi,* February 1982, p. 8.

Qasim, Qasim M., "Islamic Banking: New Opportunities for Co operation Between Western and Islamic Financial Institutions", *Journal of Islamic Banking and Finance,* April-June 1986, pp. 55-61.

Qila'ji, M. Rawwas, *Al-Ihtiraf wa Atharuhu fl al-Fiqh al-Isldmi* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1984).

Quan, N. T. and A. Y. C. Koo, "Concentration of Land Holdings: An explanation of Kuznet's Conjecture", *Journal of Development Economics,* 18 (1985), pp. 101-17.

Quraishi, Marghoob A., "Investment and Economic Development in Muslim Countries", *Proceedings of the Third Seminar* (Gary, Indiana: Association of Muslim Social Scientists, 1974), pp. 1-8.

Qureshi, D. M. "The Role of Stock Exchange in Islamic System", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 3/1988, pp. 9-20.

—, "Lease Financing" (Islamic Banking), *Journal of Islamic- Banking and Finance* (Karachi), 1/1989, pp. 14—17.

QurtubT, Yusuf Ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlihl* (Madinah: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.).

Qutb, Muhammad, *Al-Insdn Bayn al-Maddiyyah wa al-Islam* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Ha!abi, 4th ed., 1965).

Qutb, Sayyid, *Al-'Addlah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam* (Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1964), tr. John B. Hardie, *Social Justice in Islam* (Washington, D.C.: American Council of Learned Societies, 1970).

Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1975).

Rahman, M. Anisur, "The Welfare Economics of Foreign Aid", *Pakistan Development Review,* Summer 1967, pp. 141-59.

—, "Foreign Capital and Domestic Savings: A Test of Haavelmo's Hypothesis with Cross Country Data", *Review of Economics and Statistics,* February 1968, pp. 137-8.

Rajab, Ibrahim A., "Islam and Development", *World Development,* vol. 8, pp. 513-21.

Ramirez-Rojas, C. L., "Monetary Substitution in Developing Countries", *Finance and Development,* June 1986, pp. 35-8.

Rana, Irfan Mahmud, *Economic System Under Omar the Great* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1970), 152 pp.

Al-Ras, As'ad Muhammad, *Muqawwimdt al-Nizam al-lqtisadi al-Islami* (Riyadh: King Saud University, 1987).

Rashid, Salim, "Project Evaluation in an Islamic Framework", *Journal of Islamic Banking and Finance,* October-December 1987, pp. 61-9.

—, "Islamic Economics: A Historico-Inductive Approach", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 1/1989, pp. 33-44.

Rauf, M. A., *The Islamic Economic Doctrine and Contemporary Thought* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research).

Rehman, Faizan-ur, "The Time Value of Money Concept and its Application to Long-Term Investment and Working Capital Management Policy Decisions: Some Conceptual Problems in an Islamic Perspective", *Journal of Rural Development and Administration,* 2/1988, pp. 9-34.

Rodinson, Maxime, *Islam and Capitalism,* tr. Brian Pearce (Austin, Texas: University of Texas Press, 1978 - original 1966).

Rushdi, AH Ahmed, "Effects of the Elimination of Riba on Income Distribution", in Munawar Iqbal (1986), pp. 219-28.

—, "Central Banking Policy: An Islamic Perspective", *Thoughts on Economics* (Dhaka), 2/1987, pp. 77-88.

—, "Monopoly in Islam: A Case for Cross Subsidization", *Thoughts on Economics,* Winter 1987, pp. 38-62.

Al-Siba'i, Mustafa, *Ishtirakiyyah al-Isldm* (Damascus: Mu'assassah al-Matbu'at al-'Arabiyyah, 2[nd] ed., 1960).

Sadeq, A. H. M., "Distribution of Wealth Through Transfer Payments", *Hamdard Islamicus* (Karachi), 1/1989, pp. 33-44.

—, "Factor Pricing and Income Distribution From an Islamic Perspective", *Journal of Islamic Economics* (Kuala Lumpur), 1/1989, pp. 45-64.

—, *Economic Development in Islam* (Selangor, Malaysia: Pelanduk, 1990).

Al-Sadr, Muhammad Baqir, *Al-Bank al-Ldribawifi al-Isldm* (Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at, 7th ed., 1981).

—, *Iqtisddund* (Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at, 14[th] ed., 1981).'

—, *Al-Insdn al-Mu'dsir wa al-Mushkilah al-Ijtimd'iyyah* (Najaf: Matba'ah al-Nu'man, 1388 A.H.).

Said, Hakim Muhammad, *The Employer and the Employee: Islamic Concept* (Karachi: Hamdard Academy, 1972).

Salahuddin, Muhammad, "Political Obligation: Its Scope and Limits in Islamic Political Doctrine", *The American Journal of Islamic-Social Sciences,* December 1986, pp. 247-64.

Salamah, 'Abdin, "Tawfir al-Hajat al-Asasiyyah fi Zill al-Dawlah al-Islamiyyah", *Majallah al-Abhdth al-Iqtisdd al-Isldmi,* Winter 1984.

Saleem, Hafiz M., "Comparative Study of Human Nature", *Hamdard Islamicus,* Spring 1989, pp. 75-81.

Saleh, Nabil A., *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking* (Cambridge: Columbia University Press, 1986).

Saqr, Muhammad Ahmad (ed.), *Al-Iqtisdd al-Isldmi: Buhuth Mukh-tdrah min al-Mu'tamar al-'Alami al-Awwal li al-Iqtisdd al-Isldmi* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1980).

—, *Qird'dt fi al-Iqtisdd al-Isldmi* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1987).

Al-Sarakhsi, Shamsuddin, *Kitdb al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), particularly "Kitab al-Kasb" of al-Shaybani in vol. 30.

Sardar, Z., *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come* (London: Mansell, 1985).

Sato, H., *Understanding Zakat: An Inquiry into the Methodological Problems of the Science of Economics* (Niigata: Institute of Middle Eastern Studies, 1987).

Sattar, Zaidi, "The Ethics of Profits in the Islamic System", *The Islamic Quarterly* (London), 2/1988, pp. 69-76.

Al-Saud, Mohamed al-Faisal, "Islam and the West: Towards a New International Economic Order", *Journal of Islamic Banking and Finance,* April-June 1986, pp. 8-15.

Saunders, John J., *The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966).

Schirazi, A., *The Problem of Land Reform in the Islamic Republic of Iran: Complications and Consequences of an Islamic Policy* (Berlin: Freie Universitat Berlin, 1987).

Schotta, Charles, "Islamic Banking in the U.S.: Regulatory Issues", *Banking and Trade,* No. 1 (Spring 1987), pp. 39-42.

Schumacher, E. F., *Small is Beautiful* (London: Blond & Briggs, 1973).

Schuon, Frithjof, *Understanding Islam,* tr. D. M. Matheson (London: Allen & Unwin, 1973).

Shafi, Muhammad, *Distribution of Wealth in Islam* (Karachi: Muhammad Ashraf, 1979).

Shah, Nasim Hasan, "Islamic Concept *of Stale", Hamdard Islamicus,* Autumn 1987, pp. 35-56.

Shahab, Rafiullah, *Islamic State in Modern Age* (Lahore: Accurate Printers, 1988).

Shaikh, Muzaffar A., "Ethics of Decision Making in Islamic and Western Environments", *The American Journal of Islamic Social Sciences (Chicago),* 1/1988, pp. 115-28.

Shakir, A. M. A., *Individuals and Social Responsibility in Islamic Thought* (New York: New York University, 1966).

Shalaby, Ismail, "The Islamic Common Market", *Journal of Islamic Banking and Finance,* January-March 1988, pp. 83-112.

Shaltut, Shaykh Mahmud, *"Al-Ishtirdkiyyah wa al-lslam", Al- Jamhuriyyah* (Cairo), 22 December 1961.

Sharif, M. Raihan, *The Concept of Economic Development in Islam* (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 1986).

Al-Shatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafiqat fi usul al-Shan'ah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.).

Shehata, Shawki Ismail, "Islamic Concepts and Principles as Practiced in

Islamic Banks: An Analytic Study", *Journal of Objective Studies* (Aligarh, India), 1/1990, pp. 10-31.

Sheikh, Nasir A., *Some Aspects of the Constitution and the Economics of Islam* (Woking: The Woking Mission, 1967).

Siddiqi, M. A. M., *"Ribd* - Usury and Interest, Qur'an's Verdict is Clear", *Islamic Order* (Karachi), 1980, pp. 40-70.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Some Aspects of the Islamic Economy* (Lahore: Islamic Publications, 1970).

—, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1972).

—, *Contemporary Literature on Islamic Economics* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1981).

—, *Banking Without Interest* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1983).

—, *Issues in Islamic Banking* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1983).

—, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1983).

—, "Public Expenditure in an Islamic State", *Journal of Islamic Banking and Finance,* October and December 1984, pp. 7-34.

—, "An Islamic Approach to Economics", *Al-Tawhid,* December 1986-February 1987, pp. 105-25.

Siddiqi, M. Yasin Mazhar, "Economic Imbalances and the Role of Islam: An Essay in Qur'anic Interpretation", *Hamdard Islamicus,* Summer 1987, pp. 35-46.

—, "Role of Booty in the Economy during the Prophet's Time", *Journal of Islamic Economics,* King Abdulaziz University, vol. 1, 1989, pp. 83-116.

Siddiqi, Muhammad Iqbal, *Model of an Islamic Bank* (New Delhi: Anis Enterprises, 1988).

Siddiqi, S. A., *Public Finance in Islam* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1975).

Siddiqui, Dilnawaz A., "Human Resource Development: A Muslim World Perspective", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* December 1987, pp. 277-94.

Simonsen, J. B., *Studies in the Genesis and Early Development of the Caliphal Taxation System* (Copenhagen: Akademisk Forlag, 1988).

Singer, H. W., "Economic Progress in Developed Countries", *Social Research,* March 1949. Solomon, Steven, *Small Business USA* (New York: Crown Publishers, 1986).

Spiessbach, Michael F., "Principles of Islamic Investment: A Primer for Western Businessmen". *American-Arab Affairs* (Washington, D.C.), No. 27, 1988-89, pp. 40-50.

Stockhausen, Joachim von, "Islamisation of Banking: What Does it Mean for Agricultural Financing? -The Case of Pakistan", *Law and Politics in Africa, Asia and Latin America,* 1st quarter 1987, pp. 56-69.

Storey, David J. and Steven G. Johnson, *Job Creation in Small and Medium Sized Enterprises* (Luxembourg: Commission of the European Communities, 1987).

— *et al., The Performance of Small Firms* (London: Croom Helm, 1987).

Al-Suhaybani, Muhammad Ibrahim, *Athar al-Zakat 'Ala Tashghil al-Mawarid al-Iqtisadiyyah* (Riyadh, 1990).

Sutcliffe, C. R., "Is Islam an Obstacle to Development?" *The Journal of Development Areas* (University of Illinois), October 1975, pp. 77-81.

Tag El-Din, Seif I., "Moral Hazard and Financial Islamisation Policy", *Review of Islamic Economics,* 1/1991, pp. 49-69.

Taleghani, Ayatullah S. M., *Society and Economics in Islam,* tr. R. Campbell (Berkeley: Mizan Press, 1982).

Al-Tamimi, Younes "Experience of Islamic Banks in the Middle East", *Journal of Islamic Banking and Finance,* April-June 1986, pp. 63-79.

Al-Tantawi, 'Ali and Naji al-Tantawi, *Akhbaru 'Umar* (Damascus: 'Daral-Fikr, 1959).

Taylor, T. W. and J. W. Evans, "Islamic Banking and the Prohibition of Usury in Western Economic Thought", *National Westminster Bank Quarterly Review,* (November 1987), pp. 15-27.

Tekir, Sabir, "Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macro-Economics and Development", *The American Journal of Islamic Social Sciences* (Herndon, VA.), 2/1989, pp. 373-5.

Tendler, Judith, *Inside Foreign Aid* (Baltimore: Johns Hopkins University, 1975).

The Muslim Students' Association of the USA and Canada, *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam* (Bloomington, Indiana: MSA, 1976).

The Royal Academy for Islamic Civilization Research, *Problems of Research in Islamic Economics* (Amman: Al-Albait Foundation, 1987).

The World Bank: A Critical Analysis (New York: Monthly Review Press, 1982).

Tillich, Paul, *A Complete History of Christian Thought,* Carl Braaten (ed.) (New York: Harper & Row, 1968).

Tomkins, Cyril and Rifat Ahmed Abdel Karim, "The Shan'ah and its Implications for Islamic Financial Analysis: An Opportunity to Study Interactions among Society, Organizations and Accounting", *American Journal of Islamic Social Sciences,* 1 September 1987, pp. 101-16.

Turabi, Hasan, "Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Mam", *The American Journal of Islamic Social Sciences,* 1/1987, pp. 1-11.

Turnham, D., *The Employment Problems in Less Developed Countries: A Review of the Evidence* (Paris: OECD, 1971).

Udovitch, Abraham L., "Labour Partnership in Early Islamic Law", *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* 1 /1967, pp. 68-80.

—, *Partnership and Profit in Medieval Islam* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970).

—, "The Constitution of the Traditional Islamic Marketplace: Islamic Law and the Social Context of Exchange", in S. N. Eisenstadt, *Beyond the West* (London: Pinter, 1987), vol. 2, pp. 150-71.

U.S. House of Representatives, *Banking for the Poor: Alleviating Poverty through Credit Assistance to the Poorest Micro entrepreneurs in Developing Countries, Report of the Select Committee on Hunger* (Washington: U.S. Government Printing Office, May 1986).

Usmani, Muhammad Taqi, "The Role of Religious Boards in Developing Interest-Free Economy", *Al-Balagh* (Karachi), 3/1990, pp. 19-22.

Uzair, M., *Interest-free Banking* (Karachi: Royal Book Co., 1978).

—, "Banks and Financial Institutions: Growth Pattern in the 80s" (Pakistan Banks after Islamisation), *Journal of Islamic Banking and Finance,* 4/1989, pp. 10-18.

Walsh, James (ed.), *Free Will* (Englewood Cliffs, N.J., 1962).

Weiscopf, Thomas E., "The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Savings in Underdeveloped Countries", *Journal of International Economics,* February 1972, pp. 25-38.

Weiss, Anita M. (ed.), *Islamic Reassertion in Pakistan* (Lahore: Vanguard Books, 1987).

Weiss, Dieter, "The Struggle for a Vital Islamic Economy", *The Muslim World* (Hartford, Conn.), 1/1989, pp. 46-58.

Weitzman, Martin L., *The Share Economy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984).

Welch, Claude, *Protestant Thought in the Nineteenth Century* (New Haven: Yale University Press, 1972).

Williamson, John and Donald R. Lessard (eds.), *Capital Flight: The Problem and Policy Responses* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1987).

Wilson, Rodney, "Islamic Banking in Jordan", *Arab Law Quarterly* (London), August 1987, pp. 207-29.

—, "The Islamic Development Bank's Role as an Aid Agency for Moslem Countries", *Journal of International Development,* 3/1989, pp. 18-24.

— (ed.), *Islamic Financial Markets* (London: Routledge, 1990).

Wohlers-Scharf, Traute, *Arab and Islamic Banks* (Paris: OECD, 1984).

Yalcintas, Nevzat, "Economic Relations between Turkey and Islamic Countries", *Studies on Turkish-Arab Relations* (1986), pp. 317-26.

Yunus, Muhammad, *Group-Based Savings and Credit for the Rural Poor* (Dhaka: Grameen Bank, January 1984).

—, "The Poor as the Engine of Development", reproduced from *The Washington Quarterly,* Autumn 1987.

Yusri, 'Abd al Rahman, *Al-Tanmiyyah al-Iqtisddiyyah wa al- Ijtima'iyyah fi al-Islam* (Alexandria: Mu'assasah al-Shahab, n.d.).

Yusuf, Ibrahim Yusuf, *Al-Nafaqdt al-'Ammah fi al-Isldm: Dirdsah Muqdranah* (Dar al-Kitab al-Jami'i, 1980).

Yusuf, S. M., *Economic Justice in Islam* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1971).

Zaid, Abdulaziz Mohammed, *The Islamic Law of Bequest* (London: Scorpion, 1986).

Zaidi, Nawazish Ali, *Eliminating Interest from Banks in Pakistan* (Karachi: Royal Book Co., 1987).

Zaim, Sabahuddin, "Islamic Economics as a System Based on Human Values", *Journal of Islamic Banking and Finance* (Karachi), 2/1989, pp. 13-21.

Zaman, M. Raquibuz, *Some Aspects of the Economics of Zakat* (Plainfield, Indiana: The Association of Muslim Social Scientists, 1980).

—, "Monetary and Fiscal Policies of an Islamic State: The Claims versus Reality", *International Journal of Islamic and Arabic Studies* (Bloomington, Indiana), 1/1985, pp. 17-32.

—, *Some Administrative Aspects of the Collection and Distribution of Zakah and the Distributive Effects of the Introduction of Zakah into Modern Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1987).

Zarabozo, "A Basic Need Approach is the Islamic Approach to Development", *Al-Ittihad,* October-December 1980.

Zarqa, M. Anas, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", in K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980), pp. 13-15.

—, "Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-free Islamic

Economy", *Journal of Economics and Administration* (Jeddah), November 1982.

—, "Stability in an Interest-free Islamic Economy: A Note", *Pakistan Journal of Applied Economics,* Winter 1983, pp. 181-8.

—, "Islamic Distributive Schemes", in Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1988), pp. 179-80.

—, "Al-Siyasat al-Iqtisadiyyah wa al-Takhtlt fi Iqtisad Islami", in *Al-ldarah al-Maliyyah fi al-Islam* (Amman: al-Majma' al-Maliki li Buhuth al-Hadarah al-Islamiyyah, 1990).

'Islamic Financing of Mute Social Infrastructure: A Suggested Mode Based on Istisna", paper presented to the Seminar on Islamic Banking in Bahrain, 26-28 May 1990.

Al-Zarqa, Mustafa A., *Al-Fiqh al-lslami fi Thawbihi al-Jadid* (Damascus: Matabi' Alif Ba' al-Adib, 1967).

Ziring, Lawrence, "Constitutionalism and the Qur'an in the Final Decades of the 20th Century", *Hamdard Islamicus,* Autumn1990, pp. 15-21.

Zubatda, Sami, *Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas in the Middle East* (London: Routledge, 1989).

Zubair, A., "Concept and Protection of Labour Under Islamic Law", *Islamic Order* (Karachi), 3/1989, pp. 18-24.

Zuberi, Khalique, "Islamic Trade Financing Facility", *Journal of Islamic Banking and Finance,* July-September 1986, pp. 17-32.

ড. এম উমর চাপরা রিয়াদস্থ সৌদী আরবীয়ান মনিটরী এজেন্সীতে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ইসলামি অর্থনীতি ও ফিন্যান্স-এর ওপর ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। বিশেষভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত তাঁর অন্যতম কর্ম হচ্ছে *'Towards a Just Monetary System'* গ্রন্থটি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮৫ সালে বইটি প্রকাশ করে। ইসলামি অর্থনীতি ও ফিন্যান্স-এ ব্যাপক অবদানের জন্য তিনি ১৯৯০ সালে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার এবং ইসলামিক স্টাডিজে বাদশা ফয়সল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জঃ বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম দেশেই ইসলামি পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। মানুষ এখন বিভিন্ন সমস্যা বিশেষতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যা মোকাবেলায় ইসলাম কি ধরনের কল্যাণমুখী সমাধান দিতে পারে সে ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ও সমন্বিত কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা মুসলিম দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে। এখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশই সীমিত সামষ্টিক অর্থনীতি ও বহির্দেশীয় বৈষম্যের অভিজ্ঞতা লাভ করছে। এটা হ্রাসে সাহায্য করতে পারে এরূপ একটি পন্থা বা কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যাতে এসব দেশ এখন পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, চাহিদা পূরণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় ও সম্পদ হ্রাসে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অবকাঠামোর মধ্যে মুসলিম দেশগুলো অনুরূপ কর্মকৌশল উদ্ভাবন করতে পারবে কি? তাদের লক্ষ্য সফল করতে ইসলাম কি সাহায্য করতে পারে? যদি পারে, তবে কোন ধরনের ইসলামি শিক্ষা প্রযোজ্য হবে? এসব প্রশ্নের ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রকাশপূর্ব পর্যালোচনার অংশ বিশেষ

এটি একটি চমৎকার কর্ম... ; বইটিতে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দোষ এবং গুণ উভয় বিষয়ই সুতীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে... তাঁর মেধা ও মনন সম্পূর্ণরূপে রক্ষণশীল ও আধুনিকতম একই সঙ্গে তাঁর লেখার কৌশল স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। মানবজাতির কল্যাণে তিনি মানবিকতা ও গভীর উদ্বেগ নিয়ে বইটি লিখেছেন। সমাজের নৈতিক সমস্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে তাঁর বিশ্লেষণ খুবই মূল্যবান...

কোরআনের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার সাথে আধুনিক অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে ইসলামি অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করাই হচ্ছে লেখকের পরিকল্পনা এবং তা সত্যিই বাস্তবধর্মী। ইসলামি সংস্কৃতির বাইরের লোকদের ইসলাম বুঝাতে এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা যদি নিজেরাই গুরুত্বের সঙ্গে বইটির বক্তব্য গ্রহণ করেন তাহলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হবে।

-Prof. Kenneth E. Boulding ***Distinguished Prof. of Economics, Emeritus Institute of Behavioural Science, University of Colorado at Boulder.***

এটি একটি সর্বাধিক সুপাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ব্যাপক গবেষণামূলক উন্নতমানের স্টাডি- যা এ ধরনের একজন সম্মানিত ইসলামি অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকেই কেবল আশা করা যেতে পারে এ ধরনের কাজ ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ক সাহিত্যে অবশ্যই একটি অনবদ্য অবদান।

-Prof. Rodney Wilson. *University of Durham.*

ইসলামি অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে প্রকৃত কাজের প্রশংসনীয় উদ্যোগ হচ্ছে এ বইটি...। ভিত্তি ভূমি অতিক্রম করার এটি একটি প্রয়াস যাতে আধুনিককালের ও পাশ্চাত্য ধারণার সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতিযোগিতায় ইসলামি অর্থনীতির পরম আদর্শকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর করা হয়েছে।

-Prof Frank E. Vogel, *Harvard Law School.*

... এটি হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাজ... আশা করি বইটি শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, পশ্চিমা বিশ্বের সহকর্মীবৃন্দও পড়বে।

- Prof. Volker Nienhaus. *University of Bochum.*